
Boighar.com
বইঘর নিবেদন
মাসুদ রানা
নরপশু
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগীঃ
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
বইঘর
বইঘর

বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

নরপশু

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ

কাজী মায়মুর হোসেন

অসহায় প্রফেসরের স্ত্রীর নীরব কান্না বাধ্য করল
রানাকে তাঁদের মেয়েকে খুঁজে দেয়ার দায়িত্ব নিতে।
জানত না, জড়িয়ে যাচ্ছে কী গভীর ষড়যন্ত্রে।
কোর্ফিউ দ্বীপে চোখের সামনে দেখল বোমা-বিস্ফোরণে
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মউরোস।
শপথ নিল রানা, শেষ দেখে ছাড়বে।
আমেরিকায় যেতেই পিছু নিল নৃশংস একদল আততায়ী।
এল একের পর এক হামলা! নানান বিপদ উতরে
খুঁজেও পেল ও মেয়েটাকে। কিন্তু কী আছে তার কাছে
যে জন্যে এমন হন্যে হয়ে উঠেছে সিআইএ?
শত্রুর জাল ছিঁড়ে রানা জানল,
ইযরায়েল থেকে শুরু হচ্ছে মহাপ্রলয়! তৃতীয় মহাযুদ্ধে
দুনিয়া হবে নরক! বিসিআই চিফের কথা শুনে নিশ্চিত
মৃত্যুর মুখে আর একবার ঝাঁপ দিল মাসুদ রানা!

সেবা প্রকাশনা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

বইঘর



মাসুদ রানা ৪৫৪

নরপশু

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7454-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-454
NAROPOSHU
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' বায়ান্ন টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা। boighar.com
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে boighar.com
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসন্দ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউণ্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু ◆ নরপশু।

মাসুদ রানা-৪৫৪

নরপশু

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক boighar.com

গ্রিসের সবুজ অরণ্যে ভরা পাহাড়ি দ্বীপ কোর্ফিউ।

জুন মাসের উত্তপ্ত এক রাত।

মাত্র তিন দিন আগে এই দ্বীপে ওই যুবতীকে খুঁজে পেয়েছে তারা। তারপর থেকে চোখ রেখেছে ওর ওপর। আর আজ বুঝেছে, কীভাবে কিডন্যাপটা করবে। অসংখ্য জলপাই গাছের ছায়ায় পাহাড়ের ওপরে নির্জন, বড় এক ভিলা ভাড়া করেছে মেয়েটা। টিলার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঝলমলে নীল সাগরের ঢেউ।

ভিলায় একাই থাকে মেয়েটা। কেউ ভাবতে পারে, ওকে কিডন্যাপ করা সহজ। বাস্তবে তা নয়। ওই বাড়ি সরগরম করে রেখেছে নিমন্ত্রিত অতিথিরা। পার্টিতে দিনরাত চলছে গান-বাজনা, মদ্যপান ও জুয়া। এ কারণেই দূর থেকে চোখ রাখলেও ধারেকাছে ভিড়তে পারেনি কিডন্যাপিং টিম।

অবশ্য, আজকের প্ল্যান একদম নিখুঁত। ভিলায় ঢুকবে। মেয়েটাকে আটক করবে। বেরিয়ে আসবে।

টেরও পাবে না কেউ, উধাও হয়েছে মেয়েটা।

কিডন্যাপিং টিমে তারা সবমিলে আছে চারজন। তিনজন পুরুষ, চতুর্থজন ছাব্বিশ বছর বয়সী এক সুন্দরী। তারা জানে, এই দ্বীপে আজই শেষ দিন ওই মেয়ের। আগামীকাল ভোরেই কোর্ফিউ এয়ারপোর্টে বিমানে উঠবে, চলে যাবে নাগালের বাইরে।

সুতরাং, কাজ সারতে হলে আজই, নইলে আর কখনও নয়। সবদিক ভেবে দেখেছে তারা।

আজ রাতে হারিয়ে গেলে কোথাও কোনও চিহ্ন থাকবে না মেয়েটার।

সকালে কেউ খুঁজবে না ওকে।

সবাই জানে, ও ফিরে যাচ্ছে নিজের দেশে।

দিন ফুরোতেই আকাশে জ্বলে উঠেছে হাজারো নক্ষত্র। সন্ধ্যা থেকে ভিলায় শুরু হয়েছে ফেয়ারওয়েল পার্টি।

স্থানীয় এক রেন্টাল কোম্পানি থেকে সেলুন গাড়িটা ভাড়া করেছে কিডন্যাপিং টিম। ওটা রেখেছে ভিলা থেকে এক শ' গজ দূরে রাস্তার ধারে একঝাড় জলপাই গাছের ছায়ায়।

এখন চুপচাপ বসে ভিলার ওপর নজর রাখছে তারা।

জ্বলছে ভিলার সব বাতি। জোরেশোরে বাজছে মিউযিক। দূর থেকেও আসছে হাসির আওয়াজ। পাথরের সাদা বাড়িটা চমৎকার। তিনদিকে ব্যালকনি। ওখানে নাচছে কপোত-কপোতীরা। রেলিঙে ভর দিয়ে ড্রিঙ্ক করছে কেউ কেউ। কারও কারও চোখ শ্বাসরুদ্ধকর সাগর বা পাহাড়ি দৃশ্যে।

চাঁদের রুপালি আলোয় টলমল করছে নিচের সাগর। তীর থেকে আসছে উষ্ণ, মৃদু বাতাস, তাতে শত শত ফুলের মিষ্টি সুবাস। কখনও কখনও বাড়ির সামনে থামছে একটা-দুটো গাড়ি। ওগুলো থেকে নামছে অতিথিরা।

রাত এগারোটার পর কাজে নামল কিডন্যাপিং টিম।

গাড়ির সামনের সিটে ঠায় বসে থাকল দু'জন। হয়তো অপেক্ষা করতে হবে বহুক্ষণ, তবে এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত তারা। পেছন সিটের দু'জন একবার মাথা দোলাল পরস্পরের উদ্দেশে। চকচকে কালো চুলের খোঁপায় হাত বোলাল সুন্দরী, তারপর ওটা খুলে বেঁধে নিল ইলাস্টিক ব্যাণ্ড। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল মেকআপ। দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে সোজা ভিলার উদ্দেশে চলল তারা। লোকটার হাতে এক

বোতল দামি, স্থানীয় ওয়াইন। ছায়া থেকে বেরিয়ে ওপরের ভিলার মেইন গেট পেরোল তারা। টেরেসে উঠে সদর দরজা দিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতর। পেছন থেকে চেয়ে রইল গাড়ির ভেতরের দু'জন।

ভিলার উজ্জ্বল আলো ও ফুর্তির পরিবেশে নিজেদেরকে চট্ করে মানিয়ে নিল দুই কিডন্যাপার। কথা হলো না পরস্পরের মাঝে। সবার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ট্রেনিং আছে তাদের। ভিড়ের মাঝ দিয়ে চলেছে দু'জন। এমনিতেই প্রচুর মদ্যপান করেছে বলে তাদের দিকে খেয়াল নেই বেশিরভাগ অতিথির। খালি হয়েছে অন্তত পঞ্চাশটা হরেক রকম মদের বোতল। সিগারেটের ধোঁয়ায় আবছামত লাগছে ঘর। শুধু কি সিগারেট, হ্যাশিশ বা মারিইয়ুয়ানার গন্ধও মিশে আছে তার সঙ্গে।

একে একে সবগুলো ঘর ঘুরে দেখছে দুই কিডন্যাপার। প্রতিটি আসবাবপত্র অভিজাত ও দামি। কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেল টার্গেটকে। কাছ থেকে মেয়েটার ওপর সতর্ক চোখ রাখল তারা।

কিছুই জানল না যুবতী। কেড়ে নিয়েছে সবার মনোযোগ। খুব খুশি মধ্যমণি হতে পেরে। কিডন্যাপাররা জানে, দু'হাতে খরচ করছে সে। আরও প্রচুর টাকা পাবে এমন নিশ্চয়তা না পেলে এভাবে অকাতরে টাকা নষ্ট করে না কেউ। আজকের পার্টিতে অভাব নেই শ্যাম্পেনের। মেইন রুমের কোণে সেল্ফ্-সার্ভিস বার থেকে যে-যার মত নিচ্ছে পছন্দের ড্রিঙ্ক। চলছে হরিলুঠ। গলা পর্যন্ত গিলছে বিশেষ করে যুবকরা।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে যেভাবে ছুঁচোর ওপর নজর রাখে, ঠিক সেই দৃষ্টিতে যুবতীকে দেখছে দুই কিডন্যাপার। ভাল করেই জানে, অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে এর ভাগ্যে।

টার্গেটের বয়স পঁচিশ। সুন্দরী। মোনালিসার ছবির মতই

আকর্ষণীয়। গত কিছুদিনে একটু দীর্ঘ হয়েছে সোনালি চুল। রোদে পুড়ে বাদামি হয়েছে ত্বক। সেজন্যেই উজ্জ্বল নীল মনে হচ্ছে হরিণী দুই চোখ। পরনে সাদা সুতির ট্রাউযার ও হলদে সিল্কের টপ। প্রশংসা ও লোভের দৃষ্টিতে ওর দুর্দান্ত শরীরটা দেখছে যুবকরা, মেয়েরা জ্বলে যাচ্ছে হিংসায়।

যুবতীর নাম ক্যাথি হার্বার্ট।

ওর বিষয়ে সবই জানে কিডন্যাপাররা। সম্মানজনক পেশা বেছে নিয়েছে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে। বই লিখেছে। স্কলার। ইতিহাসবেত্তা। বাইবেল বিষয়ক প্রত্নতত্ত্ববিদ। হাজার হাজার পাঠক ও দর্শক বিশ্বাস করে ওকে। এখনও বিয়ে করেনি। ভিড় করে আগ্রহ নিয়ে ওকে ঘিরে রাখে একদল যুবক। তাতে খুব খুশি হয় ক্যাথি। পার্টিতে আসা সুদর্শন যুবকদের নাচের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিচ্ছে না সে। জাতে ক্যাথি ইংলিশ। এসেছে অক্সফোর্ড শহর থেকে। ওর বাবা-মার নামও ভাল করেই জানে কিডন্যাপাররা। তদন্ত করে যুবতীর বিষয়ে প্রায় সব তথ্যই জোগাড় করেছে। এজন্যে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে পর্যাপ্ত টাকা।

কিডন্যাপারদের পরিকল্পনা খুব সহজ।

একটু পর ভিড় থেকে সরে যাবে মহিলা কিডন্যাপার। তখন টার্গেটের কাছে যাবে তার পুরুষ সঙ্গী। ড্রিঙ্ক সাধবে। প্রশংসা করবে ক্যাথির রূপের। পুরুষ কিডন্যাপারের বয়স তিরিশ। মিষ্টি কণ্ঠ। সুদর্শন। তার কাজ হবে যুবতীর মদের গ্লাসে সঠিক পরিমাণের মাদক মিশিয়ে দেয়া।

খুব ধীরে কাজ করবে এমন কেমিকেল ব্যবহার করছে তারা। কাজেই যুবতীকে দেখলে যে-কেউ ভাববে, অতিরিক্ত মদ্যপান করে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনিতেই একটু পর পর ড্রিঙ্ক নিচ্ছে সে। মাদকের কারণে অতিরিক্ত ঘুম পেলে, তখন গিয়ে শুয়ে পড়বে বেডরুমে। শারীরিক কোনও ক্ষতি হবে না। হোস্ট ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলে ভেঙে যাবে পার্টি। যে-যার

মত চলে যাবে ভিলা ছেড়ে। তখন ভাড়া করা সেলুন গাড়ি বাড়ির সামনে আনবে কিডন্যাপাররা। ওদের জন্যে মোটরবোটও অপেক্ষা করছে জায়গামত।

ধরে নেয়া হয়েছে, খুব কঠিন হবে না ক্যাথি হার্বার্টের কাছাকাছি যাওয়া। ধারণা ভুল নয় তাদের। নিজের নাম জানাল যুবক বাড হিগিন্স বলে। মিষ্টভাষী লোক। প্রশংসা দিয়ে তুষ্ট করতে জানে মেয়েদেরকে। মুগ্ধ হয়ে গেছে এমন ভান করল সে। কিছুক্ষণ পর বলল, ক্যাথির জন্যে এক গ্লাস মার্টিনি এনে দেবে কি না।

মদ খেতে কোনওকালেই আপত্তি ছিল না যুবতীর।

বার-এ চলে গেল সুদর্শন কিডন্যাপার। ড্রিঙ্ক মিক্স করে ওটার সঙ্গে মিশিয়ে দিল ভায়ালের মাদক। সত্যিকারের পেশাদার লোক। হাসিমুখে ফিরে এসে ড্রিঙ্ক দিল ক্যাথির হাতে।

'চিয়ার্স,' খিলখিল করে হাসল ক্যাথি। দুষ্টুমির ভঙ্গিতে ওপরে তুলল গ্লাস, যেন টোস্ট করবে। ওর কবজির সোনার ব্রেসলেট ঝিলিক দিল কনুইয়ের কাছে নেমে এসে।

আর তখনই মাঠে মারা গেল কিডন্যাপারদের প্ল্যান।

কিডন্যাপাররা খেয়াল করেনি, একটু আগেও ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ছিল এক লোক। হঠাৎ করেই হনহন করে হেঁটে এসে ক্যাথির সামনে হাজির হলো সে। চট্ করে ধরল যুবতীর কনুই। 'একটু নাচবে আমার সঙ্গে?'

ওই লোককে আগেও ভিলায় কয়েকবার দেখেছে কিডন্যাপাররা। বয়স হবে পঁয়তাল্লিশের মত। হালকা-পাতলা শরীর। পরনে দামি পোশাক। কানের পাশে পাকতে শুরু করেছে চুল। ক্যাথি হার্বার্টের অন্য বয়ফ্রেণ্ডদের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক। এই লোক যে বাগড়া দেবে, কে জানত!

লোকটার কথায় মাথা দোলাল ক্যাথি। গ্লাস রেখে দিল টেবিলের কোণে। মধ্যবয়স্ক লোকটা মাতাল নয়, অথচ অদ্ভুত

কাণ্ড করল সে। তার হাঁটুর গুঁতো লাগল টেবিলে। গাধা না হলে এমনটা করবে না কেউ। কিডন্যাপারদের মনে হলো, ইচ্ছে করেই ওটা করেছে লোকটা। ধাক্কা খেয়ে টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ল মাদক মেশানো ড্রিঙ্ক।

কিডন্যাপারদের কাছে ছিল মাদকের ওই একটাই মাত্র ভায়াল। অসহায়, বিরক্ত চোখে মধ্যবয়স্ককে দেখল পুরুষ কিডন্যাপার।

ক্যাথিকে নিয়ে টেরেস-এ বেরিয়ে গেল লোকটা।

তারাভরা আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে বেশ কয়েকটা জুটি। ধীর তালে বাজছে জ্যায।

দুই ট্রেইণ্ড কিডন্যাপার ঝটপট ঠিক করল, এরপর কী করবে। কথা হলো দু'জনের চোখে চোখে। কেউ জানল না কিছু। নতুন প্ল্যান গুছিয়ে নিয়েছে তারা। ভিড় থেকে বেরিয়ে ঘরের পেছনে হারিয়ে গেল দু'জন। আপাতত বাড়ির ভেতর রয়ে যাবে তারা। অতিথিরা বিদায় নিলে একা থাকবে ক্যাথি হার্বার্ট। তখন কাজে নামবে দু'জন। তখনও কঠিন হবে না কিডন্যাপিঙের কাজটা। কোনও তাড়াহুড়ো না করে অনেকের মতই টেরেসে বেরিয়ে এল তারা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চুমুক দিল যে যার ড্রিঙ্কে।

টার্গেট আর মধ্যবয়স্কের মধ্যে আড়াআড়ি একটা সম্পর্ক খেয়াল করছে তারা। কিছুক্ষণ নাচল ক্যাথি আর ওই লোক। কানের কাছে ফিসফিস করে যুবতীকে কী যেন বোঝাতে চাইছে সে। কোনও কারণে খুব উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। তবে আড়াল করতে চাইছে সেটা।

দুই কিডন্যাপার ছাড়া কারও খেয়াল নেই ওদিকে।

মধ্যবয়স্ক যা-ই বলে থাকুক, পাত্তা দিল না ক্যাথি। ভাব দেখে মনে হলো তর্কাতর্কি হবে দু'জনের মধ্যে। তারপর পিছিয়ে গেল লোকটা। হাত বোলাল যুবতীর বাহুতে, সান্ত্বনা দিচ্ছে কী বিষয়ে যেন। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্যাথির গালে চুমু

দিয়ে পার্টি ছেড়ে বিদায় নিল। কিডন্যাপাররা দেখল, নিজের মার্সিডিযে চেপে চলে গেল লোকটা।

ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা একত্রিশ মিনিট।

পৌনে বারোটা বাজতেই হাতঘড়ি দেখল ক্যাথি। অপ্রত্যাশিতভাবে হাতের ইশারা করল অতিথিদের উদ্দেশে। এবার বিদায় হও আমার ভিলা ছেড়ে! নিজে গিয়ে বন্ধ করে দিল ডেকসেট। মিউযিক হঠাৎ করে থেমে যেতেই চারপাশে নামল নৈঃশব্দ্য। অতিথিদেরকে জানাল: অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা এসেছেন এই পার্টিতে। দারুণ কাটল আজকের সন্ধ্যাটা। পরে আবার দেখা হবে। এখন পার্টি ভেঙে দিতে হচ্ছে, ভোরে বিমান ধরতে যেতে হবে আমার এয়ারপোর্টে।

প্রায় সবাই অবাক হলেও মন খারাপ করল না কেউ। আরও অনেক পার্টি আছে। গ্রীষ্মকালে এই দ্বীপে প্রায় প্রতি রাতেই চলে এরকম পার্টি।

বাড়িতে কোথাও লুকিয়ে পড়ার উপায় নেই, বাধ্য হয়ে অতিথিদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল দুই কিডন্যাপার। ভালভাবেই গোপন করেছে হতাশা। জানে, এটা সামান্য সময়ের ব্যর্থতা। হাল ছাড়ার কোনও কারণ তৈরি হয়নি এখনও। রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে পৌঁছে গেল জলপাই গাছের ঝাড়ের নিচে। উঠে পড়ল নিজেদের গাড়ির পেছনের সিটে।

'এবার?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

'আবার অপেক্ষা,' পেছনের সিট থেকে জবাব দিল সুন্দরী।

ভুরু কুঁচকে ফেলল পরিপাটি চুলের লোকটা। 'ইশশ্, এত্ত সময় নষ্ট হলো! পিস্তলটা দাও, ধরে আনি হারামজাদী কুত্তীকে!' তুড়ি বাজাল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। জ্যাকেটের তলা থেকে নাইন এমএম পিস্তল নিয়ে বাড়িয়ে দিল পরিপাটি চুলের দিকে।

অস্ত্রটা খপ্ করে ধরল পরিপাটি। গাড়ি থেকে নেমে

পড়বে, এমনসময় নরম সুরে বলল সুন্দরী, ‘ভুলে গেছ, কারও মনোযোগ আকর্ষণ করা চলবে না? যা করার করতে হবে আড়ালে থেকে।’

‘মরুক শালার অর্ডার। আমি এখনই গিয়ে...’

‘আমরা অপেক্ষা করব,’ আবারও বলল সুন্দরী। শীতল চোখে তাকাল পরিপাটি চুলের দিকে।

ওই দৃষ্টি দেখে থমকে গেল লোকটা।

ঠিক তখনই শোনা গেল মোটর সাইকেল স্টার্টের গর্জন।

বাজে রাত ঠিক বারোটা।

সুযুকি বার্গম্যান স্কুটারে চেপে তুমুল বেগে প্রায় উড়ে চলেছে ক্যাথি হার্বার্ট। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে শীতল, ঝোড়ো হাওয়া এলোমেলো করে দিচ্ছে ওর চুল।

একটু পর দেখল, পেছনে আসছে একটা গাড়ি। ওটার হেডলাইটের কারণে আলোকিত হয়ে উঠেছে সামনের পথ। বারকয়েক নিভে আবারও জ্বলে উঠল হেডলাইট। থামতে সিগনাল দেয়া হচ্ছে ক্যাথিকে।

লোকটা কে, ভাবল ও। পার্টি থেকে বিদায় নেয়া কেউ? অবাক কাণ্ড! ভিলার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসার সময় ধারেকাছে কোনও গাড়ি দেখেনি ও।

থ্রটল আরেকটু মুচড়ে ধরল ক্যাথি। দু’পাশে সাঁই-সাঁই করে পিছনে পড়ছে গাছের সারি। মাঝের দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছে ও। প্রচণ্ড বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওর দীর্ঘ চুল ও পোশাক। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল, বেশ পেছনে পড়েছে গাড়িটা।

আনমনে হাসল ক্যাথি। কালকে ফিরছে অক্সফোর্ডে, তার আগে শেষবারের মত মায়াবী এই আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে ছুটে যেতে দারুণ লাগছে। ওর সব ব্যাগেজ নিজের বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে প্যাসিফিকো।

লটবহর নিয়ে স্কুটারে করে যাওয়া কঠিন কাজ।

চার শ' সিসির স্কুটার ছুটতে পারে প্রচণ্ড বেগে, ভয়ই লাগে ওর। তবে উত্তেজনা ও ঝুঁকির আকর্ষণ কখনও এড়াতে পারে না ও। থ্রটল আরও খুলে দিল ক্যাথি। ঠোঁটে ফুটে উঠল ফুর্তির হাসি।

তখনই আবার আয়নায় দেখল ওই হেডলাইট। ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে স্কুটারের পেছনে হাজির হয়েছে গাড়িটা। এবার চলে এসেছে খুব কাছে। উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ক্যাথির। একটু কমিয়ে নিল গতি। সরে গেল কিনারে, চাইছে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাক গাড়িটা।

কিন্তু তা করল না ড্রাইভার। আসছে ঠিক পেছনে। গতি কমছেও না, বাড়ছেও না। অস্বস্তি বোধ করছে ক্যাথি। ড্রাইভারের উদ্দেশে হাতের ইশারা করল। ওভারটেক করে নিজের পথে চলে যাক লোকটা। কিন্তু একই দূরত্বে রয়ে গেল ড্রাইভার। সুযুকির মৃদু খির-খির শব্দের ওপর দিয়ে শক্তিশালী গাড়িটার ইঞ্জিনের গর্জন শুনছে ক্যাথি।

আস্ত কোনও গাধা চাইছে রেস করবে। মেজাজ গরম হয়ে উঠল ক্যাথির। দাঁড়া, হারামজাদা, দেখিয়ে দিচ্ছি রেস কাকে বলে!

থ্রটল মুচড়ে ধরে কাত হয়ে সামনের বাঁক পেরিয়ে গেল ও। দু'দিকে দুলতে দুলতে তুলল ঝড়ের গতি। পিছু নিল ওই গাড়ি। থ্রটল আরও খুলে মাঝের ব্যবধান বাড়িয়ে নিল ক্যাথি। অবশ্য, তাতে লাভ হলো না। আবারও পেছনে হাজির হলো গাড়িটা। ক্যাথির ভয় হলো, পেছনের লোকটা বোধহয় ওকে পিষে মারতে চায়!

ধক্-ধক্ করছে ওর হৃৎপিণ্ড। গভীর রাতে পাহাড়ি নির্জন পথে রেস করা এখন আর মজার বলে মনে হচ্ছে না। রকেটের বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে দু'পাশে গাছের সারি।

একটু দূরে দেখল ডানে সরু পথ। ওটা গেছে পরিত্যক্ত

এক ফার্মহাউসের দিকে। আগেও দু'একবার ওদিকটা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছে। পথ শেষ হয়েছে লোহার বিশাল গেটের সামনে। কড়ায় ঝুলছে তামার তালা। কিন্তু গেটের কলামের পাশেই ধসে গেছে দেয়াল। ওখানে যে ফোকর তৈরি হয়েছে, ওটা দিয়ে স্কুটার নিয়ে ঢুকতে পারবে যে-কেউ।

কাত হয়ে ফার্মহাউসের পথে নেমে গেল সুযুকি স্কুটার। আরেকটু হলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। নরম মাটিতে পিছলে গেছে চাকা। পড়তে পড়তেও সামলে নিল ক্যাথি। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল, আবারও কাছে চলে এসেছে গাড়ির হেডলাইট।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওর। কী চায় লোকটা?

সামনে থেকে তীরের বেগে এগিয়ে আসছে চওড়া গেট। আর বড়জোর ত্রিশ গজ। বিশ...

কড়া ব্রেক করল ক্যাথি। টলমল করে উঠল স্কুটার। পরক্ষণে ঢুকে পড়ল ভাঙা দেয়ালের অংশ দিয়ে। স্কুটারের প্লাস্টিকের বাড়তি অংশ লাগল দু'দিকের দেয়ালে। গেটের সামনে ব্রেক করে থামল পেছনের ওই গাড়ি। আবারও ওটার আলো দেখল ক্যাথি রিয়ার ভিউ মিররে। পরক্ষণে পেছনে হারিয়ে গেল ওই আলো।

প্রতিযোগিতায় জিতে খুশির হাসি হাসল ক্যাথি। এক সেকেণ্ড পর আয়নায় চোখ রেখে দেখল, গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে কয়েকজন। তাদের হাতে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট। দৌড়ে আসছে তারা। দু'একজনের হাতে পিস্তল!

পেছনে 'বুম!' করে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

ক্যাথি টের পেল, ভীষণভাবে থরথর করে কেঁপে উঠেছে স্কুটার। গুলি লেগে বিস্ফোরিত হয়েছে পেছনের চাকা।

ছুটন্ত স্কুটার চলে গেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হঠাৎ করেই ক্যাথি টের পেল পিছলে পড়ছে। দ্রুতবেগে উঠে এল মাটি! মাথায় ঠাস করে কী যেন লাগতেই জ্ঞান হারাল ও।

দুই

এস্টেটের সোনাপানি করা চওড়া মেইন গেট এখন খোলা।

ঠাণ্ডা আমেজ। চারপাশে ফুলের সুবাস।

গাড়ি আর্চওয়ে পেরোতেই হরিৎ এক সুড়ঙ্গে ঢুকল রানা। কারও ব্যক্তিগত এই পথে বাঁক নিতেই পেছনে পড়ল গাছের সারি। দূরে রাজা জর্জের আমলের কাউণ্টি হাউস। সামনে মখমলের মত বিছিয়ে আছে নিয়মিত ছাঁটা মসৃণ, সবুজ ঘাস ও নানান ধাঁচের স্কাল্পচার করা লন। অডি গাড়ির চাকার নিচে কুড়মুড় শব্দ তুলছে নুড়িপাথর। পার্কিং লটে বেণ্টলি, রোল্স্ রয়েস ও জাগুয়ারের মত দামি গাড়িগুলোর পাশে গিয়ে থামল রানা।

কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল, তারপর টাই ঠিক করে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ওর পরনের কোট অত্যন্ত দামি। কিনেছে আজকের বিশেষ এই অনুষ্ঠানের জন্যেই। বাকি জীবনেও হয়তো আর ব্যবহার করবে না। মৃদু বাতাসে ভেসে আসছে ব্যাণ্ডের বাজনা। ওই আওয়াজ অনুসরণ করে লন পেরিয়ে বাড়ির পেছনে চলে এল রানা। প্রথমবারের মত বুঝল, বিশাল এলাকা নিয়ে এই এস্টেট।

লনের একপাশে ডোরা-কাটা মস্তবড় এক তাঁবু। ওখানে ভিড় করেছে অতিথিরা। চলছে গল্প। হাসিখুশি সবাই। দীর্ঘ কয়েকটি টেবিলে রাখা হরেক রকম খাবার ও দামি ড্রিঙ্ক। ট্রে হাতে নানাদিকে ছুটছে ওয়েটাররা। মহিলাদের পরনে গ্রীষ্মকালীন পোশাক, মাথায় ফুল গোঁজা হ্যাট।

অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে এই ওয়েডিং রিসেপশনে, ভাবল রানা। বোধহয় গত কয়েক মাসে বড় দাঁও মেরেছে জ্যাঁ মউরোস। সাত মাসের বেশি দেখা নেই। তারপর হঠাৎ করেই আজ লণ্ডনে রানা এজেন্সিতে এল ওই বিয়ের কার্ড।

সবসময় বন্ধুদেরকে বিস্মিত করতে ভালবাসে মউরোস। ফোন করলে সারপ্রাইয থাকে না, তাই চুপচাপ থেকেছে। শুধু কার্ডের সঙ্গের চিঠিতে লেখা ছিল: 'প্রেমিকার চাপে হঠাৎ করেই বিয়ে করছি। বন্ধুদের কাউকে পেলাম না পাশে। ইউরোপেই নেই কেউ। তবে, রানা, জেনে গেছি, তুমি কিন্তু ইংল্যাণ্ডেই আছ। যদি আমার বিয়েতে না আসো... বউয়ের কাছে লজ্জায় কান কাটা পড়বে আমার। প্লিয, রানা, এই বিপদ থেকে আমাকে বাঁচাও, ভাইটি আমার!'

বেশ কয়েকটি জুটির সঙ্গে লনে নাচছে মউরোস আর ওর বউ। ওদিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। জাতিতে ফ্রেঞ্চ ওর বন্ধু, আদব-কায়দাও অন্যরকম। কাজ নিয়েছিল মস্ত বড়লোকের মেয়ের বডিগার্ডের। কিন্তু ওকে বিয়ে করতে পাগল হয়ে উঠল মেয়েটা। নিজেও পটে গেল মউরোস। আজ সেই মেয়েকে বিয়ে করেছে।

দূরে সরে মিউযিক শুনছে রানা, দেখছে অতিথিদেরকে। কিছুক্ষণ পর থামল বাজনা। লনের আরেকদিকে রানাকে দেখে হাত নাড়ল মউরোস। চুমু দিল স্ত্রীর গালে। কী যেন বলল। হেসে ফেলল মেয়েটি, বান্ধবীদের সঙ্গে চলল তাঁবুর দিকে।

নতুন বাজনা বাজাতে লাগল ব্যাণ্ড পার্টি।

রানার দিকে পা বাড়াল মউরোস। খুশিতে ঝলমল করছে দুই চোখ। প্রথম সুযোগেই রানার হাতটা ভরে ফেলল মুঠোর ভেতর। 'দোস্ত, মনটা ছোট হয়ে গিয়েছিল, সত্যিই বুঝি এই অনুষ্ঠানে এল না কোনও বন্ধু!'

'এমনটা ভাবলে কেন?' মাথা নাড়ল রানা। 'জরুরি সব

কাজ ফেলে আসতে চেয়েছে অনেকেই। কিন্তু শুনলাম তুমি নিজেই নাকি বাধা দিয়েছ— কাজ আগে, পরে বিনোদন।'

মাথা দোলাল মউরোস। 'কথা ঠিক।' হাতের ইশারায় দেখাল দিগন্ত পর্যন্ত জমি ও সবুজ অরণ্য। 'এবার আমাকেও খুঁজে নিতে হবে ভাল কোনও কাজ। আমার বউয়ের বাবার সম্পত্তি এসব। তাঁদের একমাত্র মেয়ে জোয়ি। ও আর আমি চেয়েছিলাম কোর্ট ম্যারেজ করে নেব। কিন্তু ওর বাবা-মায়ের জেদাজেদিতেই এই অনুষ্ঠান। টাকার অভাব নেই তাঁদের।' পাশ দিয়ে এক ওয়েটার যাচ্ছে দেখে তার কাছ থেকে শ্যাম্পেনের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিল মউরোস। বন্ধুকে ইশারা করে পা বাড়াল একটু দূরের এক টেবিল লক্ষ্য করে। 'একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

টেবিলে পাশাপাশি চেয়ারে বসল ওরা। রানা বলল, 'বলে ফেলো। জটিল কোনও সমস্যা?'

'ধীরেসুস্থে বলছি,' শ্যাম্পেনের বোতলের মুখ খুলে গ্লাসে সোনালি তরল ঢালল মউরোস। গ্লাসে যোগ করল বরফের টুকরো।

রানার চোখ পড়েছে একটু দূরের এক তরুণের ওপর। 'তোমার খালাত ভাই না?'

'ওকে মনে আছে?' অবাক হলো মউরোস। 'শেষ দেখেছ অন্তত পাঁচ বছর আগে! বদলে গেছে দেখতে। চিনলে কী করে ওকে?'

'কখনও কাউকে দেখলে তার চেহারা মনে থাকে আমার।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'কাজের কথায় এসো, কী ধরনের সমস্যা তোমার?'

আস্তে করে মাথা দোলাল মউরোস। বড় করে দম নিয়ে বলল, 'পরস্পরকে ভালবাসি জোয়ি আর আমি। এদিকটাতে কোনও ঝামেলা নেই।' চুপ মেরে গেল ও।

'তা হলে সমস্যা পর্যাপ্ত টাকার?'

দূরে বাজছে ব্যাঙের বাজনা।

'বুঝতেই পারছ, হবু শ্বশুরের চাকরি করতে চাইনি। এদিকে বেশ কয়েক মাস ধরে ভাল কোনও কাজও পাচ্ছি না। ঝুঁকি আছে এমন কোনও চাকরিও নিতে দেবে না জোয়ি।'

'অযৌক্তিক নয় ওর কথা,' বলল রানা।

'অর্থনৈতিক মন্দার সময় এখন।' মাথা নাড়ল মউরোস। 'এদিকে সংসার করতে হলে চাই ছোটখাটো একটা বাড়ি। তাই চুক্তি করেছি ব্যাঙ্কের সঙ্গে। বিয়েতে যে ক্যাশ উপহার পেয়েছি, তা দিয়ে চালাতে পারব পাঁচ মাসের মর্টগেজের পেমেন্ট। এরপর কী করব জানি না। কাজই যখন নেই, তো পাব কোথায় ভাল চাকরি! ভবিষ্যতে কী করব ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে আমার।'

'জোয়ি কোনও চাকরি করে?' জানতে চাইল রানা।

'দাতব্য এক সংস্থায়। বেতন খুব কম।'

'ফ্রেঞ্চ আর্মিতে কিন্তু দক্ষ লোকদের জন্যে প্রচুর ডেস্ক জব আছে,' বলল রানা। 'অ্যাপ্লাই করে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল মউরোস। 'আমার বউয়ের পরিবারের প্রবল আপত্তি আছে আর্মির ব্যাপারে। যুদ্ধের গন্ধ পান তাঁরা। চাপ দিতে শুরু করেছেন আমার শ্বশুর। তাঁর চেয়েও বেশি জোর দিচ্ছেন শাশুড়ি। তাঁদের ব্যবসায় যেন মন দিই। ভাবতে পারো, জ্যাঁ মউরোস বিক্রি করছে মোবাইল ফোনের রিং টোন? আমি তো খুন হয়ে যাব!'

'আমার তো কাজটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে,' হাসল রানা। 'গোলাগুলি নেই, শুধু শুনবে মিষ্টি সব আওয়াজ।'

'আমার বন্ধু হয়ে এমন পাষাণের মত কথা বলতে পারলে, রানা?' দুঃখে গলা ভেঙে গেল মউরোসের। মাথা নাড়ল। 'আমি আত্মহত্যা করব। তার আগে তিক্ততা তৈরি হবে জোয়ির সঙ্গে আমার।' তুলে নিয়ে ঢকঢক করে পুরো শ্যাম্পেনের বোতল খালি করে ফেলল মউরোস।

‘তোমার বিয়েতে কোনও উপহার দিইনি,’ বলল রানা। ‘কাজে এলে হাজার কয়েক পাউণ্ড নিতে পারো আমার কাছ থেকে।’

‘আগে ধার নিতাম, শোধও করে দিতাম; কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ নিতে পারব না বলে ধারও নেব না। শোধ করার সাধ্য নেই।’

‘তা হলে কী করতে চাও?’

‘রানা এজেন্সি তো মাঝে মাঝে কিডন্যাপিং কেস পায়, তাই না? আলাপের মাধ্যমে জিম্মি ছুটিয়ে নেয়ার মত তেমন কোনও সহজ কেস পেলে...’

‘তেমন কোনও কেস পেলে জানাব। তবে তাতেও বিপদ হতে পারে। রাজি না-ও হতে পারে তোমার স্ত্রী।’

‘ওকে বলব, চাকরি নিয়েছি সিকিউরিটি কন্সালটেন্টের।’

গ্লাস খালি করে ফেলেছে রানা।

‘বিয়ের পর নিজ দায়িত্ব বুঝে চলতে হয়,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল মউরোস। ‘টাকা ধার নিয়ে পরে শোধ করতে পারব না, তেমন মানুষ নই। এখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে আকাশ।’ দূরে তাকাল মউরোস। ‘সহজ কাজ হলে জানিয়ো। প্রচুর টাকা লাগবে এমন নয়। আগে পেট তো চালাতে হবে।’

ওদের টেবিলের দিকে হনহন করে হেঁটে আসছে জোয়ি থম্পসন। মেহেদি রঙা চুল, বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী। নাকে নাকফুল। একটু উঁচু চোয়াল। তাতে খারাপ লাগে না দেখতে। পরনে দামি পোশাক। চোখের কঠোর দৃষ্টিতে সন্দেহ। রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা।

জোয়ির সঙ্গে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল মউরোস।

‘আপনার কথা অনেক শুনেছি,’ রানাকে আপাদমস্তক দেখল জোয়ি। ‘দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, কঠোরে-কোমলে মেশানো মানুষ। জান দিতে পারেন বন্ধুদের জন্যে। মউরোসের সঙ্গে

আপনার সব অভিযানের গল্প জানি। মনে মনে প্রশংসা না করে পারিনি।'

চুপ করে মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে রানা।

'এবার নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে প্রস্তাব দেবেন আপনার কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেয়ার জন্যে?' কড়া সুরে জানতে চাইল জোয়ি।

'জোয়ি, ভুলে গেছ রানাকে দাওয়াত দিয়েছি আমি?' রাগে-লজ্জায় লাল হয়ে গেছে মউরোসের গাল।

স্বামীকে পাত্তা না দিয়ে সরাসরি রানার চোখে তাকাল জোয়ি। 'আমি চাই না মউরোসকে বিপজ্জনক কোনও কিছুর ভেতর জড়ান আপনি।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' নরম সুরে বলল রানা।

ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করল জোয়ি। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এবার, প্লিয, ফেরত পেতে পারি আমার স্বামীকে? ...আপনার সঙ্গেও পরিচিত হতে চাইছে একজন।'

জোয়ির আঙুল অনুসরণ করল রানা। তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী এক যুবতী। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। সরাসরি চেয়ে আছে রানার দিকে।

'ওর নাম জেনি হাওয়ার্ড,' বলল জোয়ি, 'ওর বাবা-মা প্রায় কিনে ফেলেছে শ্রপশায়ার। অসম্ভব ধনী। এমন কী আমার বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি। ভারবিয়ারে সময় কাটায় শীতে, ড্রাইভ করে ল্যাম্বোরগিনি। আমার কাছে জানতে চেয়েছে, মউরোসের পাশে কালো চুলের লম্বা ওই বাদামি যুবক কে।'

'এমন একজন, যাকে কখনও পাবে না ওই মেয়ে,' বলল মউরোস।

কঠোর চোখে স্বামীকে দেখে নিয়ে বলল জোয়ি, 'যান না, গিয়ে বলুন ওর সঙ্গে নাচতে চান?'

‘জোয়ি...’ শুরু করেছিল মউরোস...

‘আমি তো নাচই জানি না!’ বন্ধুর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। ‘ঠিক আছে, তোমাদের দারুণ পার্টিতে এসে খুব ভাল লাগল। পরে দেখা হবে।’ চেয়ার ছেড়ে রওনা হয়ে গেল ও।

পেছন থেকে বলল অসহায় মউরোস, ‘পরে ফোনে কথা হবে, রানা!’

জবাবে মাথা দোলাল রানা। তাঁবু পেরোবার সময় চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। ওর দিকে আসছে জেনি হাওয়ার্ড। ঝলমল করছে সিল্কের নীল ব্লাউয, মানিয়ে গেছে আকাশী দুই চোখের মণির সঙ্গে। ‘হাই,’ মিষ্টি কণ্ঠে বলল মেয়েটি। ‘আমি জেনি হাওয়ার্ড। আপনি কি সত্যিই মিস্টার মউরোসের বন্ধু?’

‘ডাহা মিথ্যা বলেছে কেউ,’ জানিয়ে দিল রানা। ‘আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। পরে হয়তো কখনও দেখা হবে।’

থমকে গিয়ে বিস্মিত চোখে দেখল সুন্দরী, ওকে পাত্তা না দিয়ে কার-পার্কিং লটের দিকে চলেছে বাঙালি যুবক।

তিন

বিকেল পেরিয়ে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা।

অক্সফোর্ড শহরের সামারটাউন।

সদর দরজা বন্ধ করে হলওয়ের কাছে থামলেন প্রফেসর জন হার্বার্ট। ফুলদানীর পাশের ওক কাঠের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে দিলেন গাড়ির চাবি। কয়েক পা হেঁটে কাঠের ডেস্কে রাখলেন হাতের ব্রিফকেস।

থমথম করছে বাড়িটা। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। আজ ফেরার কথা ক্যাথির। তাঁর মেয়ে বাড়িতে থাকলে লিভিংরুমের হাই-ফাই সেট-এ ফুল ভলিউমে বাজে হার্ড রক মিউযিক।

খোলামেলা মস্ত কিচেন। প্যাশিয়োর দিকে একটা জানালা খোলা। ওই পথে আসছে বাগানের ফুলের মিষ্টি সুবাস। প্রফেসরের মনে পড়ল, গতরাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে ফ্রিযে রেখেছেন আধখালি ওয়াইনের বোতল। ফ্রিয খুলতেই দেখলেন, তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে সদ্য তৈরি চকোলেট মুস। ওটা খুব প্রিয় ক্যাথির। ও বাড়ি ফিরলে সবসময় ওই পুডিং তৈরি করে ওর মা।

বোতল থেকে গ্লাসে ঠাণ্ডা ওয়াইন ঢেলে নিলেন প্রফেসর, চেহারায় বিরক্তি। গ্লাসে মৃদু চুমুক দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে পা রাখলেন বাগানে। ফুলের বেডের কাছেই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী। পাশেই রঙচঙে তাজা ফুলে ভরা ট্রে।

মুখ তুলে স্বামীকে দেখে হাসলেন মহিলা। 'আজ বেশ তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?'

'ও কোথায়?'

'এখনও আসেনি।'

'আওয়াজ নেই দেখেই বুঝেছি। এতক্ষণে তো ওর চলে আসার কথা।'

নরম মাটিতে কর্ণিক গাঁথলেন রিয়ানা হার্বার্ট। উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে ঝাড়লেন ধুলোবালি। চোখ স্থির হলো স্বামীর হাতের ওয়াইনের গ্লাসের ওপর। 'দেখে তো দারুণ মনে হচ্ছে।' স্ত্রীর হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিলেন প্রফেসর। ওয়াইনে চুমুক দিয়ে জিভ চাটলেন রিয়ানা, তারপর নরম সুরে বললেন, 'চিন্তা কোরো না। জানোই তো ও কেমন। হয়তো কোনও বন্ধুর কাছে লণ্ডনে রয়ে গেছে।'

'ওর উচিত ছিল সরাসরি চলে আসা। এত বেশি বন্ধু

ভাল কথা নয়। আজকাল আমাদের সঙ্গে আর দেখাই হয় না ওর।'

'এখন তো আর ছোটটি নেই। পুরো পঁচিশ বছর।'

'সেক্ষেত্রে ওর উচিত বড়দের মত আচরণ করা।'

'পরে নিশ্চয়ই ফোন দেবে। তারপর কালকে হাজির হবে হঠাৎ করে।'

'তুমি ওকে বেশি বাড়তে দিয়েছ,' বিরক্তি নিয়ে বললেন প্রফেসর হার্বার্ট। 'ওর প্রিয় পুডিংও দেখলাম ফ্রিযে।'

রিয়ানা হাসলেন। 'আমার চেয়ে কম আদর করো না তুমি ওকে।'

বাড়ির ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে প্রফেসর বললেন, 'উচিত ছিল ফোনে জানিয়ে দেয়া, ও কোথায় আছে। তা হলে অন্তত দুশ্চিন্তা করতাম না।'

চার

গ্রিস, প্যাক্সোস দ্বীপ।

হাঁফিয়ে উঠে জেগে গেল ক্যাথি হার্বার্ট। চোখের পাতা মেলতেই দেখল, মুখে পড়ছে কড়া রোদ। বারকয়েক চোখ পিটপিট করল। ঠিকভাবে দেখতে চাইছে, কিন্তু সব ঝাপসা। প্রথমেই মনে হলো: আমি আছি কোথায়?

মিনিটখানেক পর কমল মগজের ঘোলাটে ভাব।

হ্যাঁ, ও আছে একটা বেডরুমে।

কিন্তু কার বেডরুম?

ওর নিজের?

কিছুই তো মনে পড়ছে না!

বুকে অদ্ভুত এক অনুভূতি টের পেল ক্যাথি।

নারকেলের ছোবার মত কর্কশ এক ম্যাট্রেসে শুয়ে আছে ও। গায়ে কুঁচকে যাওয়া পুরনো চাদর। ধড়মড় করে উঠে বসল ক্যাথি। শরীরের একপাশে টনটনে ব্যথা। কুঁচকে গেল ওর গাল। চেপে ধরল পাঁজর। মনে হলো ফেটে গেছে দু'একটা হাড়। দাউ-দাউ আগুনে যেন পুড়ছে মগজ। সিযন করা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে জিভ। হাতের দিকে তাকাল ক্যাথি। ফুলে আছে। ছড়ে-কেটে গেছে। বেশ ব্যথা। নিশ্চয়ই পড়ে গিয়েছিল ওপর থেকে। তখন আত্মরক্ষা করতে গিয়েই হাতের এই বেহাল অবস্থা।

হঠাৎ মনে পড়ল, আলো দেখেছিল। খুব উজ্জ্বল আলো। বিকট আওয়াজ হয়েছিল। কোথায় যেন ভিড় করেছিল অনেক মানুষ। অদ্ভুত এসব স্মৃতি খুবই ঘোলাটে। জড়িয়ে যাচ্ছে একটার সঙ্গে আরেকটা, যেন ছায়া। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে একটা-দুটো কথা। পড়ে যাচ্ছিল ও। তখনই ঠুকে গেল মাথাটা। হাত দিয়ে স্পর্শ করল করোটির পেশি। ফুলে গেছে। চোট লেগেছে জোর।

আসলে কী হয়েছিল?

মন থেকে মেঘের জটলা দূর করতে চাইল ক্যাথি।

বারকয়েক চোখ পিটপিট করে মাথা নাড়ল। না, সত্যিই, কোনও স্মৃতি নেই ওর!

এবার ভয় পেল ক্যাথি। কিছুই মনে পড়ছে না। জানা নেই ও কে, কী করছে এখানে! কী এক সর্বনাশ হয়েছে ওর! হয়তো বহু ওপর থেকে পড়েছিল। তাতে ক্ষতি হয়েছে মগজের। মনে মনে প্রার্থনা করল, বড় কোনও সমস্যা যেন না হয়। যেন ঠিক হয়ে যায় ওর ব্রেন।

শুধু বুঝতে পারছে, পড়েছে মস্তবড় বিপদে!

ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার ধারেকাছে এলে, ফাঁদে পড়া

নিরীহ জন্তুরও বোধহয় এমনই লাগে।

সহজাত অনুভূতি সতর্ক করছে ওকে।

দেরি কোরো না! পালাও! পরের কথা ভাবতে হবে না! আগে প্রাণে বাঁচতে চেষ্টা করো!

ঘরে ও ছাড়া আর কেউ নেই। মৃদুমন্দ হাওয়ায় উড়ছে জানালার পর্দা। বাইরের ব্যালকনিতে বসে আছে এক লোক।

গলা আরও শুকিয়ে গেল ক্যাথির।

রোদে ডেক-চেয়ারে বসে থাকা লোকটার হাতে পিস্তল! ওটা দেখতে অনেকটা বাক্সের মত। নল তাক করে রেখেছে ওর দিকেই!

প্রথমে ক্যাথি ভেবেছিল, এদিকেই চেয়ে আছে লোকটা। কিন্তু খুব ধীরে ধীরে নড়ছে তার বুক। জেগে থাকলে ঠিকই দেখত, ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে ও। সাগর থেকে আসা হালকা বাতাসে উড়ছে লোকটার পরিপাটি চুল। পায়ের কাছে ওউযোর খালি বোতল।

দাঁতে দাঁত চেপে শরীরের ব্যথা সয়ে বিছানা থেকে নামল ক্যাথি। এক পা রাখল টাইল করা মেঝেতে। ঠাণ্ডা।

নড়ল না লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে বিছানা থেকে সরে গেল ক্যাথি। বনবন করে ঘুরছে মাথা। বিমানের ডানার মত দু'দিকে হাত বাড়িয়ে ঠিক করে নিতে চাইল ভারসাম্য। দেখল, ওর পরনে ময়লা সাদা প্যান্ট, হলদে টপ। ঘামে চট্-চট্ করছে গা। এই পোশাকেই আছে ও এখনও। ছিঁড়ে গেছে প্যান্টের ডান হাঁটু। শরীর ভরা ধুলোবালি। ব্যথা ডানদিকেই বেশি। বুঝে গেল, পতনের সময় পড়েছে ওদিকে কাত হয়ে।

বিছানার পাশে হিলওয়ালা স্যাণ্ডেল। ওটা মানিয়ে গেছে ওর হলদে টপ-এর সঙ্গে। স্যাণ্ডেল কি ওর? জানা নেই। স্ট্র্যাপ ধরে স্যাণ্ডেল নিয়ে দরজার দিকে চলল ও। প্রার্থনা করছে, চেয়ারে ঘুমিয়ে থাকা লোকটা যেন চট্ করে জেগে না

ওঠে।

আস্তে করে দরজার হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিল ক্যাথি। ভাবছে, ওটা লক থাকবে। কিন্তু মৃদু ক্লিক আওয়াজে খুলল দরজা। বুকের ভেতর মস্ত এক লাফ দিল ওর হৃৎপিণ্ড। শব্দ না করেই বেরিয়ে এল সামনের করিডোরে। একটু এগোলেই নিচে যাওয়ার সিঁড়ি। পা টিপে-টিপে করিডোর পেরিয়ে ধাতব রেলিঙের পাশ থেকে উঁকি দিল নিচে। কারা যেন আলাপ করছে বাড়ির ভেতর কোথাও। শুনল এক মহিলা কণ্ঠ। হেসে উঠল এক লোক।

হাতুড়ির মত পাঁজরে ধুপ-ধাপ বাড়ি মারছে ক্যাথির হৃৎপিণ্ড। সিরামিক টাইলের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে লাগল। ব্যথায় কুঁচকে ফেলেছে মুখ। ভীষণ ভয়ের কারণে ওকে খুব সতর্ক করে তুলেছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। জানা নেই, আছে কোথায়। পরিষ্কার বুঝল, প্রথম সুযোগেই এখান থেকে বেরোতে হবে ওকে।

শব্দ না করেই নিচতলায় নামল ক্যাথি। ওপরের বেডরুম থেকে দৌড়ে এল না কেউ। কোনও বিপদও হলো না।

সিঁড়ি শেষ হতেই সামনে পড়ল আরেকটা দরজা। ওটা খোলা। বাইরে থেকে আসছে ঝলমলে সোনালি রোদ। এক হাতে স্যাণ্ডেল, অন্য হাতে পাঁজর চেপে ধরে ছোট্ট টেরেসে বেরিয়ে এল ক্যাথি। চাতালে ছোট সব টবে রাখা ফুলের গাছ। ওগুলো পাশ কাটিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে সাদা পাথরের সৈকতে নেমে পড়ল ও। আগুনের মত গরম নুড়িপাথর বেশ ধারালো, খচ-খচ করে বিঁধছে পায়ে। স্যাণ্ডেল পরে নিল ক্যাথি। ওগুলো অচেনা কারও হলেও মানিয়ে গেছে একদম মাপে মাপে।

সৈকত ধরে এগোল ক্যাথি। মাঝে মাঝে ঘুরে দেখছে সাদা বাড়িটা। জানালায় শাটার, ছাত লাল টাইলের। দোতলার ব্যালকনিতে লোকটাকে দেখল ক্যাথি। ওর দিকে

পিঠ দিয়ে বসে আছে ডেক-চেয়ারে। বাড়ির পেছনে উঁচু ক্লিফে চড়েছে জঙ্গুলে জমি। ওদিক দিয়ে উঠতে পারবে না ক্যাথি। হতাশ হয়ে চারপাশ দেখল।

সৈকত ফাঁকা। তবে একটু দূরে প্রায় ধসে পড়া কাঠের এক জেটি। একপাশে নোঙর করেছে এক মোটর বোট। মৃদু ঢেউয়ের দোলায় দুলছে এদিক ওদিক।

জেটির দিকে পা বাড়াল ক্যাথি। আগের চেয়ে জোরে হাঁটছে। স্যাণ্ডেলের তিন ইঞ্চি হিলের জন্যে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। বারবার ঘুরে ঘুরে দেখছে ওই সাদা বাড়ি।

না, ওদিকে কেউ নেই।

হয়তো নিরাপদেই বেরোতে পারবে এই বিপদ থেকে।

জেটিতে পৌঁছে গেল ক্যাথি। কাঠের পাটাতন শক্তপোক্ত বলেই মনে হলো। ফস্কা পাথর আর বালির চেয়ে ওটার ওপর দিয়ে যাওয়া সহজ হবে। হাঁটার গতি বাড়াল ক্যাথি। ভুলে গেছে টনটনে ব্যথার কথা।

কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর পেছনে শুনল কর্কশ এক চিৎকার।

ওটা এসেছে বাড়ি থেকেই।

পুরুষকণ্ঠ। রেগে গিয়ে ফাটিয়ে ফেলছে গলা।

ভয়ে বুক ধক-ধক করছে ক্যাথির। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল। ওর হৃৎপিণ্ড যেন এক লাফে বেরিয়ে আসবে পাঁজর ভেদ করে। দোতলার ব্যালকনির পরিপাটি চুলের ওই লোক টেরেসের তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ছুটে আসছে জেটির দিকে, হাতে পিস্তল! চিৎকার করে জঘন্য সব গালি দিচ্ছে সে।

দু'সেকেণ্ড পর বাড়ি থেকে বেরোল আরও তিনজন। এক সুন্দরী যুবতী ও দুই পুরুষ। ক্যাথির দিকে আঙুল তুলল মেয়েটা, পরক্ষণে জেটি লক্ষ্য করে দৌড় দিল তিনজন। চিৎকার করে কী যেন বলছে নিজেদের ভেতর।

জেটির মাঝে পৌঁছে গেছে ক্যাথি। যেতে পারবে বোট

পর্যন্ত। কিন্তু আউটবোর্ড মোটর চালু করতে পারবে কি না, তা জানে না।

গুলি করবে না তো এরা?

কী চায় এরা ওর কাছে?

দুর্বলতা ও ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ক্যাথির পা। টলমল করতে করতে চলল বোটের দিকে। তখনই হোঁচট খেল এবড়োখেবড়ো কাঠের পাটাতনে। তক্তার মাঝের এক ফাটলে পা পড়তেই মুচড়ে গেছে গোড়ালি। পা টেনে নিতে চাইল ক্যাথি। বেকায়দাভাবে আটকা পড়েছে স্যাণ্ডেলসহ গোড়ালি। উঠে বসে খুলতে চাইল স্ট্র্যাপওয়ালা স্যাণ্ডেল।

জেটির পাটাতনে ধুপ-ধাপ আওয়াজে ছুটে আসছে কেউ। তিন সেকেণ্ড পর ক্যাথির ঘাড়ে ঠেকিয়ে দেয়া হলো পিস্তলের মাযল। কানের কাছে ফোঁস-ফোঁস শ্বাস ফেলছে সে। মুখ তুলে তাকাল ক্যাথি। দাঁত খিঁচিয়ে ওকে দেখছে রাগে অন্ধ পরিপাটি চুলের লোকটা!

পৌঁছে গেল অন্যরাও।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল একজন।

'কুত্তীটা কখন যেন জেগে গিয়েছিল,' কাঁধের ওপর দিয়ে বলল পরিপাটি চুল।

'তুমি কী করছিলে?' কঠোর সুরে জানতে চাইল সুন্দরী যুবতী। 'নিজে ঘুমাচ্ছিলে?'

পরিপাটি চুল জবাব না দিয়ে ঘাড় ধরে টেনে তুলল ক্যাথিকে। ঘাড়ে-পিঠে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

দৌড়ে পালাতে চাইল ক্যাথি। কিন্তু খপ্ করে ধরা হলো ওর দু'হাত। লাথি ছুঁড়তে চাইল ও, প্রাণপণে জুড়ল আর্তচিৎকার।

ওকে কিছুই বলল না কিডন্যাপাররা। নিয়ে চলেছে টেনে হিঁচড়ে। আবারও তুলল দোতলার ঘরে। ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলল। কিডন্যাপাররা এবার ডাক্ট টেপ ব্যবহার

করল ওর দুই গোড়ালি ও হাঁটুতে। উপায় থাকল না হাঁটার।

কাজটা শেষ হলে বেল্টের পেছনে পিস্তল গুঁজল পরিপাটি চুল। খপ্ করে ধরল ক্যাথির ডান কবজি। এত জোরে চাপ দিল, ওর মনে হলো গুঁড়ো হচ্ছে হাতের হাড়। হ্যাঁচকা টানে ওর বাহু ওপরে তুলল লোকটা। ধাতব ঠং-ঠনাৎ আওয়াজ হলো। হ্যাণ্ডকাফের মাধ্যমে বিছানার ফ্রেমের সঙ্গে আটকা পড়ল ক্যাথির ডান কবজি। একইভাবে আটকে দেয়া হলো বাম কবজি।

প্রাণপণে লড়তে চাইল ক্যাথি। তাতে কোনও কাজ হলো না। 'আমার কাছে কী চান আপনারা? ছেড়ে দিন আমাকে! কী চান আপনারা আমার কাছে?'

মুখে ডাক্ট টেপ লাগিয়ে দিতেই থামল ক্যাথির চেঁচামেচি। এখন শুধু দু'চোখ থেকে দরদর করে নামছে অশ্রু।

পরিপাটি চুলের লোকটা বেল্টের পেছন থেকে পিস্তল নিয়ে আবারও নল ঠেকাল ওর মাথার পাশে। শীতল লোহার স্পর্শে ভীষণ ভয়ে সরতে চাইল ক্যাথি। কিন্তু সে উপায় নেই। চোখ বুজে ফেলল ও।

হাসল লোকটা, সরিয়ে ফেলল পিস্তল। পিছিয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাথিকে দেখল কিডন্যাপাররা। ভাল করেই জানে, ওই মেয়ের শক্তি নেই যে লড়বে। দম নিচ্ছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যে-কোনও সময়ে আতঙ্কে জ্ঞান হারাবে ক্যাথি।

কোমরে দু'হাত রেখে ঘাড় কাত করে ওকে দেখছে সুন্দরী যুবতী, ঠোঁটে মৃদু হাসি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপাতত একাই থাকুক। আমাকে ফোন করতে হবে। কাজটা শেষ হলে ওর পেট থেকে বের করব সব।'

'আপনারা কী চান আমার কাছে?' চিৎকার করে জানতে চাইল ক্যাথি, কিন্তু মুখের টেপের কারণে কিছুই বলতে পারল না।

একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কিডন্যাপাররা।

সবার পরে গেল পরিপাটি চুলের লোকটা। তার আগে ঝুঁকে এসে ক্যাথিকে বলল, 'তোমাকে দুরমুশ করার সময় দারুণ মজা পাব আমি। সত্যি!'

পাঁচ

অক্সফোর্ড শহর।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মুখ-হাত ধুয়ে টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যায়াম করেছে রানা। স্নান সেরে জিন্স প্যান্ট ও সুতির সাদা শার্ট পরে নেমে এল হোটেলের রেস্টুরেন্টে। ধীরেসুস্থে সারল ইংলিশ নাস্তা। বিল মিটিয়ে আধঘণ্টা হেঁটে পৌঁছে গেল শহরের প্রাণকেন্দ্রে।

গতকাল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওর ক'জন সহপাঠীর দেয়া ডিনারে যোগ দিতে এই শহরে এসেছিল রানা। হাতে জরুরি কাজ নেই বলে ঠিক করেছে, স্মৃতি-বিজড়িত এই শহরে কাটিয়ে যাবে আরও দু'একটা দিন। ওর বন্ধুরা চাপ দিচ্ছিল, যেন তাদের বাড়িতে ওঠে। কিন্তু হোটেলে স্বস্তি বোধ করবে বলে নরম কথায় তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে রানা।

আপাতত চলেছে বডলিয়ানের উদ্দেশে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড় ও পুরনো লাইব্রেরি ওটাই।

সাতসকালেই মাথার ওপর আগুন ঢালছে সূর্য। হাঁটতে হাঁটতে গরম লেগে উঠতে জ্যাকেট খুলে ফেলল রানা। ওটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি। আবারও যেন ফিরেছে ছাত্রজীবনে। লেখাপড়া ছাড়া আর কোনও দায়-

দায়িত্ব নেই, জীবনে নেই কোনও জটিলতা। সত্যিকারের মুক্ত-বিহঙ্গ।

আনমনে মৃদু হাসল রানা। ওকে অবাক চোখে দেখল এক পথচারী। হয়তো ভাবছে এই যুবক বদ্ধ-পাগল। হাসিটা আরও চওড়া হলো রানার। আপাতত ভুলে গেছে সব অপ্রাপ্তি ও কষ্ট। গুনগুন করে গেয়ে উঠল বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে গিয়েই ব্রেক কষল। না, সুর জ্ঞান ঠিকই আছে, কিন্তু রাম ছাগলের ডাকের মতই লাগছে গলাটা নিজের কানে।

যা, ব্যাটা, তোর ফাঁসি! আর যা-ই হোক, তোকে দিয়ে গান-টান হবে না, মনে মনে রায় দিল রানা। পৌঁছে গেছে বডলিয়ান লাইব্রেরির আর্চওয়েের নিচে। ভাবল, মেইন রিডিং রুমগুলোয় আজও কি আছে পুরনো চামড়া আর বার্নিশ করা কাঠের গন্ধ?

লাইব্রেরিতে ঢুকে সোজা ডেস্কের সামনে থামল রানা। পকেট থেকে বের করে লাইব্রেরিয়ানের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল ওর পুরনো কার্ড। মনে পড়েছে, হাতির মত ইয়া মোটা জেন প্যাটারসনকে। লাইব্রেরিয়ান ওই মহিলা ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মহা এক আতঙ্ক। লালচে দুই চোখে সবাইকে চাইত ভস্ম করতে।

না, যুদ্ধের মাটিল্ডা ট্যাঙ্কের মত বিধ্বংসী জেন এখন আর নেই। সে-জায়গায় মিষ্টি এক মেয়ে। বয়স বড়জোর চব্বিশ। বেণী করেছে বালিরঙা চুল। এক গোছা পড়েছে চোখের ওপর। কার্ড নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত রানাকে দেখল মেয়েটা, তারপর মন দিল কার্ডে। 'বুঝলাম পুরনো ছাত্র, কিন্তু এই কার্ডে তো কাজ হবে না। লাগবে নতুন কার্ড।'

'ও। তা হলে নতুন কার্ড পাওয়া যায় কি না দেখি গিয়ে।'

হাসল মেয়েটা। 'লাগবে না। চিনি আপনাকে। আমার

তিন ক্লাস ওপরে পড়তেন। ...কোন্ বই লাগবে, তা তো লেখেননি ফর্মে!'

'বই পড়তে আসিনি, ঘুরে দেখতে এসেছি,' বলল রানা।

'তো যান, ঘুরে দেখুন,' স্মিত হাসল লাইব্রেরিয়ান।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সরে এল রানা। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দেখছে। রিডিংরুমে গভীর মনোযোগে বই ঘাঁটছে গম্ভীর ক'জন ছাত্র-ছাত্রী। কিছুক্ষণ পর আবার সামনের ঘরে ফিরল রানা। খেয়াল করেছে, প্রথম থেকেই ওকে আগ্রহ নিয়ে দেখছে তরুণী লাইব্রেরিয়ান। চোখে চোখ পড়তেই লাল হচ্ছে দু'গাল। তারপরই তাকাচ্ছে অন্যদিকে। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেল নাকি রে, বাবা?

মেয়েটাকে মধুর এক নায়কোচিত হাসি দিয়ে লাইব্রেরি ছেড়ে বেরিয়ে গেল রানা।

নেই কাজ তো খই ভাজ— অবস্থা ওর।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে শত শত মানুষের ব্যস্ততা। নীরব বডলিয়ানের গভীর পেট থেকে বেরিয়ে এখন কাঠ-ফাটা গরমে মনটা আনচান করে উঠল রানার। ঢুকে পড়ল সামনের প্রথম পাব-এ।

নাহ্, গোটা দুয়েক বিয়ার না খেলেই নয়!

ছয়

গ্রিস, প্যাক্সোস দ্বীপ।

'লাইন কি যথেষ্ট সিকিয়োর? আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ করতে চাই।'

'লাইন সিকিয়োর। তবে আগেই রিপোর্ট দাওনি কেন, পার্কার?'

'একটা সমস্যা হয়েছে।'

চুপ করে আছে ওদিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'মেয়েটার বিষয়ে সমস্যা?'

'জী।'

'খুন করে ফেলোনি তো? আমি কিন্তু তোমাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলাম, যাতে জীবিত থাকে সে।'

'বেঁচেই আছে।'

'তা হলে আবার কী?'

'বেঁচে আছে, কিন্তু আমাদের কোনও কাজে আসছে না।'

'তার মানে সব গোলমাল করে ফেলেছ?'

'ওকে হাতে পেয়েছি আমরা, ঠিক আছে? কঠিন হয়েছে ওকে ধরা। ছিল একটা ছুটন্ত মোটরসাইকেলে। ভিলা থেকে তিন মাইল ধাওয়া করে টিলাগুলোর ওখানে ওকে ধরি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ। দু'পাশে জঙ্গল। থামাতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু তাতে ভয় পেয়ে রাস্তা থেকে নেমে চলে গেল একটা ফার্মের গেটের ওদিকে। গাড়িতে বেণ্ডার আর ক্লেটনকে রেখে বয়েটারকে নিয়ে পায়ে হেঁটে পিছু নিই আমি।'

'তার মানে পালিয়ে গেছে?'

'না। পেয়েছি ওকে। মোটরসাইকেল থেকে পড়ার পর আর কোথাও যেতে পারেনি।'

'কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে ওর?'

'দৈহিকভাবে তেমন কিছু না, সামান্যই। কোথাও কোথাও ফুলে গেছে বা ছড়ে গেছে। কিন্তু চোট লেগেছে মাথায়। সমস্যা এখানেই। অজ্ঞান ছিল তিরিশ ঘণ্টা। চেতনা ফিরেছে, কিন্তু ভুগছে ট্রমাটিক অ্যামনেযিয়ায়। জবাব দিতে পারছে না আমাদের কোনও প্রশ্নের। জানেও না, ও আসলে

কে।’

‘ঠিক মেয়ে, না ভুল করে অন্য কাউকে ধরেছ?’

‘ভুল করিনি। হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট শিওর।’

‘কতটা খারাপ ওর অবস্থা?’

‘সত্যি বলতে, তা আমরা জানি না। হয়তো চট্ করে উঠে আসবে অ্যামনেযিয়া থেকে।’

‘নিজেদের জন্যে প্রার্থনা করো, যেন তা-ই হয়। বুঝতে পারছ, বিষয়টা কতটা সিরিয়াস?’

‘সব আমাদের নিয়ন্ত্রণের ভেতরেই আছে।’

‘আমার তো তেমন মনে হচ্ছে না, পার্কার। কয়েক দিনের ভেতর ওই মেয়ের স্মৃতি না ফিরলে, নিয়ে আসবে এখানে। ভাল ফ্যাসিলিটি আছে, এমন কোথাও নেব।’

‘আরেকটা ছোট সমস্যা আছে।’

‘তার মানে, সমস্যা আরও আছে?’

‘ভিলা থেকে উধাও হয়েছে মেয়েটার সব মালপত্র। ওই বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি আমরা। লাগেজ-টাগেজ কিছুই নেই। কথা ছিল ভোরে এয়ারপোর্টে যাবে। বুঝতেই পারছেন, আবারও নতুন করে প্ল্যান করতে হবে। আমরা দেখাতে পারব না যে দুর্ঘটনায় মরেছে।’

‘কথা ঠিক, পার্কার।’

‘আরেকটা কথা। পার্টিতে ছিল ওর এক বয়ফ্রেণ্ড। তখন তাকে সন্দেহ করিনি। ঝামেলা করেছে পরে। মেয়েটাকে দেয়া বয়েটারের ড্রিঙ্ক ফেলে দিয়েছিল টেবিল থেকে। কাজটা করেছিল ইচ্ছে করে।’

‘তার মানে, কিছু জানে ওই লোক। কে সে?’

‘যতটা জানি, স্থানীয়। ওই মেয়ের গাদা-গাদা বয়ফ্রেণ্ডদের একজন। বোধহয় বিবাহিত। প্রায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল পার্টিতে। ভিলার গ্যারাজে সবসময় রাখে ওর মার্সিডিয, যাতে কেউ না দেখে। আমাদের ধারণা, মেয়েটার

মালপত্র আগেই সরিয়ে ফেলেছে ওই লোক। আমরা এটাও জানি, তার সঙ্গে বিছানায় যেতেই রওনা হয়েছিল ওই মেয়ে।'

'তা হলে সবই জানে লোকটা।'

'তাই তো মনে হয়। কিন্তু ওই মেয়ের স্মৃতি হারিয়ে গেছে বলে কিছুই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।'

'লোকটা সম্পর্কে আর কিছু জানতে পেরেছ?'

'তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছি।'

'যা করার ঝটপট করবে। ঘড়ির কাঁটা মেপে কাজ করতে হবে। এদিকে যে-কোনও সময়ে ওই মেয়েকে খুঁজতে শুরু করবে ওর আত্মীয়স্বজনরা।'

'ওর প্রেমিককে খুঁজে নেব আমরা।'

'নইলে পড়বে মস্ত বিপদে। কৈফিয়ত, অজুহাত বা ব্যর্থতা কোনওটাই সহ্য করা হবে না। ওই লোককে পাওয়ার পর গুম করবে তাকে। এখনও সুযোগ আছে এই বিচ্ছিরি পরিস্থিতি সামলে নেয়ার। মনে রেখো, কোনও গোলমাল হলে কেউ তোমরা প্রাণে বাঁচবে না। আমার কথা বোঝা গেছে?'

সাত

গত কয়েক দিন লণ্ডন শাখার রানা এজেন্সির জরুরি সব কাজ সারতে গিয়ে যথেষ্ট দৈহিক পরিশ্রম হয়নি রানার। আজ বিকেলের আগেই হোটেল থেকে বেরিয়ে এল জগিং প্যান্ট ও টি-শার্ট পরে। কর্নমার্কেটের ক্রেতাদের এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো পুরনো ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের কাছে। মনে

পড়ছে অতীত স্মৃতি। এখানেই অধ্যাপনা করেন প্রফেসর জন হার্বার্ট। চাচার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চাচা ক্যান্সারে মারা গেলে বেশ ক'বার এসেছিলেন ফুফুর বাড়িতে। সেই ছোটবেলায় দেখেছে, চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। ওকে খুব উৎসাহ দিতেন অঙ্কের বিষয়ে। তাঁর নিজের ইচ্ছে ছিল গণিতের ছাত্র হওয়ার। বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে আর হয়ে ওঠেনি। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন, ছেলে লেখাপড়া করে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের লেকচারার হোক। তাই হন তিনি। বাইবেল সম্পর্কে মজার সব গল্প বলতেন রানাকে। পরেও ক'বার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সবসময় মিষ্টি করে হাসতেন, জিজ্ঞেস করতেন লেখাপড়া ঠিকভাবে হচ্ছে কি না।

ক্রাইস্ট চার্চের মেইন গেট পেরিয়ে চারকোনা বিশাল জমির দিকে তাকাল রানা। হেঁটে পৌঁছে গেল রাজকীয়, পুরনো বালিপাথরের দালানগুলোর কাছে। সূর্যের সোনালি আলোয় অদ্ভুত লাগছে সব। সমান করে ছাঁটা সবুজ ঘাসের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের ঠিক মাঝে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে পাথরের ফোয়ারা। কিছুই বদলে যায়নি। যেন এখুনি ডানা মেলে উড়াল দেবে রোমান বার্তাবাহক দেবতা মার্কারি। ওই মূর্তি পাশ কাটিয়ে থমকে গেল রানা। একটু সামনেই প্রবেশপথের আর্চওয়ে, ওদিকে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে ছোট ক্যাথেড্রাল। ব্যবহার করা হয় কলেজের চ্যাপেল হিসেবেও। সন্ধ্যা হলেই ওখানে শুরু হবে সমবেত প্রার্থনা।

ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের পেছনে বিস্তৃত তৃণভূমি।

চ্যাপেলকে ডানে রেখে বামে চলল রানা।

চারপাশ নির্জন।

নদীতীরে গিয়ে আধঘণ্টা জগিং করে টের পেল, অনেকটা কেটেছে কাফ মাসলের আড়ষ্টতা। যে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় আছে, একটু আনফিট হলেই খুন হয়ে যাবে। ঠিক করল, আগামীকাল ভোর থেকে বরাবরের মতই প্রতিদিন দৌড়াবে

দশ মাইল করে।

বিশ্রাম না নিয়েই হালকা চালে দৌড়ে কলেজের বিশাল চৌকো জমির দিকে ফিরতে লাগল রানা। গুনগুন করে গাইছে বিখ্যাত এক গায়কের বিরহের গান। নিজের গানে এতই মুগ্ধ, খেয়াল করেনি এগিয়ে আসছেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক। রানা চ্যাপেল পেরোবে, এমনসময় ওর সামনে থমকে গেলেন মানুষটা। 'এক্সকিউয মি!'

'বলুন?' গান গিলে ফেলল রানা।

'আপনি কি মাসুদ রানা?'

'জী।' প্রথমবারের মত ভদ্রলোককে খেয়াল করে দেখল রানা।

'আমি...'

'আপনি প্রফেসর জন হার্বার্ট,' বলল রানা। 'বেশ কয়েক বছর পর দেখা হলো আপনার সঙ্গে।'

'আপনি... তুমি তা হলে সত্যিই রানা?' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

'তাই তো মনে হচ্ছে, আঙ্কেল জনি। আছেন কেমন?'

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। চোখে কীসের যেন ঘন ছায়া।

ওটা কি বিষাদের? ভাবল রানা।

'তোমার বন্ধু রিচার্ডের কাছে শুনেছি, এ শহরে এসেছ,' বললেন প্রফেসর হার্বার্ট।

'জী। বন্ধুদের একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলাম।'

'আজই একটু আগে ফোন করেছিলাম রানা এজেন্সিতে, ওরা তোমার ফোন নম্বর দিল না।'

'দেয়ার নিয়ম নেই। তবে আপনি নিজের নাম ও ঠিকানা দিয়ে থাকলে একটু পরেই মেসেজ পেয়ে যাব।'

মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'রানা, একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।' অস্বস্তি বোধ করছেন, ইতস্তত করে দ্বিধা কাটিয়ে বললেন,

'আগামীকাল কি লাঞ্চের সময়ে ফ্রি আছ?'

'জী, আছি।'

'তুমি কি একবার আসবে আমাদের বাড়িতে? একসঙ্গে লাঞ্চ করতাম?'

যা বলার তখনই বলবেন প্রফেসর, বুঝল রানা। 'আপনি নিশ্চয়ই এখনও সামারটাউনের ওই বাড়িতেই আছেন?'

মাথা দোলালেন প্রফেসর হার্বার্ট।

'চলে আসব।'

'দুপুর একটায় অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।' ক্লান্ত হাসলেন প্রফেসর। রানা মাথা দোলালে চললেন ক্যান্টারবেরি কোয়াডে নিজ অফিসের দিকে।

পেছন থেকে দেখল রানা, বড় দুর্বল ভঙ্গিতে হাঁটছেন ভদ্রলোক। অথচ, বয়স তাঁর মাত্র তেষট্টি। ছিলেন সবসময় হাসিখুশি ছটফটে মানুষ। চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। রসিয়ে বলতেন দারুণ মজার সব কৌতুক। আজকের এই প্রফেসরের সঙ্গে অতীতের ওই মানুষটাকে মেলাতে পারল না রানা।

একদম বুড়িয়ে যাওয়া পরাজিত এক মানুষ তিনি।

প্রফেসরের ভয়ানক কোনও রোগ হয়নি তো?

তা হলে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ দিলেন কেন?

না, অন্য কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে গেছেন আঙ্কেল জনি।

ওর যাওয়াই উচিত।

আট

গ্রিস, প্যাক্সোস দ্বীপ।

সুযোগ পেলেই বাক ক্ল্যাস্প নাইফ আরও ধারালো করে পরিপাটি চুলের লোকটা। ব্যালকনিতে বসে আছে কড়া রোদে। একটু পর পর ওউযো ঢালছে গলায়। মাঝে মাঝে দেখছে ক্যাথিকে, আর ভাবছে: *কুত্তী মেয়েলোকটাকে কুচি কুচি করে কাটতে পারলে মন্দ হতো না।* মেয়েটাকে দেখলেই প্রতিবার ঘৃণায় কুঁচকে ফেলছে ভুরু। ধার দেয়ার তেলমাখা পাথরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘষছে ছুরির চকচকে রুপালি ফলা। এতই ধারালো করেছে, রাতে ফলার ওপর একটা ব্যাঙ্ক নোট রেখে গেলে, পরদিন সকালে এসে দেখবে দু'টুকরো হয়েছে ওটা।

প্যান্টের পকেট থেকে ছুরি নিয়ে ক্ষুরধার ফলা খুলল পরিপাটি চুল। ধীর পায়ে এসে থামল ক্যাথির বিছানার পাশে। বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখল মেয়েটা। ভয় পেয়েছে ভীষণ। চাইল গলা ফাটিয়ে আর্তচিৎকার করতে, কিন্তু মুখের টেপের জন্যে বেরোল অদ্ভুত আওয়াজ। হ্যাণ্ডকাফ পরা ওর প্রসারিত দু'হাত পড়ে আছে বিছানায়। ম্যাট্রেসের কর্কশ কাপড় ভয়ে খামচে ধরল ক্যাথি।

বিছানার পাশে বসল পরিপাটি চুল। ঝুঁকে দেখাল ধারালো ছোরা। ওটা নিল ক্যাথির চোখের সামনে। দরদর করে ঘামছে মেয়েটা। 'দারুণ জিনিস, তাই না?' সাবধানে ফলার ওপর বুড়ো আঙুল বোলাল। তাতে কেটে গেল ত্বকের

পাতলা অংশ। 'তুমি জানোও না কতটা ধারালো। তবে সবই টের পাবে কিছুক্ষণ পর।'

ছোরার ফলার উল্টো দিকের পুরু অংশ ক্যাথির গালে ছোঁয়াল সে। আঁৎকে উঠে শ্বাস ফেলল মেয়েটা। ঢোক গিলছে বারবার।

'এবার তোমার মুখ খুলব, তবে চিৎকার কোরো না ভুলেও। সব খুলে বলবে। কিছুই চেপে যাবে না। নইলে এক খোঁচায় তুলে আনব তোমার একটা চোখ। তাতে দারুণ মজাও পাব।'

ঘরের আরেক পাশ থেকে ক্যাথিকে দেখছে কৃষ্ণকেশী যুবতী। বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। গম্ভীর। পরিপাটিকে বাধা দিতে গিয়েও চুপ করে থাকল।

ক্যাথির মুখ থেকে ফড়াৎ করে টেপ খুলল লোকটা। আতঙ্কে হাঁফাচ্ছে মেয়েটা। ঢোক গিলছে বারবার। শীতল ফলা আলতো করে ওর কপালে বুলিয়ে নেয়ায় গুড়িয়ে উঠল। ফলা এসে থামল চোখের কোণে।

'আমার কিছুই মনে নেই,' বিড়বিড় করল ক্যাথি। 'কিছুই জানি না।'

'সবই জানো। মিথ্যা বলবে না।'

'বিশ্বাস করুন... মিথ্যা বলছি না।'

'জানো, ছোরার ছোট্ট এক খোঁচায় টুপ করে উঠে আসবে তোমার ওই নীল চোখ,' বলল পরিপাটি চুল। 'কখনও দেখেছ কীভাবে ফেটে যায় অক্ষিগোলক? দেখতে দারুণ মজার। যেন খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম।' হিমশীতল হাসল লোকটা। আস্তে করে ছোরা বোলাল ক্যাথির গালে। সরিয়ে নিল ছোরা।

ভয়ঙ্কর ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যাথি। ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমি জানি না আপনারা কী বলছেন। কিছুই জানা নেই আমার।'

'সিম্পসন...' বলল বয়েটার। 'তোমার মনে আছে মিস্টার সিম্পসনকে... তাই না? মনে নেই কী সর্বনাশ করেছ তার?'

ঘনঘন মাথা নাড়ল ক্যাথি। প্রায় কেঁদে ফেলল।

'ওটা কই?' জানতে চাইল লোকটা।

'আমি জানি না ওটা কী জিনিস।'

'রেখেছ কোথায়?' কড়া ধমক দিল পরিপাটি চুল।

'কিছুই জানি না!' ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি। 'আপনারা কী চান, তা-ই জানি না আমি! কিছুই জানি না!' বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওর চোখ। জুলফি বেয়ে গড়িয়ে যাওয়া অশ্রুর সঙ্গে আটকে গেছে কয়েকটা চুল। 'বিশ্বাস করুন, কিছুই জানি না! আপনারা ভুল মানুষকে ধরেছেন!' মনের দুঃখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল ক্যাথি। করুণা প্রার্থনা করল, 'ছেড়ে দিন আমাকে! মাফ করে দিন! যেতে দিন! আমি কাউকে কিছুই বলব না, যিশুর কিরে!'

সামনে বেড়ে লোকটার কাঁধে হাত রাখল কালো চুলের যুবতীটি। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। কঠোর চোখে দেখছে ক্যাথি হার্বার্টকে। কয়েক সেকেণ্ড পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে পিছু নিল মেয়েটার। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দু'জন। পেছনে ভিড়িয়ে দিল দরজা। এখন কথা শুনতে পাবে না ক্যাথি। 'হুমকি দিয়ে কাজ হচ্ছে না।'

'ওই মেয়ে সব গোপন করছে, পার্কার,' উত্তেজিত কণ্ঠে ফিসফিস করল লোকটা।

'আমার তা মনে হচ্ছে না। ভুল ভাবছ।'

'কুত্তীটার সঙ্গে মাত্র আধঘণ্টা কাটাতে দাও, ওর পেট থেকে বের করে আনব সব।'

'কী করে? চোখ উপড়ে নিয়ে?'

'আধঘণ্টাই যথেষ্ট হবে।'

‘ওর ওপর কম মানসিক চাপ দিইনি আমরা। তোমার কেন মনে হচ্ছে ওর মুখ খোলাতে পারবে?’

‘ঠিকই মুখ খুলবে। একটা ঘণ্টা সময় দিয়ে দেখো।’

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নাড়ল যুবতী। ‘ওকে আর এখানে রাখব না। দরকারি সুযোগ সুবিধা এখানে নেই। ওকে পাঠিয়ে দেব।’

‘তার আগে মাত্র দশটা মিনিট দাও, বাপ-বাপ করে মুখ খুলবে।’

‘না।’

‘পাঁচ মিনিট? বিশ্বাস করো, ভড়-ভড় করে সব বলবে।’

‘নির্যাতন করে খুব আনন্দ পাও, বয়েটার।’

‘আমি শুধু নিজের কাজ করছি।’

‘যদি মেরে ফেলো ওকে? তা হলে সবাই খুন হব।’

‘খুন করব না। জানি কী করতে হবে।’

‘তাই নাকি?’ নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল ক্রিস্টিনা পার্কার। ‘মন দিয়ে শোনো, সরিয়ে ফেলবে তোমার ওই ছোরা। আবার যদি ওটা দেখি, তোমার মগজে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেব। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?’

তিরিক্ষি মেজাজ সামলে যুবতীর দিকে তাকাল খুনি বয়েটার। মুখে কোনও কথা নেই।

‘ওকে পাঠিয়ে দেব,’ বলল ক্রিস্টিনা পার্কার। ‘কথা বের করার অন্য উপায় আছে ওদের।’

নয়

অক্সফোর্ড শহর।

হলিওয়েল মিউযিক রুমের খটখটে সিটে বসে একজন দু'জন করে শ্রোতা ঢুকতে দেখছে রানা। এই হলরুমে সামান্য আওয়াজও ছড়িয়ে পড়ে দূরে, তাই ফিসফিস করে আলাপ করছে কেউ কেউ। পেছনের সারিতে আছে রানা। ভাল করেই জানে, শ্রোতার ভিড় হবে না এই কনসার্ট শুনতে।

ছাত্রজীবনে একবার ওকে এখানে ধরে এনেছিল এক আঁতেল বন্ধু। চরম অস্বস্তি বোধ করেছিল রানা। আজ কাজ নেই বলে এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে হলিওয়েল মিউযিক রুমে। ভাবছে, দেখাই যাক সহ্য হয় কি না তারের বার্টোকের চৌপদী। বেশিরভাগ মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে ওই আওয়াজে। মন বলতে শুরু করে, নিশ্চয়ই এই বাজে শব্দ আসছে স্রেফ নরক থেকে!

বডলিয়ান লাইব্রেরি থেকে সামান্য দূরেই এই কনসার্ট রুম। সাদা রঙ করা ঘর, শেষ প্রান্তে নিচু এক মঞ্চ। সব মিলিয়ে আঁটে বড়জোর এক শ'জন শ্রোতা। ভেতরে উজ্জ্বল, কড়া আলো। সিট তো নয় কাঠের তক্তা। নিতম্ব ও পিঠের বিশ্রামের উপায় নেই। কর্তৃপক্ষ গর্বের সঙ্গে জানিয়ে দেন: এটা গোটা ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো কনসার্ট হল। একসময়ে এখানেই তাঁর কমপোযিশন বিলিয়ে দিতেন কমপোযিটর মাসিয়া হ্যাণ্ডেল।

একটু পর মঞ্চে উঠবে বাদক দল। তাদের নেতা সংক্ষেপে কমপোযিটর হ্যাণ্ডেল সম্পর্কে বক্তৃতা দেবে। নাম জানিয়ে দেবে দলের সবার। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মিউযিক বিভাগ থেকে অন্তত মাস্টার্স পাশ করেছে এরা প্রত্যেকে। মশা মারতে মারতে যেমন মানব-হত্যাকারী হয়ে ওঠে ভয়ানক খুনি, এদেরও ওই একই অবস্থা। একটু পর যে-যার বিশ্রী, বিকট আওয়াজ দিয়ে জান কবজ করতে চাইবে। ওই যান্ত্রিক তুমুল ঝড়ে টিকতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছে রানা।

মানসিক অত্যাচার সহ্য করার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এমনসময় হঠাৎ করে দেখল ওই মেয়েটাকে।

ওকেও চিনে ফেলেছে মেয়েটা। ঠোঁটে ফুটল মৃদু হাসি।

বডলিয়ানের লাইব্রেরিয়ান। কাঁধে লুটিয়ে আছে বালিরঙা চুল। পরনে হালকা জ্যাকেট। তাতে আড়াল হয়নি যৌবন। দারুণ আকর্ষণীয় ফিগার মেয়েটার।

মেয়েটা এগিয়ে আসতেই কোল থেকে প্রোগ্রাম লিস্ট নামাল রানা।

'একা?' নরম সুরে জানতে চাইল মেয়েটা। 'বিরক্ত হবেন আমি বসলে?'

পাশের সিটের পিঠে জ্যাকেট রেখেছে রানা, ওটা খপ্ করে ধরে সরিয়ে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না-না, বিরক্তি কীসের!'

বসল মেয়েটা। ঠোঁটে হাসি। ওর হাতে ছোট একটা ব্যাগ, নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ভাবতেও পারিনি আপনাকে এখানে দেখব। নামটা বোধহয় আগে বলিনি? আমি লিলি।'

'জেনে খুশি হলাম। আমি রানা।'

জ্যাকেট খুলে ফেলল লিলি।

রানা দেখল, প্রথম যখন ওদের দেখা হয়, সেই একই

সাদা ব্লাউয মেয়েটার পরনে। 'কাজের চাপ বেশি?'

মাথা নাড়ল লিলি। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। মঞ্চে অবতরণ করেছে মিউযিশিয়ানরা, হাতে তাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

হাততালি দিল কয়েকজন শ্রোতা।

দু'চার কথা বলল লিডার, তারপর যে-যার সিটে বসল দুই বেহালা বাদক, একটু দূরে ভায়োলা বাদক। দু'দলের মাঝে বসেছে চেলিস্ট। পরস্পরের উদ্দেশে মাথা দোলাল তারা। তারপরই আর রক্ষা থাকল না রানার, কানের কাছে করুণ শব্দে আর্তনাদ ছাড়ল অন্তত দু'তিনটে ক্ষুধার্ত হায়েনা।

ওই আওয়াজ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অস্বস্তিকর। কেন যেন মনে হয় বেঁচে থেকে আর লাভ কী! আত্মহত্যার ইচ্ছে হলেও টিকে থাকল রানা, কারণ নাকে এসেছে লিলির মিষ্টি পারফিউম। ওর হাঁটুর সঙ্গে ঘষা লাগছে মেয়েটার হাঁটু। প্রায় খালি হল-এ এত সিট পড়ে থাকতে মেয়েটা ওর পাশে এসে বসল কেন, ভাবছে রানা। প্রাণপণে ভুলে যেতে চাইল, ওর অসহায় কানের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন করছে নিষ্ঠুর একদল বাদক।

কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে। রানার মনে হলো কেয়ামত তক ওকে নরকে রাখার পর থেমে গেল সব শাব্দিক জট। ততক্ষণে সূর্যাস্ত হয়েছে। হলিওয়েলের সরু গলিতে বেরিয়ে এল রানা ও লিলি।

'দারুণ লাগল,' প্রশংসার সুরে বলল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, অন্তরটা একেবারে থরথর করে কাঁপিয়ে দেয়,' সায় দিল গম্ভীর রানা।

'একটু বেশি আওয়াজ, তাই না?'

'জেট বিমানের চালু ইঞ্জিনের মত তো আর নয়।'

'মনে এনে দেয় প্রশান্তি।'

হাঁটতে হাঁটতে উদাস হয়ে গেল রানা।

'ড্রিঙ্ক নেবেন?' জানতে চাইল লিলি।

'ক্ষতি কী?'

কাছেই টার্ফ পাব, মনে পড়ল রানার। ওরা রাস্তা পেরোতেই সামনে শুনল হালকা মিউযিক ও হাসির আওয়াজ।

পাবের ভেতরে ছাত একটু বেশি নিচু, দাঁত বের করে রেখেছে বিম, একদিকে গুহার মত জায়গায় কাঠের বার। দেখলেই বোঝা যায়, ওটার বয়স অন্তত দু'আড়াই শ' বছর।

ভেতরে গিজগিজ করছে কাস্টোমার। বেশ কয়েকটা টেবিল দখল করেছে একদল ইতালিয়ান পর্যটক। অতিরিক্ত আওয়াজ করছে তারা। লিলির জন্যে এক গ্লাস হোয়াইট ওয়াইন আর নিজের জন্যে দু' পেগ স্কচ হুইস্কি নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওরা বসল নিরালা, নীরব বিয়ার গার্ডেনের এক কোণে। চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে পাথরের দেয়াল। তার ওপর উঠেছে কয়েক রকমের লতা ফুলগাছ। বাতাস ভারী হয়ে আছে মধুমালতির সুবাসে।

সিগারেটের প্যাকেট বের করে জানতে চাইল রানা, 'একটা ধরালে আপত্তি আছে?'

'আমিও নেব একটা,' বলল লিলি।

প্যাকেট বাড়িয়ে ওকে একটা শলা দিল রানা। লাইটার জ্বেলে আগুন সরবরাহ করল। নিজেও ধরাল একটা। যে যার গ্লাস তুলে দু'জন মৃদু টোকা দিয়ে নিল ওরা। এখানে কী করছে, ভাবতে গিয়ে কেমন যেন অবাক লাগছে রানার। তবে সহজভাবেই ওকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছে মেয়েটা।

'দারুণ কনসার্ট ছিল,' বলল লিলি। 'শ্রোতা কম, এটা লজ্জাজনক।'

'বার্টোক শুনতে হলে রুচি তৈরি হতে হবে।'

'আধুনিক কনসার্ট চললে ফেটে পড়ত হলিওয়েল মিউযিক রুম।' মৃদু হাসল লিলি। 'বলবেন, আপনি আছেন

কী পেশায়?'

'টুকটাক সব কাজ। তেমন কিছু নয়।'

'তা-ই না হয় শুনি আপনার আপত্তি না থাকলে।'

'ছোটখাটো একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাই, ওই কাজেই ব্যস্ত।'

মনে হলো রানার কথায় সন্তুষ্ট হলো লিলি। 'এবার আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে কী ধরনের ক্যারিয়ার বেছে নেব।'

'লাইব্রেরিয়ানের কাজ ভাল লাগে না?'

'লাগে। তবে আরও অনেক ভাল লাগে ছবি আঁকতে। আমি আসলে পেইন্টার হতে চাই। বডলিয়ানের চাকরিটা সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ওই বেতনে চলা কঠিন। চাইছি ফুল টাইম পেইন্টিং করতে। তাতে কোনওমতে খরচ উঠলে আর চিন্তা নেই।'

'আর্টিস্টদের জীবন খুব কষ্টের,' বলল রানা, 'প্রাণপণ খেটেও অনেকে রয়ে যায় অসফল। আপনি কী ধরনের আর্ট করেন?'

মৃদু হাসল লিলি। 'আপনার ভাল লাগবে না।'

'দেখিই না।'

ব্যাগ থেকে একটা বিযনেস কার্ড নিল লিলি। ওটার এক দিকে লেখা: লিলি রিভার্স, ফাইন আর্ট পেইন্টার। নিচে ফোন নম্বর আর ওয়েব সাইট অ্যাড্রেস। উল্টো দিকে অদ্ভুত এক ডিযাইন। ঝকঝকে, জ্যামিতিক। ওই ডিযাইন দেখে রানার মনে পড়ল ক্যাণ্ডিনস্কির কথা। 'এটা আপনার?'

মাথা দোলাল লিলি।

'সুন্দর। খুঁত নেই। আশা করি সফল হবেন।' কার্ড বাড়িয়ে দিল রানা।

'রেখে দিন,' মৃদু হেসে বলল লিলি।

কার্ডটা পকেটে রাখল রানা। কিছুক্ষণের জন্যে ওদের

মাঝে নামল নীরবতা। গ্লাসের সোনালি তরল ঘোরাচ্ছে রানা। অস্বস্তি বোধ করে হাতঘড়ি দেখল। ড্রিঙ্কটা শেষ করে বলল, 'এবার বিদায় নিতে হয়।'

'আপত্তি না থাকলে বলবেন, আপনি কোথায় থাকেন?' জানতে চাইল লিলি।

'উঠেছি উডস্টক রোডে মধ্যবিত্তদের জন্যে উপযুক্ত এমন এক গেস্ট হাউসে। ...আপনি?'

'ছোট্ট ফ্ল্যাট জেরিকোতে।'

'সঙ্গে গাড়ি নেই, চলুন পায়ে হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে দিই,' বলল রানা।

'গাড়ি থাকলে আমিও লিফ্‌ট্‌ দিতাম। একই পথে সেণ্ট গিল্‌স্‌ পর্যন্ত যেতে পারি আমরা। যাবেন আমার সঙ্গে?'

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

মিষ্টি হাসল লিলি।

বিয়ার গার্ডেন থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি চলল ওরা।

সরু গলি ধরে হেঁটে চলেছে, তেমন কোনও কথা হচ্ছে না ওদের ভেতর। পুরনো সব কলেজ দালানে বাড়ি খেয়ে ফিরছে পদশব্দ। পৌঁছে গেল শহরের কেন্দ্রে। নিউ থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল একদল দর্শক। ব্যস্ত হয়ে উঠল কাবাবের ভ্যানগুলো। রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ভাজা মাংসের সুগন্ধ। সেণ্ট জনের কলেজ পেরিয়ে চওড়া সেণ্ট গিল্‌স্‌। এদিকের রাস্তা নির্জন। ল্যাম্প পোস্টের ঘোলাটে সোনালি আলোয় বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল লিলি। একপাশের গলি দেখাল। 'এবার আমাকে যেতে হবে ওই পথে। আশা করি আবারও দেখা হবে লাইব্রেরিতে?'

'হয়তো।'

ঘুরে পা বাড়াবে রানা, এমনসময় ডাকল লিলি, 'রানা?'

'হ্যাঁ, কী?'

দ্বিধা নিয়ে বলল মেয়েটা, 'ভাবছিলাম... আগামীকাল রাতে আমার সঙ্গে সিনেমা দেখবেন?'

চুপ করে থাকল রানা।

'পেইন্টার গোয়েয়ার ওপরে সিনেমা,' নার্ভাস সুরে বলল লিলি। 'বড় আর্টিস্ট ছিলেন।'

'তাঁর ব্যাপারে জানি।' কথাটা বলেই খারাপ লেগে উঠল রানার। এমন রুক্ষভাবে না বললেও পারত।

'ভাল সিনেমা কি না, জানি না। ভাবলাম, আপনার হয়তো ভাল...' মিইয়ে গেল লিলির কণ্ঠ। অস্বস্তি বোধ করে সামান্য সরল। চেয়ে আছে নিজের পায়ের পাতার দিকে।

নিজেও রানা পড়েছে অস্বস্তির ভেতর। নরম সুরে বলল, 'সরি, লিলি। আমি বোধহয় আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। হয়তো আগামীকালই ফিরব লণ্ডনে।'

'ও!' লজ্জায় লাল হলো মেয়েটা। নিচু করে নিয়েছে মাথা। 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। পরে হয়তো কখনও আবার ও দেখা হবে।' ঘুরে হেঁটে চলল গলির ভেতর।

দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

ঘুরে তাকাল না লিলি।

নিজের পথে পা বাড়াল রানা। তবে এক শ' গজ যেতেই গতি কমল ওর। তারপর ল্যাম্প পোস্টের সোনালি আলোর নিচে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মাথা নাড়ল বার কয়েক। লাথি দিতে ইচ্ছে হলো নিজের পাছায়। কানে শুনল নিজের কড়া কণ্ঠ। লিলির প্রস্তাবটা এভাবে ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত হয়েছে। করে বসেছে বাজে কাজ। মেয়েটা এমন নয়, যে-কারও সঙ্গে ডেট-এর জন্যে প্রস্তাব দেবে। অনেক ভেবে, বহু দ্বিধা কাটিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর বোকার মত ওই হাত সরিয়ে দিয়েছে ও। করে বসেছে চরম অপমান। এখন ফিরে গিয়ে কৈফিয়ত দিলে হয়তো কমবে ওর দোষ।

ঘুরেই হন হন করে রওনা হলো রানা। ঢুকে পড়ল সরু

ওই গলিতে। ল্যাম্প পোস্টের হলদে আলোয় প্রায় কিছুই দেখছে না। দু'পাশে উঁচু দালানের দেয়াল। কেউ নেই, ফাঁকা পড়ে আছে গলি।

অবশ্য তিরিশ গজ দূরে রানা দেখল লিলি আর তিন তরুণকে। ওই তিনজন কোণঠাসা করেছে মেয়েটাকে।

সামনের জন গলা ধরে দেয়ালে ঠেলে রেখেছে লিলিকে। দু'পাশে তার দুই অপকর্মের সঙ্গী। পালাবার পথ রাখেনি। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে মেয়েটা। ওর ব্যাগ এখন একদিকের তরুণের হাতে। শক্ত করে স্ট্র্যাপ ধরে রেখেছে লিলি, দেবে না সর্বস্ব। গায়ের জোরে পারবে না বুঝে শেষে ছেড়েই দিল ব্যাগ। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গায়ের জোরে জিতে গিয়ে খলখল করে হাসল তিন তরুণ।

অন্ধকার ও ছায়ায় মিশে এগোল সতর্ক রানা। লিলিকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত ওরা। প্রশিক্ষিত সৈনিক হলেও জানত না কখন ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে রানা। তিন তরুণের দু'জন শ্বেতাঙ্গ, তৃতীয়জন কুচকুচে কালো। তার হাতেই লিলির ব্যাগ। গলা ধরে লিলিকে ঠেসে ধরেছে যে, ন্যাড়া মাথা তার। নাকে রিং। আত্মবিশ্বাসী। তাকেই নেতা বলে মনে হলো রানার। দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ তরুণ বেঁটে এবং মোটা। পেট ভরা চর্বি। কমবয়সী তিন ছিনতাইকারী। বয়স হবে সতেরো থেকে বিশ। পরনে একই কোম্পানির পোশাক।

বয়স কম হলেও বিপজ্জনক। সোনালি আলোয় ঝিলিক দিল কী যেন। জ্যাকেটের পকেট থেকে ছুরি বের করেছে দলনেতা। কিচেন নাইফ। হ্যাণ্ডেল কালো প্লাস্টিকের। ফলা দৈর্ঘ্যে আট ইঞ্চি। একদিক করাতের মত খাঁজ কাটা। শিকারের মুখের সামনে ছুরি নাচাল তরুণ। ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠল লিলি। ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে ওকে ধমক দিল দলনেতা তরুণ। চিৎকার করে লোক জড় করতে চাইলে খুন করে ফেলবে।

ছুরি দেখে কঠোর হলো রানার মুখটা। নিঃশব্দে এগোল

আবার। এখনও ওকে দেখতে পায়নি তিন ছিনতাইকারী।

ব্যাগ হাতড়ে দেখছে কালো তরুণ। পার্স চাই তার।

মোটা তরুণ ধরে রেখেছে লিলির বাহু। আরেক হাতে কবজি থেকে খুলতে চাইছে হাতঘড়ি। ভীষণ ভয়ে কাঁপছে লিলি। চোখে মৃত্যু-আতঙ্ক।

ভূতের মত ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'রানা!' ওকে দেখতে পেয়েছে লিলি।

চমকে গেছে তিন ছিনতাইকারী। চোখ বিস্ফারিত হলো তাদের।

কী করবে তা ঝড়ের বেগে ভেবে নিয়েছে রানা। মাত্র তিন সেকেণ্ডে হাড়গোড় ভেঙে রাস্তায় পড়ে থাকবে তিন তরুণ। সাধারণ মানুষ মনে করে আতঙ্কের জিনিস ছিনতাইকারীর ছোরা, কিন্তু দলনেতা জানেও না, কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ফলা। চাইলে এই ছোকরার কাছ থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে দুই সেকেণ্ডে তার মগজে গেঁথে দিতে পারবে রানা।

বিপজ্জনক তরুণ এরা। তবে কাঁচা।

'পার্স খোলো,' কুচকুচে কালো ছেলেটাকে বলল রানা।

একবার পার্স, তারপর আবার বাদামি যুবককে দেখল তরুণ। যুবকের চোখে ভয়ঙ্কর কঠোরতা।

নিজে চোখ পিটপিট করতে লাগল সে।

রানার চোখ দলনেতার ওপর। নিষ্কম্প, নরম কণ্ঠে আবারও বলল, 'খোলো ওটা।'

চোখে-মুখে দ্বিধা ছুরিওয়ালার। কুঁচকে ফেলেছে ভুরু।

সে কী ভাবছে, তা বুঝল রানা।

তারা দলে তিনজন। কিন্তু তার পরও কী যেন ঠিক নেই। ছোকরার মনে হচ্ছে, এই লোক একাই দশজনের সমান। আত্মবিশ্বাস কমছে তার।

তরুণের চোখে হুমকির জায়গায় দেখা দিয়েছে ভয়।

চেষ্টা করছে সেটা লুকাতে। ছুরির হ্যাণ্ডেল ধরা তালু ঘামছে। কাঁপছে ফলা। লিলির গলা থেকে হাত সরাল সে।

সুযোগ পেয়ে কয়েক পা সরে গেল মেয়েটা।

রানার কথা শুনেছে কালো তরুণ। চামড়ার ছোট্ট পার্স লিলির, বেশ ব্যবহৃত। চেইন টেনে খুলল ছেলেটা। ভেতর থেকে বেরোল একটা বিশ পাউণ্ডের নোট।

'যথেষ্ট নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'একেকজন পাবে সাত পাউণ্ডেরও কম। ডেবিট কার্ড ফুরিয়ে গেছে। একই কথা ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারেও। তো এই ভদ্রমহিলার কাছে বেশি টাকা নেই। বাড়ি ফিরবে তোমরা একেকজন পৌনে সাত পাউণ্ড হাতে। মাটি হবে পুরো রাত। বন্ধুদের গর্ব করে বলতে পারবে না, অসহায় এক মেয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ সব।'

'মর্, শালা!' নিজেকে সামলে নিয়ে গালি দিল দলনেতা। কণ্ঠ কেঁপে গেছে তার।

গালি পাত্তা দিল না রানা। 'ঠিক আছে, এসো একটা চুক্তি করি।' প্যান্টের পেছন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল ও। ওটা খুলে দেখাল। ভেতরে সব পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট। অন্তত এক শ'টা। মানিব্যাগ নাচাল রানা। 'সবই পাবে। সেজন্যে কিচ্ছু না, শুধু খুন করতে হবে আমাকে। ...কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, পড়ে থাকবে এই গলিতে হাত-পা ভাঙা অবস্থায়। জীবনে আর উঠে বসতে পারবে না।' মৃদু হাসল রানা। চকচক করছে দু'চোখের কুচকুচে কালো মণি। 'মজার খেলা, তাই না?'

কথাটা ভাল ঠেকল না বলে এক পা পিছাল দলনেতা। তার দিকে চেয়ে ঢোক গিলল অন্য দু'জন।

অলসভঙ্গিতে মানিব্যাগ পকেটে রাখল রানা। 'আরও কথা আছে। পরে যদি শুনি লিলি রিভার্সকে আবারও বিরক্ত করেছ, খুঁজে নেব তোমাদেরকে।'

‘পাবেন কই?’ শুকনো গলায় বলল দলনেতা।

‘পাব,’ নরম সুরে বলল রানা। ‘তখন শুধু হাত-পা ভাঙব না। স্রেফ খুন হয়ে যাবে।’

দ্বিধা যাচ্ছে না শক্তপোক্ত শরীরের তরুণের।

‘ছুরিটা ফেলো,’ বলল রানা। ‘ব্যাগ আর পার্স ফেরত দাও ভদ্রমহিলাকে।’

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন ছিনতাইকারী।

‘মাত্র তিন গুনব,’ এক পা সামনে বাড়ল রানা। ‘এরপরের সব দায়-দায়িত্ব তোমাদের।’

লোকটা অস্বাভাবিক। কাঁপে না গলা। যা বলছে, করে দেখাবে বলেই মনে হচ্ছে। সামান্য ইতস্তত করে হাত থেকে ছুরি ফেলল দলনেতা। ব্যাগ ও পার্স লিলির হাতে ধরিয়ে দিল কালো ছেলেটা। পিছিয়ে গেল মোটকু। চেয়ে আছে রানার চোখে।

‘অ্যাই, চল্!’ বলে হঠাৎ করেই দৌড় দিল দলনেতা। সে লেজ তুলে ভাগছে দেখে পেছনে ছুটল অন্য দু’জন।

থরথর করে কাঁপছে লিলি, মুখ ফ্যাকাসে। সামনে বেড়ে চলে এল রানার পাশে। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল ছুরিটা।

‘সত্যিই হাত-পা ভাঙতে?’ জানতে চাইল লিলি। চমকে গেল রানার চোখের কালো মণিতে চোখ রেখে। ‘তুমি আসলে কে, রানা?’

‘চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই,’ বলল রানা।

দশ

শহরতলীতে ফুল ও ফলের গাছে শোভিত ভিক্টোরিয়ান বড়সড় এক সেমি-ডিটাচ্‌ড্‌ বাড়িতে থাকেন হার্বার্ট পরিবার। দুপুর সাড়ে বারোটায় মিসেস হার্বার্টের জন্যে এক বোতল দামি ওয়াইন ও কিছু ফুল নিয়ে উপস্থিত হলো রানা।

বহুদিন পর দেখল রিয়ানা হার্বার্টকে। তাঁর চোখে-মুখে বয়সের ছাপ নেই। তবে কালো চুলের মাঝে এখন ধূসর সব রেখা। আগের মতই হালকা-পাতলা। কিন্তু রানার মনে হলো, বেশ রুগ্ন হয়ে গেছেন রোগেশোকে। চিরকাল ছিলেন চুপচাপ মানুষ। ভালবাসেন স্বামীর আড়ালে থাকতে। আজ যেন আরও বেশি নীরব। রানার জানার কথা নয়, পুরো সাত দিন ধরে নিখোঁজ তাঁদের একমাত্র সন্তান ক্যাথি।

বাড়ির পেছনে প্যাশিয়োতে সার্ভ করা হলো লাঞ্চ। রানা দেখল, আগের মতই আছে ওঁদের শখের বাগান। অবশ্য আরও ঝলমল করছে প্রফেসরের গোলাপ ঝাড়ের রঙিন ফুল। বাগানের শেষে পাথরের দেয়াল ছেয়ে ফেলেছে আইভি লতা।

লাঞ্চ শেষে ওয়াইনে চুমুক দিয়ে টুকটাক আলাপ করছে ওরা, এমনসময় ছুটে এল সাদা একটা ছোট টেরিয়ার কুকুর। সন্দেহ নিয়ে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে আর শুঁকছে ঘাস।

'অনেকদিন আগে যখন এসেছি, ঠিক এমনই একটা কুকুর ছিল আপনাদের,' বলল রানা। 'ওটারই উত্তর পুরুষ?'

'ওর নাম ছিল মারিয়া,' বললেন রিয়ানা। 'এটা ওর নাতি উইস্কি।'

নাম শুনে তদন্ত বাদ দিয়ে ছুটে এল কুকুরটা। রানার সামনে বসে পড়ে বাড়িয়ে দিল ডান থাবা। হ্যাণ্ডশেক করবে।

'এটা শিখিয়েছে ক্যাথি,' বললেন প্রফেসর। 'ওর জন্যে মরে যেতেও রাজি উইস্কি। ক্যাথি আপাতত বাড়িতে নেই বলে ওর দেখভাল করছি আমরা। বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটায় আমাদের মেয়ে।'

উইস্কির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে জানতে চাইল রানা, 'কেমন আছে ক্যাথি?'

মেয়েটার কথা শুনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো দম্পতির। অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন প্রফেসর হার্বার্ট। চেয়ে আছেন নিজের হাতের দিকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন রিয়ানা। চোখে চোখে কথা হলো স্বামীর সঙ্গে। যেন চাইছেন কিছু বলুন প্রফেসর।

'খারাপ কিছু হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

স্ত্রীর বাহুতে হাত রাখলেন প্রফেসর। চোখ তুলে চাইলেন না রানার চোখে। মনে হলো, বুকটা ভেঙে গেছে তাঁর।

'মনে হচ্ছে, এটা সাধারণ আমন্ত্রণ নয়, কিছু বলতে আজ আমাকে ডেকেছেন, স্যর,' বলল রানা।

টুইডের জ্যাকেটের পকেট থেকে পুরনো ব্রায়ার পাইপ বের করলেন প্রফেসর। প্লাস্টিকের পাউচ থেকে বাউলে তামাক ভরলেন।

উনি কী বলবেন সেজন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে রানা।

ভুরু কুঁচকে পাইপে আগুন দিলেন জন হার্বার্ট। সুগন্ধী তামাক গিলে একটু পর আকাশের দিকে ছাড়লেন ধোঁয়া। 'বহু দিন পর তোমাকে দেখে খুশি আমরা। তোমার জন্যে সবসময় খোলা এ বাড়ির দরজা। সাধারণ পরিস্থিতিতেও লাঞ্চের দাওয়াত দিতাম।'

'কী ধরনের সমস্যা?'

চুপ করে আছেন প্রফেসর।

উঠে চলে গেলেন রিয়ানা। একটু পর ফিরলেন আরেক বোতল ওয়াইন হাতে। তিনটে গ্লাস ভরে দিলেন। বসে পড়লেন আগের চেয়ারে।

চোখাচোখি হলো স্বামী-স্ত্রীর।

'তোমার চাচা আর আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বললেন জন হার্বার্ট। 'নিয়মিত যোগাযোগ না হলেও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতই জানি তোমাকে।'

'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা।

'তাই ভাবছি, বিশ্বাস করতে পারব তোমাকে,' বললেন হার্বার্ট। 'খুলে বলতে পারব সব।'

মৃদু মাথা নেড়ে চুপ করে থাকল রানা। অপেক্ষা করছে।

'তোমার কাছে সাহায্য চাই আমরা,' দ্বিধা নিয়ে বললেন প্রফেসর। 'তুমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ছেড়ে যাওয়ার পর শুনেছি যোগ দিয়েছিলে আর্মিতে। খুবই ভাল করছিলে ওখানে। পরে চাকরি ছেড়ে খুলেছ ডিটেকটিভ এজেন্সি। নাম হয়েছে এ ক্ষেত্রেও। কখনও কখনও হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করেছ, যাদের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। বিশেষ করে কিডন্যাপ্‌ড্ বাচ্চাদের উদ্ধারের কাজে ভাল করেছে তোমার এজেন্সি।' চুপ হয়ে গেলেন হার্বার্ট।

'ক্যাথির কিছু হয়েছে,' নরম সুরে বলল রানা।

চেয়ার ছেড়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন রিয়ানা। দু'মিনিট পর ফিরলেন। এখন হাতে রুপালি দুটো ফোটোফ্রেম। চেয়ারে বসে একটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হার্বার্ট। 'তোমার মনে আছে ক্যাথিকে, রানা? তোমার সঙ্গে ওর শেষ দেখা হয়েছিল অন্তত বিশ বছর আগে।'

আবছাভাবে রানার মনে পড়ল মিষ্টি এক মেয়েকে। ওর পেছনে ছুটে বেড়াত সাদা এক কুকুর। ফোটোতে মন দিল রানা। খুশিতে উচ্ছল বাচ্চা এক মেয়ে। সামনের ওপরের

পাটিতে দুটো দাঁত নেই।

'পাঁচ বছর বয়স ছিল ওর,' বলল রানা।

'সাড়ে পাঁচ,' বললেন প্রফেসর।

'এখন পঁচিশ,' জানালেন রিয়ানা। বাড়িয়ে দিলেন দ্বিতীয় ফ্রেম।

ওটা নিয়ে ফোটো দেখল রানা। যৌবনে এসে দেখতে দুর্দান্ত সুন্দরী হয়েছে ক্যাথি। নীল চোখ। খাড়া নাক। সুন্দর ঠোঁট। কোমর পর্যন্ত সোনালি চুল। জাপটে ধরে রেখেছে ছোট্ট একটা কুকুর ছানা।

'আগামী মার্চে ওর ছাব্বিশ হবে,' বললেন রিয়ানা।

ছবি টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা। 'ক্যাথির কী হয়েছে?'

'ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,' বললেন প্রফেসর, 'সাত দিন আগে ফেরার কথা। কিন্তু ফেরেনি।'

'কী ধরনের সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অস্বস্তি নিয়ে পাইপ নাড়ছেন জন হার্বার্ট। কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, 'আমরা খুব ভালবাসি ক্যাথিকে।'

'স্বাভাবিক,' ভদ্রলোক আসলে কী বলতে চান, তা বুঝতে পারছে না রানা।

চুপ করে আছেন প্রফেসর। একটু পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুরু করলেন, 'আমাদের ব্যক্তিগত কিছু কথা বলব তোমাকে। আশা করি, এ বিষয়ে আর কারও সঙ্গে আলাপ করবে না। এমন বিষয়, যেটা আমাদের সম্মান-অসম্মানের সঙ্গে জড়িত।'

'আমার মুখ বন্ধ থাকবে, আঙ্কেল,' বলল রানা।

দুর্বল হাসলেন হার্বার্ট। 'রিয়ানা আর আমার বিয়ের পর বহু দিন পেরোলেও বাচ্চা হয়নি। দোষ আমাদের ছিল না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। তারপর পুরো পাঁচ বছর পর প্রেগনেণ্ট হলো রিয়ানা। এরপর পৃথিবীতে এল আমাদের পুত্র সন্তান।'

অপেক্ষা করছে রানা। ওর জানা আছে, হার্বার্ট দম্পতির কোনও ছেলে নেই।

'ওর নাম দিলাম আমরা হেনরি। একটা বছরও বাঁচল না ও। আমরা তলিয়ে গেলাম চরম হতাশা ও দুঃখের সাগরে।'

'বুঝতে পেরেছি, কেমন কষ্ট লেগেছিল আপনাদের,' বলল রানা।

'অনেক বছর আগের কথা, তবুও ভাবলে এখনও বুক ভেঙে যায় আমাদের,' বললেন প্রফেসর। 'ও চলে গেলে আবারও বাচ্চা নেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু হচ্ছিল না। আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে দত্তক নেব ভাবছি, এমনসময় কনসিভ করল রিয়ানা। ওটা ছিল আমাদের জন্যে অলৌকিক ঘটনা। নয় মাস পর এল নিখুঁত একটা মেয়ে।'

'ওকে মনে আছে,' বলল রানা, 'হাসিখুশি, বুদ্ধিমতী।'

'তাই আসলে,' বললেন প্রফেসর। 'তবে তখন মনে হয়েছিল, আবার যদি স্রষ্টা কেড়ে নেন ওকে আমাদের কাছ থেকে? জানি, এমনটা ভাবা অযৌক্তিক। বড় কোনও রোগ ছুঁতে পারল না ওকে। আমাদের অতি আদরে বড় হতে লাগল। আর এটাই দোষ করলাম আমরা। লাই দিয়ে খেয়ে ফেললাম ওর মাথাটা। মানুষ করতে পারলাম না।'

'এখন কী করছে, ক্যাথি?' জানতে চাইল রানা।

'অল্প বয়সে লেখাপড়া শেষ করে নামকরা অ্যাকাডেমিক। মগজ ভাল। বেশি খাটতে হয়নি ওকে। মাস্টার্স পাশ করল আর্কিওলজির ওপর। ম্যাগডালেন থেকে। ফার্স্ট ক্লাস। ওর প্রিয় সাবজেক্ট বিবলিকাল আর্কিওলজি। নতুন সায়েন্স। ওটায় প্রথমসারির পথিকৃৎ ও। গতবছর তিউনিসিয়ায় যে টিম ওস্ট্রাকা আবিষ্কার করেছে, তাদের নেতৃত্বে ছিল ক্যাথি।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। ওস্ট্রাকোন শব্দটা এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে। অর্থাৎ খোসা। বহুবচনে ওস্ট্রাকা নামটি এসেছে আর্কিওলজিস্টদের কাছ থেকেই। হাজার হাজার বছর আগে

ওই মাটিতে লেখা হতো দরকারি সব তথ্য। বাদ পড়ত না চুক্তি, হিসেব, বিক্রির খতিয়ান, বই এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তু।

'খবরটা জানি,' বলল রানা। 'তবে জানতাম না আমার চেনা কেউ ওটা আবিষ্কার করেছে।'

'খুব খুশি হয়েছিল ক্যাথি,' বললেন প্রফেসর। 'উনিশ শ' দশ সালে ইযরায়েলে যেসব ওস্ট্রাকা পাওয়া গিয়েছিল, তারপর এত বছর পর এত পরিমাণে লিখিত তথ্য পেল কেউ। সব ছিল প্রাচীন এক মন্দিরে। হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।'

'পত্রিকার পাতায় পড়েছি,' বলল রানা।

'অন্যদের চেয়ে অনেক আলাদা ও। লিখে ফেলেছে গ্রিক সেজ প্যাপিয়াসের ওপরে বই। কয়েকবার ওকে ডেকে নিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছে আর্কিওলজি টিভি চ্যানেল থেকে।'

'কৃতী-সন্তানের জন্যে গর্বিত হওয়ার কথা আপনাদের,' বলল রানা।

মৃদু হাসলেন প্রফেসর জন হার্বার্ট। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর আবার মেঘ জমল চোখে-মুখে। বুকের কাছে ঝুঁকে গেল থুতনি। নিভে গেছে পাইপ। ওটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। 'পেশাদার অ্যাকাডেমিক হিসেবে তুলনা নেই ওর। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে ও খুব অস্বাভাবিক। আমাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল নয়।' হতাশা বোঝাতে হাতদুটো তুলে আবার নামিয়ে নিলেন। 'আমি আর কী বলব? বয়স পনেরো হওয়ার পর থেকেই পুরো বখে গেল ও। কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। বেশ কয়েকবার ছিঁচকে চুরি করে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। দোকান থেকে মালপত্র চুরি, মানুষের পকেট মারা... এসব। ওর ঘরে পেতাম চোরাই মালপত্র। এসব ছিল ওর জন্যে মজার ব্যাপার। আমরা ভাবতাম, বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। মাতলামি, বাজে মানুষের সঙ্গে মেশা... নোংরা পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকা, সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা... মারামারি...' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। একটু পর

আবার শুরু করলেন, 'কথায় কথায় তর্ক করে। আগ্রাসী মানসিকতা। যেটা চায়, যেভাবে হোক আদায় করে ছাড়ে। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চুন থেকে পান খসলেও এত খারাপ সব কথা বলে, শুনলে লাল হয়ে যায় কান।' লালচে হয়ে গেছে প্রফেসরের চোখ। রানার চোখে তাকালেন। 'জানি, এমন হয়েছে আমাদের দোষেই। দ্বিতীয়বার সন্তানের মুখ দেখতে পেয়ে এতই খুশি হয়েছিলাম, আহ্লাদ দিয়ে নষ্ট করেছি ওর মাথা।'

প্রফেসর থেমে যেতে ওয়াইনে মৃদু চুমুক দিল রানা, তারপর বলল, 'বলেছেন ক্যাথি বাড়িতে নেই। তা হলে কি ধরে নেব ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'আজ নিয়ে সাত দিন,' আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রফেসর।

'আপনারা ভাবছেন, কোনও ঝামেলায় পড়েছে ও?'

'কী ভাবব, সেটাই জানি না।'

'ওর সম্পর্কে যা শুনলাম, তাতে এক সপ্তাহ কিন্তু অনেক দিন নয়। আপনিই বলেছেন, বুনো জীবন কাটাচ্ছে ও। হয়তো চলে আসবে যে-কোনও দিন।'

'যদি তা বিশ্বাস করতে পারতাম, ভাল হতো...' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মুখ নিচু করে বসে আছেন রিয়ানা।

'আপনারা কি চান আমি ওকে খুঁজে বের করি?' জানতে চাইল রানা।

'খুব ভাল হতো।'

'ইচ্ছে করে দূরে সরে থাকা এবং ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও বন্দি বা কিডন্যাপ হওয়া কিন্তু এক কথা নয়,' বলল রানা।

'মিথ্যা বলব না, আগেও নানান লোকের সঙ্গে উধাও হয়েছে,' কাঁপা গলায় বলালেন প্রফেসর।

মাথা নিচু করে বসে আছেন রিয়ানা। বললেন, 'কিন্তু এবার ব্যাপারটা তেমন নয়। খুব খারাপ অনুভূতি হচ্ছে আমাদের।'

'কী কারণে আপনাদের এমন মনে হচ্ছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'টাকা। টাকার জন্যে। কোথা থেকে পেল ক্যাথি অত টাকা?'

'একটু খুলে বলুন।'

'সরি, অতীতের বেশ কিছু কথা খুলে বলিনি। আগস্ট মাসে তুরস্কে এক এক্সকেভেশনের প্রোজেক্টে কাজ করছিল ক্যাথি। সেসময় হঠাৎ করেই আমরা জানলাম, ওই কাজ বাদ দিয়ে চলে গেছে কোর্ফিউ দ্বীপে। ওখানে এক বন্ধু আছে আমার। কয়েক দিন তার ওখানে ছিল ক্যাথি।' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে লাগলেন, 'তখনই হঠাৎ কোথা থেকে যেন পেয়ে গেল অনেক টাকা। ডক্টরাল ছাত্রী। অত টাকা ওর কাছে থাকার কথা নয়। অথচ, আমার বন্ধুর কথা অনুযায়ী, ওই সময়ে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগল ও। হাজার হাজার ডলার। আমার বন্ধুর মনে হয়েছে, এতই বেশি টাকা, চাইলেও খরচ করে ফুরাতে পারবে না ক্যাথি। দিতে লাগল একের পর এক পার্টি। প্রতি দিন নতুন সব লোক নিয়ে মাতাল হয়ে ফিরতে লাগল বাড়ি।'

'বুঝতে পারছি, আপনারা আছেন ভীষণ মানসিক কষ্টে।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'সেটা বড় কথা নয়। মন্দ দিক হচ্ছে, আমার বন্ধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। মেজাজ দেখিয়ে চলে গেছে ওর বাড়ি ছেড়ে। দ্বীপের সবচেয়ে দামি হোটেলে উঠেছে ক্যাথি। তারপর ওখানেও ঝামেলা করেছে বলে ওকে বের করে দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। তখন ভাড়া করেছে উপকূলে বিলাসবহুল এক ভিলা। দামি জায়গা। বন্ধুর কাছে শুনেছি, অসভ্য একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশে ওই ভিলায় দিনরাত পার্টি করছিল ও।'

‘বলে যান।’

‘তারপর হঠাৎ করেই উধাও হলো। আট দিন আগের কথা। ল্যাণ্ড ফোনের রেকর্ডারে পেলাম ওর মাতাল কণ্ঠের বার্তা। আগামীকাল দুপুরে বাড়ি ফিরবে ক্যাথি। ব্যস, তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই। এখনও অপেক্ষা করছি ওর জন্যে। কেউ জানে না কোথায় গেছে। আমাদের চেনা প্রতিটি ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে খোঁজ নিয়েছি। এখন আর ওই ভিলায় নেই ক্যাথি। কোনও হোটেলেও নেই। কোর্ফিউ এয়ারপোর্টের কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন, সেই ভোরে বিমানে ওঠেনি ক্যাথি। স্রেফ যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে।’ কাতর চোখে রানাকে দেখলেন প্রফেসর হার্বার্ট। ‘এসব থেকে কী বুঝছ?’

কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল রানা, ‘প্রথম থেকে ধরা যাক। আপনি অবাক হয়েছেন, কোথা থেকে এল এত টাকা। এটা বড় বিষয় না-ও হতে পারে। আপনি বলেছেন, ক্যাথির অভাব নেই বয়ফ্রেণ্ডের। হতে পারে, কোনও বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশছে। এখনও কোর্ফিউ দ্বীপ ত্যাগ করেনি। রূপসী মেয়ে। ওকে কাছে পাওয়ার জন্যে আগ্রহী হবে অসংখ্য ধনী মানুষ। সেজন্যে হাজার হাজার ডলার খরচ করতেও দ্বিধা করবে না। হয়তো কোর্ফিউ দ্বীপ থেকে দূরে দুর্দান্ত কোনও ইয়টে আমোদ-ফুর্তি করছে ও।’

‘হতে পারে,’ বললেন প্রফেসর হার্বার্ট।

‘তার ওপর রয়েছে ক্রেডিট কার্ড। কয়েক শ’ ডলার খরচ করলেই দশ গুণ টাকা ধার দিতে চায় ক্রেডিট কার্ড কর্তৃপক্ষ। এই কারণে সহজেই নগদ টাকা পেয়ে থাকতে পারে।’

‘অসম্ভব নয়,’ সায় দিলেন প্রফেসর।

‘তা হলে ঠিক কী কারণে আপনারা ভাবছেন, মস্ত কোনও বিপদে পড়েছে ক্যাথি?’

‘বুঝিয়ে বলা কঠিন,’ বললেন হার্বার্ট, ‘কিন্তু কেমন যেন

লাগছে আমাদের। এ অনুভূতি শুধু সন্তানকে আগলে রাখার জন্যে, তা নয়। মন যেন বলছে, কোনও বিপদে পড়েছে ক্যাথি।' চেয়ারে ঝুঁকে রানার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'আমাদের খুব উপকার হবে, তুমি একবার কোর্ফিউ থেকে ঘুরে এলে। ক্যাথি ঠিক আছে কি না দেখবে। ...আমাদের সর্বনাশ হবে ও ড্রাগ বা পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িয়ে গেলে...' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর।

'ওসবে জড়াবে ভাবছেন কেন?' বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল রানা।

'আমাদের সামনে আর কোনও উপায় নেই, রানা। এমন নয় যে আশা করব, তোমার কথায় বাড়ি ফিরবে ক্যাথি। কিন্তু হয়তো ফোন করবে আমাদেরকে। ওকে বোঝাতে পারবে তুমি, যত ঝগড়া বা তিক্ততাই হোক, সেজন্যে আমরা সত্যি দুঃখিত। অন্তর থেকে ভালবাসি ওকে।'

অসহায় এক বাবার কাতর অনুরোধ কীভাবে ফেরাবে, তা নিয়ে ভাবছে রানা। তখনই দেখল, রিয়ানার চোখ থেকে টুপ করে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রু।

'আমরা ভেবেছি, ওকে খুঁজে বের করতে নিজেরা ওখানে যাব,' বললেন হার্বার্ট, 'কিন্তু ওকে পেলেও, আমাদের কথা শুনবে না ও। নিজ ইচ্ছে মত চলে। দেখা হলেই শুরু করবে ঝগড়া— আমরা নাক গলাচ্ছি ওর ব্যক্তিগত বিষয়ে। অভিযোগের পর অভিযোগ করবে— ওকে বাঁচতে দিচ্ছি না। তারপর চলে যাবে আরও বহু দূরে কোথাও। আমরা চিনি ওকে, আমাদেরকে কষ্ট দিতে ভাল লাগে ওর।' তিক্ত হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'এমন কাউকে চাই, যে কি না পরিবারের বন্ধু, ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাতে পারবে ওকে। তেমন কাউকে পাচ্ছি না তোমাকে ছাড়া। ...রানা, টাকা খরচ করতে দ্বিধা করব না।' করুণ চোখে রানাকে দেখলেন তিনি। 'জমানো বেশ কিছু টাকা আছে আমাদের। খরচ করতে পারব দশ

হাজার পাউণ্ড। তাতেই হওয়ার কথা। বাড়তি কিছু টাকাও থাকবে তোমার হাতে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতে পারি ওই দশ হাজার পাউণ্ড। আসলে, আমার আর সাধ্য নেই, নইলে আরও বেশিই দিতাম।'

রিয়ানার নীরব অশ্রু দেখার পর থেকেই মউরোসের কথা ভাবছে রানা। এবার সেটাই বলল, 'আমি হয়তো যেতে পারব না। তবে ব্যবস্থা করে দেব। আপনারা এমন কাউকে চান, যে কিনা বিশ্বস্ত। তেমনই একজনের কথা মনে পড়েছে আমার...'

আধঘণ্টা পর হার্বার্ট ভিলা থেকে বেরোল রানা। সোজা ফিরল ওর হোটেলে। ঘরে পৌঁছে কল দিল মউরোসের নম্বরে। দ্বিতীয়বার রিং টোন বাজতেই ফোন ধরল ওর বন্ধু।

'কাজ ঠিক করেছি তোমার জন্যে,' বলল রানা। 'ওটা নিতে পারো।'

খুশি হয়ে উঠল মউরোস। 'কী করতে হবে?'

'মন দিয়ে শোনো...' প্রফেসরের সঙ্গে যে কথা হয়েছে, সব গুছিয়ে বলতে লাগল রানা।

ওর কথা শেষ হলে মউরোস বলল, 'অন্তত এক বছরের মর্টগেজ শোধ দিতে পারব। তবে আগেই জানি, কী বলবে জোয়ি।'

'তোমার কাজ ক্যাথিকে খুঁজে বের করা। ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নয়। ওর বাবার কাছ থেকে যা শুনলাম, খুব কঠিন হবে না ওকে খুঁজে নেয়া। পার্টির বাজনা আর খালি বোতলের পথ পৌঁছে দেবে তোমাকে ঠিক জায়গায়। ওর বাবা-মা জানতে চান, তাঁদের মেয়ে সুস্থ কি না। তুমি বুঝিয়ে বলবেঃ ওর উচিত বাবা-মার সঙ্গে যোগাযোগ করা।'

'সহজ কাজ।'

'জোয়িকে বলতে পারো, তোমার কাজ এক বাবা-মার

একটা মেসেজ তাদের মেয়ের কাছে পৌঁছে দেয়া। কাজটা কঠিন হওয়ার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, গ্রিসের দ্বীপ তো আর আফগানিস্তান নয়।' হাসল মউরোস। 'কাজ শেষ করতে বড়জোর চার-পাঁচ দিন, তাতে পাব দশ হাজার পাউণ্ড। যথেষ্টর বেশি। ভেরি গুড।'

'ঠিক আছে, তা হলে প্রফেসর হার্বার্টকে ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি, কাজটা নিচ্ছ তুমি।'

স্বস্তির হাসি হাসল মউরোস। 'হ্যাঁ, জানাতে পারো, দোস্ত! আর... থ্যাঙ্ক ইউ।'

'মার খাবি, ব্যাটা!'

এগারো

রানা যখন কথা বলছে মউরোসের সঙ্গে, ওই একইসময়ে অক্সফোর্ড শহর থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে, গ্রিক দ্বীপ প্যাক্সোসের এক নির্জন সৈকতে জেটির দিকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্যাথি হার্বার্টকে।

চার দিন আগে জেটিতে রাখা বোট নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। তারপর আর রোদের মুখ দেখেনি। বিছানায় আটকে রেখেছিল এরা। চিৎকার করলে তখন শুধু টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি মিলত। পুরো চার দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এরা ওকে।

পুরো সময়টা মগজ খাটাতে চেষ্টা করেছে ক্যাথি।

অথচ, জানতে পারেনি, ও আসলে কে।

কী নাম ওর?

মগজ যেন মস্তবড় কালো দেয়াল। তবে কখনও কখনও মনে পড়েছে স্বপ্নের মত আধখাপচা এক-আধটা দৃশ্য।

চেহারা।

কণ্ঠস্বর।

অচেনা জায়গা।

সবই যেন চলে আসে খুব কাছে, তারপর চট্ করে আবারও হারিয়ে যায় কুয়াশার ভেতর।

আঙুলে আছে ছোট্ট এক পুরনো ক্ষত। ওটার দিকে চেয়ে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভেবেছে, ওটা বোধহয় ছোটবেলার কাটাচিহ্ন।

কিন্তু ব্যথাটা পেয়েছিল কীভাবে?

কোনও স্মৃতি নেই ওর।

হাজারটা প্রশ্ন জাগছে মনে।

কোথা থেকে এসেছে ও?

কারা ওর পরিবার বা বন্ধু?

কেমন ছিল ওর জীবন?

এর চেয়েও ভীতিকর হচ্ছে একটি প্রশ্ন: এরা ওকে মেরে ফেলবে না তো?

প্রথমে ভীষণ ভয় ছিল মনে। তারপর তা হয়ে উঠল চাপা আতঙ্ক। চুপচাপ খেয়াল করেছে কিডন্যাপারদেরকে, শুনেছে কথা। দুই লোক কখনও কথা বলে না। বেশিরভাগ সময় দেখাও দেয় না। কিন্তু ওই ছাব্বিশ বা সাতাশ বছরের মেয়েটা আর পরিপাটি চুলের লোকটা আসে নিয়মিত। ওই মেয়েটার চোখ খুব কঠোর, তবে কখনও একটু গলে মন। নরম সুরে কথাও বলে।

আর ওই লোকটা... ভয়ঙ্কর নীচ এক সাইকোপ্যাথ। অন্তর থেকে তাকে ঘৃণা করে ক্যাথি। চার দিন পড়ে থাকার সময় বারবার মনে হয়েছে— কোনও উপায়ে নিজেকে মুক্ত করবে ও, কেড়ে নেবে ওই লোকের কাছ থেকে পিস্তল বা

ছোরা, পালিয়ে যাওয়ার আগে খুন করবে শয়তানটাকে।

কিন্তু এরা জরুরি তথ্য জোগাড় করতে যতই চেষ্টা করুক, কোনও কাজ হচ্ছে না হুমকি বা ধমকিতে।

গত ক'দিনে ধীরে ধীরে তাদেরকে হতাশ হতে দেখেছে ও।

এই দীর্ঘ সময়ে হঠাৎ করে একটা চিন্তা এসেছে ক্যাথির।

সত্যিই যদি ফিরে আসে ওর স্মৃতি... তখন কী হবে?

দরকারি সব জেনে যাওয়ার পর কী করবে এরা?

ক্যাথি জানে, সুযোগ পেলে কী করবে পরিপাটি চুলের ইবলিসটা। তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে শুধু ওই মেয়েটা।

হয়তো ওর এই অ্যামনেযিয়াই রক্ষা করছে ওকে!

আজ কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে এরা।

কিন্তু কোথায়?

হাল ছেড়ে দিয়েছে?

এটা ভাবতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠছে ক্যাথি।

ছেড়ে দিচ্ছে?

পৌঁছে দেবে বাড়িতে?

অথবা, ধরে নিয়েছে কোনও কাজেই আসবে না ও।

উচিত খেলা খতম করে দেয়া।

মেরে ফেলবে ওকে?

চিন্তাটা আসতেই থরথর করে কাঁপতে লাগল ওর দুই হাত। ক্যাথির মেরুদণ্ডে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে খোঁচা দিচ্ছে পরিপাটি চুল। 'সামনে বাড়ো!'

আগের চেয়ে জোরে হাঁটতে চাইল ক্যাথি। কিন্তু খালি পায়ে বালিতে গতি তুলতে পারছে না। হাঁটুদুটো যেন নরম রবারের, যে-কোনও সময়ে ভাঁজ হয়ে যাবে।

হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রুক্ষ একটা হাত ধরে ফেলল ওর বাহু। হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল। পিঠে গুঁতো দিল পিস্তলের নল।

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল ক্যাথি।

রাগে লাল হয়ে ওকে দেখছে পরিপাটি চুলের লোকটা। ধৈর্যের মূর্তি হয়ে পেছনে আসছে মেয়েটা। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে আকাশে চোখ বোলাল সে। দু'পাশে দুই লোক। নীরব, নিস্পৃহ চেহারা। একজনের ঊরুর পাশে আলগাভাবে ঝুলছে পিস্তল।

ঝড়ের কবলে পড়া বাঁশের পাতার মত কাঁপছে ক্যাথি। বুঝে গেছে, এরা এবার খুন করবে ওকে!

হ্যাঁ, আজ রক্ষা নেই ওর!

'ভাল করেই জানি, কী ভাবছ,' নিচু গলায় পেছন থেকে বলল কেউ। 'দৌড়ে পালাতে চাও।' খিঁকখিঁক করে হাসল লোকটা। 'তা হলে দৌড় দাও! আমি চাই যেন তাই করো। তা হলে সহজেই খুন করতে পারব।'

'মুখটা বন্ধ রাখো!' ধমক দিল কালো চুলের মেয়েটা।

সাগরের তীরে পৌঁছে গেছে ওরা। কাঠের জেটিতে ঠেলে তোলা হলো ক্যাথিকে। লবণাক্ত তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে শিউরে উঠল ও।

পিছু নিয়েছে অন্যরা।

এরা ডুবিয়ে মারবে ওকে?

তখনই শুনল আওয়াজ। দূর থেকে আসছে বিমান। কপালে হাত রেখে আকাশে চোখ তুলল ক্যাথি।

সাদা বিন্দুর মত একটা বিমান।

পিঠে ঠেলা খেয়ে জেটি ধরে এগোল ও।

সাদা বিন্দু বড় হয়ে উঠল। একটু পর দেখা গেল আকার-আকৃতি। ওটা ছোট একটা সি-প্লেন।

জেটির শেষপ্রান্তে পৌঁছে থামল সবাই।

দুই ইঞ্জিনের খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ তুলে নামছে সি-প্লেন। কিছুক্ষণ পর স্পর্শ করল ঢেউয়ের মাথা। লাফিয়ে উঠল বারকয়েক, তারপর নেমে পড়ল প্রচুর পানি ছিটিয়ে। বাঁক

ঘুরে চলে এল জেটির দিকে, পেছনে সাদা ফেনা।

একটু পর জেটির পাশে ভিড়ল সি-প্লেন। নামছে-উঠছে সাগরের ঢেউয়ের তালে। গতি কমল প্রপেলারের। ইঞ্জিনের বিকট শব্দে দু'হাতে দু'কান চেপে ধরেছে ক্যাথি। পিঠে খোঁচা দিচ্ছে পিস্তলের নল।

সরু ফিউজেলাজের হ্যাচ খুলতেই দেখা দিল এক লোক। শীতল চোখে ক্যাথিকে দেখে নিয়ে মাথা দোলাল অন্যদের উদ্দেশে। সে এবং আরেক লোক মিলে বিমান বেঁধে ফেলল জেটির পিলারে। গ্যাংওয়ে বাড়িয়ে দেয়া হলো জেটির ওপর।

পেছন থেকে ঠেলে সরু ওই সেতুর ওপর তোলা হলো ক্যাথিকে। টলমল করতে করতে বিমানে উঠল ও। ভেতর দিকটা ঘুপচি। বিশ্রী গরম। তৃতীয় একলোক ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলল পেছনের সিটে।

'আমাকে কোথায় নিচ্ছেন?' আতঙ্ক নিয়ে জানতে চাইল ক্যাথি।

হ্যাচের ওদিক থেকে উঁকি দিল পরিপাটি চুল।

মুহূর্তের জন্যে ক্যাথির মনে হলো, ওই শয়তানটাও উঠবে বিমানে। তবে তার কাঁধে হাত রাখল কালো চুলের মেয়েটা। মাথা নাড়ল। তর্ক জুড়তে চাইল ইবলিসটা, তারপর ধমক খেয়ে পিছিয়ে গেল। তার জায়গায় বিমানে উঠল চুপচাপ দু'জন। বসে পড়ল ক্যাথির পাশের দুটো সিটে। পাত্তাই দিল না ওকে। ধুপ্ আওয়াজে বন্ধ হলো হ্যাচ। দুই ইঞ্জিনের গতি বাড়তেই থরথর করে কাঁপতে লাগল হালকা বিমান। একটু পর আবারও উঠবে আকাশে।

সি-প্লেনটাকে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে দেখল বয়েটার ও ক্রিস্টিনা পার্কার। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে নীল আকাশে ভেসে উঠল যান্ত্রিক প্রকাণ্ড মশা। বহু দূরে গিয়ে হয়ে উঠল সাদা বিন্দু। তারপর সেটাও থাকল না।

‘ঘাড় থেকে নামল আপদ,’ বলল ক্রিস্টিনা।

রাগী চোখে তাকে দেখল বয়েটার। ইচ্ছে ছিল বিমানে উঠবে। অন্যদেরকে বুঝিয়ে বদমাস মেয়েটার মুখ থেকে বের করবে সব কথা। দিনের পর দিন পাথুরে এই সাগরতীরে সময় নষ্ট করেও কিছুই পেল না। নিজেকে বঞ্চিত লাগছে তার। বিড়বিড় করে বলল, ‘এবার তা হলে বিদায় নেব এই নরক থেকে?’

‘না,’ বলল ক্রিস্টিনা। ‘শেষ হয়নি আমাদের কাজ।’

বারো

রানা এজেন্সি। লণ্ডন।

আজই সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড শহর থেকে ফিরেছে রানা। একটু দূরের বাঙালি এক রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার সেরে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছে, এমনসময় বেজে উঠল মোবাইল ফোন। টেবিল থেকে ওটা নিয়ে স্ক্রিন দেখল রানা। ফোন জ্যাঁ মউরোসের।

কল রিসিভ করল ও, ‘হ্যাঁ, মউরোস।’

‘এদিকে গণ্ডগোল বেধেছে, তোমার সাহায্য লাগবে, রানা,’ চাপা উত্তেজনা নিয়ে বলল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি।

‘তুমি এখন কোথায়?’ জানতে চাইল ক্লান্ত রানা।

‘এখনও কোর্ফিউতে,’ বলল মউরোস। ‘যা বলেছিলে, তার চেয়ে এখানকার পরিস্থিতি অনেক জটিল।’

‘কী ধরনের সমস্যা?’

কী যেন বলল মউরোস, শুনতে পেল না রানা। ‘একটু

জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না।'

'যত দ্রুত সম্ভব চলে এসো।'

'ফোনে বলা যাবে না?' জানতে চাইল রানা।

'সামনাসামনি বলব। বাজে ধরনের ঝামেলা।'

'কাজটা তো সহজ হওয়ার কথা ছিল, মউরোস।'

'তাই বলেছিলে। কিন্তু ঘাপলা আছে বড় ধরনের।'

রানা চুপ করে আছে।

'রানা, আমি সিরিয়াস,' বলল মউরোস। 'আসতে দেরি কোরো না।'

'কতটা সিরিয়াস?'

'ভয়ঙ্কর সিরিয়াস।'

'তুমি ভাবছ সামলাতে পারবে না?'

'ব্যাকআপ চাই, নইলে যখন তখন বিপদে পড়ব।'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা।

হিথ্রো এয়ারপোর্টে গিয়ে উঠতে হবে এথেন্সের বিমানে। তারপর ওখান থেকে পৌঁছাতে হবে কোর্ফিউ দ্বীপে।

'ঠিক আছে, আগামীকাল দুপুরের আগেই পৌঁছে যাব। ...কোথায় দেখা হবে?'

পরদিন সকাল।

সারি সারি টিলা, সবুজ অরণ্য, উপত্যকার হাজারো বুনো ফুল, দূরে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, পাইনে ঘেরা প্রায় ঘুমন্ত গ্রাম ও বিশাল নীল সাগর— স্বর্গ বললেও ভুল হবে না কোর্ফিউ দ্বীপকে। কার্কাইরা এয়ারপোর্টের চারপাশ ঘুরে নামল বিমান।

আগেও এ দ্বীপে এসেছে রানা। ছোট্ট এয়ারপোর্ট ত্যাগের আগে লকার ভাড়া করে ওখানে রাখল পাসপোর্ট ও রিটার্ন টিকেট। লকারের চাবি গেল জিন্সের প্যান্টের পকেটে। ওর সঙ্গে থাকল শুধু মোবাইল ফোন, ওয়ালেট ও কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়ার মত হালকা একটা ক্যানভাস ট্র্যাভেল ব্যাগ।

বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট ছেড়ে। অসুবিধা হলো না ট্যাক্সি পেতে। বকবক করছে গ্রিক ড্রাইভার। তাকে পাত্তা দিল না রানা। ম্যাপ খুলে দেখে নিল কোথায় যেতে হবে।

মাত্র দু'মাইল দূরে শহর।

সরু সব পথ পেরিয়ে কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট রাস্তায় পৌঁছুল রানা। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বাড়ি। রাস্তায় শুরু হয়েছে সকালের ভিড়। খুলেছে শপিং আর্কেড, ট্যাভার্নস্, হট ফুড বার ও ক্যাফে।

নানা জাতের মানুষে গিজগিজ করছে বাজার, তাদের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোল ট্যাক্সি। নাকে এল লবণ মাখা চিংড়ি ও স্কুইডের আঁশটে গন্ধ। সূর্যের আলোয় চকচক করছে দোকানে সাজানো তাজা জলপাই।

খুব ব্যস্ত স্যান রোক্কো স্কয়্যার। ক্যাফেগুলোর বাইরে টেবিলে খদ্দেরদের জন্যে দেয়া হচ্ছে নাস্তা ও কফি। প্রাচীন সরু, আঁকাবাঁকা পথে গর্জন ছেড়ে অতিরিক্ত জোরে ছুটছে গাড়িঘোড়া।

কাছাকাছি পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে। কঠোর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, করিৎকর্মা মউরোসের কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছে রানা। ওর বন্ধু পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না, এটা সত্যি ওর জন্যে বিস্ময়কর। প্রেম ও বিয়ে ধার কমিয়ে দিল মউরোসের? আগেও কারও কারও জীবনে এমন দেখেছে রানা।

সকাল নয়টার আগেই মউরোসের গেস্টহাউসের সামনে পৌঁছুল ও। পুরনো শহরের ব্যস্ত রাস্তার একপাশে ফ্যাকাসে পাথরের বাড়ি। সামনে ক্যাফে টেরেস। ফুটপাথের ধারে টেবিলের ওপরে ছায়া দিচ্ছে মস্তবড় সব রঙিন ছাতা। এখানে ওখানে পাথরের বড় টবে ডযনখানেক সবুজ গাছ।

একটু দূরের এক টেবিলে বসে আছে মউরোস। একহাতে নিউয পেপার। পাশে কফির পট ও মগ। রানাকে

রাস্তা পেরোতে দেখে চেহারায় ফুটল স্বস্তি। কিন্তু হাসি নেই মুখে।

ভিড় ঠেলে বন্ধুর টেবিলের সামনে পৌঁছে গেল রানা। নাস্তা নিয়ে ব্যস্ত একদল টুরিস্ট। তাদের মাঝে যেমন আছে হানিমুনে আসা দম্পতি, তেমনি আছে বয়স্ক দম্পতিরা। প্রায় সবার সঙ্গে ক্যামেরা ও গাইডবুক। কর্মস্থলে যাওয়ার পথে মুখে কিছু দিয়ে নিচ্ছে অনেকে। টেরেসের প্রান্তে বসে আছে সুতি জ্যাকেট পরা ছোটখাটো এক লোক, নাক গুঁজে রেখেছে ল্যাপটপ কমপিউটারে।

মউরোসের টেবিলে উইকার চেয়ারে জ্যাকেট ঝুলিয়ে দিল রানা। মেঝেতে নামিয়ে রাখল ক্যানভাস ব্যাগ। বসে পড়ল পাশের চেয়ারে।

'কফি দেব?' জানতে চাইল মউরোস।

'দাও।'

রানার জন্যে পট থেকে কফি ঢালল মউরোস। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। কফি মগ সামনে ঠেলে দেখাল পাশের খবরের কাগজ। 'তুমি না এলে বিপদে পড়তাম। আমার ধারণা, খুব খারাপ কিছু হয়েছে ক্যাথি হার্বার্টের।'

'প্রথম থেকে বলো,' কফির মগে চুমুক দিল রানা।

'পাঠালে বার্তাবাহক হিসেবে, কিন্তু কাজটা হয়ে উঠল গোয়েন্দাগিরির,' বলল মউরোস। 'বলেছিলে সেই ভিলাতে থাকবে না ওই মেয়ে। তবুও সার্চ করেছি। ওর বিষয়ে কোনও ক্লু ছিল না। ভিলার মালিক জানে না কোথায় গেছে। বিমানে ওঠেনি। হার্বার্ট পরিবারের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত। বুঝে গেলাম, কেন ওই পরিবারের সঙ্গে মিশ খায়নি মেয়েটা। ওর বাবা যা বলেছেন, ওই একই কথা বললেন ভদ্রলোক। ঝগড়া করে চলে গেছে ক্যাথি। উঠেছিল হোটেলে। ওখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ওকে। তখন ভাড়া করল ভিলা। নতুন কোনও তথ্য নেই। বাধ্য হয়ে

খোঁজখবর শুরু করলাম দ্বীপ জুড়ে। বাদ পড়ল না কোনও বার বা ক্যাফে। প্রতিটি জায়গায় দেখালাম ওর ছবি। জানালাম, আমি তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকে খুঁজছি, কারণ আইনী কিছু জটিলতার কারণে ওকে লাগবে। পুলিশ, ফেরির লোকজন, এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ, ট্যাক্সি ড্রাইভার, হোটেল, হাসপাতাল... বাদ দিলাম না কিছু। নিজের ভিজিটিং কার্ড দিলাম সবার হাতে। কোনও তথ্য পেলে যেন আমাকে জানানো হয়। খরচ করেছি অন্তত ষাট বা সত্তরটা কার্ড। এখন পর্যন্ত নেই কোনও খবর। দ্বীপে নেই ওই মেয়ে।'

'তোমার ধারণা, খারাপ কিছু হয়েছে ওর?' বলল রানা। 'কাগজের জটিলতা এড়িয়েও দ্বীপ ছাড়তে পারে। হয়তো চলে গেছে কারও ইয়টে করে। আমরা আলাপ করছি, অথচ হয়তো মাত্র একমাইল দূরের সাগরে ইয়টের আর্মচেয়ারে বসে শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছে।'

চুপ করে শুনছিল মউরোস, রানা থেমে যেতেই মাথা নাড়ল। 'মনে হয় না। ঘটনা আরও জটিল।'

'এই বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য পেয়েছ?'

'হুঁ। ফোন এল এক লোকের কাছ থেকে। জানাল, নাম অ্যাবেলিনো থ্যানাটস। পরিচিত এক লোকের কাছ থেকে শুনেছে, খুঁজছি ক্যাথি হার্বার্টকে। মেয়েটার জন্যে চিন্তিত মনে হলো তাকে। বলল, ভাল করেই চিনত। ওর সম্পর্কে জরুরি কিছু তথ্যও জানে। কিন্তু ফোনে বলবে না, ভাল হয় গোপনে কোথাও দেখা করলে।'

'অর্থাৎ, বিবাহিত লোক,' বলল রানা। 'স্থানীয় সম্মানিত কেউ। স্ত্রী যখন বাইরে কোথাও, সেই সুযোগে মেলামেশা করেছে ক্যাথির সঙ্গে।'

'আমারও তা-ই ধারণা। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। ব্যবসায়ী। স্থানীয় গল্‌ফ্ ক্লাবের বড়সড় কর্মকর্তা। সমাজের মাথা। কোর্ফিউ টাউনে চমৎকার বিলাসবহুল বাড়ি। দূরে

পাহাড়ের ওপরে জঙ্গলের মাঝে দারুণ সুন্দর বাংলো। সুযোগ সুবিধা সবই আছে। সঙ্গে সুন্দরী মেয়ে থাকলে আর কী চাই! গত কয়েক দিন ছুটি কাটিয়ে টাউনের বাড়িতে ফিরেছে তার ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রী। তাই ওখানে দেখা করতে রাজি হয়নি সে। দেখা করতে বলেছিল পাহাড়ি বাংলোয়। গেলাম। খুব নার্ভাস মনে হলো তাকে। বলল এমন সব কথা, যেগুলো শুনব ভাবতেও পারিনি।'

থেমে গিয়ে টেরেস দেখল মউরোস। ছোট্ট এক গ্রিক ছেলে। সাত বছর হবে বয়স। কালো চুল, কালো চোখ, রোদে পোড়া চামড়া। পরনে ডোরাকাটা টি-শার্ট ও লাল হাফ প্যান্ট। টেরেসের টেবিলের মাঝ দিয়ে দক্ষ খেলোয়াড়দের মত দাপাচ্ছে বাস্কেট বল। এদিক-ওদিক বাউলি কাটার ভঙ্গি করছে। সিমেন্টে পড়ে ধ্যাপ-ধ্যাপ আওয়াজ তুলছে বল। টেবিলের কোনা ঘুরে চলে গেছে রাস্তার কাছে। একটু দূরের টেবিল থেকে ছেলেটাকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে হাসছেন কয়েকজন মহিলা।

নতুন করে কফি নেবে বলে চুপ হয়ে গেছে মউরোস। এই সুযোগে চেয়ারে ঘুরে ছেলেটাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল রানা। বারবার ড্রপ দিয়ে বলটা নিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে পিচ্চি। কিন্তু কেউ চেয়ে আছে দেখে মনোযোগ সরে যেতেই ওর হাত থেকে ফস্কে গেল বল। কমপিউটার নিয়ে ছোটখাটো লোকটা যেখানে বসেছে, সেই টেবিলের পায়ায় লেগে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। নিচু গলায় গালি দিল লোকটা। গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজে ভাষাটা চিনল না রানা। বাঁদরের মত দেখতে লোকটা, ত্রিকোণ চেহারা। চোখে আগুন নিয়ে চেয়ে আছে ছোট্ট ছেলেটার দিকে। রাস্তা থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে সরে গেল পিচ্চি।

'দুর্ঘটনা এড়াতে হলে উচিত মাঠে গিয়ে খেলা,' মন্তব্য করল মউরোস।

বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'কী বলেছে থ্যানাটস।'

'বেশ কিছু দিন ধরেই গোপনে প্রেম করছিল ওরা,' বলল মউরোস। 'একরাতে মিলিত হলো ওরা। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই একসাথে রাত কাটাত দু'জন। এমন নাগর আরও ক'জন ছিল ক্যাথির। কিন্তু থ্যানাটসকে বিছানাসঙ্গী হিসেবে বেশি পছন্দ করত মেয়েটা। কিছু গোপন না করেই সব খুলে বলেছে লোকটা। আগেও অনেক মেয়ের সঙ্গে বিছানায় গেছে। তারও মনে হয়েছিল বিছানায় ক্যাথির তুলনা নেই। ওকে কাছে পাওয়ার জন্যে নানান দামি জিনিস দিচ্ছিল। তারপর হঠাৎ করেই থ্যানাটসের টাকা আর প্রয়োজন পড়ল না ক্যাথির। কোত্থেকে যেন পেল অঢেল টাকা।'

'জানতে পেরেছ, কোথা থেকে পেয়েছে?'

মাথা দোলাল মউরোস। 'স্টেট্স্ থেকে। আন্তর্জাতিক মানি অর্ডারের মাধ্যমে এসেছে বিশ হাজার ডলার। থ্যানাটসকে বলেনি কে পাঠিয়েছে। তবে এটা বলেছে, কিছু দিনের ভেতর আসবে আরও অনেক টাকা।'

'আরও?'

'হ্যাঁ। লাখ লাখ ডলার। বাকি জীবনে আর কোনও কাজ করতে হবে না। থ্যানাটসকে জানিয়েছিল, ও ভাবছে দ্বীপে বড় একটা বাড়ি কিনে এখানেই রয়ে যাবে।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল মউরোস, 'তবে আরও বিস্ময়কর ঘটনা কী, জানো?'

'না জানালে জানব কী করে,' হাই চাপল রানা।

'কোথা থেকে এত টাকা এসেছে না বললেও, এটা বলেছে, ওই টাকা আসবে একটা ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে।'

'কী ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী?'

'আর কিছুই জানে না থ্যানাটস। ওই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে টাকা। আর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি।

যে-কেউ বলবে, কপালের জোরে লটারি পেয়েছে ওই মেয়ে।'

'শেষ কবে ক্যাথির সঙ্গে দেখা হয় থ্যানাটসের?' জানতে চাইল রানা।

'যে রাতে পার্টি দিল ক্যাথি, শেষবার দেখা হয়েছে সেখানেই। পরদিন ভোরে এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা ছিল মেয়েটার। তবে যায়নি। থ্যানাটস চায়নি পার্টিতে কেউ চিনে ফেলুক তাকে। গিয়েছিল মনের টানে দেখা করতে। প্রায় লুকিয়ে ছিল পার্টিতে। সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ওখানেই ছিল। ক্যাথির সঙ্গে কথা হয়েছিল, রাতে দু'জন মিলে মৌজ করবে পাহাড়ি বাংলোয়। পার্টি শেষ করে স্কুটারে চেপে ওখানে যাবে মেয়েটা।' আবারও কফি ঢেলে নিল মউরোস।

'কিন্তু ক্যাথি ওই বাংলোয় যায়নি,' বলল রানা।

মাথা দোলাল মউরোস। 'তারপর থেকেই আর পাওয়া যাচ্ছে না ওকে। পার্টি শেষ হওয়ার পর গভীর রাতে থ্যানাটসের বাংলোতে যাওয়ার পথে হারিয়ে গেছে।'

'স্কুটারে করে যাওয়ার কথা ছিল ক্যাথির?'

'হুঁ। ভাড়া নেয়া হয়েছিল রেণ্ট-এ-কার এজেন্সি থেকে। দামি সুপার স্কুটার। ওটাও উধাও হয়েছে।'

'সড়ক দুর্ঘটনা? হয়তো পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছে মাতাল হয়ে। এখন পড়ে আছে কোনও খাদে।'

'অসম্ভব নয়,' বলল মউরোস, 'কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। থ্যানাটস বলেছে, অদ্ভুত এক ঘটনা দেখেছিল পার্টিতে। ওখানে ছিল কমবয়সী অনেক যুবক। সবার চোখ ছিল ক্যাথির দিকে। সেজন্যে প্রেমিকার ওপরে চোখ রেখেছিল থ্যানাটস। খুব হিংসা লাগছিল। তখনই দেখল এক যুবককে। বয়স ত্রিশ মত। চমৎকার সোনালি চুল। সুদর্শন। সঙ্গে এক যুবতী। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে ক্যাথির সঙ্গে ভিড়ে যায় যুবক। নাম বলেছিল বাড। থ্যানাটসের ধারণা, সে আমেরিকান।'

'আর তার সঙ্গের মেয়েটা?'

'থ্যানাটস বলেছে, মেয়েটা দেখতে ছিল অনেকটা গ্রিক দেবীর মতই রূপসী। গ্রিকও হতে পারে। একবারও কথা বলতে শোনেনি। সবার কাছ থেকে দূরে ছিল। বাডকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল থ্যানাটস। যুবককে বেশ পাত্তা দিচ্ছিল ক্যাথি। একটু পর থ্যানাটস দেখল, বারের পেছনে গেল যুবক। কী যেন মিশিয়ে দিল ড্রিঙ্কে। তারপর ওটা এনে দিল ক্যাথির হাতে। সত্যিই কিছু মিশিয়ে দিয়েছে কি না, তা পুরো নিশ্চিত নয় থ্যানাটস। যুবকের পিঠ ছিল তার দিকে।'

ভাবছে রানা, ওটা হয়তো যৌন উত্তেজনা তৈরির কোনও ওষুধ। যাতে যুবকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ক্যাথি। আবার এ-ও হতে পারে, বেশ কয়েকজন মিলে চেয়েছিল ক্যাথিকে দল বেঁধে রেপ করতে। অবশ্য, এরচেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে। হয়তো কিডন্যাপ হয়েছে মেয়েটা। বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'খারাপ কিছু হয়েছে, ধরে নেয়া যায়।'

'থ্যানাটস শিয়োর নয় গ্লাসে কিছু মিশিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলল মউরোস, 'কিন্তু গ্লাসটা টেবিলে রেখেছিল ক্যাথি। সেই সুযোগে হাঁটু দিয়ে টেবিলের পায়ায় গুঁতো মেরে গ্লাসটা ফেলে দেয় থ্যানাটস। যে-কেউ নাকি ভাবত, বেসামাল মাতালের কাজ। এরপর ক্যাথিকে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে থ্যানাটস। বাডের ব্যাপারে সতর্ক করে বলে, ওই যুবক থেকে সাবধান। যাতে পার্টি ভেঙে দিয়ে চলে যায় ওর বাংলোয়। তাতে তর্ক শুরু করল ক্যাথি। থ্যানাটস ভয় পেল, যে-কোনও সময়ে চেঁচামেচি করবে ও। তাতে সমস্যায় পড়বে সে। বাডের দেয়া কোনও ড্রিঙ্ক যেন ক্যাথি স্পর্শ না করে, সেটা জানিয়ে পার্টি ত্যাগ করে থ্যানাটস। সোজা ফেরে পাহাড়ি বাংলোয়।'

'পরে ওখানে যাবে ক্যাথি, তা না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'হয়তো স্রেফ নাচিয়ে মজা পেয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল মউরোস। 'যাবে না মনে

করলে, থ্যানাটসের মাধ্যমে আগেই নিজের মালপত্র ওই বাংলোয় পাঠিয়ে দিত না। নিজের মার্সিডিয গাড়িতে করে সব নিয়ে গিয়েছিল থ্যানাটস। কাপড়চোপড় আর টুকটাক সব। এ ছাড়া, ছিল ছোট একটা ট্র্যাভেল পাউচ। ওটাতে ছিল পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট আর টাকা। থ্যানাটসকে ফাঁকি দেয়ার ইচ্ছে ক্যাথি হার্বার্টের ছিল না।'

'হয়তো হাল ছাড়েনি বাড নামের ওই যুবক,' বলল গম্ভীর রানা। 'তারপর কী হয়েছে?'

'সেরাতে যখন ক্যাথি বাংলোয় গেল না, ল্যাণ্ড ফোনে ভিলায় কল দিল থ্যানাটস। ওদিকে থেকে ফোন ধরল না কেউ। বাধ্য হয়ে ভিলায় গেল সে। সব দরজা-জানালা বন্ধ করে গিয়েছিল ক্যাথি। কোথাও ছিল না স্কুটার। মেয়েটা উধাও হয়েছে ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ল থ্যানাটস।'

'পুলিশকে জানাতে পারল না যে হারিয়ে গেছে মেয়েটা,' বলল রানা। 'নইলে প্রকাশ পেত দু'জনের সম্পর্ক। তা ছাড়া, থ্যানাটস ভেবেছে, কে জানে, হয়তো দু'চার দিন পর আপনিই ফিরবে ক্যাথি।'

মাথা দোলাল মউরোস। 'ফাঁদে পড়েছিল থ্যানাটস। কিন্তু যখন শুনল ক্যাথির অভিভাবকরা খুঁজতে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন খুশি মনেই মেয়েটার সব জিনিসপত্র আমাকে দিয়ে দিয়েছে।'

'ওগুলো এখন কোথায়?'

পেছনের দোতলার একটা জানালা দেখাল মউরোস। 'আমার ঘরে। তবে ওর পাউচ আমার কাছে।' পাশের মেঝে থেকে প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ তুলে টেবিলে রাখল ও।

ওটা থেকে ট্র্যাভেল পাউচ নিয়ে হাতড়ে দেখল রানা। ভেতরে তেমন কিছুই নেই। শুধু পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন আর একটা কাপড়ের পার্স। ওটার ভেতরে একগাদা ইউরো। সব মিলে ছয় হাজারেরও বেশি।

‘রাকস্যাকে কাপড়ের নিচে আরও আছে,’ বলল মউরোস, ‘বিশ হাজার ডলারের বড় এক অংশ খরচ করেছে।’

‘তোমার কথাই ঠিক, রাত কাটাতে চেয়েছিল থ্যানাটসের সঙ্গে,’ বলল রানা, ‘এত টাকা কেউ ফেলে যাবে না।’ ব্যাগ থেকে বের করল ট্র্যাভেল এজেন্টের চকচকে এক পেপার ওয়ালেট। ওটা থেকে নিল এথেন্স থেকে হিথ্রো বিমানবন্দরে যাওয়ার বিমান টিকেট। যেদিন হারিয়ে গেল ক্যাথি, সেদিনের তারিখ। ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা বই নিল রানা। ওটা চামড়া দিয়ে মোড়া। অ্যাড্রেস বুক। পাতার কিনারা ঝকঝকে। নতুন কেনা হয়েছিল। বাড নামের কাউকে পাওয়া যায় কি না ভেবে অ্যাড্রেস বুকে চোখ বোলাতে লাগল রানা।

যা ভেবেছে, তেমন কিছুই পেল না। বাড নামের কেউ নেই অ্যাড্রেস বুকে। লেখাগুলোর ওপর আবারও চোখ বোলাল রানা। মাত্র কয়েকটা এণ্ট্রি। প্রায় সবই ০১৮৬৫ সংখ্যার। অক্সফোর্ডের কোড। এসব সংখ্যার একটা ক্যাথির বাবা-মার। অবশ্য, এ ছাড়াও আছে বিদেশের কয়েকটা নম্বর। তাদের একজন মেরিয়ান ট্রুলি। আরেকজনের নাম বার্কলে। কোনও কোম্পানির নামও হতে পারে। কোনও ঠিকানা নেই, শুধু ফোন নম্বর। মেরিয়ান ট্রুলি আর বার্কলের ফোন নম্বর থেকে রানা বুঝল, এরা দু'জন বাস করে মার্কিন মুলুকে।

‘বার্কলে কে?’ জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল মউরোস। ‘জানি না।’

অ্যাড্রেস বুকের আরও কয়েকটা পাতা উল্টে দেখল রানা। টুপ করে ওটা থেকে পড়ল একটা ব্যবসায়িক কার্ড। তুলে নিল রানা। কার্ডে লেখা: হার্ভে সিম্পসন, অ্যাটর্নি। ঠিকানা বলছে, সে বাস করে আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যের স্যাভানা শহরে। কার্ডটা প্যান্টের পকেটে রাখল রানা। ‘টাকা

আর পোশাক ছাড়া আর কিছু পেয়েছ রাকস্যাকে?'

'না, আর কিছু না,' বলল মউরোস।

'তা হলে সূত্র বলতে এ-ই।' টাকা পাঠানো হয়েছে আমেরিকা থেকে, ভাবছে রানা। গ্রিসের ওই পার্টিতে ছিল আমেরিকান ওই লোক বাড। 'ইউএস-এর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্যাথির। এ বিষয়ে কিছু বলেছে থ্যানাটস?'

'টাকা ওখান থেকে এসেছে, এ ছাড়া আর কিছুই বলেনি,' বলল মউরোস।

'সেক্ষেত্রে থ্যানাটসের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'সময় দিতে পারবে সে?'

'না, পারবে না, রানা।'

'বুঝতে পারছি, সামাজিক জটিলতার কথা ভেবে আড়ালে থাকতে চাইছে। তবে মাত্র দু'চারটা প্রশ্ন করব তাকে।'

'কথা বলতে পারবে না বলেছি অন্য কারণে,' বলল মউরোস।

'কী সমস্যা তার?'

'ভেবেছ এমনি এমনি ডেকেছি?' ভাঁজ করা খবরের কাগজ খুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল মউরোস। 'প্রথম পাতায় চোখ বোলাও। গতকালকের পেপার। গ্রিক ভাষা না জানলেও সবই বুঝবে।'

দৈনিক পত্রিকায় ছেপেছে সাদা-কালো ছবি। পুলিশের কয়েকটা গাড়ি রাখা। কয়েকজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছোট এক ভিলার বাইরে। পাশের ছবিতে এক লোকের মুখ। বয়স পঁয়তাল্লিশ মত। পৌরুষদীপ্ত। গোঁফ আছে। জুলফির চুল ধূসর। নিচে লেখা: খুন হয়েছেন শিল্পপতি ও সমাজসেবী অ্যাবেলিনো থ্যানাটস।

'আগেই বলেছি, ব্যাপারটা সিরিয়াস,' বলল মউরোস। 'ওই লোক খুন হয়েছে জেনেই ফোন করি। ছবি দিয়েছে ওই ভিলারই। ওখানে পাওয়া গেছে লোকটাকে। দ্বীপে ছড়িয়ে

গেছে খবরটা।'

'কে পেয়েছে থ্যানাটসকে?'

'পুলিশে খবর দিয়েছে কেউ। লাশ পড়ে ছিল দু'দিন ধরেই। অতিরিক্ত পরিমাণের হেরোইন ছিল মৃতদেহে। বাড়িতে কয়েক জায়গায় ছিল কয়েক প্যাকেট হেরোইন। যে কেউ ভাববে, বেশি হেরোইন সেবন করে মরেছে সে, অথবা আত্মহত্যা। কারও কারও ধারণা, খুন হয়েছে সে। আসলে কী ঘটেছে, বলতে পারছে না কেউ। গত কয়েক বছরের ভেতর দ্বীপের সবচেয়ে বড় স্ক্যাণ্ডাল হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা। আগে কখনও এমন কিছু হয়নি এখানে।'

চুপ করে আছে রানা। কী ভাববে, জানে না। সবসময় হাতে হাত রেখে চলে ড্রাগ্‌স্‌, নগদ টাকা ও মৃত্যু। কিন্তু ক্যাথি আর থ্যানাটস ড্রাগসের ব্যবসার সঙ্গে জড়ালে, মউরোসকে কেন ওসব জানাল লোকটা? সেক্ষেত্রে মুখ বুজে থাকার কথা। কেন নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে?

উঁহুঁ, এসবের ভেতর আছে অন্য কোনও জটিল ব্যাপার।

টাকার সঙ্গে কীসের সম্পর্ক ওই ভবিষ্যদ্বাণীর?

জানা যায়নি ওটা কী বিষয়ে।

'আরও আছে,' বলল মউরোস, 'কারা যেন ফলো করছে আমাকে।'

'কখন থেকে?'

'দ্বীপে এসে ক্যাথি হার্বার্টকে খুঁজতে শুরু করার পর থেকেই।'

'কোনও ভুল হচ্ছে না তো তোমার?'

মাথা নাড়ল মউরোস। 'না। ওরা কাজে ভাল। তবে এত ভাল নয় যে চোখ এড়িয়ে যাবে। দলে একাধিক লোক।'

'ক'জন?'

'তিন কি চারজন। তাদের একজন মহিলা।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'আপাতত আশপাশে আছে

কেউ?’

‘না। হয়তো এসেছে নতুন কেউ, যাকে চিনি না। ...এবার কী করতে চাও, রানা? আমরা কি পুলিশের হাতে ব্যাপারটা তুলে দেব? তারা চেষ্টা করে দেখুক কী করা যায়।’

‘বাধ্য না হলে পুলিশের কাছে যাব না,’ বলল রানা।

‘কিন্তু এগোবার কোনও পথ নেই,’ বলল মউরোস, ‘বার্তাবাহক হিসেবে এসেছি, ওই কথাই বলেছি জোয়িকে। ...আমার কাজ শেষ, তা হলে কি বাড়ি ফিরব?’

আবারও টেবিলগুলোর মাঝে বাস্কেট বল হাতে এসে খেলছে পিচ্চি ছেলেটা। একটু আগে কমপিউটার নিয়ে ছোটখাটো লোকটা বসেছিল যে টেবিলে, সেটা এখন খালি। দক্ষতার সঙ্গে ডজ দিয়ে ওই টেবিল পাশ কাটিয়ে গেল পিচ্চি। কিন্তু হঠাৎ করে হোঁচট খেতেই হাত থেকে ছুটে গেল বল। ওটার পেছনে দৌড় দিল পিচ্চি। নেমে পড়েছে পেভমেণ্ট ছেড়ে। রাস্তায় গিয়ে পড়েছে বল।

চোখের কোণে রানা দেখল, একটা ভ্যান। সবুজ। তোবড়ানো। কোনও ডেলিভারি ভেহিকেল। দ্রুতগতি। বলের পেছনে ছুটছে ছেলেটা। সোজা পড়বে গিয়ে ভ্যানের নিচে!

কী যেন বলল মউরোস, ওদিকে খেয়াল নেই রানার। ঘুরে দেখল, তীর বেগে আসছে ভ্যান। পাশের প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলছে ড্রাইভার। রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়েছে চোখ। জানে না, সামনেই বাচ্চা এক ছেলে।

গড়াতে গড়াতে থেমেছে বল। তুলতে ঝুঁকল ছেলেটা। তখনই দেখল ভ্যান। বিস্ফারিত হলো ওর চোখ। পাথরের মূর্তি হলো ভয়ে। ধেয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু!

কমছে না ভ্যানের গতি।

ব্রেক করেও এখন আর থামাতে পারবে না ড্রাইভার।

মগজ অত্যন্ত দ্রুত চললে, সবসময় মনে হয় সব ঘটছে স্লো মোশনে— রানার ক্ষেত্রেও তা-ই হলো। লাফ দিয়ে

চেয়ার ছাড়ল, দু'লাফে নামল রাস্তায়। ছেলেটা আছে আঠারো ফুট দূরে। ক্ষিপ্র চিতার বেগে ছুটল রানা। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছুল বাচ্চাটার পাশে। কোমর জড়িয়ে ধরে তুলেই টের পেল, চাপ লাগতেই বেরিয়ে গেছে বেচারার ফুসফুস থেকে সব বাতাস।

ভ্যান পৌঁছে গেছে নাকের ডগায়। ডাইভ দিয়ে গাড়িটার ওপাশে পড়ল রানা। রাস্তায় গড়াচ্ছে, বুকের ভেতর আড়াল করেছে ছেলেটাকে।

ভীষণ ভয়ে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।

ভ্যানের ড্রাইভার কড়া ব্রেক করতেই চারপাশে ছড়িয়ে গেল তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ। আটকে গেছে চার চাকা। পোড়া রাবার রাস্তায় তৈরি করল কালো সাপের মত আঁকাবাঁকা দাগ। বাঁক নিয়ে বেকায়দাভাবে থামল ভ্যান। ক্যাফের টেরেস আর রানা ও ছেলেটার মাঝে সাসপেনশনের ওপর ভর করে এদিক-ওদিক দুলছে ওটা।

রানার মনে হলো, নতুন করে চালু হলো সময় ও জীবন। চিৎকার করছে ক্যাফের খদ্দেররা। চোখ এদিকে। বুঝে গেছে, বেপরোয়া ওই বাদামি চামড়ার যুবক প্রাণের ঝুঁকি নিল বলেই বেঁচে গেছে ছোট ছেলেটা।

বাজে ভাবে কাঁধ ছিলে গেছে, ভীষণ জ্বলছে রানার। উঠে বসে ভ্যানের নাকের ওপর দিয়ে দেখল, ক্যাফে টেরেসে দাঁড়িয়ে আছে মউরোস। বিস্মিত চোখে দেখছে ওকে। এক হাতে শক্ত করে ধরেছে চেয়ারের পিঠ।

তখনই রানার চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো গোটা পৃথিবী!

তেরো

একমুহূর্ত আগে জমজমাট ছিল ক্যাফে টেরেস। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবীসহ নাস্তা সারছিল অনেকে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের কমলা আগুন গপ্ করে গিলে ফেলল সব। পেভমেন্ট পেরিয়ে শকওয়েভ পৌঁছুল রাস্তায়। ভেঙেচুরে আকাশে উঠল জ্বলন্ত টেবিল-চেয়ার ও ছেঁড়া মস্ত ছাতা। বৃষ্টির মত ওপর থেকে নামল আগুনধরা জঞ্জাল। চুরমার হয়েছে আশপাশের বাড়িগুলোর কাঁচের জানালা। শকওয়েভ কষে চড় লাগাল ভারী ভ্যানটাকে। আকাশে উঠে কাত হয়ে ধুম্ করে পড়ল ওটা, বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হয়েছে জানালা।

বেকায়দাভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছিল রানা, বুকে চেপে রেখেছে বাচ্চাটাকে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগতেই ছিটকে গেল পেছনে। রাস্তায় পড়েই গড়ান দিয়ে বুকে লুকিয়ে ফেলল ছেলেটাকে। আকাশ থেকে ঝরঝর ঝরছে ভাঙা আবর্জনার টুকরো।

হঠাৎ নামল ভুতুড়ে থমথমে নীরবতা। তারপর শুরু হলো হৈ-চৈ ও আর্তচিৎকার।

কানের পাশে প্রকাণ্ড ঘণ্টি বাজিয়ে দিলে যেমন লাগে, তেমনই ঝনঝন করছে রানার দু'কান। বনবন করে ঘুরছে মাথা। সচেতন প্রথম চিন্তা এল: নিরাপদ কোথাও সরাতে হবে বাচ্চাটাকে। ভাঙা কাঁচের মধ্যে ধীরে ধীরে হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল রানা। ছেলেটার বিস্ফারিত চোখে চোখ

পড়ল ওর। ভীষণ ভয় পেয়েছে বেচারা। আহত কি না পরখ করে দেখল রানা। কপালের জোরে কিছুই হয়নি পিচ্চির। অবশ্য, এমনই শক পেয়েছে, বন্ধ হয়েছে জবান।

এবার মউরোসের কথা মনে পড়ল রানার। টলমল করে উঠে দাঁড়াল। ঘাড়ে ও কাঁধে ভীষণ ব্যথা। রক্তে ভিজে গেছে ছেঁড়া শার্ট। ঘাড়ে বুলিয়ে চোখের সামনে হাত আনল রানা। চট-চট করছে লাল আঙুল। জ্বলন্ত ভ্যানটাকে ঘুরে টেরেসের ধ্বংসাবশেষ দেখল।

নৃশংসভাবে খুন হয়েছে অনেকে। রক্তে ভেজা ক্ষত-বিক্ষত লাশ। এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অনেকে চিৎকার করছে আতঙ্কে। গুঙিয়ে সাহায্য চাইছে আহতরা। মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ছে বাকিরা। উঠে দাঁড়াল মারাত্মকভাবে আহত নয় এমন ক'জন। ঘোরের ভেতর টলতে টলতে সরে যাচ্ছে হত্যাযজ্ঞের এলাকা থেকে। বাতাসে কালো ধোঁয়া ও কটু গন্ধ। ছোট সব আগুন জ্বলছে রাস্তায়।

'মউরোস!' গলা ফাটিয়ে ডাকল রানা। দুই সেকেণ্ড পর পেল বন্ধুকে।

এখনও সেই চেয়ারের পিঠে রয়ে গেছে মউরোসের হাত। শুধু কবজি পর্যন্ত। পেভমেণ্টে পড়ে আছে ওর ছিন্নভিন্ন লাশ। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চোখ বুজল রানা।

আহতদের আর্তচিৎকার, করুণ গোঙানি ও দৌড়ে আসা সাহায্যকারীদের হৈ-চৈ ছাপিয়ে ক'সেকেণ্ড পর এল অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের গাড়ির সাইরেনের তীক্ষ্ণ নিনাদ। একটু পর ব্যস্ত হয়ে আহতদের সেবা দিতে লাগল প্যারামেডিকরা। উপস্থিত হয়েছে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রাস্তা ভরে গেল ইমার্জেন্সি ভেহিকেল ও ইকুইপমেণ্টে। ক্যাফে এলাকা ঘিরে ফেলেছে পুলিশ অফিসাররা। চিৎকার করে কথা বলছে রেডিয়োতে। সরিয়ে দিচ্ছে আশপাশের রাস্তা থেকে আসা কৌতূহলী মানুষের

ভিড়। প্রিয় কাউকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে কেউ। রাগ ও আতঙ্কের ছাপ সবার চোখে-মুখে, নির্মম হিংস্রতার মাত্রা বুঝে হতবাক।

চাদর দিয়ে লাশ ঢাকছে করোনারের দলের লোক। পরে ব্যাগ এলে ভরবে মৃতদেহ। যে-যার কাজ করছে মেডিকেল টিম। অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়ার আগে আহতদেরকে দেয়া হচ্ছে প্রাথমিক চিকিৎসা। চাকার কর্কশ আওয়াজ তুলে বিদায় নিচ্ছে ইমার্জেন্সি ভেহিকেল। সে-জায়গায় আসছে নতুন অ্যাম্বুলেন্স।

রাস্তার ওপার থেকে দেখছে রানা। পাশেই দুই হাঁটুর মধ্যে বাস্কেট বল রেখে ফুটপাথে চুপ করে বসে আছে ছেলেটা। অবাক চোখে দেখছে সব। জিজ্ঞাসার চোখে রানার দিকে তাকাল। কেটে গেছে ডান ভুরু। ওখানে সামান্য রক্ত। বাচ্চাটার কাঁধ আলতো করে চাপড়ে দিল রানা।

ভিড়ের ভেতর কী যেন দেখল ছেলেটা। রানা বাধা দেয়ার আগেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে ছুটে চলে গেল।

একটু পর প্যারামেডিক দলের দু'জন দেখল রানাকে। দৌড়ে এল তারা। রানার মনে পড়ল, রক্তে ভিজে গেছে ওর শার্টের একপাশ। তবে কোনও ব্যথা নেই। শুধু মনে হচ্ছে, অবশ হয়ে গেছে দেহের ওদিকটা। ঠিকভাবে শুনছে না কানে। রানা আপত্তি তুলতে চাইলেও ওর কাঁধে ভারী ব্ল্যাঙ্কেট চাপিয়ে দিল দুই প্যারামেডিক। শুরু হলো আহত জায়গার চিকিৎসা। লোকদু'জনের কথা থেকে রানা বুঝল, ওর ঘাড়ের ক্ষতটা বেশ গুরুতর। এবার আপত্তি তুলল না, ধরে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ওকে নিয়ে চলল প্যারামেডিকরা।

শেষবারের মত টেরেসের দিকে তাকাল রানা। রক্তাক্ত চাদরে রেখেছে মউরোসের অবশিষ্টাংশ। এখন আর চেয়ারের পিঠে নেই ছেঁড়া কবজি। রানাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিল প্যারামেডিকরা। শুইয়ে দেয়া হলো সরু এক বাঙ্কে। ধুপ্ করে

বন্ধ হলো দরজা। গর্জন ছাড়ল গাড়ির ইঞ্জিন। বাজতে শুরু করেছে সাইরেন।

রানা বুঝল, রওনা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স। চারপাশে তাকাল। চলন্ত গাড়ির ভেতর দুলছে মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট আর টিউব। ওর ওপরে একটা স্ট্যাণ্ডে নড়ছে ড্রিপ।

গাড়িতে একা নয় রানা। ওর শরীর হাতড়ে দেখছে কারা যেন। নাকের কাছে এসেও সরে গেল দুটো মুখ। ঝনঝন করছে কান। শুনছে নানান কণ্ঠ। বহু দূরে আবছা একটা মুখ। কোথায় যেন ভেসে চলেছে ও। কোনও ওজন নেই। গিয়ে পড়ছে কালো এক গহ্বরে। গভীর কোনও কূপে তলিয়ে যেতে যেতে আগুন ও বিস্ফোরণের দুঃস্বপ্ন দেখছে রানা। ওর দিকে চেয়ে হাসছে জ্যাঁ মউরোস। তারপর ওই জায়গা দখল করল ছোট্ট ছেলেটা। একবার ওকে দেখে নিয়ে দৌড়ে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। তখনই ঝুপ্ করে নামল রানার চোখের সামনে কালো একটা ভারী পর্দা।

চোদ্দ

হঠাৎ ঘুম ভাঙল রানার। কিছুক্ষণ লাগল নিজেকে ফিরে পেতে। চোখদুটো সামান্য একটু মেলে দেখল, ও ঘরে একা। আসবাবপত্র সব সাদা। এটা বোধহয় কোনও ক্লিনিক হবে। নাকে চাপড় দিল ডিস্ইনফেক্ট্যাণ্ট ও হাসপাতালের খাবারের কুবাস। খোলা দরজার ওদিকে করিডোর ধরে ট্রলি ঠেলে নিয়ে গেল নীল ওভারঅল পরা এক আর্দালি।

শক্ত বিছানায় কাত হলো রানা। ঘাড় ও কাঁধের তীব্র

ব্যথায় কুঁচকে ফেলল ভুরু। হাত তুলে দেখল ঘাড়ে বড় একটা সাদা ড্রেসিং। এবার সবই মনে পড়ল ওর। বিস্ফোরণ হয়েছিল ক্যাফে টেরেসে। কাঁচের টুকরো গেঁথেছিল ঘাড়ে। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল প্যারামেডিকরা।

চট্ করে মনে পড়ল, খুন হয়ে গেছে মউরোস।

একটু দূরের বেডসাইড টেবিলে রানার হাতঘড়ি। ওটা তুলে নিতে গিয়ে টান পড়ল ঘাড়ের সেলাইয়ে। ঘড়ির তারিখ আর সময়টা দেখল। বিস্ফোরণের পর পেরিয়ে গেছে প্রায় বাইশ ঘণ্টা। অজ্ঞান হয়ে পার করেছে একদিন একরাত।

ধীরে ধীরে বেড থেকে নামল রানা। পরে নিল হাতঘড়ি। এই ঘরের একপাশে অ্যাটাচ্ড্ বাথরুম। টলমল পায়ে ওখানে গিয়ে ঢুকল ও। আয়নায় দেখল ঘাড় ও কাঁধের ড্রেসিং। গজ কাপড়ের প্রান্ত তুলে পরখ করল ক্ষত।

এর চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর জখম আগেও হয়েছে ওর। সামান্য ক'টা কাঁচের টুকরো আটকে রাখতে পারবে না ওকে। মাথা গলিয়ে খুলে ফেলল হাসপাতালের গাউন। দেরি না করে ধুয়ে নিল হাত-মুখ। ঘরে ফিরল নিজের পোশাক পরতে। বেডের পাশের চেয়ারে ভাঁজ করে রাখা আছে ওর প্যাণ্ট। ছেঁড়া, রক্তাক্ত শার্ট উধাও। মেঝেতে ওর জুতো।

রানা প্যাণ্ট পরে নিয়েছে, এমনসময় ঘরে ঢুকল এক নার্স। ঝড়ের বেগে গ্রিক ভাষায় প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে রানাকে হাঁটাচলা করতে দেখে।

ওই ভাষা ভালই বোঝে রানা, কিন্তু আস্তে করে মাথা নেড়ে ইংরেজিতে বলল, 'সরি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বেড দেখাল সুন্দরী নার্স। হাতের ইশারা করছে ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়তে।

এবার আগের চেয়ে জোরে মাথা নাড়ল রানা। 'জরুরি কাজ আছে। আমাকে একটা শার্ট দিতে পারেন?'

'হাসপাতাল ছাড়তে পারবেন না,' রানার ঘাড়ের ড্রেসিং

দেখাল নার্স। 'আপনি আহত।'

'ঠিক আছি,' বলল রানা। 'জরুরি কাজে যেতে হবে।'

'ডাক্তার ডাকছি,' ঘুরেই ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নার্স। পেছনে দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা।

ডাক্তারের অপেক্ষা করতে হবে, বেডের কিনারায় বসল রানা। পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, তারপর জোর নক হলো দরজায়। রানা ভেবেছিল ভুরু কুঁচকে ঘরে ঢুকবে ডাক্তার। শুরু হবে তর্ক। কিন্তু ডাক্তার নয়, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ভালুকের মত প্রকাণ্ড এক লোক। চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাবে বলে ঘরে ঢুকতে নিচু হতে হয়েছে তাকে। চকচকে চোখে দেখল রানাকে। এসে থামল ওর সামনে। বিশাল চওড়া হাসি তার ঠোঁটে। খপ্ করে শক্ত হাতে ধরল রানার হাত। তার পিছু নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকেছে শীর্ণ এক মহিলা।

অপ্রতিরোধ্য উৎসাহ নিয়ে রানার হাত ঝাঁকাচ্ছে দৈত্য।

রানার মনে হলো, রক্ষা নেই এর খপ্পর থেকে। হাতটা হ্যাঁচকা টানে খুলে নেবে ব্যাটা!

'আপনি একজন হিরো!' গ্রিক সুরে ইংরেজি বলল দানব।

এই লোককে কী বলা যেতে পারে, ভাবছে বিস্মিত রানা, এমনসময় দেখল দরজায় সেই ছোট্ট ছেলেটা। ডান ভুরুর ওপর প্লাস্টার। গালে দুটো সেলাই। এবার রানা বুঝল, বাস্কেট বলের মালিক ওই ছেলেটারই বাবা-মা এরা।

'আপনি সত্যিকারের হিরো,' আবারও বলল দৈত্য। ছাড়ল না রানার হাত। 'আপনি রক্ষা করেছেন আমাদের ছেলেকে।'

'তেমন কিছুই করিনি,' বলল রানা। 'ও-ও তো আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও যদি রাস্তায় না নামত, বোমার আঘাতে খুন হতাম আমি।'

'কিন্তু আপনি ঠিক সময়ে হাজির না হলে ভ্যানের নিচে পড়ত সালোমাও।' ছেলের করুণ পরিণতি ভেবে এক চোখ

থেকে গালে নামল দানবের অশ্রু। নাক টেনে নিল সে। 'আমার নাম প্যাসিফিকো কোলিয়াস। ইনি আমার স্ত্রী অ্যাবে। বোমাটা যেখানে ফেটেছে, তার পেছনেই আমাদের গেস্টহাউস।' রানার ঘাড় ও কাঁধের ওপর চোখ পড়ল তার। 'আপনি আহত হয়েছেন।'

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'কয়েক টুকরো কাঁচ। একটা শার্ট পেলেই একটু পর বিদায় নেব।'

দৈত্যের হাসি দারুণ মিষ্টি। খুলতে শুরু করেছে শার্টের বোতাম। নিচে কোলিয়াস হোটেলের টি-শার্ট। 'আমার শার্টটা নিন। না-না, কোনও দ্বিধা করবেন না। খুব সম্মানিত বোধ করব ওটা আপনি নিলে।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে শার্ট নিল রানা। সুতির হালকা নীল শার্ট, চমৎকার করে ইস্ত্রি করা। ভাবছে, আরেকটু লম্বা হলে ওটা ওর পাঞ্জাবি হতে পারত। শার্ট পরতে গিয়ে সেলাইয়ে টান পড়তেই গাল কুঁচকে গেল ওর।

বকবক করছে দৈত্য। বোমা ফাটার সময়ে কিচেনে ছিল তার স্ত্রী এবং সে। ধরে নিয়েছিল চিরকালের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে সালোমাওকে। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসে দেখে, টেরেসে পড়ে আছে রক্তাক্ত লাশ ও আহতরা। ক্ষত-বিক্ষত বাড়ির সামনের দিক। ভেবেছে, তাদের প্রশান্তিময় দ্বীপে হানা দিয়েছে ড্রাগ লর্ডদের খুনেরা। তলানিতে ঠেকেছে নিরীহ মানুষের নিরাপত্তা। সর্বনাশ হবে ওদের ব্যবসার। কিন্তু এখন তারা জানে, সবই সামলে নিতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, ক্ষতি হয়নি সালোমাওর। আর সেজন্যে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে তারা রানার কাছে। যা আছে, সবই দিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না ওকে। কখনও ভুলবে না...

এই পর্যায়ে দানবকে বাধা দিল রানা, 'আমি যা করেছি, সেই একই কাজ করত অন্য যে-কেউ।'

'কই, অন্য আর কেউ তো করেনি? আপনি কোন্

হোটেলে উঠেছেন, স্যর?' জানতে চাইল প্যাসিফিকো।

'উঠতে পারিনি,' বলল রানা। 'মাত্র পৌঁছেছিলাম। দ্বীপে থাকার ইচ্ছে ছিল না।'

'কিন্তু আহত হয়েছেন, এখন আপনার কিছু দিনের জন্যে থেকে যাওয়াই ভাল। আমরা খুব খুশি হব আপনি আমাদের ওখানে উঠলে।'

'কী করব এখনও ভেবে দেখিনি।'

'প্লিয, যদি দ্বীপে থাকেন, দয়া করে কোনও হোটেলে উঠবেন না,' বলল প্যাসিফিকো। পকেট থেকে বের করল সুতলি বাঁধা চাবি। 'সৈকতে আমাদের ছোট একটা বাড়ি আছে। শহরের ঠিক বাইরে। খুব আরামদায়ক নয়, তবে কোর্ফিউ ত্যাগের আগে আপনি ওখানে থাকলে আমরা খুব খুশি হব।'

'বলেছেন বলে ধন্যবাদ, তবে লাগবে না,' বলল রানা।

রানার কবজি খপ্ করে ধরল দৈত্য, তালুতে গুঁজে দিল বাড়ির চাবি। ওটার সঙ্গে আছে প্লাস্টিকের ছোট ট্যাগ। ওখানে লেখা ঠিকানা। 'দয়া করে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। যত দিন কোর্ফিউ দ্বীপে আছেন, ওই বাড়ি আপনার।'

রানার আরও একগাদা প্রশংসা করে, আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল প্যাসিফিকো, তার স্ত্রী অ্যাবে ও পিচ্চি ছেলেটা। গ্রিক পরিবার চলে যাওয়ার পর জিন্সের প্যান্টে মস্তবড় শার্ট গুঁজতে লাগল রানা। তখনই আবারও খুলে গেল দরজা।

ঘুরে তাকাল রানা। ভেবেছিল এসেছে ডাক্তার। কিন্তু এবারের মানুষটি ওর চেনা।

জোয়ি থম্পসন। মুখ ফ্যাকাসে। কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে চেহারা। গালে অশ্রুর দাগ। মেয়েটার পিছু নিয়ে ঘরে ঢুকল বয়স্ক এক লোক ও এক মহিলা। গম্ভীর চেহারায় রানাকে দেখল তারা। ওয়েডিং পার্টিতে তাদেরকে দেখেছে

রানা। জোয়ি থম্পসনের বাবা-মা।

'আমি দেখতে এসেছি তোমার চেহারাটা,' বলল জোয়ি।

জবাব দিল না রানা। জানা নেই কী বলা উচিত।

'আমার স্বামীকে যে খুন করেছে, তাকে দেখতে এসেছি,' বলল জোয়ি। 'বলতে এসেছি, ঠিক কেমন লাগছে আমার।' তিরতির করে কাঁপছে ঠোঁট। চোখের অশ্রু মুছল ও।

হঠাৎ হাঁটুর কাছে জোর পাচ্ছে না, টের পেল রানা। মনে হলো, বলা উচিত, আমি খুন করিনি মউরোসকে। যদি জানতাম, বিপদের ঝুঁকি আছে, মরে গেলেও বন্ধুকে এসবে জড়াতাম না। কিন্তু এসব বলা এখন অর্থহীন। এ ধরনের কৈফিয়ত দেয়ার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

রাগে-কষ্টে মুখ বিকৃত হলো জোয়ির। 'ওয়েডিং পার্টিতে তোমাকে দেখেই বুঝেছি, সর্বনাশ ডেকে আনছ আমাদের জীবনে। খুবই দুঃসাহসী, বেপরোয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক তুমি, মাসুদ রানা, লোভ দেখিয়ে ঠেলে দিয়েছ আমার স্বামীকে মৃত্যুর মুখে।'

'জোয়ি, ভাবতেও পারিনি যে এমন কিছু ঘটতে পারে,' নিচু গলায় বলল রানা।

'নিজেও জানো না, তুমি আসলে কতটা ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর খুনি!' ঘৃণা ফুটল জোয়ির কণ্ঠে, 'শেষ করে দিয়েছ আমার সংসার, আমার জীবন। আমার বাচ্চার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ ওর বাবাকে।'

হতবাক হয়ে ওকে দেখল রানা।

'দু'দিন আগে জেনেছি আমি মা হতে চলেছি,' ফুঁপিয়ে উঠল জোয়ি। 'ভেবেছিলাম মউরোস বাড়ি ফিরলে জানাব। কিন্তু আর কখনও ফিরবে না ও। আমার বাচ্চা কখনও চিনবে না ওর বাবাকে। সেজন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মাসুদ রানা!'

প্রচণ্ড দুঃখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জোয়ি। দুলছে, যে-কোনও

সময়ে পড়ে যাবে জ্ঞান হারিয়ে। ওকে ধরে ফেললেন ওর বাবা। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জোয়ি। ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ভরা চোখে দেখল রানাকে। 'তুমি খুনি, মাসুদ রানা!' চিৎকার করে উঠে চড় দিতে গেল রানার গালে।

এক পা সরে গেছে রানা। তবুও লাগল চড়টা ওর গালে। নিজ পায়ের দিকে চেয়ে রইল ও। বুক ভেঙে গেছে ওর নিজেরও। চোখ তুলে তাকাতে পারল না মানুষগুলোর চোখে। চিৎকার শুনে বাইরে থেকে ঘরে ঢুকেছে দু'জন নার্স। এগোতে গিয়েও থমকে গেল তারা।

প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে কাঁদছে জোয়ি। থরথর করে কাঁপছে দু'কাঁধ। পাশ থেকে ওকে জড়িয়ে ধরলেন ওর মা। 'চলো, যাই, জোয়ি।' দরজার দিকে পা বাড়াল দু'জন।

বিষাক্ত দৃষ্টিতে রানাকে দেখলেন জোয়ির বাবা। নার্সদের ঠেলে সরিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দরজার কাছ থেকে রানাকে দেখলেন মিসেস থম্পসন। 'ঈশ্বরের বিচার বলে কিছু থাকলে, নিজের বিবেকের দংশনে নরকে যাবে তুমি, মাসুদ রানা!'

পনেরো

প্যাক্সোস দ্বীপ, গ্রিস।

সৈকতের কাছে সাদা রঙের বড় এক ভবনের দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে বসে আছে সোনালি চুলের বয়েটার ব্ল্যাকউড। তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টিনা পার্কার। ল্যাপটপ কমপিউটারের স্ক্রিনে গভীর মনোযোগ তাদের।

ঝকঝকে ডিজিটাল ইমেজ। গতকাল কোর্ফিউ দ্বীপের এক অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে তুলেছে ওই ভিডিয়ো। ক্যামেরা যুম করা হয়েছে দু'জন লোকের ওপর। তারা বসে আছে টেরেসের বাইরের প্রান্তে।

আপাতত ওই দু'জনকে এক নম্বর লোক এবং দুই নম্বর লোক হিসেবে ধরে নিয়েছে ক্রিস্টিনা ও বয়েটার। কোর্ফিউ দ্বীপে পৌঁছেই ক্যাথির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিল প্রথম লোকটা। গতকাল হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হলো দ্বিতীয়জন। এদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ক্রিস্টিনা ও বয়েটারের। এ কারণে অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেছে তারা।

আরও খারাপ কথা, বোমা ফাটলেও বেঁচে গেছে দুই নম্বর। এ কারণেই এই এলাকায় বাধ্য হয়ে রয়ে যেতে হয়েছে তাদেরকে।

কমপিউটার স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, আলাপ করছে দুই লোক। তারপর হঠাৎ ওখানে হাজির হলো বল হাতে ছোট এক ছেলে। কিছুক্ষণ পর ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ল দুই নম্বর লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর লেলিহান আগুন গ্রাস করল ক্যাফের টেরেস।

'পয করো,' বলল ক্রিস্টিনা।

কি বোর্ডের বাটন টিপল বয়েটার। স্থির করা পর্দায় দেখা গেল আগুনের কমলা গোলা। নানাদিকে ছিটকে যেতে গিয়েও থমকে গেছে চুরমার হওয়া জঞ্জাল। মানুষের মুখে আতঙ্ক।

'বামে সরো,' বলল ক্রিস্টিনা।

আরেকটা কি টিপে ইমেজ সরাল বয়েটার। রাস্তায় দেখা দিয়েছে সবুজ ডেলিভারি ভ্যান। বাঁক নিয়ে থেমে গেছে। ওদিকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ক্যাফে টেরেস থেকে নামা ওই লোক, বুকের ভেতর বাচ্চা ছেলেটা।

চিন্তিত চেহারায় লোকটাকে দেখছে ক্রিস্টিনা। কিছুক্ষণ

পর বলল, 'এ বিষয়ে কিছু জানা আছে তার? দেখেছে কিছু?'

'মনে হয় না জানে,' বলল বয়েটার, 'দৌড় দিয়েছিল ছেলেটাকে বাঁচাতে। কয়েক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হলেই পড়ত বোমার আওতার ভেতর।'

'কিন্তু যদি দেখে থাকে সলোমনকে? যদি মনে থাকে ওর চেহারা? এই লোক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষী।'

'কিছুই জানে না। বেঁচে গেছে কপালের জোরে। এসব জানার কোনও উপায় ছিল না তার।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল ক্রিস্টিনা। 'হয়তো। পিছিয়ে যাও। ঠিক আছে। থামো। আবারও প্লে করো।'

'অন্তত এক শ'বার দেখেছি আমরা,' বিরক্তি নিয়ে বলল বয়েটার।

'জানতে চাই কে ওই লোক। খারাপ অনুভূতি হচ্ছে আমার।'

আবারও ভিডিয়ো দেখতে লাগল তারা। খারাপ রেকর্ডিঙের কারণে আসছে নানান শব্দ। টেবিলে বসে আলাপ করছে অনেকে। হেঁটে যাচ্ছে পথচারীরা। গাড়ির চাপা গর্জন।

'এত আওয়াজে ওদের কথা শুনতে পাব না,' বিড়বিড় করল ক্রিস্টিনা।

'আমরা তো আর সিনেমা তৈরি করতে বসিনি,' বলল বয়েটার। 'ভিডিয়ো ক্যামেরা সঙ্গে নিয়েছিলাম বলে আওয়াজ পাচ্ছি। নইলে শুনতেই পারতাম না এতকিছু।'

'চুপ করো তো! চলতে দাও ভিডিয়ো।'

নীরব হয়ে গেল বয়েটার। এই অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ক্রিস্টিনার ওপর। তার কথা মত না চললে বিপদ হবে। প্রয়োজনে খুন করতেও দ্বিধা করে না ওই মেয়ে।

'পয,' বলল যুবতী। 'শুনলে? আবারও মেয়েটার নাম বলল। আরেকটু পিছিয়ে যাও।'

কয়েক ফ্রেম পেছনে গেল বয়েটার। 'বোঝার উপায় নেই

যে ওই মেয়ের কথাই বলেছে।'

'আমি শিয়োর। বাড়াও ভলিউম। কমাতে পারবে বাজে আওয়াজ?'

'সাধ্যমত করেছি, আর সম্ভব নয়,' তিক্ত চেহারায় বলল বয়েটার। গতরাত থেকে খেটে মরছে। ক্রিস্টিনা চাইছে লোকদু'জনের আলাপ শুনবে। 'আরও পরিষ্কার শুনতে হলে কয়েক ঘণ্টা বাড়তি সময় দিতে হবে আমাকে।'

'ওই হারামজাদা ছোঁড়ার বলের আওয়াজ দূর করলেই হবে,' বলল যুবতী। মাইকের কাছে এলেই থ্যাপ-থ্যাপ শব্দ তুলছে বাস্কেট বল। তখন শোনা যাচ্ছে না লোকদু'জনের আলাপ। এ কারণে মাথায় আগুন জ্বলে উঠছে ক্রিস্টিনার।

নতুন করে ভিডিয়ো চালু করল বয়েটার। আরও সতর্ক হয়ে কান পাতল তারা।

'ওই যে হার্বার্টের নাম নিল,' বলল ক্রিস্টিনা। 'ঠিকই শোনা গেছে।'

হ্যাঁ। হার্বার্ট।'

'সর্বনাশ! ঠিক আছে, চলতে দাও।' আরও কয়েক সেকেণ্ড চলল ভিডিয়ো। চোখ বুজে শব্দের ওপরে মনোযোগ দিয়েছে ক্রিস্টিনা। একটু পর আবার মেলল চোখ। দৃঢ়বদ্ধ হলো চোয়াল। 'স্টপ। সিম্পসন। এক নম্বর লোকটা বলেছে: "সিম্পসন"।'

বিরক্ত হলো বয়েটার। আগে শুনতে পায়নি। 'ঠিক। সিম্পসনের ব্যাপারে কী বলছিল লোকটা?'

'আবারও প্রথম থেকে শুনব। গতি কমিয়ে দেবে।'

চাপা হিসহিস শব্দের রেকর্ডিং শুনতে লাগল তারা। 'আমার মনে হচ্ছে বলেছে, "কোথায় আছে সিম্পসন?"' বলল ক্রিস্টিনা। 'আমি বোধহয় ভুল করছি না।'

'কিন্তু এরা সিম্পসন সম্পর্কে জানল কী করে?'

'তার মানে, ক্যাথি হার্বার্টের সঙ্গে কথা বলেছিল এরা।

ধরে নিতে পারি, প্রায় সবই জানা আছে এদের।'

'অথবা, ওই অ্যাড্রেস বুক দেখেছে।'

'ঘটনা যা-ই হোক, চাই না আরও কিছু জানুক দুই নম্বর লোকটা।'

ভিডিয়ো দেখতে লাগল তারা দু'জন। দুই নম্বর লোকটার দিকে খবরের কাগজ বাড়িয়ে দিল এক নম্বর লোকটা।

ওই একই দিনের দৈনিক পত্রিকা ডেস্ক থেকে তুলে নিল ক্রিস্টিনা। প্রথম পাতায় চোখ রেখেছে দুই নম্বর লোকটা। নিশ্চয়ই দেখছে থ্যানাটসের মৃত্যু-সংবাদ।

আবারও ভিডিয়ো ফ্রেমে ঢুকে পড়ল বাচ্চা ছেলেটা। ওর বলটা গিয়ে পড়ল রাস্তায়। আবারও দুই নম্বর লোকটার দিকে মন দিল তারা। ওই লোক লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে ছুট দিল বাচ্চাটাকে বাঁচাতে। ক'সেকেণ্ড পর টেরেসে ফাটল শক্তিশালী বোমা।

'এবার বন্ধ করতে পারো,' বলল ক্রিস্টিনা। 'যা বোঝার বোঝা শেষ।'

'বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে হিরো হওয়ার শখ হয়েছিল শালার,' বিড়বিড় করল বয়েটার।

ঘরে পায়চারি করতে লাগল ক্রিস্টিনা। 'দুইয়ে দুই মেলালে যা হয়। সবই জেনে গিয়েছিল এরা। ক্যাথি হার্বার্ট। টাকা। সিম্পসন। থ্যানাটস। এক নম্বর লোকটা ভাল করেই জানত, পিছু নিয়েছি আমরা।'

সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে ক্রিস্টিনার দিকে ফিরল বয়েটার। 'ওই লোক জানবে কী করে?' স্ক্রিন কালো হয়ে যাওয়ার এক সেকেণ্ড পর শাট ডাউন হলো ল্যাপটপ।

মাথা নাড়ল ক্রিস্টিনা। 'ক্যাথির পরিবারের সাধারণ কোনও বন্ধু ছিল না সে। আচরণ পেশাদার। নইলে কখনও বুঝত না তার পিছু নিয়েছি।'

'তা হলে কারা এরা? কাজ করছে কাদের হয়ে?'

'জানি না।'

'তোমার কী মনে হয়, ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ক্যাথি?'

'ঊর্ধ্বতনদের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে,' বলল ক্রিস্টিনা, 'তাদেরও ভাল লাগবে না এসব। দুই নম্বর লোকটা যে এখনও বেঁচে আছে, সেটা সুবিধার ঠেকছে না আমার।' গোপনে আলাপ করতে পাশের ঘরে ঢুকল ক্রিস্টিনা। ডায়াল করল নির্দিষ্ট নম্বরে। লং-ডিস্ট্যান্স কল। ফোন রিসিভ করল আগের সেই পুরুষকণ্ঠ।

'আমরা বোধহয় আরেকটা ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি,' বলল ক্রিস্টিনা। সংক্ষেপে জানাল এদিকের পরিস্থিতি।

'কতটা জানে সে?' জিজ্ঞেস করল পুরুষকণ্ঠ।

'যথেষ্টরও বেশি। জানে, টাকা আর সিম্পসনের ব্যাপারে। জেনে গেছে আমাদের কথাও। হয়তো জেনেছে আরও অনেক কিছুই।'

দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করল। আরও কিছুক্ষণ পর লোকটা বলল, 'গোটা ব্যাপারটা বাজে দিকে মোড় নিচ্ছে।'

'সব সামলে নেব,' বলল ক্রিস্টিনা।

'সে চেষ্টা করাই তোমাদের নিজেদের জন্যে মঙ্গলকর। ওই লোকের পেট থেকে বের করবে সব। এবার যেন কোনও ভুল না হয়। কাজ সারবে গোপনে। চাই না আবার সলোমনের সাহায্য নিতে। অতিরিক্ত খরচ তার পেছনে।'

কথা ফুরিয়ে যেতে ফোন রেখে পাশের ঘরে ফিরল ক্রিস্টিনা। চাপা স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, চলো। ওপারে পাঠাতে হবে দুই নম্বরকে। তার আগে সব বের করতে হবে ওর পেট থেকে।'

ষোলো

ডাক্তার আপত্তি তুললেও মাথা-ঘোরা আর অবশ অনুভূতি নিয়েই হাসপাতাল ছাড়ল রানা। কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই আরেক গালে চড় দিল সকালের তপ্ত রোদ। পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে ভাবল, এবার কী করব? জানা নেই কী করা উচিত।

পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল রানা।

দুই লোক। একজনের হাতে ক্যামেরা। অন্যজনের হাতে নোটবুক। রিপোর্টার। অপেক্ষা করছিল ওর জন্যেই।

নোটবুক হাতে লোকটা বলল, 'আপনিই তো ওই বাচ্চা ছেলের প্রাণ রক্ষা করেছেন? আমরা কি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'পরে,' জানাল গম্ভীর রানা।

'পরে? ঠিক আছে, এই যে আমার কার্ড।' রানার হাতে ভিযিটিং কার্ড ধরিয়ে দিল রিপোর্টার।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। কথা বলার মানসিকতা নেই। ক্যামেরা তুলে পটাপট কয়েকটা ছবি তুলল ফোটোগ্রাফার। তাকে বাধা দিল না রানা।

দুই সাংবাদিক চলে যাচ্ছে, এমনসময় কড়া ব্রেক কষে কর্কশ আওয়াজ তুলে পেভমেণ্টের কাছে থামল কোর্ফিউ পুলিশের একটা জিপ। খুলে গেল দুই দরজা। বেরিয়ে এল দুই লোক। তাদের একজনের পরনে ইউনিফর্ম। অন্যজনের গায়ে সিভিলিয়ান পোশাক। শেষের লোকটা বেঁটে এবং

মোটা। মাথা ভরা টাক। চোয়ালে ছাঁটা দাড়ি।

রানার সামনে থামল লোকদু'জন। সাধারণ পোশাকের লোকটা ইংরেজিতে বলল, 'মিস্টার রানা?' জ্যাকেটের পকেট থেকে নিয়ে দেখাল আইডি কার্ড। 'আমি কোর্ফিউ দ্বীপের পুলিশ ক্যাপ্টেন আবদাল্লা অ্যানেস্তাসিয়ো। জরুরি কিছু তথ্য চাই, তাই দয়া করে আসুন আমার সঙ্গে।'

চুপ করে থাকল রানা। দুই পুলিশ অফিসারের সঙ্গে উঠল ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়িতে। ওর পর পর সিটে উঠল ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো। ড্রাইভারকে জানাল, ফিরবে অফিসে। ঝড়ের গতি তুলে রওনা হলো জিপ। রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। 'সুস্থ হওয়ার আগেই হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলাম, আপনাকে পাব বেড-এ।'

'সুস্থ হয়ে গেছি,' বলল রানা।

'শেষবার আপনাকে দেখেছি রক্তাক্ত অবস্থায় স্ট্রেচারে।'

'সামান্য কেটে গেছে কাঁচের টুকরোয়। অনেকের মত গুরুতর আহত নই।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল পুলিশ ক্যাপ্টেন।

দশ মিনিট পেরোবার আগেই সিকিউরিটি পয়েন্ট পেরিয়ে বিশাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পেছনে থামল জিপ। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে অনুসরণ করতে ইশারা করল ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো।

গোটা হেডকোয়ার্টার এয়ার কণ্ডিশণ্ড। লোকটার পিছু নিয়ে গোছানো এক অফিস-ঘরে ঢুকল রানা।

'বসুন,' টেবিলের সামনে চেয়ার দেখাল অ্যানেস্তাসিয়ো।

'কী ধরনের তথ্য চাইছেন, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন,' ডেস্কের কোণে বসল ক্যাপ্টেন। দোলাতে লাগল ডান পা। মৃদু হাসল। 'লোকে বলছে, আপনি নাকি সত্যিকারের হিরো।'

‘বাড়িয়ে বলছে,’ বলল রানা।

‘বোমা ফাটার আগের মুহূর্তে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন পিচ্চি সালোমাও কোলিয়াসকে। তার আগে কথা বলছিলেন ওই ক্যাফের এক খদ্দেরের সঙ্গে।’

মাথা দোলাল রানা।

‘ওখানে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে আপনার?’

‘না,’ বলল রানা।

মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। ডেস্ক থেকে নিল নীল এক নোটবুক। ‘বোমায় খুন হয়ে যাওয়া জ্যাঁ মউরোস সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি তো আপনার বন্ধু ছিলেন?’

মাথা দোলাল রানা।

‘কী কারণে কোর্ফিউ দ্বীপে এসেছিলেন তিনি?’

এ ধরনের পুলিশ অফিসারদের চেনে রানা। এরা পূর্ণ আত্মনিয়োগকৃত। মিষ্টি করে হাসবে, কথা বলবে নরম সুরে। বের করবে পেট থেকে সব। সুতরাং অনুচিত হবে ভুল কথা বলা। ‘মউরোসের জন্যেই আসি এই দ্বীপে। চেয়েছিল আমার পরামর্শ। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই ফাটল বোমাটা।’

মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। নোট নিল প্যাডে। ‘জানেন না, কী কারণে ই-মেইল বা ফোনে সরাসরি আলাপ করেননি তিনি।’

‘কারণটা জানা নেই,’ বলল রানা।

‘হুম।’ নড়েচড়ে বসল ক্যাপ্টেন। ‘অর্থাৎ, শুধু আলাপ করতে এত দূরে আসেন। অথচ, জানেনই না কী বিষয়ে কথা বলবেন তিনি?’

‘জী।’

‘এটা খুব অস্বাভাবিক।’

‘বেড়াতে পছন্দ করি,’ বলল রানা।

‘কী ধরনের পেশায় আছেন আপনি, মিস্টার রানা?’

‘একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাই।’

নতুন নোট নিল ক্যাপ্টেন। ‘আচ্ছা।’ মুখ তুলে রানাকে দেখল। ‘আপনার কোনও কাজেই কি এসেছিলেন জ্যাঁ মউরোস? তিনি কিন্তু দ্বীপে এসেই নানান প্রশ্ন তুলেছিলেন এক ইংরেজ মহিলা সম্পর্কে।’

‘এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই,’ বলল রানা।

ভুরু উঁচু করল ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো। চকচক করছে চোখ। ওই দৃষ্টি যেন বলছে: এইবার তরে পাইছি! ‘গতকাল রাতে মিস্টার মউরোসের স্ত্রী কিন্তু অন্য কথা বলে গেছেন। তাঁর স্বামী নাকি কাজ করছিলেন আপনার হয়ে। খুঁজে বের করতে এসেছিলেন এই দ্বীপে ওই মেয়েকে।’

চোখ বুজে মাথার তালু টিপল রানা। না বুঝেই ফাঁদে পা দিয়েছে। মনে মনে কষে এক লাথি দিল নিজের নিতম্বে।

‘মর্গে আছে ছয়টা লাশ,’ বলল ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো, ‘গুরুতর আহত আরও এগারোজন। তাদের একজন কখনও চোখে দেখবে না। আরেকজন চিরকালের জন্যে পঙ্গু। আমার শহরে বোমা ফাটিয়েছে কেউ। কাজেই, কেন তা করা হয়েছে, এবং কে করেছে, সেটা জানার অধিকার আমার আছে।’

চুপ করে থাকল রানা।

হাসল ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো। ওই হাসি বরফের মত শীতল। ‘আছেন শকের ভেতর। ভাল করতেন হাসপাতাল না ছাড়লে। বোধহয় মাথা পরিষ্কার হতে আরও দু’এক দিন লাগবে। আশা করি, চিন্তা গুছিয়ে নেয়ার পর খুলে বলবেন সব। তখন ওসব প্রশ্নের জবাব আবারও জানতে চাইব। বলে রাখি, আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করছি: ভুলেও কোর্ফিউ দ্বীপ ত্যাগ করবেন না। জমা দিন পাসপোর্ট। আপনাকে আর প্রয়োজন না পড়লে ফেরত পাবেন।’

‘ওটা আমার কাছে নেই,’ বলল রানা।

‘কোথায় আছে?’

‘জ্যাকেটের পকেটে ছিল, তখন ফাটল বোমা। পুড়ে গেছে বিমানের টিকেটও। চেয়ারের পিঠে ছিল ওই জ্যাকেট। ছাই হয়ে গেছে সব।’

দীর্ঘক্ষণ কড়া চোখে ওকে দেখল ক্যাপ্টেন, তারপর বলল, ‘আপনার প্যান্টের পকেটে ওয়ালেট দেখেছি। ওটা দিন।’

তার হাতে ওয়ালেট দিল রানা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেতরের সব দেখছে ক্যাপ্টেন। বিশেষ মন দিল ড্রাইভিং লাইসেন্সের ওপর। ঘেঁটে দেখল ইউরো নোট। মন্তব্য করল, ‘প্রচুর টাকা সঙ্গে রাখেন।’

‘পারতপক্ষে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি না,’ বলল রানা। ‘দেখতেই পাচ্ছেন, ওয়ালেটে আমার পাসপোর্ট নেই।’

‘আপনি খুব অস্বাভাবিক মানুষ। হাজার মাইল পথ পাড়ি দেন, কারণ ফোনে আলাপ করতে পছন্দ করেন না। ব্যবহার করেন না ক্রেডিট কার্ড, তাই সঙ্গে থাকে নগদ হাজার হাজার ইউরো। আরোগ্যের আগেই চেক আউট করেন হাসপাতাল থেকে। আর পুলিশ অফিসার হিসেবে আমার কাজ এসব অস্বাভাবিকতা খেয়াল করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করছি: এমন কী কাজ আছে আপনার, যে কারণে এত তাড়া?’

‘ভাবছেন ওই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে?’

‘তা বলছি না। তবে সব কথা বলছেন না আপনি।’ মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো। ‘তাই বলছি, এরপর থেকে কথা বলবেন ভেবেচিন্তে। আবার কথা হবে পরে। আপাতত বিদায় নিতে পারেন।’

চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে চলে গেছে রানা, এমনসময় পেছন থেকে ডাকল ক্যাপ্টেন। তার হাতে কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ। ‘এর ভেতরে আপনার কিছু জিনিসপত্র আছে। আগুনে

পোড়েনি এসব।'

ব্যাগটা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। কেমন অবশ লাগছে দেহ-মন। মনোযোগ নেই চারপাশে। এগিয়ে চলেছে এক পা এক পা করে। বুকে উঠেছে ঝড়। ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়োর কথা ভাবছে না। বারবার মগজে খোঁচা দিচ্ছে জোয়ির কথা: আমার বাচ্চা কখনও চিনবে না ওর বাবাকে। সেজন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মাসুদ রানা। নিজেও জানো না, তুমি আসলে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর খুনি! শেষ করে দিয়েছ আমার সংসার, আমার জীবন। আমার বাচ্চার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ ওর বাবাকে!

কথাগুলো ধারালো ছোরার মত চিরছে হৃদয়। মৃদু টলতে টলতে হাঁটছে রানা। নিজেও জানে না, কখন বেরিয়ে এসেছে শহর ছেড়ে। পৌঁছে গেছে সাগরের উঁচু তীরে। নিচে সাগরে ভাসছে কিছু নৌকা। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে নামল রূপালি বালির নরম সৈকতে। চারপাশ নির্জন। কেউ নেই। কিছু দূর হাঁটার পর বাঁক ঘুরে ওপরে উঠলে পাথুরে জমি। সামনে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত পাইনের ঘন সবুজ জঙ্গল।

একটা পাথরে ধপ্ করে বসল রানা। দু'পায়ের মাঝে থাকল কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ। বুজে ফেলল চোখ। ওর মনে হলো, ফুরিয়ে গেছে শরীরের সব শক্তি। রক্ষা পেল না— বারবার মনের আয়নায় ভেসে উঠছে মউরোসের হাসিমুখ। চিৎকার করে বলছে জোয়ি: তুমি নিষ্ঠুর খুনি!

ঠিকই বলেছে মেয়েটা। মউরোস মারা গেছে ওরই ভুলে। ও-ই বন্ধুকে ঠেলে দিয়েছিল মরণফাঁদে। বলেছিল, কাজটা খুব সহজ। কিন্তু এই দুনিয়ায় মূল্যবান কিছু চাইলে দিতে হয় প্রচুর সময় ও পরিশ্রম। রানা, তুই কেন ভাবলি যে সহজেই পাবে মউরোস অত টাকা? তোর তো জানার কথা ছিল!

খুন হয়ে গেছে মউরোস!

বাচ্চাটা কখনও দেখবে না ওর বাবাকে!

প্রবল জ্বরের ঘোরে দরদর করে ঘামছে রানা। হাত ভরল প্লাস্টিকের ব্যাগে। হাতে ঠেকল নষ্ট মোবাইল ফোন। ওটা বের না করে তুলে নিল মদের ধাতব ফ্লাস্ক। ওটা ওর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল মউরোস। ফ্লাস্কের মুখ খুলে ঢকঢক করে গিলল উষ্ণ উইস্কি। জিভ ও গলা পুড়িয়ে বুক চিরে নামল তরল-গরল। একটুক্ষণের জন্যে মগজ ভোঁতা করে দিলেও চিরকালের জন্যে বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা করবে না ওটা।

চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। হিসহিস শব্দে এসে জুতোর ডগা ভিজিয়ে দিল ঢেউ। আবার ফিরল সাগরে। চোখ মেলে দূরাকাশে তাকাল রানা। নীরব চিৎকার করছে ওর হৃদয়: আছ কেউ?

রানা জানে, জবাব দেবে না কেউ।

প্রচণ্ড ক্রোধ ও তীব্র হতাশায় থরথর করে কেঁপে উঠল রানা। বড় এক ঢোকে আধখালি করল ফ্লাস্ক। উঠে চলে গেল কিছুটা দূরে। ওদিকের এক টিলার কোলে ক'টা ছোট বাড়ি। ওখান থেকে সিঁড়ি নেমেছে সৈকতে।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে এল মানুষের কণ্ঠস্বর। এদিকে আসছে কয়েকজন। কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হোক, চাইছে না রানা। ওর এখন চাই নিঃসঙ্গ নীরবতা।

ঘুরে আবারও ছোট পাথরের কাছে ফিরল রানা। সাগরের তীরে হিসহিস শব্দে মিলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঢেউ।

তিক্ত হাসল রানা। এমনি করেই একদিন ফুরিয়ে যাবে ও নিজেও। একাকী পথচলা শেষে বিদায় নেবে পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু তার আগে আছে জরুরি একটা কাজ। যারা এতিম করেছে অসহায়, অনাগত, অবোধ শিশুকে, কোথাও পালিয়ে বাঁচবে না ওইসব নরপশু। দরকার হলে দুনিয়ার প্রতিটি কোণে হানা দেবে রানা। মউরোসের অকাল মৃত্যুর জন্যে

কঠিন মূল্য দিতে হবে তাদেরকে।

সতেরো

কাঠের তক্তায় পেরেক মেরে আটকে দেয়া হয়েছে জানালা, অবশ্য তক্তার মাঝের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাতের নিকষ অন্ধকার। অনেকক্ষণ হলো ওদিকে চেয়ে আছে হতাশ ক্যাথি। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। একটু পর বিছানায় শুয়ে চোখ রাখল সিলিং-এ।

গত পাঁচ দিন আগে ওই দ্বীপ থেকে বিমানে করে সরিয়ে নিয়েছে ওকে। জানার উপায় নেই, আছে কোথায়।

এ এলাকায় পড়েছে বেশ শীত। ঠাণ্ডায় যেন কষ্ট না পায়, তাই কিডন্যাপাররা দিয়েছে ভারী সোয়েটার, উলের প্যান্ট ও ভারী মোজা।

বেশিরভাগ সময় কাটছে অতীত ঘাঁটতে গিয়ে। মনে পড়ছে টুকরো সব স্মৃতি। তাতে যেমন বাড়ছে সচেতনতা, তেমনি ফিরছে অস্পষ্ট স্বপ্নের মত সব ভাবনা। একেকটা যেন ছোট ছোট দ্বীপের বিচ্ছিন্ন অংশ। তবে আশা করছে, একদিন সবমিলে তৈরি হবে স্বাভাবিক কোনও চিত্র। মাঝে মাঝেই অন্তরে হানা দিচ্ছে দু'জন মানুষ। একজন বয়স্ক লোক, অন্যজন বয়স্কা মহিলা। এঁরাই বোধহয় ওর বাবা-মা। গভীর ধূসর কুয়াশা হাতড়ে সাদা এক কুকুরের দেখা পেয়েছে ক্যাথি। ওই কুকুরটা ওর নিজের। কী যেন ওটার নাম?

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি যেন সোনালি রোদ, চাইলেও ধরা যায় না মুঠোর ভেতর। আবছা সব চিন্তা এলে সেসব নিয়ে

ভাবতে চাইছে ক্যাথি, কিন্তু একপলকে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে সব। আবার নিজে থেকেই ধরা দিচ্ছে বহু কিছু। যেমন ওই ভিলা, মনে পড়ছে পরিষ্কার। যদিও ভুলে গেছে ওই দ্বীপের নাম। এটাও মনে নেই, কী করছিল সে ওই দ্বীপে।

হঠাৎ একটা স্মৃতি মনে পড়ল: মোটরসাইকেলে করে কোথায় যেন যাচ্ছিল। ওর চুলের মাঝ দিয়ে সাঁই-সাঁই করে বইছিল দমকা হাওয়া। আয়নায় দেখেছে উজ্জ্বল আলো। মনে ছিল ভয়।

ভাবনাগুলো জড় করতে চাইছে ক্যাথি। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে, সে-সময়ে মোটরসাইকেল থেকে পতন হয়েছিল ওর। খুব লেগেছে মাথায়। এখনও ফুলে আছে জায়গাটা। তবে এখন আর ব্যথা নেই বললেই চলে।

এরপর কী হয়েছিল, ভাবতে চাইছে ক্যাথি। সহজেই চট্ করে মনে পড়ল, সাদা বাড়িতে আটকে রেখেছিল ওকে চারজন কিডন্যাপার। ওখান থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছে। ধরা পড়ে গিয়েছিল।

সোনালি চুলের ওই পিশাচের মত লোকটার কথা ভেবে শিউরে উঠল ক্যাথি। জানা নেই, কোথায় আছে ওই পশুটা। আবারও ফিরবে ভাবলেই আতঙ্ক লাগছে ওর।

মনে পড়ল, কীভাবে আনা হয়েছে ওকে এখানে।

দ্বীপ পেরিয়ে বহু দূরে গেছে সি-প্লেন। অনেকক্ষণ পর নামল নীল সাগরে। দূরে উপকূল। বারবার ক্যাথি জিজ্ঞেস করেছে, কোথায় নিয়ে চলেছে তারা। জবাব দেয়নি কেউ। সি-প্লেনে এসে ভিড়ল হলদে এক স্পিডবোট। ওটাতে করে তীরে নিল দুই লোক। পাথুরে সৈকতে ওকে ছেঁচড়ে নিয়ে থামল সরু এক রাস্তার পাশে। অপেক্ষা করছিল ভ্যান। পেছনের সিটে তুলল তারা। চিৎকার করতে চেয়েছে ক্যাথি, কিন্তু চেপে ধরা হলো হাত-পা-মুখ।

ওর মনে হলো, ধর্ষণ করবে বুঝি এরা। পরে খুন করবে।

কিন্তু তেমন কিছু করেনি লোকদু'জন। তারপর এল তৃতীয় এক লোক। তার কাছে ছিল কালো চামড়ার কেস। ওটা থেকে নিল সিরিঞ্জ। উবু হয়ে ওটা গেঁথে দিল ওর বাহুতে। ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল ও।

পরে ঘুম ভাঙল ঠাণ্ডা এই ঘরের শক্ত বাঙ্কে। কোনও জানালা নেই। রঙচটা কংক্রিটের চার দেয়াল। ছাতে শেডহীন উজ্জ্বল বাল্ব্। চারদিন ধরে বন্দি এখানে। হ্যাঁ, পুরো চারদিন! প্রায় পাগল হয়ে গেছে ভয় আর বুক ভেঙে দেয়া হতাশায়।

চার দিন ধরে ক্যাথির ঘরে আসছে কয়েকজন লোক। তাদের একজন দিচ্ছে খাবার ও পানি। পানি খেলেও বেশিরভাগ সময় পড়ে থাকছে ওর খাবার। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বের করা হচ্ছে ঘর থেকে। জানালাহীন এক করিডোর পার করে নিয়ে যাচ্ছে এক ঘুপচি টয়লেটে। কখনও কথা বলে না লোকটা। গম্ভীর।

এ ছাড়া, আছে কালো সুট পরা এক লোক। প্রতিদিন দেখা দিচ্ছে তিনবার করে। সে ঘরে এলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ক্যাথি। রুক্ষ হলদেটে ত্বকের ওই লোক লম্বা, চিকন, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। ব্যাকব্রাশ করা চুল। দাঁত হাঙরের দাঁতের মত ধারালো। যেন ক্ষুধার্ত নেকড়েমানব। এতই শীতল হাসি, হাত-পা কাঁপে ক্যাথির।

মাত্র একটা বিষয়ে কথা বলে লোকটা: ওটা কোথায়?

বরাবরের মত একই জবাব দিচ্ছে ক্যাথি। 'জানি না। আমি জানি না। জানি না। আমি জানি না।'

ক্যাথির বক্তব্য শুনে বিরক্ত হয়ে গেছে লোকটা। ওর নিজেরও খারাপ লাগছে একই কথা বলতে। লোকটার চোখে জ্বলে ওঠে শীতল ক্রোধ। ওর মনে হচ্ছে, যে-কোনও দিন প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়বে লোকটা, পিটিয়ে মেরে ফেলবে ওকে। নিজেকে শেষে সামলে নিচ্ছে ম্যানিয়াকটা। ভেংচি

কেটে হাসছে। আবারও জিজ্ঞেস করছে একই কথা।

ওটা কোথায়?

কোথায় রেখেছ?

কিন্তু অজানা তথ্য পাবে কোথায় ও?

তবুও বারবার বলছে ওই লোক: বলো, কোথায় রেখেছ, তা হলেই ছেড়ে দেব। পৌঁছে দেব বাড়িতে। আর কোনও বিপদ হবে না তোমার।

অনেক ভেবেও কিছুই মনে পড়ছে না ক্যাথির। জানাতে পারছে না, জিনিসটা কী এবং কোথায় রেখেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরার পর ভেঙে পড়ছে। কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। নিস্পৃহ চেহারায় ওকে দেখছে লোকটা। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর ছেড়ে। আটকে দিচ্ছে দরজার তালা।

তৃতীয়জন এক ডাক্তার। সাদা কোট। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মোটাসোটা। মাথায় টাক। কুচকুচে কালো দাড়ি। নরম আচরণ করছে প্রথম থেকেই। তবে হাসিতে অনিশ্চয়তা। প্রতিদিন পরখ করে দেখছে দেহের তাপমাত্রা। বাদ পড়ছে না ব্লাড প্রেশার। কান পেতে শুনছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। পরীক্ষা করছে মাথার ফোলা জায়গাটা। খুব সহানুভূতিপূর্ণ। হয়তো সত্যিই চাইছে, ফিরে আসুক ওর স্মৃতি। অনেক প্রশ্ন আছে এই ডাক্তারের মনে। কথা বলছে খুব নরম সুরে। তার প্রশ্নের কিছু জবাব দিতে পেরেছে ক্যাথি। আবার অনেক কথা জানা নেই। যা বলেছে, প্রতিটি কথা প্যাডে লিখে নিয়েছে ডাক্তার।

'তোমার নাম কী?'

'ক্যাথি হার্বার্ট।'

'বয়স কত তোমার?'

'পঁচিশ।'

'বলো তো, এটা কী মাস চলছে?'

'জানি না।'

'কী কারণে তুমি এখানে?'

'জানি না।'

'কী হয়েছে তোমার?'

'আমি জানি না।'

জোর খাটিয়ে ওর পেট থেকে কথা বের করতে চাইছে না ডাক্তার। নেকড়েমানবের জিজ্ঞেস করা কোনও প্রশ্ন নিয়ে কখনও কথা বলছে না সে। ক্যাথির ধারণা: মনের কথা বলতে পারবে ডাক্তারের কাছে। বলেওছে, 'আমার খুব ভয় লাগে। এরা কোথায় এনেছে? আমাকে নিয়ে কী করবে এরা?'

এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না ডাক্তার। শুধু মৃদু হেসে বলছে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না। আবার ফেরত পাবে তোমার সব স্মৃতি।'

কিন্তু দেখেছে ক্যাথি, ডাক্তারের হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে অসহায়ত্ব আর অনিশ্চয়তা। সে আসলে জানে না, তার নিজের কথা ঠিক কি না।

দু'দিন আগে ডাক্তারের দ্বিতীয় ভিযিটের সময় ক্যাথি টের পেল, মন কষাকষি চলছে ডাক্তার আর নেকড়েমানবের ভেতর। ঘরের বাইরে ফিসফাস শুনেছে ক্যাথি। বাইরের করিডোরে চলছিল চাপা গলায় তর্ক। এতই অস্পষ্ট আওয়াজ, কান পেতেও কাজ হয়নি।

তারপর গতকাল আবারও এল ডাক্তার। তার সঙ্গে এক যুবতী। আগের ওই যুবতী নয়। এর চুল প্রায় লালচে, কালো নয়। মিষ্টি হাসছিল, কিন্তু দেয়ালে হেলান দিতেই জ্যাকেটের ফাঁকে হোলস্টার আর অস্ত্রের বাঁট দেখেছে ও।

গতকাল বিছানার কোণে বসে নরম সুরে বলল ডাক্তার, 'তোমার জন্যে সু-সংবাদ এনেছি, ক্যাথি।'

'আমাকে ছেড়ে দেবে? বাড়ি ফিরতে পারব? আমার বাড়ি কোথায়?'

বিষণ্ন হেসে ওর বাহুতে মৃদু চাপড় দিল ডাক্তার।

'আপাতত বাড়ি ফিরতে পারবে না, ক্যাথি। কিন্তু এর চেয়ে অনেক ভাল ঘরে নেব। ওটা আরামদায়ক। তোমার ভাল লাগবে।'

'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই!' চিৎকার করল ক্যাথি। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দেখে ঘর ছেড়ে বিদায় নিল ডাক্তার ও ওই যুবতী। আবারও তারা ফিরবে, সেজন্যে সারাদিন অপেক্ষা করল ক্যাথি, কিন্তু এল না কেউ। শেষে ঘুমিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। ভাবছিল, ওর মনটাকে নিয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা করছে ডাক্তার।

পরদিন সকালে এল ডাক্তার আর ওই মেয়ে। তাদের সঙ্গে আরও দু'জন। এদেরকে আগে কখনও দেখেনি ক্যাথি। হয়তো বডিগার্ড। নেকড়েমানব আসেনি, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছে ও।

ঘর থেকে ওকে বের করে করিডোর ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ডাক্তার। ক্যাথির পেছনে রূপসী ওই মেয়েটা। ওদের তিনজনকে অনুসরণ করেছে ওই দুই লোক। টয়লেটে যাওয়ার বামের বাঁক পেছনে পড়ার পর, ডানে নোংরা এক করিডোর ধরে হেঁটেছে ওরা। করিডোরের শেষমাথায় দরজা। ওটা পেরোবার পর সামনে পড়ল রঙচটা এলিভেটরের খোলা দরজা। মেয়েটা বাটন টিপে ওকে সবচেয়ে ওপরের তলায় নিয়ে এল।

দরজা খুলতে ক্যাথি দেখল, এবারের করিডোরের দেয়ালে সাদা রঙ। বড় স্কাইলাইট দিয়ে আসছে উজ্জ্বল সোনালি রোদ। বাঁক ঘুরে আরেকটা করিডোরের শেষমাথায় পৌঁছে খোলা হলো একটা দরজা।

বাঁদরের খাঁচার মত নিচের ছোট্ট ওই ঘরের অন্তত দ্বিগুণ বড় এই ঘর। পাশেই পরিষ্কার টয়লেট। বিছানায় পুরু তোষকের ওপরে সাদা, নিপাট চাদর। খাটের একপাশে ওর জন্যে নতুন পোশাক। ঘরের কোণে টেবিলে কিছু ম্যাগাযিন

ও ছোট এক পার্সোনাল ডিভিডি প্লেয়ার। আছে একগাদা সিনেমার ডিস্ক। ক্যাথির মনে হলো, আগেই দেখেছে এসব সিনেমা, তবে মনে পড়ল না কোথায় দেখেছিল। অদ্ভুত অনুভূতি হলো মনে।

'এবার একটু বিশ্রাম নাও,' বলল ডাক্তার, 'আগামীকাল থেকে শুরু হবে নতুন থেরাপি সেশন। ওটার কারণে ফেরত পাবে স্মৃতি।' একবার চোখ টিপে চলে গেল সে। পেছনে আর সবাই। লক করে দেয়া হলো দরজা।

তাই, আজ ভোরে অধৈর্য হয়ে ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্যাথি। ভাবছে, এসব কী হচ্ছে ওর জীবনে? ডাক্তারকে দেখে মনে হয় দয়ালু। ইচ্ছে করছে তাকে বিশ্বাস করতে। কিন্তু ওর মগজে সতর্ক করছে আরেকটা কণ্ঠ: ডাক্তার কিন্তু দায়িত্বে নেই, তার ক্ষমতা সামান্যই।

কয়েক রাত হলো ঘুমাতে পারছে না ক্যাথি। শুধু ধড়ফড় করছে বুক। এ মুহূর্তে অস্থির লাগছে বলে বিছানায় উঠে বসল হাত চালাল মাথার চুলে। টিপে ধরল কপাল। ওর মগজে আছে জরুরি কোনও তথ্য। যেটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

সত্যি যদি মনে পড়ে সব?

তারপর কী হবে?

আঠারো

কোর্ফিউয়ের রুপালি সৈকত ছেড়ে কার্কাইরার দিকে হাঁটছে রানা। গার্বেজ ক্যান পেয়ে ওখানে ফেলল হাতের প্লাস্টিকের

ব্যাগ ও ভেতরের সব পোড়া জিনিসপত্র। শহরে ঢুকে কিনল নতুন কয়েকটা শার্ট, দুটো জিন্স প্যান্ট ও মিলিটারি শোল্ডার ব্যাগ। জিনিসপত্র ভেতরে রেখে ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে মিশে গেল ভিড়ের মাঝে। বোমা বিস্ফোরণের পর অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে দ্বীপে। সবার মনে রাগ, আতঙ্ক, উত্তেজনা ও তিক্ততা। আগের তুলনায় ফাঁকা সব রাস্তা। প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এখনও ছাপা হচ্ছে রক্তাক্ত মৃতদেহের ছবি এবং বিস্তারিত লেখা।

শপিং মলের এক দোকান থেকে প্রি-পেইড মোবাইল ফোন কিনল রানা। স্যান রোক্কো স্কয়্যারের নিচু এক দেয়ালে বসে কল দিল প্রফেসর জন হার্বার্টকে। তাঁদের জানার কথা নয় বোমা বিস্ফোরণে খুন হয়েছে মউরোস। এখন এসব বললে ঘাবড়ে যাবেন তাঁরা। সেটা চাইছে না ও।

অবশ্য, মিসেস হার্বার্ট কল রিসিভ করতেই বুঝে গেল, সব জেনে গেছেন তাঁরা। ফুঁপিয়ে কাঁদছেন মহিলা। খস-খস শব্দ পেল রানা। ধরিয়ে দিয়েছেন ফোনের রিসিভার স্বামীর হাতে।

'হ্যালো?' ক্লান্ত স্বরে বললেন প্রফেসর। 'রানা? তুমি এখন কোথায়? দু'দিন ধরে খুঁজছি। তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে বলেছে, তুমি নাকি চলে গেছ কোর্ফিউ দ্বীপে?'

'জী, কোর্ফিউতেই আছি,' বলল রানা। 'আমার ভুল না হলে সবই জেনেছেন।'

প্রায় ভেঙে গেল প্রফেসরের কণ্ঠ, 'ক্যাথি কি আহত? এসবের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে?'

'কোর্ফিউ দ্বীপে নেই ক্যাথি,' বলল রানা।

ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন হার্বার্ট। 'থ্যাঙ্ক গড! শুনেছি তোমার বন্ধুর ব্যাপারে। ভয়ঙ্কর। খুব খারাপ লাগছে ওর জন্যে। ...এখন কী ভাবছ?'

'জানি না, কী ভাবা উচিত।'

চুপ করে আছেন প্রফেসর। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'একটা কথা বলব। শুনতে খারাপ লাগতে পারে। তবুও জিজ্ঞেস না করে পারছি নাঃ তোমার বন্ধু কি কথা বলতে পেরেছিল ওর সঙ্গে?'

'না, দেখা হয়নি। এখনও জানা যায়নি কোথায় আছে ক্যাথি।'

'তুমি কি খুঁজে বের করবে ওকে?'

'আমেরিকায় কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ওর?' জানতে চাইল রানা। 'কখনও বলেছে কিছু?'

বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে বললেন হার্বার্ট, 'হ্যাঁ। ওখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুব চমৎকার সম্পর্ক ছিল ওর।'

'এক উকিল? নাম হার্ভে সিম্পসন?'

'না। ওই নাম কখনও শুনিনি। ক্যাথির বান্ধবী বয়স্কা এক মহিলা। দু'বছর আগে গ্রীষ্মে এখানে এসে শিক্ষকতা করেন। তাঁর নাম মিস মেরিয়ান ট্রুলি। সেসময়ে ক'বার তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছি আমরা। নিজেও ক্যাথি তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গেছে আমেরিকায়।'

'তাঁর বাড়ি জর্জিয়াতে?'

'হ্যাঁ। জর্জিয়ার স্যাভানায়। কেন, রানা, কী হয়েছে?' আরও দ্বিধান্বিত হয়ে উঠছেন প্রফেসর। 'ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের মেয়ের?'

'স্টিভ বার্কলে নামের কাউকে চেনেন?'

'না।'

'অথবা বাড নামের কেউ?'

'না।'

'শেষ প্রশ্ন,' বলল রানা। 'কখনও কি কোনও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কিছু বলেছিল ক্যাথি?'

চুপ করে কী যেন ভাবছেন প্রফেসর। একটু পর বললেন, 'কী বললে?'

‘এমন কোনও ভবিষ্যদ্বাণী, যেটার জন্যে বিশাল বড়লোক হবে ক্যাথি?’

‘না, এসব কিছুই জানি না।’ রেগে যাচ্ছেন হার্বার্ট। ‘আমরা জানতে চেয়েছি, কী হয়েছে আমাদের মেয়ের। ফোন দেব এথেন্সে ব্রিটিশ কন্সুলেটে। পুলিশকেও জানাব। হয়তো কিডন্যাপ হয়েছে ক্যাথি। অথচ, পাগলের মত তুমি বলছ কোথাকার কোন্ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা।’

‘মনে হতে পারে উন্মাদের মত কথা বলছি, কিন্তু যথেষ্ট কারণ আছে বলেই জিজ্ঞেস করেছি,’ বলল রানা। ‘সত্যিই যদি কিডন্যাপ হয়ে থাকে ক্যাথি, আপনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আরও বড় বিপদে পড়বে ও।’

‘তা হলে এখন কী করব?’ প্রফেসরের কণ্ঠ থেকে রাগ মিলিয়ে গিয়ে সেখানে এখন ভয় ও হতাশা।

‘চুপচাপ অপেক্ষা করুন। খুঁজতে শুরু করব চারপাশে। আসলে কী ঘটছে সেটা বুঝলে আমার কাছ থেকে জানতে পারবেন।’

‘যদি মুক্তিপণ চায়? আমাদের টাকা নেই যে খরচ করব। টাকা দিতে পারব না বুঝলে হয়তো খুন করবে ওকে।’

রানার ধারণা, ক্যাথির জন্যে মুক্তিপণ চাইবে না কেউ। সেজন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ‘এখন এগোতে হবে এক পা এক পা করে। দয়া করে ধৈর্য ধরুন। আপনারা কিন্তু বলেছেন, দ্বিধা না করেই বিশ্বাস রাখতে পারেন আমার ওপর।’

দুর্বল স্বরে বললেন প্রফেসর, ‘হ্যাঁ। সত্যিই তোমাকে বিশ্বাস করি আমরা।’

‘ধরে নিন, সাধ্যমত করব।’ কল কেটে দিল রানা। বুক চিরে এল দীর্ঘশ্বাস। ভাল লাগছে না কিছুই। শুকিয়ে গেছে মুখের ভেতরটা। খুঁজে নিয়ে ঢুকল কাছের বার-এ। নিল নির্জলা উইস্কি। বারের পরিবেশটা হতাশায় ভরা। বোমা

বিষয়ক খবর প্রচার করছে টিভিতে। মন দিয়ে দেখছে খদ্দেররা। আধঘণ্টা ওখানে থাকল রানা, তারপর বেরিয়ে এল। ঘুরে বেড়াল স্কয়্যারে। টুরিস্টদের জন্যে কাবাবের দোকান থেকে এক-শিক কাবাব কিনে খেল। সরে গেল স্কয়্যারের পশ্চিমে। উঠল ছাউনি দেয়া ফুটপাথে। হাঁটতে হাঁটতে দেখছে পাশের দোকানের কাঁচের জানালা দিয়ে ভেতরের শো-কেস। কিছুক্ষণ পর থামল আরেকটা বার-এর সামনে। বসল বাইরের টেরেসে। নিল ঠাণ্ডা কয়েকটা বিয়ার, সঙ্গে এক বাউল জলপাই।

ওখান থেকে সরে কয়েক ঘণ্টা ঘুরে বেড়াল ভবঘুরের মত। বারবার মনে আসছে মউরোস আর ক্যাথির কথা। শেষ বিকেলে দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়লে ব্যস্ত এক ট্যাক্সি র‍্যাংক থেকে নিল ক্যাব। ঠিকানা জানাতেই সৈকতের সড়ক ধরে ছুটল ড্রাইভার।

পনেরো মিনিট পর ট্যাক্সি ছেড়ে সামান্য হাঁটতেই পৌঁছে গেল প্যাসিফিকো কোলিয়াসের বিচ হাউসে।

জায়গাটা কোর্ফিউ টাউন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে। চমৎকার করে গুছিয়ে রাখা ছোটখাটো বাড়ি। দেয়াল সাদা রঙ করা। মেঝে টাইলের, শীতল। কোলিয়াস দম্পতির অনুরোধ, যেন এই বাড়িতে ওঠে ও। ডাইনিং রুমের টেবিলে স্ফটিকের কারুকাজ করা ফুলদানীতে এক গুচ্ছ তাজা গোলাপ। ফ্রিযে আধ ডযন বরফের মত ঠাণ্ডা স্থানীয় হোয়াইট ওয়াইন ও মরিচ দিয়ে রান্না করা মাংস, সব্জি ও পাহাড়ের মত উঁচু করে রাখা বাউলে সবুজ জলপাই ও নানান ফল।

বরফ-ঠাণ্ডা এক ওয়াইনের বোতলের কর্ক খুলে সৈকতে বেরিয়ে এল রানা। বাতাসে ভেসে এল দূর থেকে বাজনা। ওদিকে তিন শ' গজ দূরে সাদা বালির মধ্যে তৈরি করা হয়েছে ট্যাভার্না। ছাত ক্যানভাসের। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে

থাকল রানা, তারপর রওনা হলো ট্যাভার্নার দিকে।

ওখানে পৌঁছুবার আগেই শেষ হলো হাতের ওয়াইনের বোতল। ছাউনির ভেতরে ঢুকে বারটেণ্ডারকে ওটা দেখাল রানা। 'আরেক বোতল দিন।'

মাথা দুলিয়ে কাউন্টারের পেছনের তাক থেকে ওয়াইনের বোতল নিল লোকটা। কাউন্টারের সামনের স্টুলে বসল রানা। বোতলটা রেখে অন্যদিকে গেল বারটেণ্ডার। ছিপি খুলে এক ঢোক ওয়াইন গিলে সাগরের দিকে তাকাল রানা। দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে সোনালি বলের মত সূর্য। পানির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে লালচে ঝিলিক।

আশপাশের টেবিল ঘিরে ড্রিঙ্ক করছে মাত্র কয়েকজন। নিচু গলায় চলছে আলাপ। হাসছে কেউ কেউ। গতকাল সকালের ভয়াবহ বিস্ফোরণের আতঙ্ক ভুলতে চাইছে সবাই, তবুও দু'একজনের চেহারায় দুশ্চিন্তা। গিটার ও বাউযুকি ব্যবহার করে স্থানীয় নাচের দ্রুত সুর তুলেছে চারজনের ব্যাণ্ড। ড্যান্স ফ্লোরে নাচছে মাত্র চার দম্পতি।

একটু দূরের টেবিলে বসেছে সুন্দরী দুই মেয়ে। তাদের একজন বারবার দেখছে রানাকে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে বান্ধবীর কানে। একইসময়ে রানার দিকে চেয়ে হাসল তারা।

ওদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সূর্যাস্ত দেখল বিষণ্ন রানা।

কয়েক মিনিট পর ট্যাভার্নায় ঢুকল এক যুবতী। বার কাউন্টারে রানা ছাড়া আর কেউ নেই দেখে এসে বসল ওর পাশে। বামদিকের স্টুলে রাখল হাতব্যাগ। খুবই সুন্দরী মেয়েটা। বয়স পঁচিশ বা বড়জোর ছাব্বিশ। পরনে লো কাট ঘিয়ে রঙের পোশাক। তার সেরা সম্পদ বোধহয় মেঘের মত কালো, কোঁকড়ানো কোমর ছাওয়া চুল। বারটেণ্ডারের উদ্দেশে ইংরেজিতে অর্ডার দিল সে। কথায় কড়া স্প্যানিশ টান।

অর্ডার পেয়ে এক বোতল মিনারেল ওঅটার দিল বারটেণ্ডার। এক চুমুক পানি খেয়ে ভাবনায় তলিয়ে গেল মেয়েটা। কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখল রানা, তারপর আবারও তাকাল সূর্যাস্তের মন-খারাপ-করে-দেয়া দৃশ্যে। ফুরিয়ে গেল জীবন থেকে আরও একটা দিন।

কাছেই বেজে উঠল কারও মোবাইল ফোন। ব্যাগ থেকে যন্ত্রটা বের করে স্প্যানিশ ভাষায় জবাব দিল মেয়েটা। ওই ভাষা অজানা নয় রানার। আযমেরি নামের কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে এই মেয়েটা। না, ভাল নেই সে। যখন তখন বোমা ফাটছে, তাই আর থাকবে না এ দেশে। আগামীকাল প্রথম ফ্লাইটে ফিরবে মাদ্রিদে।

ফোন কল কেটে দিল মেয়েটা। দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে তাকাল রানার দিকে।

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই,' সান্ত্বনার সুরে বলল রানা।

মিষ্টি হাসল কেশবতী। 'আপনি কি ইংরেজ? আপনার উচ্চারণ তো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির।'

'ইংরেজ নই, তবে ওখানেই লেখাপড়া করেছি।'

'টুরিস্ট?'

'ঠিক তা বলা যায় না।'

দারুণ মধুর হাসল মেয়েটা।

'আপনি এসেছেন স্পেন থেকে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল কেশবতী। 'সবার সামনে জোরে কথা বলাকে কখনও ভাল বলে মনে হয়নি আমার। সরি, তা-ই করে বসেছি। ফোন করেছিল আমার বোন। খারাপ কিছু হয়ে গেল কি না, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল।'

'স্বর্গের মত কোর্ফিউ দ্বীপে এসেও ভাল লাগছে না আপনার?' একটু অবাক হয়েছে রানা।

জবাব না দিয়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল সুন্দরী। 'আমি স্পেন থেকে এসেছি বুঝলেন কী করে? আপনি স্প্যানিশ জানেন?'

‘এক-আধটু জানি,’ হাসল রানা। ‘আমার সঙ্গে চলবে দুটো ড্রিঙ্ক?’

মিষ্টি হাসল যুবতী। ‘এরই ভেতর ড্রিঙ্ক নিয়েছি। আজ আর নয়। থ্যাঙ্ক ইউ।’

পানির বোতল দেখাল রানা। ‘ওটা তো সোমরস নয়। আমার খাতিরে না হয় নিন একটু ওয়াইন?’

মৃদু মাথা দোলাল স্প্যানিশ সুন্দরী। বারটেণ্ডারকে রানা বলতেই সে বার-কাউন্টারে রাখল আরেকটা ওয়াইনের গ্লাস। রানার পাশের স্টুল থেকে হাতব্যাগ তুলে ওখানে বসল রূপবতী। পায়ের কাছে মেঝেতে রাখল হাতব্যাগ। হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। ‘আমার নাম এমিলিয়া।’

সুন্দরীর হাতটা নরম ও পেলব। করমর্দন করে বলল রানা, ‘আমার নাম মাসুদ রানা।’ দূরের কোণের টেবিল দেখাল। ওখান থেকে ভাল দেখা যায় সাগর। ‘আপনার আপত্তি না থাকলে, চলুন, ওই টেবিলে গিয়ে বসি?’

মৃদু মাথা দোলাল মেয়েটি।

‘ভুলে যাবেন না আপনার ব্যাগ,’ ওটা তুলে সুন্দরীর হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

গ্লাস ও ওয়াইনের বোতল নিয়ে কোণের টেবিলের দিকে চলল ওরা। যাওয়ার পথে একটা চেয়ারে হোঁচট খেল রানা। হাতের গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল ওয়াইন। মাথা নাড়ল মৃদু। ‘সরি! অনেক বেশি গিলে ফেলেছি।’

টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা, ধীরে ধীরে জমে উঠছে গল্প। কিছুক্ষণ পর আকাশে উঠল অজস্র তারা ও মস্ত এক চাঁদ— সম্ভবত সুপার মুন। রুপালি আলোয় ঝলমল করতে লাগল সাগর।

‘আপনি সত্যিই কোর্ফিউ ছেড়ে যেতে চান?’ বলল রানা, ‘এই দ্বীপ কিন্তু সত্যিই স্বর্গ।’

‘বোমা ফাটছে, তাই ভয় পেয়েছি,’ স্বীকার করল

এমিলিয়া, 'কী ভয়ঙ্কর! খুন হয়ে গেল নিরীহ এতগুলো মানুষ!'

মাথা দোলাল রানা। চুপ করে আছে।

'অন্যান্য সমস্যাও আছে,' বলল এমিলিয়া।

'যেমন?' আগ্রহ প্রকাশ করল রানা।

'সত্যিই কি জানতে চান? তা হলে শুনুন, আমার প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে জুটে গেছে আমারই প্রেমিক। আমার বোন তাই ভেবেছিল, আমি এখানে এলে শক্ত করতে পারব মন। কিন্তু খুনোখুনি দেখে এখন আর জায়গাটা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।' দুর্বল হাসল সুন্দরী। রানার চোখে চোখ রেখেও নামিয়ে নিল দৃষ্টি।

'ভাবতে পারছি না, আপনার মত রূপসীকে ফেলে অন্য কারও পেছনে যেতে পারে কেউ,' মেয়েটার বাহুতে দু'আঙুলে মৃদু তবলা বাজাল রানা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্প্যানিশ সুন্দরী। 'আপনি নিজেও তো খুব হ্যাণ্ডসাম। আপনিই বা কী করছেন এখানে? ছুটি না ব্যবসা?'

'ছুটিই বলতে পারেন, গলা পর্যন্ত মদ গিলছি।' বোতলের তলানির তরল নিজের গ্লাসে ঢেলে নিল রানা। ধীর গতির ঐতিহ্যবাহী চমৎকার এক গ্রিক গানের সুর বাজাচ্ছে ব্যাণ্ড। গলা মিলিয়েছে তরুণী এক ভোকালিস্ট।

'জীবিকার জন্যে কী ধরনের কাজ করেন, রানা?' জানতে চাইল এমিলিয়া।

'বলার মত তেমন কোনও কাজই করি না।'

'আপনার ঘাড়ে কী হয়েছে?'

'আপনি কিন্তু অনেক প্রশ্ন তোলেন।'

হাসল এমিলিয়া। 'জানতে চাইছি, কারণ আপনাকে ভাল লেগেছে।'

মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'আপত্তি না

থাকলে নাচবেন আমার সঙ্গে?'

'আপত্তি নেই, রানা।' লাজুক হাসল সুন্দরী।

ছোট্ট ড্যান্স ফ্লোরে চলে এল ওরা। একবার কোণের টেবিলের পাশে রাখা হাতব্যাগটা দেখল এমিলিয়া। 'চুরি হবে না তো?'

'না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন,' ভরসা দিল রানা।

ধীর লয়ে বাজছে মিউযিক। রানা ও এমিলিয়া যেন হারিয়ে গেল নিজেদের গোপন এক জগতে। এক হয়ে মিশে যেতে চাইছে বঞ্চিত দুটো উষ্ণ দেহ। চকচক করছে এমিলিয়ার দুই চোখ। দৃষ্টিতে অমোঘ এক বুনো আহ্বান। কিছুক্ষণ নাচার পর মেয়েটাকে দু'হাতে কাছে টানল রানা। স্প্যানিশ সুন্দরীর পুরুষ্টু ভেজা ঠোঁটে নামল বাঙালি যুবকের নিষ্ঠুর ঠোঁট। একবার শিউরে উঠে আত্মসমর্পণ করল এমিলিয়া। সাড়া দিল ওর জিভ।

দীর্ঘ চুম্বনের পর নিচু স্বরে বলল রানা, 'সৈকতে একটা বাড়িতে উঠেছি, কাছেই। ওখানে একাকী সময় কাটাতে পারব।'

মুখ তুলে রানাকে দেখল এমিলিয়া। আগের চেয়ে দ্রুত হয়েছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। চোখ নামিয়ে নিল। আস্তে করে মৃদু মাথা দোলাল। 'তা হলে চলো।'

বিল মিটিয়ে এমিলিয়াকে নিয়ে ট্যাভার্না থেকে বেরিয়ে এল রানা। চাঁদের আলোয় হাসছে রুপালি বালি। ফিসফিস করছে সাগরের ঢেউ। পেছনে পড়ল প্রেমের মায়াবী সুর।

উঁচু হিলের স্যাণ্ডেল খুলে খালি পায়ে রানার পাশে চলেছে এমিলিয়া। ঝিক করে উঠল পায়ের সুন্দর নখের লাল নেইল পলিশ। হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে সুন্দরী মেয়েটার ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল রানা। ছেড়েও দিল। বোধহয় লজ্জা পেয়েছে এমিলিয়া। হাঁটার গতি বাড়ল ওর। তাল রাখতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলে পড়েই যেত রানা। থমকে গিয়ে খিলখিল

করে হাসল স্প্যানিশ রূপসী। কাছে এসে শক্ত করে ধরল রানার হাত। 'পড়ে যেয়ো না যেন। মাতাল হয়ে গেলে?'

হাসল রানা। একটু বেসুরো সুরে বলল, 'একদম ঠিক। সারাদিন ধরেই মদ গিলছি।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা।

একটু পর পৌঁছুল কোলিয়াসদের বাড়িতে। দরজার তালা খুলতে গিয়ে রানার হাত থেকে বালিতে পড়ল চাবি। অন্ধের মত এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল রানা। বিড়বিড় করে গালি দিল কাকে যেন। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর চাবি পেয়ে বলল, 'পেয়েছি শালাকে!'

হেসে হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিল এমিলিয়া। 'এমনিতেই তো খোলা!' ঠেলা দিতেই হাট হয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল স্প্যানিশ সুন্দরী। পিছু নিল রানা। এক হাতে আবারও জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে। বামহাতে বাটন টিপে জ্বেলে নিল বাতি। থমকে গেছে রানা। এমিলিয়া এক পা এগোতেই তার ঘাড়ে নামল ওর কারাতে কোপ। টুঁ শব্দ না করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মেয়েটা।

অচেতন করতে চেয়েছে রানা, খুন করতে নয়। চট্ করে বসে পড়ল মেয়েটার পাশে। হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে ভেতরে হাত ভরতেই স্পর্শ পেল শীতল ইস্পাতের। পিস্তলটা বের করে নিল রানা। ট্যাভার্নায় ব্যাগের ওজন আর ভেতরের জিনিসের আকৃতি দেখে আগেই ভেবেছে, এমনই কিছু থাকবে মেয়েটার কাছে। বেরেটা নাইণ্টিটু এফ সেমি-অটোমেটিক। ভাল অস্ত্র। নাইন এমএম কক্ ও লক করা। সেফটি অফ করল রানা। সরে গেল কয়েক ফুট দূরে।

ওই একইসময়ে ঝটকা দিয়ে খুলল কিচেনের দরজা। এমনই হবে, ভেবেছে রানা। ওর মুঠির ভেতর পর পর দু'বার লাফিয়ে উঠল বেরেটা।

সরাসরি গুলির গতিপথে এসেছে লোকটা। দুই গুলি বুকে

নিয়ে ছিটকে পেছনের মেঝেতে গিয়ে পড়ল সে। হাত থেকে খসে মেঝেতে পিছলে গেল পিস্তলটা। চুপচাপ শুয়ে থাকল আততায়ী। থুতনি বুকের কাছে। রক্তে ভেসে গেছে দুই ঠোঁট।

গুলির বিকট আওয়াজে ঝনঝন করছে রানার কান। দেরি না করে সামনের দরজায় গিয়ে দেখে নিল চারপাশ। সৈকত এখনও নির্জন। বাড়ির দেয়াল কমিয়ে দিয়েছে গুলির শব্দ, নইলে টের পেত তিন শ' গজ দূরের ট্যাভার্নার লোকজন।

জ্ঞান ফিরছে সুন্দরী মেয়েটার। একহাতে ঘাড় চেপে ধরে গুঙিয়ে উঠল। তাকে টপকে অনাহূত আগন্তুকের পিস্তল তুলে নিল রানা। একই মডেলের, নাইন এমএম বেরেটা। তবে এটার ব্যারেলে পরানো আছে সাইলেন্সার। বামহাতে স্লাইড পিছিয়ে নিল রানা। ব্রিচে চকচকে তামার কার্ট্রিজ। মৃত আগন্তুককে দেখল রানা। খুব স্টাইল করে কাটা সোনালি চুল। সুদর্শন। রানার মনে পড়ল, থ্যানাটস বলেছিল, ক্যাথির বিদায়-পার্টিতে গিয়েছিল এক যুবক এবং তার সঙ্গিনী। ওই মেয়েটা দেখতে ছিল গ্রিক দেবীর মতই রূপসী।

সাপ্রেসার খুলে অস্ত্রটা বেল্টে গুঁজল রানা। অন্য পিস্তলটা তাক করল মেয়েটার মাথা লক্ষ্য করে। কাছাকাছি রেঞ্জে ওটা ভয়ঙ্কর। 'উঠে বসো,' নির্দেশ দিল রানা।

কেশে উঠে হাঁটু ও কনুইয়ে ভর করে উঠে বসল মেয়েটা। কপাল থেকে সরিয়ে দিল কালো চুল। এখন কালো চোখে তীব্র রাগ ও ঘৃণা।

'আগেই শহরে দেখেছি,' বলল রানা, 'প্রথম দেখি স্যান রোক্কো স্কয়্যারে। পরে দোকানের কাঁচে। পিছু নিতেই জেনেছি, তুমি আমার লেজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেছনে নিয়ে ঘুরেছি। যদিও ইচ্ছে করলে হাওয়া হয়ে যেতে পারতাম।'

মার খাওয়া বাঘিনীর মত গুটিসুটি মেরে বসল মেয়েটা। উত্তেজিত। একহাত সামনের মেঝেতে। চেপে বসেছে ঠোঁটে

ঠোঁট। কঠোর চোখে দেখছে বাঙালি গুপ্তচরকে। কপাল থেকে আবারও সরিয়ে দিল এক গোছা চুল। রানা দেখল, মেয়েটার কপালের এক পাশে দপ-দপ করে কাঁপছে রগ।

'পিছু নাওনি, আসলে আমিই ডেকে এনেছি,' বলল রানা, 'ব্যস্ত ট্যাক্সি র‍্যাংক থেকে ক্যাব নিয়েছি, যাতে অনুসরণ করতে পারো। পরের ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠেছ। কোথাও না গিয়ে সরাসরি এলাম, যাতে পথ না হারাও। মাতালের অভিনয় করেছি, যাতে নিশ্চিন্ত থাক। নইলে সহজে পা রাখতে না ফাঁদে।'

ফাঁকা চোখে রানাকে দেখছে কৃষ্ণকেশী।

দু'জনের মাঝের দূরত্ব মাপছে, বুঝল রানা। ঝুঁকি কতটা, সেটা নিয়ে ভাবছে। ভালই ট্রেনিং পেয়েছে। 'কাজে যথেষ্ট ভাল তুমি,' বলল রানা, 'বোন আর প্রেমিকের গল্প ফাঁদলে, কিন্তু উচিত ছিল আরও সতর্ক হওয়া। এবার মুখটা খোলো, এমিলিয়া। যদিও মনে করি না ওটা তোমার আসল নাম। আমাকে বাধ্য কোরো না গুলি করতে।'

চুপ করে থাকল মেয়েটা।

'ক্যাথি হার্বার্ট এখন কোথায়?'

জবাব দিল না সুন্দরী।

'কে বোমা ফাটাল ওই ক্যাফেতে?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা কি ফাটানো হয়েছিল মউরোসকে মেরে ফেলতে?'

'আমার কিছুই জানা নেই। তুমি এসব কী বলছ!'

মেঝেতে গুলি করল রানা। চিৎকার করে হাত সরিয়ে নিল মেয়েটা। ওর আঙুলের এক ইঞ্চি দূরে লেগেছে বুলেট।

'তোমার রিফ্লেক্স ভাল,' বলল রানা। 'গুলি করেছি দুই আঙুলের মাঝে। তবে পরেরবার উড়িয়ে দেব একটা আঙুল। মুখ খোলো। ক্যাথি হার্বার্ট। ওই মেয়ে এখন কোথায়?'

'চলে গেছে,' প্রায় ফিসফিস করে বলল সুন্দরী।

'এই তো মুখে বোল ফুটেছে। গুড। কোথায় গেছে ওই

মেয়ে?’

দ্বিধায় পড়ল যুবতী।

‘কোন্ আঙুল হারাতে চাও?’ জানতে চাইল রানা। ‘যেটা কম ব্যবহার করো? হাত তোলো, নইলে অন্য কোথাও গুলি লাগবে।’

‘ওই মেয়ে এখন আর গ্রিসে নেই।’

‘তা হলে কোথায় গেছে?’

‘তুমি তো এমনিতেই আমাকে খুন করবে,’ রাগী চোখে রানাকে দেখল যুবতী। ‘তা হলে তোমাকে কিছু বলব কেন?’

‘আমি তোমাদের মত নই,’ বলল গম্ভীর রানা। ‘ভাল করেই জানি, আজ রাতে কী করতে যাচ্ছিলে তোমরা। তোমাদের দরকার কিছু তথ্য। জেনে নিয়ে খুন করতে। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথার খুনি নই আমি। যদি বলো ক্যাথি হার্বার্ট কোথায়, এবং কী হচ্ছে, মরবে না। এমন কোথাও সরিয়ে দেব, যেখানে তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না কেউ। একবার ক্যাথিকে পেলে, তখন হয়তো ছেড়ে দেব তোমাকে। কী করবে স্থির করো। একটা কথা মাথায় গেঁথে নাও, মুখ না খুললে একটু পর সত্যিই মরবে। দ্বিধা করব না শেষ করে দিতে। ...তোমার আঙুল নিয়ে খেলতে ভাল লাগছে না।’ মেয়েটার কপালে পিস্তল তাক করল রানা।

‘কে আসলে তুমি?’ কাঁপা গলায় জানতে চাইল যুবতী। এখন আর স্প্যানিশ টান নেই। সেখানে আমেরিকান সুর।

‘কেউ নই। শেষ সুযোগ দিচ্ছি। ক্যাথি হার্বার্ট কোথায়?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আমেরিকান যুবতী। ‘পাঁচ দিন আগে, ওকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ইউএসএ-তে।’

‘গুড। মার্কিন মুলুকের কোথায় নিয়েছে? কারা কিডন্যাপ করেছে ওকে?’

‘আমি সবকিছু জানি না,’ বলল মেয়েটা, ‘আমাকে যা করতে বলা হয়েছে, শুধু সেটাই করেছি।’

‘নির্দেশ দেয় কারা? তাদের নাম জানাও।’
‘একটা নামও জানি না।’
‘তোমার নিজের নাম কী?’
‘ক্রিস্টিনা পার্কার।’
মনোযোগ দিয়ে তার চোখ দেখল রানা। মিথ্যা বলছে না মেয়েটা। মৃত সোনালি চুলের লোকটাকে দেখাল। ‘ওর নাম কী?’
‘বয়েটার ব্ল্যাকউড।’
‘কী কারণে এসেছিলে, ক্রিস্টিনা? বোমা সেট করে কে?’
হঠাৎ ঘর ভরে গেল বিকট আওয়াজে। কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে গেছে বুলেট, টের পেল রানা। ঝনঝন করে ভাঙল দেয়ালের একটা বাতি। ঘুরে বসেই পাল্টা গুলি পাঠাল রানা। মুঠোয় লাফিয়ে উঠেছে বেরেটা। কনুইয়ে ভর করে আধ শোয়া হয়ে গুলি করেছে বয়েটার ব্ল্যাকউড। হাতে ছোট্ট রিভলভার। আবারও গুলি করল সে। দ্বিতীয় গুলি গেল রানার শার্টের কাফের মাঝ দিয়ে।
একইসময়ে পাল্টা জবাব দিয়েছে রানা। লোকটার চোখ গলিয়ে দিয়ে মগজে ঢুকেছে গুলি। ঠাস্ করে মেঝেতে পড়ল মৃত লোকটার মাথা। পেছনের দেয়ালে ছিটকে লাগল রক্ত।
আবারও নীরবতা।
উঠে দাঁড়াল রানা, গুলি লাগেনি ওর।
এবার সত্যিই খতম হয়েছে ওই লোক।
লাথি মেরে নাকবোঁচা ম্যাগনাম .৩৫৭ রিভলভার দূরে পাঠাল রানা। পেছনে শুনল সামান্য ফুঁপিয়ে ওঠার আওয়াজ। ঝট্ করে ঘুরল রানা, মেঝেতে বসে আছে ক্রিস্টিনা পার্কার। অবাক চোখে দেখছে, ঘি রঙা ড্রেসের গর্ত থেকে ছড়িয়ে পড়ছে লাল রঙ। বয়েটারের লক্ষ্যহীন বুলেট ফুটো করে দিয়েছে তার পাকস্থলি। তারপর গিয়ে ঢুকেছে কোনও ভাইটাল অর্গ্যানে।

পোশাক ছিঁড়তে চাইছে মেয়েটা। তীব্র ব্যথায় মস্ত হাঁ মেলল। বুজল মুখ। চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। মুহূর্তে চলে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

উনিশ

জীবিত মানুষকে খুন করা সহজ, কিন্তু সেই লাশ গায়েব করা বড়ই কঠিন। কপাল ভাল রানার, টাইলে জমে থাকা রক্তের পুকুর পেরিয়ে কিচেনে পেয়েছে হেভি-ডিউটি কিছু প্লাস্টিক গার্বেজ ব্যাগ। অমন দুটো এনে বিছিয়ে দিল দরজার কাছের প্যাসেজে।

ফিরে এসে দুই কবজি ধরে টেনে নিয়ে চলল ক্রিস্টিনা পার্কারকে। পেণ্ডুলামের মত দুলছে মেয়েটার মাথা। ঘোলা চোখদুটো খোলা। রক্ত মাখা দীর্ঘ চুল বিশ্রী দাগ তৈরি করছে টাইলে। লাশটা রাখল রানা একটা গার্বেজ ব্যাগের ওপর। ফিরে গিয়ে থামল বয়েটারের লাশের পাশে। উবু হয়ে ধরল দুই গোড়ালি। এই লাশ ভারী। বেশি রক্তাক্ত। নাইন এমএম বুলেটের আঘাতে চুরমার হয়েছে ডান অক্ষিকোটর ও চোয়াল। ক্রিস্টিনার লাশের পাশের ব্যাগে ভারী লাশ রাখল রানা।

সতর্কতার সঙ্গে সার্চ করল দুই লাশ। কোনও কাগজপত্র বা ব্যক্তিগত কিছুই পেল না। বয়েটারের পেছনের পকেটে মোবাইল ফোন। ক্রিস্টিনার হাতব্যাগ থেকেও পেল একই জিনিস। মেয়েটার ফোনের শেষ কল দেখে ডায়াল করল রানা। ওর অন্যহাতে থরথর করে কাঁপল বয়েটারের ফোন।

ওই দুটো ফোনের কল রেকর্ড ঘাঁটল রানা। শুধু নিজেদের ভেতর কল করেছে এরা।

লাশদুটো প্যাসেজে রেখে বাড়ি পরিষ্কারের অভিযানে নামল রানা। দেয়ালের ল্যাম্প ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচের টুকরো। সব ঝাড়ু মেরে জড় করে, ডাস্টপ্যানে কাঁচ তুলে ফেলল বিনের ভেতর। কিচেনের এক কাবার্ডে পেল মপ, বালতি ও ব্লিচ। ঠাণ্ডা পানিতে বালতি ভরে নিয়ে এল বাইরের ঘরে। আঁশটে গন্ধে ভরে আছে ঘর। রক্ত মুছে ফেলার কাজটা শেষ হলে কিচেন থেকে নিল ধারালো ছুরি। ওটা দিয়ে কাঠের চৌকাঠের গভীর থেকে খুঁচিয়ে বের করল চ্যাপ্টা নাইন এমএম বুলেট। প্যান্টের পকেটে রাখল ওটা। দরজার চৌকাঠের বারোটা বেজে গেছে দেখে কুঁচকে ফেলল ভুরু।

বাড়ি পরিষ্কারের কাজ করতে করতে গভীরভাবে ভাবছে রানা। আগেও দেখেছে ক্রিস্টিনা বা বয়েটারের চেয়েও দক্ষ সার্ভেইল্যান্স টিম। কাজে খারাপ ছিল না এরা। দুই বেরেটা একই মডেলের। যত্ন করে রাঁদা মেরে তুলেছে সিরিয়াল নম্বর। বোঝা যায়, এরা পেশাদার। ওর ভুল না হলে, অ্যাবেলিনো থ্যানাটসকে শেষ করতে পাঠানো হয়েছিল এই দু'জনকেই। সত্যিই ওই ব্যবসায়ী ড্রাগের সঙ্গে জড়িত হলে, কখনোই চাইত না খোঁজা হোক ক্যাথিকে; ভুলেও যোগাযোগ করত না মউরোসের সঙ্গে। লোকটাকে খুন করে তার বাড়িতে ড্রাগ রেখেছে এরা। পুলিশ নতুন করে আর কিছুই ভাববে না। ক্যাফেতে বোমা ফাটিয়ে খুন করেছে মউরোসকে, কারণ থ্যানাটসের সঙ্গে আলাপ করেছিল ও। এদের পরের পদক্ষেপ সহজ। মউরোসের সঙ্গে রানাকে দেখা গেছে, তাই খুন করতে এসেছে ওকে।

মিলে যাচ্ছে চিত্রের এসব টুকরো। কিন্তু কী কারণে ক্যাথি হার্বার্ট এসবে জড়িয়ে গেল, তা বের করা যাচ্ছে না।

চাওয়া হয়নি মুক্তিপণ। কোনও কারণ নেই কিডন্যাপ করবে তাকে। ক্যাথির বাবা-মার এত টাকা নেই যে তাঁদের মেয়েকে জিম্মি করে কোটি ডলার চাইবে কেউ। প্রফেসর জন হার্বার্ট রাজনৈতিক নেতা হলে ধরে নেয়া যেত, জরুরি কোনও তথ্যের জন্যে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাঁর মেয়েকে। কিন্তু ঘটনা তেমন নয়। নিরীহ এক থিয়োলজির প্রফেসর। কারও সাতে-পাঁচে নেই। তা হলে?

অস্বাভাবিক কোনও কারণে চরম ব্যবস্থা নিয়েছে কেউ। সেটা করতে হয়েছে ক্যাথির কারণেই। কিন্তু, কী করেছিল ওই মেয়ে? যেভাবেই হোক, ক্যাথির হাতে এসেছে হাজার হাজার ডলার। কোথা থেকে পেল অত টাকা? আশা করছিল, পাবে আরও। বোধহয় ব্ল্যাকমেইল করছিল কাউকে। যাকে ভাঙিয়ে খেতে শুরু করেছিল, তার আছে টাকা আর ক্ষমতা। বাধ্য হয়ে ধরে নিয়ে গেছে ক্যাথিকে। তার মানে, যে জিনিস বা তথ্য দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করছিল মেয়েটা, ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আরেকটা প্রশ্ন জাগে মনেঃ কী কারণে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় নেয়া হলো ক্যাথিকে? সহজেই ওর মগজে গেঁথে দিতে পারত বুলেট। ভেবে-চিন্তে মাত্র একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল রানা। ক্যাথির কাছে এমন কিছু আছে, যেটা খুব জরুরি ক্ষমতাশালী একদল লোকের কাছে। ওটা না পাওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়েই প্রাণে বাঁচিয়ে রাখছে মেয়েটাকে।

সেক্ষেত্রে আরও কথা আসে।

নরম মনের মানুষ ছিল না ক্রিস্টিনা বা বয়েটার। প্রয়োজনে খুন করতেও দ্বিধা করত না। ক্যাথিও এমন কোনও মেয়ে নয়, যে সৈনিকের ট্রেনিং পেয়েছে ইন্টারোগেশন এড়াবার। ওর পেট থেকে সব বের করবে ভাবলে, আততায়ীরা তা পারত মাত্র কয়েক মিনিটে। সাধারণ

মানুষকে ছোরা বা পিস্তলের ভয় দেখানোই যথেষ্ট। প্রাণের ভয়ে সব বলে দিত গড়গ্রড় করে।

সব জেনে নিয়ে সহজেই খুন করতে পারত এরা।

পুরো বারো দিন পেরিয়ে গেছে, পাওয়া যায়নি ক্যাথিকে।

কে জানে, সত্যিই হয়তো খুন হয়েছে মেয়েটা।

রাত সাড়ে তিনটায় বন্ধ হলো সৈকতের ট্যাভার্না। শেষ খদ্দেরও রওনা হলো বাড়ির পথে। থেমে গেছে সব বাজনা, নিভিয়ে দেয়া হলো সব বাতি। চারপাশে থাকল শুধু স্তব্ধ চাঁদের আলো।

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল রানা। বালির সৈকত পড়ে থাকল নির্জন। জিন্স প্যান্টে দুই বেরেটা ও রিভলভার রেখে সদর দরজা খুলল রানা। বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল বয়েটারের ভারী লাশ। গভীর দাগ তৈরি করছে ব্যাগ। ছেঁচড়ে নিতে গিয়ে টান পড়ছে রানার ঘাড়ের সেলাইয়ে। ফুলে উঠছে বাহু ও কাঁধের পেশি। জমছে ল্যাকটিক অ্যাসিড। এক শ' গজ গিয়ে পছন্দমত জায়গা পেল রানা। দুটো বালির ঢিবির মাঝে রাখল লাশ। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। ধীর পায়ে রওনা হলো ফিরতি পথে।

বাড়িতে এসে ক্রিস্টিনার লাশ নিয়ে ফিরতে লাগল বালির ঢিবির দিকে। না-সূচকভাবে এদিক-ওদিক দুলছে লাশের মাথা। ঘোলা চোখ যেন দোষারোপ করছে রানাকে। রানা ভাবছে, ভাগ্যিস ওর গুলিতে খুন হয়নি মেয়েটা।

জ্যোৎস্নার রুপালি আলোয় দুই লাশ পাশাপাশি রাখল রানা। খুঁড়তে লাগল একদিকের বালির ঢিবি। কিছুক্ষণ পর তৈরি হলো অগভীর কবর। এক এক করে ওই গর্তে দুই লাশ ফেলল রানা। প্রথমে ক্রিস্টিনা। ওর ওপরে থ্যাপ্ শব্দে পড়ল বয়েটার। রাতের নৈঃশব্দ্যে রানার মনে হলো, প্রচণ্ড আকর্ষণে মিলিত হলো দুই লাশ।

সাদা বালিতে গর্তটা বুজে দিল রানা। বাকি যা করার,

করবে সাগরসৈকতের হাজার হাজার কাঁকড়া।

একটু খুঁজতেই পেল মৃত গুগলি ও শামুকে ভরা বাতিল এক পুরনো, ছোট নৌকা। ওটা টেনে এনে কবরের ওপর রাখল রানা। সরে গিয়ে থামল সাগরের তীরে। কোমর থেকে নিয়ে সাগরে ছুঁড়ে ফেলল তিন আগ্নেয়াস্ত্র। বাড়ি ফেরার পথে পায়ের ছাপ রয়ে গেল, কিন্তু সেসব মিলিয়ে যাবে রাতের হাওয়ায়।

বাড়ি ভালভাবে পরিষ্কার করতে না করতেই রাত পেরিয়ে এসে হাজির হলো ধূসর ভোর। দীর্ঘ শাওয়ার নিল রানা। আগেই সৈকতে পুড়িয়ে দিয়েছে রক্তাক্ত শার্ট ও প্যান্ট। বালিতে ছড়িয়ে দিয়েছে ছাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আগে ডাইনিং টেবিলে রাখল পাঁচ শ' ইউরোর একটা নোট। ওটার ওপর রাখল ওর চিঠি। ওখানে লেখা: নষ্ট হয়েছে দেয়ালের ল্যাম্প ও দরজার চৌকাঠ, সেজন্যে সে সত্যিই দুঃখিত। কোলিয়াসের দারুণ ওয়াইন খেয়ে এতই মাতাল ছিল, কী করছে, সেদিকে হুঁশ ছিল না ওর।

সাগরের সুনীল বুকে সোনালি সূর্য উঁকি দিতেই বাড়িটা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। হেঁটে চলল শহরের দিকে। একটু পর পেল ট্যাক্সি। ওটাতে চেপে চলল এয়ারপোর্টে। ক্রিস্টিনার দলের তরফ থেকে হামলা আসতে পারে, তাই সতর্ক। তবে অনুসরণ করল না কেউ।

এয়ারপোর্টের লকার থেকে পাসপোর্ট ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে রিটার্ন টিকেট ব্যবহার করে উঠল এথেন্সের বিমানে। মাঝ দুপুরে আধখালি বিযনেস ক্লাসে বসে সেভেন-ফোর-সেভেন বিমানে করে চলল আটলাণ্টা লক্ষ্য করে।

ওর জানা নেই, কী আছে সামনে, কী পাবে আমেরিকায়। তবে, এটুকু জানে, মউরোসের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে কোথাও না কোথাও চরম মূল্য দেবে কেউ না কেউ।

বিশ

তাপমাত্রা কোর্ফিউ দ্বীপের চেয়ে বেশি না হলেও দ্বিগুণ স্যাঁতসেঁতে আমেরিকার জর্জিয়া স্টেট। আটলান্টার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন এয়ারপোর্টে বিমান থেকে নামতেই শার্টের পিঠ ভিজে উঠল রানার। ঠিক করে নিল হাতঘড়িতে ইউএস টাইম। আলাদা যোনের কারণে গ্রিস থেকে রওনা হয়েও আমেরিকায় পৌঁছে প্রায় একই ক্ষণে রয়ে গেছে।

মাথার ওপরে আগুন ঢালছে সূর্য। এয়ারপোর্টে রুপালি বড় এক ক্রাইসলার গাড়ি ভাড়া নিয়ে স্যাভানার দিকে চলল রানা। নামিয়ে নিয়েছে জানালার কাঁচ, হু-হু হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে কালো চুল।

ফুরিয়ে আসছে সোনালি দুপুর, এমনসময় স্যাভানা শহরে ঢুকল রানা। চওড়া সব রাস্তার পাশে ছবির মত সুন্দর সব কলোনিয়াল বাড়ি, দেখলে মনে হয় গৃহযুদ্ধের আমলের। উকিল হার্ভে সিম্পসনের অফিসের দিকে যেতে যেতে অফিশিয়াল কার্ডের ফোন নম্বর অনুযায়ী কল দিল রানা। কিন্তু ধরল না কেউ। একটু পরেই পেল একটা মেসেজ। কিছু দিন আগে কেটে দেয়া হয়েছে ওই মোবাইলের সংযোগ। ল্যাণ্ড ফোনের নম্বর দেয়া হয়নি কার্ডে। ইয়েলো পেজ ঘাঁটল রানা। কোথাও নেই উকিল হার্ভে সিম্পসনের নাম। বাধ্য হয়ে কার্ডের ঠিকানা অনুযায়ী তার খোঁজ নেবে ঠিক করল রানা। মানচিত্র দেখে ঘুরিয়ে নিল ক্রাইসলার গাড়ি।

রানার ধারণা ছিল, সাদা, প্রকাণ্ড সব পিলার সামনে নিয়ে

প্রকাণ্ড কোনও বাড়িতে হবে হার্ভে সিম্পসনের পশ ল ফার্ম। কিন্তু প্রাচীন গাছে ভরা সুন্দর, পুরনো বাড়ি ও রাস্তা পেছনে ফেলে শহরের শেষপ্রান্তে পেল পুরনো, প্রায় ধসে পড়া সিম্পসনের অফিস দালান।

এদিকটা হতদরিদ্রদের এলাকা। দালানের প্রথমতলায় নাপিতের দোকান। সামনে গাড়ি রাখার জায়গা। ফেটে গেছে মেঝে। জন্মেছে ঘাস ও ঝোপঝাড়। তৃতীয়বারের মত কার্ডের ঠিকানা দেখল রানা। না, ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

প্রথমতলার দরজা পেরোতেই 'টিং-টুং!' আওয়াজ তুলল বেল। ভেতরে আর্কটিকের ঠাণ্ডা। ফুল স্পিডে চলছে এয়ার কণ্ডিশনার। চারপাশ দেখে নিল রানা। আসবাবপত্র সব পঞ্চাশ দশকের। দুই নরসুন্দরও সত্তর বা আশি বছর পার করেছে। একজন ব্যস্ত হয়ে কাটছে এক ছোকরার চুল। অন্য কোনও খদ্দের নেই। দ্বিতীয় নাপিত চুপ করে বসে আছে স্টুলে, হাতে বিয়ার। বাজে ধরনের কুঁজো। দেখলেই মনে হয় মৃত্যুপথযাত্রী ইগুয়ানা। একটু দূরে টাইলের মেঝেতে ঝাড়ু দিয়ে কাটা চুল জড় করছে আঠারো বছরের এক শিক্ষানবীশ, পরনে অ্যাপ্রন।

রানাকে খদ্দের মনে করে বিয়ার হাতে ঘুরে তাকাল বয়স্ক নাপিত। 'আপনার জন্যে কী করতে পারি, মিস্টার? চুল কাটবেন, না শেভ?'

'কোনওটাই না,' বলল রানা। 'বলতে পারেন কোথায় পাব হার্ভে সিম্পসনকে?'

'আপনি বলতে চাইছেন পিছলার কথা।'

'কার্ডে তো হার্ভে সিম্পসন দেখছি।'

মাথা দোলাল বয়স্ক নাপিত। 'হ্যাঁ, সে-ই। পিছলা সিম্পসন।'

'ওই নাম পেল কীভাবে?'

মুচকি হাসল নাপিত। সামনের ছয়টা দাঁত নেই। 'ওর

একটা কর্ভেট গাড়ি আছে। ওটা যেভাবে চালায়, তাতে ওকে ওই নাম না দিয়ে উপায় ছিল না কারও। সবাই বলে, যে কোনও দিন অ্যাক্সিডেন্ট করে মরবে ব্যাটা।'

'কার্ডের অ্যাড্রেস অনুযায়ী এখানেই তার অফিস,' বলল রানা।

'হ্যাঁ।' সরু, হিলহিলে আঙুল তাক করে দরজার কোনা দেখাল বয়স্ক নাপিত। 'ওদিকে সিঁড়ি। উঠে বামে। কিন্তু ওখানে দেখার মত কিছু নেই।'

'থ্যাঙ্ক্স্,' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

'কষ্ট করে সিঁড়ি ভাঙার দরকার নেই, মিস্টার। পাবেন না ওকে ওই অফিসে।' ফ্যাকাসে মাঢ়ী দেখিয়ে আবারও হাসল বুড়ো। 'নো, স্যর।'

'তা হলে কোথায় আছে সে? তার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে আমার।'

রানার কথায় হেসে ফেলল দুই নাপিত ও ছোকরা। ভুরু কুঁচকে আয়নায় নিজেকে দেখছে খদ্দের। বিয়ার হাতে নাপিত বলল, 'পাবেন না তাকে। আমরাও চাই ও-ব্যাটার সঙ্গে কথা বলতে। এক মাসের ভাড়া বাকি ফেলে উধাও হয়েছে। দু' সপ্তাহ হলো ডুব দিয়েছে নরকের নর্দমায়।'

'তার মানে, আপনারা জানেন না সিম্পসন কোথায়?'

'মিথ্যা বলব কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। আমেরিকায় এসে প্রথমেই হোঁচট খেতে হচ্ছে ওকে। 'ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ,' বলে দরজা ঠেলে বেরোল রানা। আবারও বাজল টিং-টুং! ঘামছে গরমে। চলে গেল গাড়ির পাশে। পকেট থেকে চাবি নিয়ে খুলল ড্রাইভারের দিকের দরজা। উঠে পড়বে গাড়িতে, এমনসময় পেছনে শুনল পায়ের আওয়াজ।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। সেলুনের সেই তরুণ। এখন অ্যাপ্রন নেই। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া টি-শার্টে ছাপা: জিমি অ্যাণ্ড্রু।

‘মিস্টার,’ নিচু গলায় বলল সে। ‘একমিনিট।’ কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল দালান। ভয় পাচ্ছে, রানার সঙ্গে কথা বলছে, সেটা দেখে ফেলবে কেউ।

বোধহয় বেরিয়ে এসেছে পেছনের দরজা দিয়ে। উদ্বিগ্ন আর ভীত দেখাচ্ছে তরুণকে। যা বলবে, সেটা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

‘পিছলা পড়েছে মস্তবড় বিপদে, মিস্টার।’

‘কী ধরনের বিপদ?’

‘তা জানি না। কিন্তু খারাপ কিছু। বাধ্য হয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে।’ চুপ করে কী যেন ভাবল তরুণ, তারপর বলল, ‘সবসময় আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত পিছলা। বিপদে পড়ে ধার চাইলে তাও দিত।’

‘পিছলা বিপদে থাকলে, আমি হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারব,’ বলল রানা। ‘তুমি কি জানো, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?’

মাথা নাড়ল তরুণ। ‘তবে একজনকে চিনি, সে হয়তো জানে কোথায় আছে পিছলা।’

‘তা হলে তাকে জানাবে, পিছলাকে খুঁজছি আমি?’

আবারও একবার নাপিতের দোকান দেখল তরুণ। মুখ ফিরিয়ে মাথা দোলাল।

‘ওকে বোলো, ক্যাথি হার্বার্টের এক বন্ধু এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে। কথা বলতে চায় পিছলার সঙ্গে। খুব জরুরি। বুঝতে পেরেছ?’

‘ক্যাথি হার্বার্ট,’ বিড়বিড় করে নামটা মুখস্থ করে নিল তরুণ।

‘মেসেজ পেলে সবই বুঝবে পিছলা। এই নম্বরে ফোনে পাবে আমাকে।’ গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে কাগজ ও কলম নিয়ে ফোন নম্বর লিখে তরুণের হাতে দিল রানা। ওয়ালেট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিল বিশ ডলারের একটা নোট।

মাথা দোলাল তরুণ। পেছনের পকেটে চলে গেল নোট। ফিরে গেল দালানের পেছনে।

একঘণ্টা পর। শহরে মাঝারি মানের কোনও হোটেল খুঁজছে রানা, এমনসময় বেজে উঠল ড্যাশবোর্ডে রাখা ফোন। কল রিসিভ করল ও।

'আমি কার সঙ্গে কথা বলছি?' ঝগড়াটে, নাকি সুরে জানতে চাইল এক লোক।

লোকটার মারকুটে কণ্ঠ ভাল ঠেকল না রানার। দুই সেকেণ্ড পর জানাল, 'আমার নাম মাসুদ রানা। আপনি কে বলছেন?'

'আমি কে, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে,' তিক্ত স্বর। রানা টের পেল, ভয় পাচ্ছে ওই লোক। হাইন্সভিলের এক বার-এর ঠিকানা দিল। জায়গাটা স্যাভানা শহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। কীভাবে ওখানে পৌঁছুনো যাবে, সেজন্যে দু'চারটে ল্যাণ্ডমার্কও উল্লেখ করল। ফোন কেটে দেয়ার আগে বলল, 'হাজির হবেন ঠিক সাড়ে সাতটায়।'

অজানা জায়গায় ডেকে নেবে অচেনা কেউ, সেটা পছন্দ নয় রানার। তবে যে পেশায় আছে, প্রায়ই এই ঝুঁকি না নিয়ে উপায় থাকে না ওর।

ওই বার-এ পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, তা বুঝতে হাতঘড়ি দেখল রানা। যথেষ্ট সময় আছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে রওনা হলো ও। পেছনে পড়ছে সাদা সব পুরনো, বিশাল বাড়ি ও সুন্দর সব বাগান। রাস্তায় শীতল ছায়া দিচ্ছে প্রাচীন গাছ। একবার রাস্তার পাশে থেমে ছোট এক রেস্টুরেন্ট থেকে পর পর দুই কাপ কফি নিল রানা। ইতালির বাইরে আগে এত সুস্বাদু কফি পান করেনি। কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকল, তারপর বিল মিটিয়ে উঠল গাড়িতে। এবার গতি তুলল ষাট মাইলে।

বার-এর পার্কিং লটে ক্রাইসলার গাড়ি রেখে নেমে পড়তেই হার্ড রক মিউযিকের হুঙ্কার শুনল রানা। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকতেই মনে হলো, কানদুটো বহু দূরে কোথাও রেখে এলে হয়তো রক্ষা পেত। প্রকাণ্ড ঘরে ভাপসা গরম। ধোঁয়া, বিয়ার আর গিজগিজে মানুষের ঘামের গন্ধে কুঁচকে গেল ওর নাক। চারপাশ দেখে নিল রানা। বার কাউন্টারে ঝুলছে বিদ্রোহীদের পতাকা। নিচের অংশে কোনাকুনিভাবে রাখা দুই তলোয়ার। হাইহিল জুতো পরে নানান টেবিল লক্ষ্য করে ছুটছে ওয়েট্রেসরা। পরনে জিন্স প্যান্ট ও খোলা গলার টি-শার্ট। নিচু এক মঞ্চে রাখা ইলেকট্রিক গিটার, বেয গিটার ও ড্রাম। দু'পাশে স্পিকারের পাহাড় আর অ্যামপ্লিফায়ার। ব্যাণ্ড দল এলেই শুরু হবে কানের ওপর আরও মারাত্মক অত্যাচার।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে এগোল রানা।

ওকে ফোনে বলে দেয়া হয়েছে কোথায় যেতে হবে। একটা পিনবল মেশিন আর পে-ফোনের মাঝের দরজা দিয়ে গেলে সামনে পড়বে সিঁড়ি।

ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে উঁচু ধাপগুলো টপকে দোতলার করিডোরে উঠে এল রানা। নিচ থেকে আসছে বিকট মিউযিক। এতই জোরে যে, কাঁপছে পায়ের নিচের মেঝে। নাচ শুরু হলে দ্বিগুণ জোরে বাজবে স্পিকার। সামনে দরজা দেখে টোকা দিল রানা।

ভেতর থেকে এল মহিলা কণ্ঠ, 'ভেতরে আসুন।'

কবাট খুলে ঘরে পা রাখল রানা। এটা কোনও অফিস, তবে পরিত্যক্ত হয়েছে বহু দিন আগে। আসবাবপত্র বলতে একটা ডেস্ক ও কাঠের খটখটে চেয়ার। বইয়ের বদলে মাকড়সার ঝুল ভরা বুকশেল্ফ্। এক কোণের টবে লম্বা একটা গাছ, কবে যে শুকিয়ে ওটার প্রাণ চলে গেছে স্বর্গে

কেউ খেয়াল করেনি।

ঘরে ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট এক মেয়ে। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ। দীর্ঘ কোঁকড়া চুল। ডাই মেখে সোনালি। পায়ে হাইহিলের বুট। পরনে টাইট জিন্স প্যান্ট ও সুয়েড শার্ট। কাঁধের স্ট্র্যাপে চামড়ার ভারী হাতব্যাগ।

'ফোনে এক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি,' মেয়েটাকে বলল রানা।

'আপনি কথা বলেছেন পিছলার সঙ্গে,' কড়া সুরে বলল মেয়েটা।

'সে কোথায়?' এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'এক পা-ও এগোবে না, মিস্টার,' ধমক দিল মেয়েটা। 'যা জিজ্ঞেস করার, আমি করব।' হাতব্যাগ থেকে বের করল বিশাল এক রিভলভার। শক্ত করে ধরেছে দুই হাতে। ওটার ওজন রাখতে গিয়ে ফুলে গেছে কবজির রগ।

'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি,' বলল রানা। 'তো কী জানতে চাও তুমি?'

'কার হয়ে কাজ করো?'

'ভাবছ কেন, কারও হয়ে কাজ করি?'

'কারণ, স্টিভ বার্কলের লোক হলে প্রাণ নিয়ে বেরোতে দেব না,' কঠোর সুরে বলল মেয়েটা। মনে হলো না মিথ্যা বলছে।

'বার্কলেকে চিনি না,' বলল রানা।

'তাই?' ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল মেয়েটা। 'কোত্থেকে এসেছ?'

'এদিকের লোক নই,' বলল রানা, 'কথা বলতে চাই পিছলা সিম্পসনের সঙ্গে। ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

রিভলভার আরেকটু উঁচু করল মেয়েটা। 'খবরদার! নড়বে না!'

রিভলভারটা ভাল করে দেখল রানা।

ওটা বিশাল। সিঙ্গল অ্যাকশন। ভারী ক্যালিবারের। স্টেইনলেস স্টিলের। আলাস্কায় এই জিনিস দিয়েই গ্রিজলি ভালুক শিকার করে শিকারীরা। চেম্বারের মুখে উঁকি দিচ্ছে হলোপয়েণ্ট বুলেট। মাযলের ডায়ামিটার কমপক্ষে আধ ইঞ্চি। হালকা-পাতলা মহিলার হাতে মানাচ্ছে না ওটা। আধ হাত লম্বা ভারী নল উঁচু করে রাখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে মেয়েটা। সত্যিই যদি গুলি করে, ওটার রিকয়েলে পাটকাঠির মত ভাঙবে ওর কবজি।

'রিভলভারটা তোমার না, তাই না?' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই পিছলার?'

'কার, তাতে কী যায় আসে?' ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল মেয়েটা। 'গুলি করে ফুটো করে দিতে পারব তোমাকে। দরকার পড়লে তা-ই করব। কাজেই দূরে থাকো। যাতে দেখতে পাই, সেজন্যে সামনে রাখো হাত।'

'ওই জিনিস তোমাকে দেয়ার আগে পিছলার উচিত ছিল এর কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দেয়া, কী করা যাবে, আর কী না।' মৃদু হাসল রানা। 'ওটা কিন্তু কক্ করা নয়। গুলি করতে পারবে না।'

চট্ করে রিভলভার দেখল মেয়েটা। অবিশ্বাসের চোখে তাকাল রানার দিকে।

'ট্রিগারে টান দিয়ে দেখো,' বলল রানা। 'কিছুই হবে না। ওই যে দেখতে পাচ্ছ, ওটা হ্যামার। বুড়ো আঙুল দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আগে ওপরে তুলতে হবে ওটাকে।'

বুড়ো আঙুলে হ্যামার পেঁচিয়ে ধরল মেয়েটা।

'টেনে তোলো, দেখবে ক্লিক আওয়াজে লক হবে ওটা।'

ধাতব ক্লাঙ্ক-ক্লাঙ্ক আওয়াজে ঘুরে লক হলো পাঁচ গুলির সিলিণ্ডার।

'গুড,' বলল রানা, 'এবার গুলি করতে পারবে। কিন্তু তার আগে দু'একটা কথা শোনো। আমি স্টিভ বার্কলের

লোক নই। জানিও না ওই লোক কে। এবার, খুব সাবধানে জ্যাকেটের ভেতরে হাত ভরব। ভয় পেয়ো না। আমি নিরস্ত্র। বের করব আমার পাসপোর্ট।' সবুজ বই বের করে ডেস্কে ফেলল রানা। 'আজই স্ট্যাম্প করেছে ইউএস ইমিগ্রেশন থেকে। ফাঁদে-পড়া এই বেচারার নাম মাসুদ রানা। পাসপোর্টেও দেখবে এই একই লোকের ছবি।'

পাসপোর্ট তুলে পরখ করতে লাগল মেয়েটা। একদিকে সরে গেল রিভলভারের নল। হাসতে হাসতে অস্ত্রটা কেড়ে নিতে পারে রানা, কিন্তু মৃদু হেসে দাঁড়িয়ে থাকল।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটা। বাড়িয়ে দিল পাসপোর্ট।

'এবার বিশ্বাস করলে?' জানতে চাইল রানা।

রিভলভার নামাল মেয়েটা। কোমল হয়ে এসেছে মুখ। চোখে স্বস্তি। 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করছি, যাও।'

'তা হলে ওটা ডি-কক করো।'

'ও, হ্যাঁ। ইয়ে... তুমি করো।'

ওর কাছ থেকে অস্ত্রটা নিয়ে বুড়ো আঙুলে হ্যামার পেঁচিয়ে ধরে, ট্রিগার চেপে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল রানা ঘোড়া।

'তোমার নাম কিন্তু বলোনি,' অস্ত্র ফেরত দিল রানা।

'জলি।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, জলি।'

'জর্জিয়ায় কী কাজে এসেছ, মিস্টার রানা?'

'আমাকে রানা বলে ডাকতে পারো। ইউরোপ থেকে এসেছি ক্যাথি হার্বার্টের খোঁজে।'

'তোমাকে তো তেমন লোক বলে মনে হচ্ছে না, যে কিনা ওই বেশ্যার পেছনে ঘুরবে।'

'বিপদে পড়েছে।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ তুলল জলি। 'ও নিজেই

তো ভয়ঙ্কর বাজে আপদ।'

'বিপদে আছে পিছলাও,' বলল রানা, 'নইলে তোমার হাত-কামানের সামনে পড়তাম না।'

'সরি, সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না।'

'পিছলা এখন কোথায়?'

'স্টিভ বার্কলের ভয়ে লুকিয়ে আছে।'

'ওর ওখানে নিয়ে যাবে আমাকে?' মৃদু হাসল রানা।

একুশ

রানাকে নিয়ে রাতের আঁধারে দক্ষিণের উপকূলীয় সড়ক ধরে জ্যাকসনভিলের দিকে চলেছে জলি। কিছুক্ষণ হলো টিপটিপ করে পড়ছিল বৃষ্টি, হঠাৎ করে গাড়ির ছাতে বাজতে লাগল অসংখ্য বেতালা ড্রাম। রাস্তা হয়ে গেল পিচ্ছিল।

নীরবে কয়েক মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ করেই বলল জলি, 'উফ্, একটা ড্রিঙ্ক পেলে বাঁচতাম। এখনও কাঁপছে হাত।' রানার দিকে চেয়ে প্রথমবারের মত হাসল। 'আগে কখনও কারও দিকে অস্ত্র তাক করিনি।'

'ভালভাবেই দায়িত্ব পালন করেছ।' জ্যাকেটের পকেট থেকে ফ্লাস্ক বের করে জলির দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'স্নায়ু শান্ত রাখবে।'

ছিপি খুলে এক ঢোক আগুনে তরল গিলল জলি। 'দারুণ জিনিস তো! নাম কী?'

'ল্যাফ্রোএইগ সিঙ্গল মল্ট স্কচ, দশ বছর পুরনো।'

'ভাল জিনিস,' আরেক ঢোক খেয়ে ফ্লাস্ক ফেরত দিল

জলি। 'গ্লাভ কমপার্টমেন্টে সিগার আছে। একটা দেবে?'

গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে অবাক হলো রানা। 'হাভানা সিগার?'

'বাবার কাছ থেকে শিখেছি। চাইলে নিজেও একটা নিতে পারো।'

সিগার আছে রুপালি অ্যালিউমিনিয়াম টিউবে। দুটো সিগার বের করে আগুন ধরিয়ে একটা জলিকে দিল রানা, অন্যটা নিজের জন্যে।

কষে টান দিল মেয়েটা। মুখ থেকে বেরোল গলগল করে ধোঁয়া। 'তো, রানা, আসলে কে তুমি?'

'এমন এক লোক, যে কিনা সাহায্য করতে চায়।'

মাথা দোলাল জলি। 'অস্ত্রের ব্যাপারে অনেক কিছু জানো। সাধারণ কেউ নও।'

'পিছলা সম্বন্ধে বলো,' বলল রানা।

'দেখা হয়েছিল ল স্কুলে।'

'তুমিও তা হলে উকিল?'

মাথা নাড়ল জলি। 'পার হতে পারিনি বার একযাম। নার্ভাস হয়ে যেতাম। কয়েকবার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিই। কিছু দিন কাজ করেছিলাম পিছলার হয়ে। তবে এখন কাজ করি শহরের এক ল ফার্মে।'

'নিজে না এসে তোমাকে পাঠাল কেন?'

'কারণ, কোথাও যেতে পারবে না। দেখলেই বুঝবে কারণ।'

'কী হয়েছে ওর?'

'স্টিভ বার্কলের লোক। ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। খুনই করত, কিন্তু সেসময়ে পুলিশে ফোন করি।'

'কে এই স্টিভ বার্কলে?'

'যা বলার নিজের মুখেই বলুক পিছলা।'

'এসবের ভেতর ক্যাথি হার্বার্ট জড়িয়ে গেল কীভাবে?'

'প্রায় দু'বছর দু'জন দু'জনকে ভালবেসেছি পিছলা আর আমি,' বলল জলি। 'কিন্তু তারপর আমাদের মাঝে কাবাবের হাড্ডির মত হাজির হলো ওই ক্যাথি হার্বার্ট।'

'শুনেছি কয়েকবার এই শহরে এসেছে ক্যাথি,' বলল রানা। 'উঠত মিস মেরিয়ান ট্রুলির বাড়িতে।'

মাথা দুলিয়ে সিগারে আরেক টান দিল জলি। 'শেষবার যখন এল, মাস ছয়েক আগে, একটা বার-এ বসে মাল টানছিল পিছলা। সবসময় কোনও না কোনও বার-এ ওকে পাওয়া যেতই। ওর সঙ্গে পরিচয় হলো সুন্দরী ইংরেজ মেয়েটার সঙ্গে। ওর আকর্ষণ এড়াতে পারল না পিছলা। ওই একই কথা খাটে ক্যাথির ব্যাপারেও। চার আনা পয়সাও নেই পিছলার। কিন্তু সবসময় হাসিখুশি। ওটাই ওর আকর্ষণ।' গম্ভীর হয়ে গেল জলি। একটু পর মৃদু হাসল। 'পিছলার অফিসে একবার দেখা হলো ক্যাথির সঙ্গে। পিছলা বলল, মেয়েটা এসেছে ব্যবসায়িক চুক্তি করতে। বদমাশটা চেপে গেছে যে প্রতিদিন দু'জন মিলে স্বর্গ থেকে ঘুরে আসছে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর বুঝে গেলাম সবই। প্রতি রাতে অনেক দেরি করে ফিরত পিছলা।' জানালা নামিয়ে ছাই ঝাড়ল জলি। 'দোষ অস্বীকার করেনি পিছলা। তখনই ওকে ছেড়ে চলে গেলাম। জানিয়ে দিলাম, জীবনেও আর ওর মুখ দেখব না। চুকে গেছে সব। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় ফোন দিল পিছলা। বলতে লাগল, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। যদি সত্যি ওকে ছেড়ে চলে যাই, যে-কোনও দিন আত্মহত্যা করবে। ফোনে মেসেজ দিতে লাগল। কাঁদতে লাগল ল্যাংড়া কুকুরের মত।'

'আত্মহত্যা করবে ওর ওই মস্তবড় রিভলভার দিয়ে?'

'উড়ে যেত ওর অর্ধেক।'

'তা ঠিক।'

'যাই হোক, এক রাতে মুখোমুখি হতে গেলাম পিছলার অফিসে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, শুনতে পেলাম আর্তনাদ আর

হাউমাউ কান্না। তারা তিনজন ছিল। পিটিয়ে পিছলার পিছলা হলুদ গু বের করে দিয়েছিল। কী করি, ফোন দিলাম পুলিশে। কাছেই ছিল একটা প্যাট্রল কার। মাত্র তিন মিনিটে পৌঁছে গেল দুই অফিসার। কিন্তু আগেই সাইরেন শুনেছে ওই তিন গুণ্ডা, পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে উধাও হলো তারা। বেদম পিট্টি দিয়ে বাজে অবস্থা করে ফেলেছিল পিছলার।'

'কবের কথা?'

'হবে দু'সপ্তাহ,' বলল জলি। 'পিছলা ভাবছে, আবারও ওকে খুঁজে বের করবে স্টিভ বার্কলে। তাই সাহস নেই যে কোনও হাসপাতালে যাবে। অথচ, খুব জরুরি ওর চিকিৎসা নেয়া।'

'পিছলার সেবা করছ, তাই না?'

'পাহারাদার কুত্তার মত চোখ রেখেছি। আবার বলতে পারো নার্স আর কাজের বুয়াও। সব মিলেই জলি।'

'তার মানে, ক্যাথি আর পিছলার মধ্যে চুক্তি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, চুক্তি হয়েছিল,' গম্ভীর হয়ে গেল জলি। 'আর ওই জন্যেই আজ পিছলার এই হাল।'

'কীসের চুক্তি করেছিল?'

'যা বলার পিছলাই বলবে। গোপন করবে না কিছু। একটু পর ওখানে পৌঁছুব আমরা।'

মাইল খানেক যাওয়ার পর হাইওয়ে ছেড়ে কাঁচা, সরু এক অন্ধকার রাস্তায় নামল জলি। অতিরিক্ত জোরে চালাচ্ছে গাড়ি। বামে গেল কাদামাখা পথ। সামনেই পড়ল মোটেলের প্রায় ধসে যাওয়া সাইনবোর্ড। বৃষ্টির পানিতে প্যাচ-প্যাচ করছে চারপাশ। গাড়ি ঢুকল মাটির উঁচু এক উঠানে। হেডলাইটের আলোয় রানা দেখল দীর্ঘ সব ঘাস। একপাশে উপচে যাওয়া গার্বেজ ব্যারেল, ভাঙা আসবাবপত্র ও চ্যাপ্টা অজস্র বিয়ারের ক্যান। মোটেলের ছাত নিচু। মেরামত করা জরুরি। থেমে গেছে বৃষ্টি। উঁচু বারান্দার মাথায় পোকা ভরা

হলদে নিয়ন বাতি।

বাঁক নিয়ে পুরনো এক পিকআপ ট্রাকের পাশে থেমে ইঞ্জিন বন্ধ করল জলি। ইশারা করে নেমে পড়ল।

তারের খাঁচা থেকে হুঙ্কার ছাড়ল বাঘের মত দুটো ডোবারম্যান কুকুর। পেছনের পায়ে ভর করে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে দরজার ওপর।

'পিছলার নতুন বাড়ি,' বলল জলি।

কয়েকটা ঘরের জানালায় জ্বলছে বাতি। কোথাও থেকে আসছে টিভির অস্পষ্ট আওয়াজ। প্রাণপণে ঘেউ-ঘেউ করছে কুকুরদুটো। ওই হুঙ্কার থামাতে দূর থেকে বাজখাঁই ধমক দিল মাতাল কেউ।

রানাকে পথ দেখিয়ে নয় নম্বর রুমের সামনে থামল জলি। পুরনো হার্ডবোর্ডের দরজা, উঠে আসছে চল্টা। জোরে নক করল জলি। 'আমি! জলি!' ব্যাগ হাতড়ে বের করল দরজার চাবি, তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঘর অন্ধকার। বাতাসে ভাসছে অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। জানালার পর্দা টেনে বাতি জ্বালল মেয়েটা।

ঘুমের ঘোরে পড়ে ছিল পিছলা সিম্পসন, ঝাঁকি খেয়ে মাথা তুলল। চোখ পিটপিট করছে আলোয়।

বয়স ত্রিশ, জলির চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। কিছু দিন আগেও সুদর্শন ছিল। মার খেয়ে এখন লাল, হলদে ও বেগুনি সব দাগ মুখে। ভুরুর সঙ্গে সেঁটে আছে নোংরা, ঘর্মাক্ত, কালো চুল। পরনে ডেনিম শার্ট, বগলে ঘামের হলদেটে দাগ। লোকটা বসে আছে আর্ম চেয়ারে। বেরিয়ে এসেছে গদির বেশিরভাগ অংশ। পা-দুটো সোজা করে সামনের এক টুলের ওপর রেখেছে পিছলা। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত প্লাস্টার করা। চোখ রানার ওপর। দৃষ্টিতে ব্যথা ও ভয়। কোলে মসবার্গ পাম্প শটগান। নার্ভাস হয়ে ওটা ওপরে তুলতে গেল সে।

‘ভয় নেই, পিছলা,’ বলল জলি, ‘বার্কলের লোক নয় এ।’

‘চেয়ার টেনে বসুন,’ রানাকে বলল পিছলা। ‘খুলে বলুন কী জানতে চান।’

‘কয়েকটা বিয়ার নিয়ে আসছি,’ বলল জলি। ‘তোমরা আলাপ করো।’ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও।

পুরো একমিনিট নীরবতায় বসে থাকল রানা ও পিছলা সিম্পসন। তারপর মুখ খুলল রানা, ‘সরাসরি কাজের কথায় আসি। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ক্যাথি হার্বার্টকে। বারো দিন আগে হারিয়ে যায় গ্রিসের কোর্ফিউ দ্বীপ থেকে। ওকে খুঁজে বের করা আমার কাজ। ধারণা করছি, ওকে খোঁজার বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন আপনি।’

‘জানতাম, শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়বেই ও মেয়ে,’ বলল পিছলা। ‘আমারও মুখ খুলিয়ে ছেড়েছে।’

‘কারা তারা?’ জানতে চাইল রানা।

‘সর্বনাশ করে দিয়েছে আমার,’ গুঙিয়ে উঠল পিছলা। ‘গুঁড়ো করে দিয়েছে হাড়। বুঝতেই তো পারছেন।’

‘আমি হয়তো আপনার সাহায্যে আসতে পারব,’ বলল রানা।

‘তা জানি না। তবে যারা এই অবস্থা করেছে, তারা পেলে আপনার একটা হাড়ও আস্ত রাখবে না।’ চোয়াল ঘষল পিছলা। পুরো একমিনিট পর বলল, ‘আপনি আসলে আমার কাছে কী জানতে চান?’

‘প্রথম থেকে বললে সুবিধা হবে আমার,’ বলল রানা। ‘ক্যাথি আর আপনার চুক্তি থেকে শুরু করুন। বাদ দেবেন না স্টিভ বার্কলের বিষয়ে কিছু। পরিচিত হয়ে উঠছে ওই নাম। কে তিনি?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিছলা উকিল। ‘দিন দেখি ওটা।’ টেবিলে রাখা জ্যাক ডেনিয়েল্‌স্ বুর্বোনের বোতল তার দিকে

বাড়িয়ে দিল রানা। ওটা নিয়ে ছিপি খুলে ঢক-ঢক করে দুই ঢোক গিলল সিম্পসন। আস্তিনে মুছল মুখ। 'একেবারে প্রথম থেকে বলছি। আগে বলুন, আপনার জানা আছে মিস মেরিয়ান ট্রুলি কে?'

মাথা দোলাল রানা।

'তা হলে তো ভাল করেই জানেন, আমেরিকায় এলে ওই মহিলার বাড়িতেই ওঠে ক্যাথি। ওই এলাকার একটা বার-এ পরিচয় হয়েছিল ওর সঙ্গে আমার।'

'তা জেনেছি।'

অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল পিছলা। পায়ের ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ। 'মিস ট্রুলি আর ক্যাথির সম্পর্ক খুব ভাল। অন্তত তাই মনে করেন মিস ট্রুলি। তবে মহিলার টাকার লোভেই তাঁর সঙ্গে মিশত ওই মেয়ে। বারবার বলত, টাকা থাকলে এটা কিনতাম, ওটা কিনতাম... ইত্যাদি। মনে মনে আশা করত, ওর কথা শুনে খুশিমনে চেক বইয়ের পাতায় বড় অঙ্কের টাকার অঙ্ক লিখবেন তিনি। আসলে সহজে এমন বান্ধবী পাওয়া কঠিন, যার কিনা আছে দুই বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি। চিরকাল চেয়েছেন কোল জুড়ে বাচ্চা আসুক। কিন্তু পছন্দমত কাউকে পাননি বলে জীবনটা পার করে দিয়েছেন একা। ক্যাথিকে পেয়ে ভাল লেগেছিল তাঁর। এদিকে ওই বিশাল অঙ্কের টাকা পাওয়ার নেশা পেয়ে বসেছিল ক্যাথিকে।'

'ঠিক ভালভাবে চিনি না ওকে,' বলল রানা। 'শেষবার ওকে দেখেছি পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে।'

আরেক ঢোক বুর্বোন নিল উকিল। 'ক্যাথির ধারণা হয়েছিল, মহিলার কাছ থেকে পাবে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু তখনই হঠাৎ করে কোথা থেকে হাজির হলো স্টিভ বার্কলে।' গাল কুঁচকে ফেলল উকিল। রানার মনে হলো, এইমাত্র গাছ থেকে পেড়ে কাঁচা করলা চিবুতে শুরু করেছে পিছলা। 'আগে

কখনও শোনেননি স্টিভ বার্কলের নাম?'

'আমার কি শোনার কথা?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'বেস্টসেলার অথোর। টেলিভেনজেলিস্ট। আগামী নির্বাচনে জিতলে হবে স্টেট গভর্নর। কিছু দিন হলো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মিস ট্রুলির। মহিলার ধারণা, স্টিভ বার্কলের পাছা থেকে ঝরে সূর্যের সোনালি রোদ। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন ঈশ্বর আর যিশুর ওপর। ধর্মের সঙ্গে জড়িত দাতব্য সব প্রতিষ্ঠানে দেন মোটা অঙ্কের টাকা। তাঁর মাথা মুড়িয়ে খাচ্ছে লোকটা। এমন ভাব নিচ্ছে, যেন সে বাস্তব এক সন্ত। তাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন মহিলা। ছয় মাস আগে মিস ট্রুলির বাড়িতে বেড়াতে এল ক্যাথি। তখনই মহিলা খুলে বললেন, কী পরিকল্পনা করেছেন তিনি। শত শত কোটি ডলার দেবেন স্টিভ বার্কলের সংগঠনকে। হাজার হাজার নয়, কোটি কোটি ডলার!'

'শুনে দেখি কত?'

'নয় অঙ্কের।'

'এক শ' মিলিয়ন ডলার,' বলল রানা।

মাথা দোলাল পিছলা। 'ঠিকই ধরেছেন। ওটা কিছুই না মিস ট্রুলির কাছে। ম্যাচিউর হবে বলেই বেশকিছু ইনভেস্টমেণ্ট আর বণ্ড থেকে আসছে ওই টাকা। সেজন্যে ঘণ্টায় পাঁচ শ' ডলার করে নেয় এমন কয়েকজন উকিল কাজ করছে মিস ট্রুলির হয়ে। যে-কোনও দিন ওই অঙ্কের নগদ টাকা পেতে পারেন মহিলা। এই মাসে বা আগামী মাসের শুরুর দিকেই সব চলে আসবে বার্কলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে।'

'ক্যাথি যখন এ খবর জানল, ভাল লাগল না ওর,' মন্তব্য করল রানা।

'তা তো বটেই,' মাথা দোলাল পিছলা। 'বৃদ্ধা মহিলার বাড়িতে একবার দেখাও হলো ওর সঙ্গে বার্কলের। ক্যাথির মনে হয়েছে, ওই লোক ভীষণ চতুর এক বাটপার, ঠগ।

ভাবতেও পারেনি ওকে না দিয়ে ওই বদমাশকে টাকা দেবেন মিস ট্রুলি। বারবার মহিলাকে সতর্ক করতে লাগল ক্যাথি। ভাবতে লাগল, ওর বিরুদ্ধে তাঁর কানে খারাপ কথা তুলেছে ওই লোক।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল রানা। অপেক্ষা করছে চুপচাপ।

'পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন?' বলল পিছলা। 'বারবার স্টিভ বার্কলের প্রশংসা করেন মিস ট্রুলি, তাতে মাথা খারাপ হওয়ার দশা ক্যাথির। তিক্ত মনে ফিরল ইংল্যাণ্ডে। তারপর বেশকিছু দিন আমাদের যোগাযোগ ছিল না। নিজের ঝামেলায় বাঁচি না, ওর খোঁজ রাখা দূরের কথা। জলি বোধহয় খানিকটা বলেছে আপনাকে। যাই হোক, কয়েক সপ্তাহ আগে আবারও ফোন করল ক্যাথি। উঠান ভরা পাকা ফসল পাওয়া পায়রার মত উত্তেজিত হয়ে বাক-বাকুম করছিল। তুরস্কের এক খনন এলাকায় নাকি পেয়েছে দারুণ কী যেন। ওটার কারণে স্টিভ বার্কলের কাছ থেকে আদায় করবে লাখ লাখ ডলার। জানাল, ফাঁদে পড়ে গেছে লোকটা। ক্যাথি এমন ব্যবস্থা করবে, লেজ গুটিয়ে ওর কথা মত চলতে হবে তাকে। ওর দাবি অনুযায়ী সুড়সুড় করে দেবে টাকা। তাতে নেই কোনও ঝুঁকি।' নাক দিয়ে বিদঘুটে ঘোঁৎ আওয়াজ বের করে, তিক্ত চোখে প্লাস্টার করা দুই ঠ্যাং দেখল পিছলা।

'তার মানে, স্টিভ বার্কলেকে ব্ল্যাকমেইল করছিল ক্যাথি,' বলল রানা। 'কিন্তু কীসের ভয় দেখিয়ে চাপ দিচ্ছিল?'

আধখালি উইস্কির বোতল এদিক-ওদিক নাড়ছে পিছলা। 'সত্যি বলতে, তা আমি জানি না। বিস্তারিত কিছু বলেনি আমাকে ক্যাথি। নোংরা কিছু হবে। হয়তো যৌন কোনও বিষয়। কে জানে! ঘটনা যা-ই হোক, কাজে লেগেছিল। গ্রিস থেকে ফোন করে ক্যাথি। একটা প্রস্তাব দেয় বার্কলেকে।

চেয়েছিল বেশ কিছু টাকা। ক্যাথি জানত, এখনও এক শ' মিলিয়ন ডলার হাতে পায়নি বার্কলে। তাই সহজ কিস্তি দিতে বলে। আপাতত পঁচিশ হাজার ডলার দিলেই হবে। পাঁচ হাজার ছিল আমার ফি। সেজন্যে বার্কলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে একটা বাক্স।'

'বাক্স?'

'হ্যাঁ, বাক্স। ছোট। কার্ডবোর্ডের। আকারে এমন।' ছয় ইঞ্চি চৌকো জায়গা দেখাল পিছলা। 'হালকা। জানি না ওটার ভেতরে কী ছিল। জানবই বা কী করে। তবে নাড়লে ভেতরে ঢব-ঢব আওয়াজ হয়েছিল।'

তার মানে, ওটা ফোটোগ্রাফ নয়, ভাবল রানা। বোধহয় সেক্সের কোনও ব্যাপারে ব্ল্যাকমেইল করা হয়নি।

'স্টিভ বার্কলে ওই বাক্স নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঘরে,' বলল পিছলা। 'দাঁড়িয়ে থাকলাম বাইরে। ফড়-ফড় শব্দ করে ছিঁড়ে ভেতরের জিনিস বের করল লোকটা। খুব তাড়া ছিল তার। ভেতরে যা-ই থাকুক, ওটার কারণে কেমন দমে গেল সে। তিরিশ মাইল দৌড়ালে যেমন ঘাম হবে, সেভাবে এল ঘামতে ঘামতে। বলল, পরদিন যেন আবার তার অফিসে যাই। গেলাম পরদিন সকালেই। আমার হাতে তুলে দিল নগদ পঁচিশ হাজার ডলার। আমার ভাগ রেখে বাকিটা পাঠিয়ে দিলাম গ্রিসে ক্যাথির ঠিকানায়।'

হঠাৎ দামি হোটেল বা ভিলাতে পার্টি দেয়ার টাকা কোথায় পেল মেয়েটা, বুঝতে পেরেছে রানা। 'আরও টাকা দাবি করল ক্যাথি, তাই না?' জানতে চাইল।

'ক্যাথি জানিয়ে দিয়েছিল, বার্কলে এক শ' মিলিয়ন হাতে পেলেই দেরি না করে তাকে দিতে হবে দশ মিলিয়ন ডলার। নইলে ফাঁস করে দেবে সব। আমি পাব দশ পার্সেন্ট। সেজন্যে কিছুই করতে হবে না আমাকে। বলতে পারেন হ্যাণ্ডলিং ফি। কথা থেকে মনে হয়েছিল, ওই চুক্তি মেনে

নিয়েছে বার্কলে। নিজের কপাল দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আরে, ভাই, এটাই তো বেশিরভাগ উকিলের জীবনের স্বপ্ন। এমন এক দাঁও মারবে, পরের চোদ্দ গুষ্ঠির জন্যে আদায় করে নেবে কোটি কোটি টাকা। সব প্ল্যান করে ফেললাম। ইঁদুরের গর্তে আর থাকব না। অভিজাত এলাকায় অফিস নেব। বাকি জীবনে আর কোনও অন্যায় করব না।' আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিছলা উকিল। 'কিন্তু কথা পাল্টে ফেলল লোকটা।'

'সে রাতে পিটিয়ে আপনার নলি ভাঙতে এল তিন লোক।'

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল সিম্পসন। 'গত কয়েক দিন ধরেই মনে হচ্ছিল, কে বা কারা যেন অনুসরণ করছে আমাকে। দেখিনি কাউকে। কেমন খারাপ অনুভূতি হতো। তখন থেকেই রিভলভার সঙ্গে রাখলাম। তারপর অফিসে গভীর এক রাতে ডেস্কে বসে কাজ করছি, জানতেও পারলাম না ওরা গোপনে এসেছে। হঠাৎ চেয়ার থেকে টেনে মেঝেতে ফেলে দিল তারা। কানের ফুটোয় গুঁজে দিল পিস্তলের নল। আমার পাছায় কষে লাথি দিয়ে একজন বলল, "ওটা কোথায়? কই!" কী বলছে তাই তো বুঝতে পারলাম না। তারপর জানতে চাইল, কোথায় আছে ক্যাথি হার্বার্ট।'

'বলে দিলেন।'

'প্রথমে বলিনি,' মাথা নাড়ল পিছলা। 'আগেও মাঝে মাঝে পিট্টি খেয়েছি বাজে মক্কেলের হাতে। আমি তো আর মুরগি না। সব মেনে নিয়েই বেশ স্বাভাবিকভাবে চুপচাপ পিট্টি খাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, একটু পর হাল ছেড়ে পোঁদে আরও দুটো লাথি দিয়ে বিদায় নেবে। কিন্তু... তখনই ব্যাগ থেকে বের করল ওগুলো। কী ভয়ানক দেখতে হাতুড়ি! তিন নম্বর লোকটা পিস্তল ধরল মাথার পাশে। অন্য দু'জনের একজন চেপে ধরল ডান পা। অন্যজন পাগল হয়ে উঠল আমার পা ভাঙতে। গোটা কয়েক বাড়িতে দুই পা ভেঙে

যেতে আমার আর উপায় থাকল না মুখ না খুলে। বলে দিলাম সব। আরে, ভাই, আমার বদলে আপনি হলেও একই কাজ করতেন।'

'আপনাকে কখনও কোনও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কিছু বলেছে ক্যাথি?' জানতে চাইল রানা।

অবাক চোখে ওকে দেখল পিছলা। 'কী ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী? ওই যে যারা বাটপারি করছে নক্ষত্র দেখিয়ে?'

'ক্যাথি বিবলিকাল আর্কিওলজিস্ট, হয়তো বাইবেলের কোনও ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে,' বলল রানা। 'একজনকে বলেছে, ওই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক টাকা।'

'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না,' মাথা নাড়ল পিছলা। 'বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে কী করে টাকা পাবে? তবে এটা জানি, কোনওভাবে বাগে পেয়ে গিয়েছিল বার্কলেকে।'

'বাদ দিন,' বলল রানা। 'বিষয়টা জরুরি না।'

টোকা না দিয়েই দরজা খুলল কে যেন। আর্ম চেয়ারে প্রায় লাফিয়ে উঠল পিছলা। খপ্ করে তুলে নিয়ে দরজার দিকে তাক করল বন্দুক। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, বিপদ হবে না। বন্দুক রেখে আবারও এলিয়ে পড়ল চেয়ারের পিঠে।

দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকল জলি। ওর হাতে ছয় ক্যান বিয়ার। নামিয়ে রাখল বিছানায়। নরম সুরে পিছলাকে বলল, 'সময় হয়েছে বড়ি খাওয়ার।'

দুঃখিত চেহারায় মাথা দোলাল উকিল। 'মিস্টার রানা, আমার আর কিছু বলার নেই। জলি যদি না থাকত, আজ আপনার সঙ্গে এসব কথাই হতো না।'

চেয়ারের পাশে থেমে পিছলার কাঁধে আলতো করে হাত রাখল জলি। অন্যহাতে মুছল ওর চোখের অশ্রু। মেয়েটার বাহুতে মৃদু হাত বোলাচ্ছে ওর প্রেমিক। রানা টের পেল, দু'জনের ভেতর রাগ-দুঃখ-ক্ষোভ সবই আছে, কিন্তু সব

ছাপিয়ে আছে গভীর ভালবাসা।

'চাইনি আজ ওখানে গিয়ে বিপদে পড়ুক জলি,' বলল পিছলা। 'খুব জোর করল ও। খুব সাহসী মেয়ে।'

'এবার কী করবেন ভাবছেন?' জানতে চাইল রানা।

'ফকির এক পঙ্গু উকিল আর কী করবে? শেষ হয়ে গেছি আমি।'

'চিকিৎসা না করিয়ে পড়ে থাকতে পারবেন না এখানে।'

'আগে আমার কথা ভুলে যাক বার্কলে, নইলে বেরোতে পারব না। অথবা, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাব এখানেই। বাড়ি ফিরতে পারব না। কোথাও যাওয়ার নেই আমার। ওরা যদি খুঁজে পেয়ে যায়, খুন করবে আমাকে। তার চেয়ে মদ গিলে মরে যাওয়া অনেক ভাল।' চট্ করে জলিকে দেখল পিছলা উকিল। ওর দিকে চেয়ে হাসছে মেয়েটা। চোখে অশ্রু। 'আমি আর কী বলব?' করুণ হাসল পিছলা। 'যেদিন ক্যাথি হার্বার্টের সঙ্গে দেখা হলো, সেদিন থেকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি কপাল। হারিয়ে বসেছি সব। সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন, দুনিয়ার সেরা মেয়েটাকেও হারিয়ে ফেলেছি আমি নিজের দোষে।'

'আমি তো মাফ করে দিয়েছি তোমাকে,' ফিসফিস করে বলল জলি। চুমু দিল পিছলার ঘর্মাক্ত কপালে।

ঘুরে রানার দিকে তাকাল পিছলা। 'এবার কী করবেন?'

'দেখা করব মিস ট্রুলির সঙ্গে,' বলল রানা।

'তাঁর ফোনের নম্বর আছে আমার কাছে,' বলল পিছলা।

'গুড। মহিলার সঙ্গে আলাপের পর কথা বলব স্টিভ বার্কলের সঙ্গে।' ওয়ালেট বের করে একহাজার ডলার পিছলার হাতে দিল রানা। 'রাখুন।'

'এত টাকা কীসের জন্যে?' জানতে চাইল জলি।

'আমি নেব পিছলার রিভলভারটা। কেন যেন মনে হচ্ছে, কাজে লাগবে ওটা।'

বাইশ

প্রায় মাঝরাতে গাড়িতে করে হাইন্সভিলে রানাকে পৌঁছে দিল জলি। হ্যাণ্ডশেক করে আন্তরিক হেসে বিদায় নিল। বৃষ্টির রাত, মেয়েটার গাড়ির ব্যাকলাইট দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখল রানা, তারপর উঠে পড়ল ক্রাইসলার গাড়িতে। ফিরতি পথে রওনা হলো স্যাভানা লক্ষ্য করে। সিটের পেছনে ক্যানভাস ব্যাগে ঘুমিয়ে আছে পিছলার ফ্রিডম আর্মস্ .৪৭৫ লাইনবাউ হান্টিং রিভলভার ও এক বাক্স হলোপয়েন্ট কার্তুজ।

স্যাভানা শহরের কেন্দ্রে পৌঁছে সাধারণ মানের এক হোটেলে উঠল রানা। ডিনার সেরে নিজের ঘরে ফিরে বসল জানালার সামনে। একটু দূরে কুচকুচে কালো স্যাভানা নদী, তার বুকে নৌকায় জ্বলছে বাতি।

ভীষণ পরিশ্রান্ত রানা, অথচ ঘুম আসছে না। আনমনে ভাবছে গত কয়েক দিনের কথা।

গ্রিসে সব ছিল অস্পষ্ট। এখন তা হয়ে গেছে আরও ঘোলাটে। বেড়ে গেছে ঝুঁকির পরিমাণ। নোংরা হয়েছে দৃশ্যপট। একেকটা টুকরো জোড়া দিতে গিয়ে বুঝতে পারছে, সম্ভাবনা খুব কম যে এখনও বেঁচে আছে ক্যাথি।

রানা এখন জানে সেই ক্ষমতাশালী লোকটার নাম, যে কিনা হুমকির মুখে পড়েছিল বলে নিয়েছে কঠোর ব্যবস্থা। এক শ' মিলিয়ন বিশাল অঙ্কের অর্থ। তার ওপর জর্জিয়ার গভর্নর হলে আর কী চাই! এখানেই থামতে হবে, এমনও নয়। ভবিষ্যতে ওই লোক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে না,

তাই বা কে বলতে পারে!

এখন পরিষ্কার, কেন ক্যাথির অ্যাড্রেস বুকে ছিল স্টিভ বার্কলের নাম। কীভাবে এবং কেন তাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল ক্যাথি, সে রহস্য এখনও জানা যায়নি। কিন্তু একটা কথা ঠিক: অনেক বেশি চেয়ে বসেছিল মেয়েটা। দশ মিলিয়ন ডলার দেয়ার ইচ্ছে ছিল না লোকটার। কাজেই বেঁকে বসেছে। তার দিক থেকে দেখলে, বিশেষ কোনও কারণ নেই ক্যাথিকে বিশ্বাস করবার। হয়তো দিয়েই দিল দশ মিলিয়ন ডলার। তারপর? আবারও চাপ দেয়া হবে না, এমন কথা দিচ্ছে কে? হয়তো দশ বছর পর আরও দশ মিলিয়ন ডলার চাইবে ক্যাথি। ফতুর করে ছাড়বে তাকে। একবার মানুষের লবণাক্ত মাংসের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত মুখিয়ে থাকত ক্যাথি।

এই চরম হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়, চিরকালের জন্যে ক্যাথি হার্বার্টকে বিদায় করে দেয়া। চুকে যাবে সব ঝামেলা। স্বাভাবিকভাবেই ওর প্রাণের চেয়ে দশ মিলিয়ন ডলারকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করবে বার্কলে।

বাকি থাকে পিছলা উকিল। বার্কলে জানে, ছেঁড়া সুতোর আরেক প্রান্ত সে। প্রথমবার খতম করতে পারেনি তার লোক। কিন্তু আগে হোক বা পরে, পিছলাকে বাগে পাবে তারা। এ কথা পিছলাও জানে। যারা মুখ খুলতে পারে, এমন কাউকে বাঁচতে দেবে কেন বার্কলে? প্রথমে চিরকালের জন্যে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে থ্যানাটসের। তারপর মউরোসের।

সব পরিষ্কার হয়ে উঠছে রানার কাছে।

এখন স্টিভ বার্কলেকে শেষ না করলে, আসবে ওর ওপর হামলা। সেক্ষেত্রে প্রাণে বাঁচবে, এমনও নয়। এক শ' মিলিয়ন ডলারের হাজারভাগের মাত্র এক ভাগ দিয়েই নামকরা সব খুনি ভাড়া করতে পারবে ওই লোক।

কালো নদীর দিকে চেয়ে চুপচাপ ভাবছে রানা।

ওর মনে পড়ল জন হার্বার্ট ও তাঁর স্ত্রীর কথা। তাঁদেরকে কোন্ মুখে বলবে, ধরে নিন, মারা গেছে আপনাদের মেয়ে!

চিন্তার জট দূরে সরাতে চাইল রানা। এসব ভাববে পরে। প্রথম কাজ হওয়া উচিত স্টিভ বার্কলের কাছে পৌঁছুনো।

পরদিন ভোর এল আগুনের মত তাপ ও আলো নিয়ে। নাস্তা সেরে সকাল নয়টায় পিছলা উকিলের দেয়া নম্বরে মিস ট্রুলির বাড়িতে ফোন দিল রানা।

কবরের গভীর থেকে যেন এল এক গম্ভীর কণ্ঠ: 'এটা মিস ট্রুলির বাড়ি।'

রানা ব্যাখ্যা দিল: ও হার্বার্ট পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাওয়ার পথে স্যাভানা শহরে থেমেছে। একবার দেখা করবে মিস ট্রুলির সঙ্গে।

এই কথায় নরকের ফেরেশতার মত গমগমে কণ্ঠে রানাকে অপেক্ষা করতে বলল ওই লোক।

কিছুক্ষণ পর ফোনে এলেন মেরিয়ান ট্রুলি। তাঁর দু'এক কথা শুনেই তাঁকে পছন্দ করে ফেলল রানা। শক্ত চিত্তের মানুষ তিনি। অথচ বুকে বইছে সবার জন্যে ভালবাসার ফল্গুধারা। জানালেন, খুব খুশি হয়েছেন যে হার্বার্ট পরিবারের এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, রানার কি সময় হবে তাঁর সঙ্গে একটু কফি খাওয়ার? খুব খুশি হবেন সকাল এগারোটার পর ট্রুলি ভবনে এলে।

বাকি সময় পুরনো শহরটা ঘুরে দেখল রানা। কিনল সাধারণ কিন্তু রুচিশীল কিছু পোশাক। হোটেলে ফিরে পাল্টে নিল বাসি জামা। ওর পরনে থাকল কালো জিন্স, সাদা শার্ট ও কালো জ্যাকেট। ক্রাইসলার চালিয়ে হাজির হলো মিস ট্রুলির বাড়িতে।

সাধারণ বাড়ি নয়, রাস্তা থেকে দেখা যায় না কলোনিয়াল আমলের বিশাল ম্যানশন। চারপাশের বাগানে ফুটেছে

হাজারো ফুল। ফলের গাছও কম নেই। গাড়ি রেখে ম্যানশনের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল বাজাল রানা। হাসি-হাসি মুখে দরজা খুলল এক লোক। তাকে দেখলে যে-কেউ ভাববে সে চড়ুই পাখির খালাত ভাই। কিন্তু গলা তার ভীষণ গম্ভীর। এই লোকই ধরেছিল রানার ফোন। হাতের ইশারায় ওকে বাড়িতে ঢুকতে বলল সে।

ছক কাটা মার্বেলের মেঝের চওড়া এক এণ্ট্র্যান্স হলে পা রাখল রানা। দেয়ালে দেয়ালে সোনারঙ ফ্রেমে বাঁধানো সব পোর্ট্রেট।

'আপনার ব্যাগটা সরিয়ে রাখতে পারি?' জানতে চাইল ইংলিশ বাটলার।

'আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গেই থাকুক,' বলল রানা।

সকাল এগারোটা বাজে, ঢং-ঢং করে জানিয়ে দিল এক গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়ি। রানাকে ড্রইংরুমের দরজায় নিয়ে এল বাটলার। নক করল একবার। তারপর খুলল দরজা। সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইনি মিস্টার রানা। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ম্যাম।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে রানার দিকে এগিয়ে এলেন মিস মেরিয়ান ট্রুলি। চেহারায় আভিজাত্য। টানটান মেরুদণ্ড। বয়স পঁচাত্তর থেকে আশি। তবুও সুন্দরী। ত্বকে ভাঁজ পড়েনি। মিষ্টি হাসি। দাঁত নিখুঁত। মাথাভরা চুল রুপালি। পরনে নামকরা দর্জির তৈরি সিল্কের ব্লাউয ও কালো স্কার্ট। এখানে-ওখানে শোভা পাচ্ছে দামি মুক্তো। হাত বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। জানালা দিয়ে আসা রোদে ঝিলিক দিল হীরার আঙটি। ওটার দাম কমপক্ষে দুই লাখ ডলার।

'খুব খুশি হলাম পরিচিত হতে পারে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'দয়া করে আমাকে রানা বলেই ডাকবেন।'

'রানা। সুন্দর নাম।'

'ওই নামেই ডাকে পরিচিতরা।'

হাতের ইশারায় রানাকে আরামদায়ক সোফা দেখালেন মিস ট্রুলি। একবার তাকালেন বাটলারের দিকে। চড়ুই পাখি চলে গেল কফি আনতে। নিজে মহিলা বসলেন ষোলোতম লুই-এর আমলের এক সেটিতে। ওটার নিচে শুয়ে আছে ছোট এক সাদা পিকিনিজ কুকুর। সন্দেহের চোখে রানাকে দেখে ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলল ওটা।

'আপনার বাড়িটা চমৎকার,' বলল রানা।

'বলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। এই বাড়ি আছে আমাদের পরিবারে স্বাধীনতার আগে থেকে।' মিষ্টি হাসলেন মহিলা। 'তা হলে আপনি হার্বার্ট পরিবারের বন্ধু?' তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন রানাকে।

মৃদু মাথা দোলাল ও। 'তাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাকে।'

'ভাল মানুষ তাঁরা,' বললেন মেরিয়ান ট্রুলি, 'অক্সফোর্ড শহরটাও চমৎকার। আগামী আগস্টে হয়তো আবারও ওখানে যাব গ্রীষ্মকালীন স্কুলে পড়াতে।'

'শুনেছি আর্কিওলজির বিষয়ে খুব আগ্রহ আপনার।'

'কথা ঠিক,' বললেন মিস ট্রুলি। 'ওই জন্যেই পরিচয় হয় ক্যাথির সঙ্গে। খুব প্রতিভাশালী মেয়ে। বুদ্ধিও তেমন। তবে একটু মাথা গরম। এতটা পাগলামি না করাই ভাল।'

'প্রায় সবাই ওই একই কথা বলে ওর ব্যাপারে।'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ওর?'

'যখন এতবড় ছিল,' মেঝে থেকে তিন ফুট ওপরে হাত তুলে দেখাল রানা।

মুচকি হাসলেন মহিলা। 'তার মানে, আপনাকে কখনও প্রেমিক হিসেবে নেয়নি ক্যাথি?'

'না। পরে জেনেছি, দারুণ সুন্দরী হয়েছে ও।'

চুপ হয়ে গেছেন মেরিয়ান ট্রুলি।

রানা টের পেল, মহিলার চোখে কীসের এক স্বস্তি।

'কী পেশায় আছেন আপনি, মিস্টার রানা?'

'ছোটখাট একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাই।'

'বাহ্, গুড! উপকার করছেন মানুষের।' আবারও মিষ্টি হাসলেন মিস ট্রুলি। 'তো, উঠেছেন কোথায়?'

হোটেলের নাম জানাল রানা।

তাতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, ওখানে থাকবেন কেন? প্লিয, চলে আসুন আমার গেস্টহাউসে।'

'আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না,' বলল রানা।

'বিরক্ত হব কেন? অতিথিদের জন্যে এ বাড়ির পেছনে আছে গেস্টহাউস। কোনও সমস্যা হবে না আমার।'

তিনি জোর করছেন দেখে বলল রানা, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই। আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে হোটেল থেকে আপনার লাগেজ।'

ক্যানভাস ব্যাগ দেখাল রানা। 'আর কিছু নেই।'

হেসে ফেললেন মিস ট্রুলি। 'বেড়াতে যাওয়ার সময় একেবারেই মালপত্র নেন না দেখছি। লাঞ্চ আর ডিনার আজ আমাদের সঙ্গে করবেন। ...ঠিক আছে?'

'আরও কেউ থাকবে?'

'শুধু আমি আর বার্কলে। এই বাড়িতে নিয়মিত আসে ও। আপনজন হয়ে গেছে।'

'ওঁর নাম স্টিভ বার্কলে?' স্বাভাবিক সুরে বলল রানা।

'হ্যাঁ। তা হলে আগেও শুনেছেন ওর নাম?'

'কে না শুনেছে তাঁর নাম।'

'তা হলে বোধহয় পড়েছেন ওর বই?' জানতে চাইলেন মহিলা।

'পড়ার সময় করে উঠতে পারিনি।'

'এক্ষুণি একটা দিচ্ছি।' ছোট্ট রুপালি বেল বাজালেন মিস ট্রুলি। ঘরে ঢুকল সুন্দরী এক কৃষ্ণাঙ্গিনী। তার দিকে চেয়ে

হাসলেন মহিলা। পরিচয় করিয়ে দিলেন রানা ও মেয়েটির। 'রানা, ও আমার হাউসকিপার, শেলি।' মেয়েটার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিস্টার বার্কলের একটা বই এনে দেবে লাইব্রেরি থেকে?'

'জী, এক্ষুণি এনে দিচ্ছি,' মাথা দুলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা।

চকচক করছে মিস ট্রুলির দু'চোখ। উচ্ছ্বাস নিয়ে বললেন, 'পড়লেই বুঝবেন কত বড় লেখক। বদলে যাবে আপনার জীবন। বোধহয় জানেনও না, গভীর এক রাতে ঘুমের ভেতর বার্কলেকে দেখা দিয়েছিলেন যিশুর শিষ্য, দূত ও বাইবেলের প্রচারক সন্ত জন।'

'আপনার কথায় এখন মনে হচ্ছে, অনেক আগেই বইটা পড়া উচিত ছিল,' বলল রানা।

কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল শেলি। হাতে বড়সড় একটা হার্ডব্যাক বই। ওটা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে মিস ট্রুলির হাতে দিল মেয়েটা। মৃদু হেসে ওকে বিদায় করলেন মহিলা। রানার হাতে দিলেন মহাভারতের মত মোটা বইটা।

মিস ট্রুলিকে ধন্যবাদ দিয়ে ওটা কোলে রাখল রানা। প্রচ্ছদে সোনালি, পুরু অক্ষরে লেখা:

আমার সঙ্গে কথা বলেছেন সন্ত জন
স্টিভ বার্কলে

'দরিদ্র আর বঞ্চিত সব পরিবারকে বিনে পয়সায় এই বই দেয় বার্কলে,' প্রশংসা করতে গিয়ে ঝিকমিক করছে মহিলার চোখ। 'সত্যিকারের ভালমানুষ।'

কাভার উল্টে লেখকের ভূমিকায় চোখ রাখল রানা। পড়ছে ঝড়ের বেগে।

স্টিভ বার্কলে লিখেছে:

আজ থেকে দশ বছর আগে, শেষ করেছি এই পাণ্ডুলিপি। কখনও ভুলব না সেই স্বর্গীয় মুহূর্ত। একে একে এই

পাণ্ডুলিপি দিয়েছি আমেরিকার সব প্রকাশকের কাছে। কিন্তু প্রকাশ করেনি তারা কেউ। জানতাম, এমনই হবে। আগেই এটা বলেন সন্ত জন। মন শক্ত করে নামতে হবে কাজে। হাল ছাড়লে চলবে না। প্রকাশ করতেই হবে এই বই। তাঁকে কথা দিয়েছি, তাই প্রথমে বিক্রি করেছি নিজের গাড়ি। এরপর বিক্রি করেছি বাড়ি। আর যা ছিল, বিক্রি করেছি সবই। রাত কাটত পুরনো এক ট্রেইলারে। প্রকাশনা সংগঠন গড়তে ব্যয় করেছি প্রতিটি সেণ্ট। আর আজ, প্রিয় পাঠক, সন্ত জনের জ্ঞানের বইটি আপনার হাতে। তিনি যা বলেছেন, সত্য হয়েছে প্রতিটি কথা। বইটি বিক্রি হয়েছে লাখ লাখ কপি। পরের বছর প্রকাশকরা হাত-পা চেপে ধরল স্বত্ব পাওয়ার জন্যে। এই বইয়ের মাধ্যমে সন্ত জনের অমিয় বাণী ছড়িয়ে পড়েছে এ দেশের এক কোটি বিশ লাখ নাগরিকের মধ্যে। শুধু তা-ই নয়...

'কী বুঝছেন, রানা?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন মিস ট্রুলি।

বার্কলে মহা ধড়িবাজ, ভাবছে রানা। মুখে বলল, 'পড়ার মত একটা বই।'

'এটা আপনাকে দিলাম,' খুশি হয়ে বললেন মিস ট্রুলি। 'অনেকগুলো আছে আমার কাছে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ম্যাম। প্রতিটি অক্ষর পড়ব। আগ্রহী হয়ে উঠেছি লেখকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে।'

ঝিলিক দিল মিস ট্রুলির চোখ। 'দেখা হওয়াটাই ছিল আপনাদের নিয়তির লিখন। বুঝতে পারছি, দারুণ সময় কাটবে বার্কলে আর আপনার।'

পথ দেখিয়ে গেস্টহাউসে রানাকে নিয়ে এল শেলি। বাড়িটা ম্যানশনের পেছনে। একতলা কয়েকটা অ্যাপার্টমেণ্ট। প্রতিটাতে দুটো বেডরুম, কিচেন, বাথরুম, লিভিংরুম এবং একটি করে ডাইনিংরুম। আসবাবপত্র দেখার মত অভিজাত।

একা হওয়ার পর ফোর-পোস্টার খাটে ব্যাগ রেখে লিভিংরুমে ফিরল রানা। ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে দেখল প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বাগান। আরও সুন্দর লাগছে পাম গাছ ও স্প্যানিশ মসের উপস্থিতির কারণে। ফুলের সব বেডে নানান রঙের অসংখ্য গোলাপ।

রাজকীয় পরিবেশে ভাবল রানা, প্রতারক বার্কলের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো হাসিখুশি, অমায়িক, বিত্তশালিনী মেরিয়ান ট্রুলির?

লোকটা আসলে কেমন?

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর জানবে লোকটা আসলে কেমন।

তেইশ

বিছানায় উঠে বসেছে ক্যাথি হার্বার্ট। কোলে অলস দুই হাত। ছাত ভেদ করে বহু দূরে চোখ। খাটের পাশের প্লাস্টিক চেয়ারে বসে প্যাডে নোট নিচ্ছে ডাক্তার। বেশিরভাগ সময় এ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকে না অন্য কেউ। বরাবরের মতই নরম সুরে প্রশ্ন করছে লোকটা।

'তোমার কবজিতে খুব সুন্দর ব্রেসলেট, ক্যাথি। ওটা কি আসল সোনার?'

ডানহাত তুলে চকচকে ব্রেসলেট দেখল ক্যাথি। মনেই ছিল না ওটা ওর কাছে আছে। 'সোনার বলেই তো মনে হচ্ছে,' সন্দেহ নিয়ে বিড়বিড় করল। কী ধরনের প্রশ্ন করবে ডাক্তার, সব মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। কঠোর কোনও কথা

বলবে না। সরাসরি কোনও প্রসঙ্গ তুলবে না। লোকটা যেন ঘেঁটে দেখতে চায় ওর মগজ। মাঝে মাঝে মনে হয়, চিৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে যায় ও। মরুক ডাক্তার লোকটা। ঘৃণা জাগে অন্তরের গভীর থেকে। কিন্তু ডাক্তারের নরম কথা আর চোখ জানিয়ে দেয়, সে ওর শুভানুধ্যায়ী। মনটা চায় তাকে বিশ্বাস করতে। আবার মনের আরেক অংশ সতর্ক করে, ভুলেও একে বিশ্বাস কোরো না। তুমি এদের হাতে বন্দি। তোমাকে কিডন্যাপ করেছে এরা। যদিও মনে হয়, সত্যিই ওকে সাহায্য করতে চায় লোকটা।

'অ্যান্টিক মনে হচ্ছে,' বলল ডাক্তার। 'মনে আছে ওটা কোথা থেকে পেয়েছ?'

'না, জানা নেই কোথা থেকে পেয়েছি। কত দিন ধরে আমার কাছে আছে, তা-ও জানি না।'

'কাছের কেউ দিয়েছে হয়তো,' বলল ডাক্তার, 'এমন কেউ, যে কিনা ভালবাসে তোমাকে। হয়তো আত্মীয় তিনি। বলো তো, তোমার পরিবারের কথা।'

'মনের আয়নায় দেখি কিছু মুখ। মনে হয় তারা আমার বাবা-মা।'

মাথা দোলাল ডাক্তার। 'তা হলে তো বহু দূর এগোতে পেরেছ। এরপর দেখবে হঠাৎ অনেক কিছু মনে পড়ে যাবে।'

'সবই মনে পড়বে?'

'তোমার যেটা হয়েছে, ওটাকে বলে পোস্ট-ট্রমাটিক রেট্রোগ্রেড অ্যামনেযিয়া,' বলল ডাক্তার। 'অস্থায়ীভাবে হয় এসব স্মৃতিবিভ্রম। কত দ্রুত আরোগ্য হবে, সেটা নির্ভর করে আঘাতের ওপর। খুব জোরে মাথায় আঘাত লেগেছিল। তবে এর চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থাও দেখেছি, সেরে গেছে।' ব্রিফকেস তুলে ওটা থেকে একটা বই বের করল সে। 'দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।'

বইটাকে পাত্তা না দিয়ে নিস্পৃহ সুরে বলল ক্যাথি, 'আমি

কোথায় আছি?' ডাক্তারকে কতবার এই একই কথা জিজ্ঞেস করেছে, ভাবতে গিয়ে হাঁফ লেগে উঠল ওর।

বরাবরের মত একই জবাব দিল ডাক্তার, 'এমন এক জায়গায়, যেখানে ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।'

লোকটার অস্বস্তি টের পায় ক্যাথি। 'আমাকে নিয়ে কী করা হবে?' চোখ রাখল সরাসরি ডাক্তারের চোখে। গাল বেয়ে নামল অশ্রুর ধারা।

অন্যদিকে তাকাল ডাক্তার। 'আমরা ফিরিয়ে আনব তোমার স্মৃতি।'

'তারপর কী হবে? আমি স্মৃতি ফেরত পেলে, তখন?'

আস্তে করে বইটা বিছানায় রাখল ডাক্তার। 'আগে এদিকে মন দাও, ঠিক আছে?'

বইটার দিকে তাকাল ক্যাথি। নানান জাতের কুকুর নিয়ে লেখা। রঙিন ছবিও আছে ভেতরে। 'এটা দিয়ে কী হবে?'

'তুমি বলেছিলে, বাড়িতে তোমার একটা কুকুর ছিল। এসো, খুঁজে দেখি কোন্ জাতের কুকুর ওটা।'

'তাতে কী লাভ?'

'ছবি দেখতে গিয়ে হয়তো মনে পড়বে অন্য কোনও স্মৃতি। মগজ সবসময় কাজ করে অবচেতন মনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। একটা স্মৃতির লেজ ধরে আসে আরেকটা। যদি বের করতে পারো কোন্ জাতের কুকুর তোমার, হয়তো চট্ করে মনে পড়বে ওটার নাম। পরক্ষণে হয়তো আসবে সাগর সৈকতের কোনও স্মৃতি। ধরে নিতে পারো, চালু হয়ে গেছে মগজ। কে জানে, পরের দিন হয়তো আলোকিত হয়ে উঠবে মনের পর্দা। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝতে পেরেছি,' প্রায় ফিসফিস করল ক্যাথি।

একটা একটা করে পাতা ওল্টাতে লাগল ডাক্তার। 'এবার দেখা যাক। তোমার কুকুরটা দেখতে এমন ছিল?' ল্যাব্রাডর দেখাল সে।

ভুরু কুঁচকাল ক্যাথি। 'আমারটা এত বড় ছিল না।'

'ঠিক আছে, তা হলে দেখি ছোট কুকুরের ছবি। এই যে আরেকটা। কিংস্ চার্লস্ স্প্যানিয়েল। তোমারটা এমন?'

মাথা নাড়ল ক্যাথি। 'না।'

'তা হলে এটা?'

'না, এটাও না।'

আরেক পৃষ্ঠায় গেল ডাক্তার।

'একমিনিট!' বলে উঠল ক্যাথি। 'এইটাই!'

'এটা?' আঙুল দিয়ে দেখাল ডাক্তার। 'ওয়েস্ট হাইল্যাণ্ড হোয়াইট টেরিয়ার।'

ছবিটা পরিষ্কার চিনতে পেরেছে ক্যাথি। ছোট, সাদা কুকুর। ও-ই জিনিস্ই ছিল ওর। 'এটাই আমার কুকুর।'

'গুড,' হাসল ডাক্তার, 'ভাল উন্নতি হয়েছে তোমার, ক্যাথি।'

'তা হলে এবার কি ছেড়ে দেবেন আমাকে?'

'কয়েক দিনের ভেতর,' বলল ডাক্তার।

'কত দিন?'

'এখনও বলতে পারছি না। সব নির্ভর করে তোমার উন্নতির ওপর।'

'আসলে কী মনে পড়তে হবে আমার?' জানতে চাইল ক্যাথি। চড়ে যাচ্ছে কণ্ঠস্বর। 'এটা তো কোনও থেরাপি মনে হচ্ছে না। আটকে রাখা হয়েছে আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। এতই গুরুত্বপূর্ণ কী থাকতে পারে, যে কারণে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে আমাকে বেআইনীভাবে?'

এসব কথার জবাব নেই ডাক্তারের কাছে। 'এসো, এক ধাপ করে এগোতে শুরু করি আমরা, ঠিক আছে?'

সেশন শেষ হওয়ার পর ক্যাথিকে ঘরে একা রেখে বেরিয়ে গেল ডাক্তার। পেছনে দরজায় তালা মেরে দিল গার্ড। চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার মাল্ডুন। ভাবছে:

আমি ডাক্তার। আমার কাজ মানুষকে সাহায্য করা। অথচ, যা করছি, সেটা একদম ভুল কাজ। কোন্ আক্কেলে জড়িয়ে গেলাম এসবে?

'মিস্টার অ্যামেট চাইছেন তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করবেন আপনি,' জানাল গার্ড।

'পরে,' বলল ডাক্তার।

'এখনই যেতে বলেছেন।'

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার। ঝুঁকে গেল দু'কাঁধ।

তিন মিনিট পর হাজির হলো ওই লোকের অফিসে। দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। ঘরটা ছোট ও চৌকো। কংক্রিটের ন্যাড়া দেয়াল ও মেঝে। অ্যামেটের ডেস্কে একটা কমপিউটার ও ফোন ছাড়া আর কিছুই নেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে লোকটা। ঠোঁটে টিটকারির বাঁকা হাসি।

দিন দিন তার প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বাড়ছে ডাক্তারের। সুযোগ পেলে এক ঘুষিতে বদমাশটার নাক-মুখ ভর্তা করে দিত। কিন্তু তারপর কী হতো, সেটাও ভাল করেই জানে। 'কী জন্যে ডেকেছেন?'

'ভাল কোনও খবর আছে?' জানতে চাইল অ্যামেট।

দ্বিধায় পড়ল ডাক্তার। 'যা চান, তেমন কোনও তথ্য এখনও পাইনি।'

'হুম,' মাথা দোলাল অ্যামেট। 'আমিও তা-ই ভেবেছি। মনে করি না আপনার এই থেরাপি দিয়ে কোনও কাজ হবে। আপনার কী মনে হয়?'

'কাজ হচ্ছে না, তা ঠিক বলা যায় না। তা ছাড়া, থেরাপি শুরু করেছি আমরা মাত্র কয়েক দিন আগে।'

'আপনি বোধহয় জানেন না, কী ধরনের ঝামেলায় আছি আমরা, ডক্টর মাল্ডুন। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।'

'কিন্তু আপনি তুড়ি মারলেই তো আর সারবে না সিভিয়ার রেট্রোগ্রেড অ্যামনেযিয়া। ওর গোট রেযাল্ট আগের

চেয়ে ভাল হচ্ছে।'

'গোট আবার কী?' ধমকে উঠল অ্যামেট।

'গ্যালভেস্টন ওরিয়েন্টেশন অ্যাণ্ড অ্যামনেযিয়া টেস্ট,' নিজেকে শান্ত রাখতে গিয়ে হিমশিম খেল ডাক্তার।

'মেডিকেল বিদ্যার নামে পাগলামি ঝাড়বেন না আমার ওপর। ওই মেয়ে ডাহা মিথ্যা বলছে।'

'পলিগ্রাফ রেযাল্ট আপনিও দেখেছেন।'

'সবসময় সঠিক হয় না লাই ডিটেক্টর। আপনি নিজেও এটা জানেন।'

'আমার কথা মন দিয়ে শুনুন,' বিরক্তি চাপতে পারল না ডাক্তার। 'আমরা সফল হওয়ার খুব কাছে পৌঁছে গেছি। হয়তো আর কয়েক দিনে সুস্থ হয়ে উঠবে মেয়েটা। বড়জোর এক বা দুই সপ্তাহ। এরই ভেতর ফিরবে ওর সব স্মৃতি।'

মাথা নাড়ল অ্যামেট। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, ইচ্ছা করে দেরি করিয়ে দিচ্ছেন আপনি।'

'তা করছি না।'

'হ্যাঁ, তা-ই করছেন, ওই কুত্তীর প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। সময় পাইয়ে দিচ্ছেন তাকে। একটা কথা মাথায় গেঁথে নেন, আপনাকে পয়সা দেয়া হচ্ছে সহানুভূতি দেখানোর জন্যে নয়। ফলাফল পাওয়ার জন্যেই দেয়া হচ্ছে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। অথচ, কোনও কাজেই আসছে না আপনার ফালতু বকবকানি চিকিৎসা। অনেক ধরনের সুবিধা করে দিয়েছি আপনাকে। কোনওদিকে কম দিইনি। আপনার কথায় রঙ করা হয়েছে ওপরের পুরো ফ্লোর, দিয়েছি হারামজাদীকে আরামদায়ক ঘর। আপনার কথায় নরম আচরণ করেছি আমরা। কোনও চাপ দেয়া হয়নি। কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে। সেটা মাথায় রাখবেন।'

মাথা নিচু করে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে আছে ডাক্তার ডিক মাল্ডুন। মুঠো করে ফেলেছে হাতদুটো। 'তা হলে কী

করতে বলেন আপনি?'

'চাপ দিন কুত্তীটাকে। নানান উপায়ে।'

'কী ধরনের চাপ?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যামেট। 'যাতে কাজ হয়, সেই পথটা বের করুন। কী করবেন, সেটা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই।'

'আপনি নির্যাতনের কথা বলছেন?'

আবারও কাঁধ ঝাঁকাল অ্যামেট। 'আগেই বলেছি, কাজ হলো কি না, সেটাই বড় কথা।'

অবাক চোখে তাকে দেখল ডাক্তার। 'আপনি সিরিয়াস? ওই মেয়ে কিন্তু রোগিণী।'

চুপ করে শীতল চোখে ডাক্তারকে দেখছে অ্যামেট।

'আপনারা এখন চাপ দিলে ওর স্মৃতি তলিয়ে যাবে আরও গভীরে,' বলল ডাক্তার মাল্ডুন। 'মানসিক পতন হবে ওর। তা ছাড়া, আমার কাছে এমন কিছু নেই, যেটা দিয়ে ওর ওপর নির্যাতন চালাতে পারি। ওই জঘন্য কীর্তির জন্যে আমাকে ভাড়া করেননি আপনারা।'

'যা বলব, সেটাই করবেন,' কঠোর সুরে বলল অ্যামেট। 'এবার দেখুন, কীভাবে ওই কুত্তীর কাছ থেকে বের করা যায় তথ্য।' ডেস্ক থেকে একটা কাগজ নিয়ে ডাক্তারের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

দ্রুত পড়ল ডাক্তার। কাগজে লেখা মাত্র একটা নাম। এমন এক কেমিকেল, যেটা ব্যবহার করা হয় না মেডিকেল প্র্যাকটিসে। চমকে গেছে ডিক মাল্ডুন। 'আপনারা কি মেয়েটাকে ওই জিনিস দেবেন? কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন না ওটা দেয়ার। এক্সপেরিমেন্টাল কেমিকেল। সম্পূর্ণ বেআইনী।'

'প্রয়োজনে ব্যবহার করব ওর ওপর,' নরম সুরে বলল অ্যামেট, 'মন দিয়ে শুনুন, সোডিয়াম পেন্টোথালের চেয়ে অনেক গভীরে গিয়ে কাজ করে এই জিনিস।'

‘আমি এতে রাজি নই।’

‘যা বলব, তাই করবেন, নইলে বিপদ হবে আপনার।’ কঠোর চোখে ডাক্তারকে দেখল অ্যামেট। ‘এতে বেশি কাজ হবে, কথা কি ঠিক?’

‘হায়ার কর্টিকাল ফাংশান দমিয়ে দিয়ে অসতর্ক করে,’ বিড়বিড় করল ডাক্তার। ‘থিয়োরি অনুযায়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রুথ সিরাম এটা। কিন্তু...’

‘আমিও তা-ই শুনেছি।’

‘তবে সন্ত্রাসী বা ভয়ঙ্কর হত্যাকারী ছাড়া কেউ ব্যবহার করে না এই কেমিকেল,’ বলল ডাক্তার। ‘আমাদের মনে রাখা উচিত, এটা আমেরিকা, সিয়েরা লিয়োন নয়।’

হলদে বড় বড় দাঁত বের করে হাসল অ্যামেট।

‘ওই কেমিকেলের সাইড এফেক্ট সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?’

জবাব দিল না অ্যামেট।

‘পঁচানব্বুই ভাগ সম্ভাবনা, ওটা ব্যবহার করলে চিরকালের জন্যে বদ্ধ-উন্মাদ হবে যে-কেউ। ল্যাবে চিম্পাঞ্জির ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে। ভয়ানক কষ্ট পেয়ে পাগল হয়। আপনি চান ওই মেয়ের ওপর ওটা প্রয়োগ করতে? মগজটা হয়ে যাবে চিনাবাদামের সমান। বাকি জীবন পড়ে থাকবে মানসিক হাসপাতালে।’

আস্তে করে মাথা দোলাল অ্যামেট। ‘তাতে আপত্তি তুলব না, যদি আগে ওর পেট থেকে বের করতে পারি সব তথ্য।’

‘তথ্য পাওয়ার জন্যে এত বড় ক্ষতি করবেন যুবতী একটা মেয়ের?’

‘অবশ্যই। যাদের হয়ে কাজ করছি, ওই তথ্য তাদের কাছে খুবই জরুরি।’

‘তা হলে অন্য কোনও ডাক্তারের সাহায্য নিন। আমি এসবে জড়াব না।’

‘আপনার সেই সুযোগ আছে ভাবছেন?’

‘এর জবাব দিতে তৈরি নই।’ ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল ডাক্তার মাল্ডুন। কিন্তু পিছনে ধাতব ক্লিক আওয়াজে আবারও ঘুরল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু’জন।

ডাক্তারের মাথায় পিস্তল তাক করেছে লোকটা। অন্য হাতে ফোনের রিসিভার। ‘ফোন দেবেন, ডাক্তার। জোগাড় করবেন ওই সিরাম। ব্যবহার করবেন আপনার প্রিয় রোগিণীর ওপর। তারপর দেখব, কার কথা ঠিক।’

মাথা নিচু করে নিল ডাক্তার। ক্ষমতা নেই বিদ্রোহ করবে। হাত-পা বাঁধা। ‘ঠিক আছে,’ কাঁপা গলায় বলল, ‘জোগাড় করতে পারব। কিন্তু প্রেসক্রিপশনে লেখার অধিকার নেই। ওই জিনিস হাতে পাওয়ার জন্যে লাগবে কয়েক দিন।’

‘তাতে চলবে না,’ বলল অ্যামেট। ‘অধৈর্য হয়ে উঠেছেন আমার এমপ্লয়ার।’ হাতঘড়ি দেখল সে। ‘সিরাম হাজির করবেন আগামীকাল রাতেই।’

‘আগামীকাল রাত!’

‘না পারলে দেখবেন কীভাবে হাত-পা ভেঙে ওই মেয়ের পেট থেকে বের করি সব কথা। তারপর আপনার চোখে গেঁথে দেব একটা বুলেট।’ নিষ্ঠুর হাসল ক্যাল অ্যামেট। ‘কী করবেন, সেটা ঠিক করবেন আপনিই।’

চব্বিশ

বিকেলটা মিস ট্রুলির গেস্টহাউসের ফোর-পোস্টার বেডে শুয়ে স্টিভ বার্কলের বই ঘাঁটল রানা। ওর কাছে পরিষ্কার হলো দুটো ব্যাপার।

প্রথম: বাইবেল প্রচারক সেন্ট জনের মুখপাত্র হয়ে উঠেছে আলাবামার গরিব এক যাজক। এমনটা হয়েছে, কারণ কয়েক বছর আগে গভীর রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন যিশুর শিষ্য জন। জানান, সামনে ভয়ঙ্কর সময়। সতর্ক হতে হবে ধার্মিক মানুষকে। সহজভাবে লেখা হয়েছে বইটি, মুগ্ধ হবে সরল মনের যে-কেউ। বইয়ের শেষপাতায় একটা স্লিপ। বার্কলে ফাউণ্ডেশনে অনুদান দিতে পারবে যে-কেউ। এবং বইয়ের লেখক যেন রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সেজন্যে তৈরি করা হয়েছে ওই সংগঠন।

দ্বিতীয় কথা, বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট-এর বুক অভ রেভেলেশন-এর ওপর নির্ভর করে লেখা বার্কলের বই। বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে ধ্বংস হবে মানবজাতি। বহুবার এসেছে বাইবেলের ওই অংশের উদ্ধৃতি। বইটি লেখাই হয়েছে কোটি কোটি বিশ্বাসী খ্রিস্টানের জন্যে। বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে আমেরিকার নাগরিকদের প্রতি। তাদের ধারণা, সময় এসেছে পৃথিবী ধ্বংসের। সামনেই মহাপ্রলয়।

বাইবেল ভেজে খেয়েছে স্টিভ বার্কলে।

লেখনিতে আন্তরিক একটা ভঙ্গি। বক্তব্য স্পষ্ট।

গোটা দুনিয়ায় চলছে অন্যায়। খুন হচ্ছে নিরীহ মানুষ। অথচ, সেটা আজ দোষের নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবেই তা করছে বহু দেশ। ধসে পড়ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। দেশে দেশে জেগে উঠেছে নৈরাজ্যবাদীরা। এমনই সময়ে আবির্ভাব হবে মহান যিশুর। বিশ্বাসীদের তিনি দেবেন নেতৃত্ব। হত্যা করবেন নিষ্ঠুর সব শত্রুদেরকে। শেষবারের মত দুনিয়ার বুকে নামবে শান্তি।

স্টিভ বার্কলে জোর দিয়ে লিখেছে, বাইবেলের বুক অভ রেভেলেশন লিখেছেন মাত্র একজন লেখক। তিনি যিশুর শিষ্য ও ধর্ম প্রচারক জন। তিনিই প্রথম বিশ্বাস করেন, নতুন করে প্রাণ পেয়েছেন যিশু। তবে বার্কলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ

করেছেন অনেকে। তাঁরা লিখেছেন, রোমান কর্তৃপক্ষ যিশুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেয়ার পর বহু দূরে চলে যান জন। প্রচার করেন খ্রিস্টান ধর্ম। সেসময় তাঁকে ফুটন্ত তেলে ফেলে দেয় রোমান শাসকরা। কিন্তু গায়ে ফোস্কা না পড়লে কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্বাসনে পাঠায় তুরস্কের তীরের কাছে গ্রিসের প্যাটম্‌স্‌ দ্বীপে। ওখানে বসে লেখেন: বুক অভ রেভেলেশন। মানুষের ভবিষ্যৎ কী, তার ওপর লেখা বই। তাতে আছে ভয়াবহ বর্ণনা। চমকে গিয়েছিল সেসময়ের পাঠক সমাজ। পরেও বাইবেলের ওই অংশ নিয়ে হয়েছে প্রচুর বিতর্ক।

বার্কলের বইয়ের মূল কথা: ঘনিয়ে এসেছে মহাপ্রলয়। শেষদিকে ফাঁপিয়ে লিখেছে, কীভাবে স্বপ্নে এলেন সন্ত জন।

বর্তমান সময়ের স্কলাররা মনে করেন না গসপেলের সেন্ট জন ও বুক অভ রেভেলেশনের লেখক একই ব্যক্তি। প্যাটম্‌স্‌ দ্বীপের জন যিশুর বারো শিষ্যের একজন কি না, তা নিয়েও আছে ঘোর সন্দেহ। বুক অভ রেভেলেশন নিউ টেস্টামেণ্টের অংশ, তা-ও মনে করেন না অনেকে। আসলে কারও কাছেই প্রমাণ নেই বলে যে-যার মত ওই অংশের বিষয়ে লিখেছেন।

স্টিভ বার্কলে আঁকড়ে ধরেছে বাইবেলের ওই অংশ। মহাপ্রলয় না ঘটলে চলছে না তার। একেবারে শেষ কয়েকটা দিন পার করছে মানবসমাজ। কিন্তু সেসবের সঙ্গে ক্যাথি হার্বার্টের সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য, স্টিভ বার্কলেকে যেভাবেই হোক ব্ল্যাকমেইল করছিল মেয়েটা। বিষয়টি বাইবেলের কোনও ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কীভাবে জড়িত, তা জানে না রানা।

কোথাও কোনও সূত্র নেই বলে ভাবতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে ও। এসে চুপচাপ বসে থাকল লিভিংরুমে। পেরোল অনেকক্ষণ, তারপর বাজল সন্ধ্যা ছয়টা পঞ্চাশ।

পোশাক পাল্টে গেস্টহাউস থেকে বেরোল রানা। চলেছে ডিনারে। ওখানে দেখা হবে লোকটার সঙ্গে।

বাগানের মাঝের পথ পাড়ি দিয়ে ম্যানশনের দরজায় থামল রানা। কলিং বেল বাজাতেই হাসিমুখে কবাট খুলল হাউসকিপার শেলি। রানাকে নিয়ে এল গ্র্যাণ্ড হলওয়েতে। ড্রইংরুমে কার কথায় যেন হাসছেন মিস ট্রুলি। রানা ঘরে ঢুকতেই সোফা ছেড়ে হনহন করে হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে এল এক লোক।

বয়স হবে পঞ্চান্ন মত। পরনে ভাল দর্জির তৈরি হালকা ধূসর কোট। মনে হলো ওটা ইতালিয়ান। স্কোয়াশ বা টেনিস খেলে লোকটা। শক্তপোক্ত দেহ। অবশ্য, পেট ও থুতনির নিচে আসছে চর্বির আভাস। দৈর্ঘ্যে রানার সমান। চুল কুচকুচে কালো। ব্যাকব্রাশ করা। এখানে-ওখানে সাদা রেখা। চওড়া হাসি নিয়ে রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'বার্কলে, এই সুদর্শন যুবকের কথাই বলেছি,' হাসিমুখে বললেন মেরিয়ান ট্রুলি। চকচক করছে চোখদুটো। 'রানা, আমার সৌভাগ্য যে পরিচয় করিয়ে দিতে পারছি তোমার সঙ্গে স্টিভ বার্কলেকে। বোধহয় বলা উচিত গভর্নর বার্কলে?'

ঝিকঝিকে সাদা দাঁতের হাসি উপহার দিল লোকটা। 'ঈশ্বর চাইলে তবেই সেটা সম্ভব, মেরিয়ান। এখনও হতে পারিনি গভর্নর।'

'জর্জিয়ার নব্বুইভাগ মানুষ তোমার পক্ষে,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'তোমাকে ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

শক্ত মুঠোয় রানার হাত নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করেছে বার্কলে। ভাব দেখে মনে হলো, বহু কাল পর আপন ভাইকে ফেরত পেয়ে খুশি। 'ভাল লাগল পরিচিত হয়ে, রানা।' কথায় কোনও দ্বিধা নেই তার। 'দোষ করে ফেলছি না তো তোমাকে নাম ধরে ডেকে?'

'আমিও অধৈর্য ছিলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে, মিস্টার বার্কলে,' বলল রানা।

'প্লিজ, আমাকে ডাকবে স্টিভ বলে। মেরিয়ান বলেছেন,

তুমিও আছ বিশ্বাসী মানুষের দলে। কথাটা শুনে খুব ভাল লেগেছে। আজকাল সত্য পথ থেকে সরে যাচ্ছে অনেকে।'

ট্রে ভরা ক্যানাপে ও মার্টিনি ককটেইল দিয়ে গেল মেইড। চলছে টুকটাক কথা। গুরুত্ব পেল ইংল্যাণ্ড ও জর্জিয়ার পরিবেশ। তারপর মেরিয়ান ও বার্কলে জানাল, জর্জিয়ার কোথায় আছে দেখার মত জায়গা ও স্থাপত্য নিদর্শন। রানা যখন এ দেশে এসেই পড়েছে, উচিত হবে ওসব ঘুরে দেখা।

কিছুক্ষণ পর আলাপ ঝিমিয়ে আসছে দেখে জানতে চাইল বার্কলে, 'আসলে কোন্‌দিকে বেশি আগ্রহ তোমার, রানা?'

'সত্যি বলতে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে অদ্ভুত এক আকর্ষণ আছে আমার,' স্বাভাবিক সুরে বলল রানা।

পরস্পরকে দেখল বার্কলে ও মেরিয়ান ট্রুলি। চোখে রানার প্রতি প্রশংসা।

'জানতাম, এমন হবে,' বললেন মহিলা, 'তো শোনো, রানা, দারুণ সুযোগ পেয়েছ। স্বয়ং বার্কলের মুখে...'

'পড়ছিলাম তাঁর বই,' মেরিয়ানের কথা কেড়ে নিল রানা। 'শ্বাসরুদ্ধকর। রীতিমত কষ্ট হয়েছে ওটা রেখে আসতে।'

'অনেক ধন্যবাদ, রানা,' লাজুক হাসি দিল বার্কলে। 'তুমি চাইলে তোমার জন্যে ওই বইয়ে সই করে দেব।'

'খুব খুশি হব তা হলে।'

এমনসময় ঘরে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বাটলার জানিয়ে দিল, সার্ভ করা হয়েছে ডিনার। মেরিয়ান ট্রুলি ও স্টিভ বার্কলের পিছু নিয়ে দেখার মত সুন্দর এক ডাইনিংরুমে পৌঁছে গেল রানা। টেবিলটা দৈর্ঘ্যে পনেরো ফুটেরও বেশি। তৈজসপত্র রুপার তৈরি। মাথার ওপরে স্ফটিকের বিশাল এক ঝাড়বাতি। টেবিলের মাথায় বসলেন মিস ট্রুলি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডানদিকে রানা, বামে বার্কলে। টেবিলের মাঝে মস্ত এক রুপালি ডিশের ঢাকনি তুলল মেইড।

'মিস ট্রুলির ফিশারি থেকে আসা স্যামন,' বলল বার্কলে। 'স্মোক্‌ড্‌। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে ওটাই সেরা।'

খাওয়ার ফাঁকে শ্যাম্পেন দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে ওরা। রানার মনে হলো, এ বাড়িতে অতিথি নয় বার্কলে। লোকটা ঢুকে পড়েছে মিস ট্রুলির বুকের ভেতর।

স্যামন মাছের কাবাব খেতে খেতে বলল লোকটা, 'রানা, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কী যেন বলছিলে...'

'মনের যত প্রশ্ন, নির্দ্বিধায় বার্কলের কাছে জানতে চাও,' খুশিমনে বললেন মেরিয়ান। 'এই যুগে বাইবেলের ওপরে ওর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।'

'তুমি যুবক, নিশ্চয়ই বুঝছ, বাস করছ মানবজাতির সেরা উত্তেজনাময় সময়ে,' বলল বার্কলে, 'কিন্তু সময় এখন সত্যিই খারাপ। আমরা সবাই রয়েছি ভয়ঙ্কর বিপদে।'

'আপনার বইয়ে পড়লাম, লিখেছেন ঘনিয়ে এসেছে মহাপ্রলয়।'

'সত্যিই পড়েছ আমার বই,' বলল লোকটা। 'কী ঘটবে, সেটাও নিশ্চয়ই জেনেছ।'

'নানান স্কলার নানান মন্তব্য করেছেন,' বলল রানা। 'যেমন কোনও কোনও থিয়োলজিয়ান বলেছেন, আসলে নিউ টেস্টামেন্টের অংশই নয় বুক অভ রেভেলেশন।'

রাগে লাল হয়ে গেল বার্কলের দুই গাল। 'হারামজাদারা কিছুই জানে না।' চট্‌ করে মেরিয়ান ট্রুলির দিকে তাকাল সে। 'সরি, গাল দেয়া অনুচিত হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে এতই তিক্ত হয়েছে মন, সামলাতে পারিনি নিজেকে। এরা আসলে কোনও স্কলারই নয়! নইলে সব জেনেবুঝে চোখ বুজে থাকে?' টেবিলে রাখা দুই হাত মুঠো করল সে। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, রানা, কী ইঙ্গিত আসছে ঈশ্বরের তরফ থেকে? ধ্বংস হচ্ছে রাষ্ট্র। নিজেদের সামলাতে পারছে না সরকার। উধাও হচ্ছে আইনের বিচার। পঙ্গু হচ্ছে

অর্থনীতি। নষ্ট হচ্ছে সংস্কৃতি। আসলে তলিয়ে যাচ্ছি আমরা গভীর কূপে। নার্কের কাছে এসে হাজির হয়েছে পৃথিবী ধ্বংসের শুরু। আর সে কথাই এসেছে যিশুর বাইবেলে।' কথায় জোর দিতে আঙুল নাড়ল বার্কলে। 'যার বোঝার, সে কিন্তু ঠিকই পাচ্ছে মহাপ্রলয়ের পরিষ্কার ইঙ্গিত। প্রভু যিশু তোমার হৃদয়ে থাকলে, তুমিও সব বুঝবে। আমরা আছি মস্ত উঁচু খাদের কিনারায়। পতন হবে ভয়ঙ্কর। অথচ, ফালতু বিষয় নিয়ে তর্কে ব্যস্ত বুদ্ধু সব স্কলার। ভাবছে: এটা ঠিক, না ওটা ঠিক। জানি না কীভাবে তাচ্ছিল্য করছে ঈশ্বরের বাণী! কান পেতে শুনছে না ধ্বংসের পদধ্বনি?' শ্যাম্পেনে চুমুক দেয়ার জন্যে থামল বার্কলে।

নিজের বক্তব্য চমৎকারভাবে উপস্থাপন করছে সে। ভাল করত নাটক বা সিনেমায় অভিনয়ে নামলে। মুগ্ধ করেছে মিস ট্রুলিকে রানা বুঝতে পারছে, বার্কলের কথা শুনে মাতালের মত বুঁদ হয়েছেন মহিলা। বিনা দ্বিধায় দেবেন এক শ' মিলিয়ন ডলার। প্রবল আত্মবিশ্বাস, শেয়ালের চাতুরি ও ধর্ম প্রচারকের গাম্ভীর্য ব্যবহার করে ধর্মবিশ্বাসী মানুষটাকে জয় করে নিয়েছে বার্কলে।

'হয়তো জানো,' নতুন করে শুরু করল সে, 'দু'হাজার দুই সালের একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকার ষাট ভাগ মানুষ মনে করে, সন্ত জনের কথা সত্য। ষাট ভাগের কথা বাদ দাও, মাত্র বিশ ভাগ মানেই পাঁচ কোটি মানুষ। তাদের মতই একই কথা বলছি আমি। আমাদের এ জীবনেই আসবে মহাপ্রলয়। আর মাত্র অল্প কিছুদিনের ভেতর। তুমি ডিনার শেষ করে টিভি দেখতে গেলে, রুপালি পর্দায় দেখবে তারই লক্ষণ।' গম্ভীর চোখে রানাকে দেখল বার্কলে। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর হাসল। 'গত বসন্তে কিছু খেয়াল করেছ, রানা?'

'ফসলের সব গাছ জন্মে গিয়েছিল সময়ের আগে।'

'এ থেকে কী বুঝলে? এমন হয়েছে প্রতিটা দেশে। শুধু ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় নয়। বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর পরিবেশ। ঋতু আর নেই আগের মত। আসছে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও বন্যা। পরিবেশবাদীরা বলছে গ্লোবাল ওআর্মিং। আমি বলব গ্লোবাল সতর্কবাণী। সন্ত জনের বইয়ে লেখা আছে এসব। খুব খারাপ হবে পরিবেশ, মাটিতে মিশে যাবে মস্তবড় সব শহর। এত তাপ দেবে সূর্য, পুড়ে মরার দশা হবে আমাদের।'

'আকাশ থেকে পাথর পড়বে, সেটার কথা ভুলে যাবেন না,' সায় দেয়ার সুরে বলল রানা। *'স্বর্গ থেকে এমন পাথরের বৃষ্টি হবে, একেকটার ওজন হবে এমনই যে রক্ষা পাবে না কেউ।'*

'ভালভাবেই পড়েছ বাইবেল।' মাথা দোলাল বার্কলে। 'একেকটা পাথরের ওজন হবে প্রায় পঁয়ত্রিশ কেজি। তা ছাড়া, আছে মহামারী। হামলা করবে ভয়ঙ্কর সব পোকা। আসবে এমন সব রোগ, যার চিকিৎসা নেই। যেমন এভিয়েন ফ্লু বা নতুন দুরারোগ্য যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া।' অলসভঙ্গিতে বাতাসে হাত দোলাল বার্কলে। 'নিউ সায়েন্টিস্ট ম্যাগাযিনে কী দেখছ, রানা? আফ্রিকার পঙ্গপাল যাচ্ছে ফ্রান্সের দক্ষিণ এলাকায়। ঠিক যেমন লেখা রয়েছে বাইবেলে। ...তা হলে বলো, এবার কী ঘটবে, সে-কথা আমাদেরকে জানাবে কে?' হঠাৎ টেবিলে চাপড় দিল বার্কলে। 'বিশ্বাস করো বা না করো, এসবই জানতেন সন্ত জন। আর তা-ই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন স্বপ্নে।'

'শুনে দেখো, রানা, কীভাবে স্বপ্নে এসে বলে গেলেন সন্ত জন,' বড় করে শ্বাস নিলেন মিস ট্রুলি। 'ভাবলে শিরশির করে ওঠে মেরুদণ্ড।'

'ঘটনা এখানেই শেষ নয়,' বলল বার্কলে। 'জন আমাকে আরও জানান: দুনিয়ার বুকে আসবে এমন এক সরকার, যারা

কাজ করবে শয়তানের পক্ষে। যা খুশি করবে। বড়লোক বা গরিব... রক্ষা নেই কারুও। সবার ডান হাতে বা কপালে মেরে দেয়া হবে সিল। কেউ কিনতে পারবে না কিছু। সবকিছুই ভোগ করবে সরকারী দলের লোক। কারও থাকবে না গবাদি পশু। নিজের নামও থাকবে না কারও। থাকবে শুধু সংখ্যা।' তিক্ত হাসল বার্কলে। 'কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, বুঝতে পারছ?'

মাথা দোলাল রানা। 'বলতে চাইছেন, কমিউনিযমের নামে যা খুশি করবে একদল লোক। ক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে।'

মৃদু হাসল বার্কলে। 'তুমি শিক্ষিত মানুষ। কী বুঝছ? এরাই হচ্ছে চিন, রাশা বা এ ধরনের দেশের সরকার। শয়তানের পক্ষে কাজ করছে তারা। মুক্ত থাকবে না মানুষ। দুনিয়া জুড়ে চলবে মাত্র একটা মুদ্রা। যেমন ইউরো। কিন্তু টিকবে না ওটা। থাকবে না ক্রেডিট কার্ড। তোমার কোনও ক্রেডিট কার্ড নেই, রানা?'

'আছে। ব্যবহার করি না পারতপক্ষে।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করছ। বার কোডের কথাই ভাবো, এরই মধ্যে আমরা ব্যবহার করছি ৬৬৬ সংখ্যাটা। আধুনিক টেকনোলজি শেষ করবে আমাদেরকে। অথচ, গ্যাঁট মেরে বসে দেখছে স্কলাররা। আসছে নতুন টেকনোলজি। তাতে ভাল না মন্দ হবে, বোঝার উপায় নেই কারও।' প্লেটে আবারও খাবার তুলছে বার্কলে। তার ফাঁকে বলল, 'বুঝতেই পারছ মধ্যপ্রাচ্যের কী হবে। ওই রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশের কারণে আরও বহু কিছুই বোঝা যায়। বাইবেলে আগেই লেখা হয়েছে, ঈশ্বরের প্রিয় ইযরায়েলিরা পাবে কাঙ্ক্ষিত দেশ। উনিশ শ' আটচল্লিশ সালে ইযরায়েল রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে, আছি আমরা শেষ সময়ে। সত্য হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছে। কাজেই তৈরি হতে হবে মন্দ

সময়ের জন্যে।'

'কেমন হবে সেই সময়?' জানতে চাইল রানা।

'এ বিষয়ে বাইবেলের স্কলাররা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অন্তর্নিহিত খবর বুঝতে হলে যেতে হবে আরও গভীরে। যা ঘটার ঘটবে ইযরায়েলে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, প্রথমে আগুন জ্বলবে ওই দেশে। কী ঘটবে, তা ঠিক করা হয়েছে হাজার বছর আগে। আক্রান্ত হবে পবিত্র ভূমি। সেটা পশ্চিম তীরে। হয়তো বোমায় খুন হবেন কূটনীতিকরা। ফলে শুরু হবে একের পর এক পারমাণবিক বোমার হামলা।'

'আপনি জানলেন কী করে?' অবাক হয়ে গেছে রানা।

'*এমন হামলা হবে আমার প্রিয় ইযরায়েলিদের ওপর, যে ভয়ঙ্কর এক মেঘে ঢাকা পড়বে জমিন। আর ওটাই তোমাদের বলে দেবে, ফুরিয়ে এসেছে সময়।*' তিক্ত হাসল বার্কলে। 'হামলা করবে গগরা। প্রাচীন দেশ ম্যাগগের মানুষ তারা। ওটাই বর্তমান ইরান দেশ। মিসাইল ফেলবে ইযরায়েলের ওপর। ফলে পৃথিবী জুড়ে আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ।'

'সত্যিই বিশ্বাস করেন পবিত্র বাইবেলের এ ভবিষ্যদ্বাণী?' জানতে চাইল রানা, 'ইহুদিদের ওপর হামলা করবে কোনও মুসলিম দেশ?'

'সন্দেহ নেই,' বলল বার্কলে, 'তার ফল ভয়াবহ। এসবই লেখা হয়েছে বুক অভ রেভেলেশনে।'

'অর্থাৎ, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ধ্বংস হবে ইযরায়েল রাষ্ট্র?'

'ধ্বংস হতে দেবেন না ঈশ্বর,' মাথা নাড়ল বার্কলে, 'ওই দেশে যতই মিসাইল পড়ুক, ক্ষতি হবে না একটা ঘাসেরও। "*ইযরায়েল দেশের বিরুদ্ধে যা-ই করুক গগরা, আমার ক্রোধ ধ্বংস করবে তাদেরকে।*" ...কী বুঝলে, রানা? খোদ ঈশ্বর রক্ষা করবেন ইযরায়েলিদেরকে। শেষ করবেন ওই জাতির শত্রুদের।'

মৃদু হাসল রানা। চুপ করে আছে।

‘এদিকে পৃথিবী জুড়ে বেধে গেছে মারাত্মক যুদ্ধ,’ বলল বার্কলে। ‘এমন এক যুদ্ধ, যেটার জন্যে মরবে শত শত কোটি মানুষ। শেষে চুক্তি করবে সবাই মিলে। প্রস্তাবটা আসবে ইউরোপের নেতাদের কাছ থেকে। তাদের একজনের থাকবে দুর্দান্ত কারিশমা। অথচ, সে মানবজাতির সত্যিকারের শত্রু।’

‘বাইবেল অনুযায়ী যিশুর বিরুদ্ধে কাজ করবে সে,’ বলল রানা।

বারকয়েক মাথা দোলাল বার্কলে। ‘চড়বে সাদা ঘোড়ায়। রেভেলেশন, চ্যাপ্টার সিক্স। ওই লোক জয় করবে গোটা পৃথিবী। আমরা হব তার দাস। নিজে সে শয়তানের পুত্র। কে জানে, হয়তো হবে কোনও ইংরেজ।’

‘খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপারে আলাপ করছ তোমরা,’ শিউরে উঠলেন মেরিয়ান ট্রুলি।

‘ঠিকই বলেছেন, মেরিয়ান,’ বলল বার্কলে, ‘চারপাশে নামবে ভয়ানক ঘুটঘুটে আঁধার। এতই শক্তিশালী হবে মহান যিশুর শত্রুরা, পৃথিবীর ক্ষমতা যাবে তাদের হাতে। কিছুই করতে পারবে না কেউ। বাধা দিলে জবাই হবে। হতাশ হয়ে পড়বে সাধারণ মানুষ। এসবই আছে জনের বইয়ে। আগুন দিয়ে, বা অন্যভাবে পুড়িয়ে দেবে কোটি কোটি গাছ। রক্তে লাল হবে সাগর। আসবে বিষাক্ত পঙ্গপাল। শেষ থাকবে না নির্যাতনের। নৃশংসভাবে খুন হবে কোটি কোটি মানুষ। শাসন ক্ষমতা তাদের কাছে, তাই যিশু বিরোধীদের হাতে খুন হবে বিশ্বাসীরা। নাযিদের অত্যাচারকে মনে হবে ছেলেখেলা।’

‘*তারপর একসময়ে এমনই ক্রুদ্ধ হবে সবাই, যেমন হয়নি আগে কখনও,*’ বুক অভ রেভেলেশনের উদ্ধৃতি দিল রানা।

গম্ভীর চেহারায় মিস ট্রুলির দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল বার্কলে। নিজের প্লেটের দিকে চেয়ে আছেন বয়স্কা মহিলা। ভীষণ অসহায় বোধ করছেন তিনি।

‘কিন্তু সবাই মেনে নেবে না নির্যাতন,’ নরম সুরে বলল

বার্কলে, ‘বাইবেল অনুযায়ীঃ হতাশা কাটিয়ে একসময়ে, কষ্ট ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাব আমরা।’

‘*যিশু নিজে নামবেন স্বর্গ থেকে,*’ বাইবেলের উদ্ধৃতি দিল রানা। ‘তখন বিকট এক আওয়াজ করবেন ঈশ্বরের দেবতা। ওটা ট্রাম্পেটের নিনাদের মত। ঘন মেঘে ঢাকা পড়ব আমরা। তারপর ঈশ্বরের সঙ্গেই থাকব চিরকালের জন্যে।’

‘আমেন,’ ফিসফিস করলেন মেরিয়ান ট্রুলি।

রানার দিকে চেয়ে হাসল বার্কলে। ‘খুশি হয়েছি যে যিশুর সত্যিকারের বার্তা অন্তরে রেখেছ, রানা। তোমাকে ফেলে স্বর্গে গেলে কষ্ট পেতাম। আসলে মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা পাবে না কেউ।’

‘*তারপর সাত বছর পর শেষ এক লড়াইয়ে নামবেন শত্রুদের বিরুদ্ধে যিশু,*’ বলল রানা। সব ঝাড়ছে বার্কলের বই থেকেই।

‘কথা ঠিক,’ মাথা দোলাল বার্কলে, ‘সত্যি আসবে এরপর সোনালি সময়। যারা বুকে রেখেছে পূর্ণ বিশ্বাস, পরকালে কষ্ট হবে না তাদের। পুরস্কার দেয়া হবে চিরকালের জন্যে।’

ডিনার সেরে ওরা ফিরল ড্রইংরুমে। মেইড একটা ট্রেতে করে দিয়ে গেল ব্র্যাণ্ডির ডিক্যাণ্টার ও স্ফটিকের গ্লাস। কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মিস ট্রুলি।

‘আপনার কথা খুব মন দিয়ে শুনলাম,’ গ্লাস ভরা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আর্ম চেয়ারে বসল রানা। ‘কিন্তু অন্য একটা বিষয়েও আপনার সঙ্গে সামান্য আলাপ করতে চাই।’

দু’দিকে দু’হাত বাড়িয়ে দিল বার্কলে। ‘যা খুশি জানতে চাইতে পারো।’

‘একজনের সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই।’

‘তাই? কে সেই মানুষ?’

‘নামটা ক্যাথি হার্বার্ট,’ বার্কলের চোখ দেখছে রানা।

হাঁ করতে গিয়েও মুখ বুজে ফেলল লোকটা। মস্ত এক ঢোক গিলল। 'ওউ? ওহ্!'

'ভাল করেই জানেন, কার সম্পর্কে বলছি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, চিনি ওকে,' শীতল কণ্ঠে বলল বার্কলে। দেখছে নিজ হাতের আঙুলের নখ। 'সে মেরিয়ানের প্রিয় বান্ধবী।'

'আপনার সঙ্গে খাতির নেই ওর।'

কঠোর চোখে রানাকে দেখল বার্কলে। 'এসব বলে কী বোঝাতে চাইছ?'

'জানি, আপনার কাছ থেকে পুরো পঁচিশ হাজার ডলার আদায় করে নিয়েছে, এখন চাইছে আরও দশ মিলিয়ন।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে বার্কলে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি তা হলে এসব জানো?'

'এ-ও জানি, কী হয়েছে পিছলা সিম্পসনের। কিছু তথ্য বাদ পড়ে থাকতে পারে। খুলে বলুন, জ্ঞান বাড়বে আমার।'

'তুমি আসলে কে, মিস্টার রানা?'

'এমন একজন, যে কিনা খুঁজছে সঠিক উত্তর। এমন কেউ, যে থামবে না জবাব না পেলে।'

মদের গ্লাস নাড়ছে বার্কলে। মুখ ফ্যাকাসে। 'আমাকে চমকে দিয়েছ, রানা। এমন বিষয়ে জানতে চাইছ, যেটা বলতে হবে গোপনে।'

'তাতে আপত্তি নেই আমার,' বলল রানা। 'প্রচুর টাকা পাওয়ার খুব কাছে পৌঁছে গেছেন, এখন নিশ্চয়ই চান না বিষয়টা উঠুক মিস ট্রুলির সামনে?'

চুপ করে থাকল স্টিভ বার্কলে।

'উত্তর না দিয়ে পার পাবেন না,' বলল রানা। 'আমাকে সব না বলে উপায় নেই আপনার।'

ড্রইংরুমে ঢুকলেন বয়স্কা মহিলা। পেছনে মেইড, হাতের ট্রেতে কফির জগ, সাদা পোর্সেলিন কাপ ও পিরিচ।

সোফায় বসে বললেন মিস ট্রুলি, 'ভাবছিলাম, আমাদের

নতুন অতিথি খুশি হবে আগামী কালকের শুটিং দেখলে।'

নার্ভাস হাসল স্টিভ বার্কলে। 'আবার কফি কেন?'

মিষ্টি হাসলেন মহিলা। 'রানা, কখনও দেখেছ রাইফেল শুটিং?' ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। 'কী হলো, বার্কলে, শরীর খারাপ? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে ফ্যাকাসে ভূত!'

'ভাল আছি,' বলল বার্কলে, 'তবে খেয়ে ফেলেছি বেশি।'

'কী ধরনের টুর্নামেন্ট?' জানতে চাইল রানা।

মেরিয়ান ট্রুলির সামনে স্বাভাবিক থাকতে চাইছে বার্কলে। 'আমার বাড়ির কাছে প্রতিবছর একবার আয়োজন করি ছোটখাটো একটা শুটিং প্রতিযোগিতা। তবে...'

হাসলেন মিস ট্রুলি। 'ছোটখাটো আয়োজন? ছোট করে দেখাচ্ছ নিজেকে। জর্জিয়া, আলাবামা আর মিসিসিপির সেরা সব শুটার আসে ওই প্রতিযোগিতায়। একেকটা টিকেট বিশ ডলার। জড় হবে কমপক্ষে দুই হাজার মানুষ।'

'দাতব্য সংস্থার জন্যে তোলা হবে টাকা,' হাসি-হাসি চেহারা করল বার্কলে, তাকে দেখাল ভেঙচি-কাটা বাঁদরের মত।

'তাই নাকি!' লোকটার দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'মিস ট্রুলি ট্রাস্ট চ্যারিটি হসপিটালের জন্যে পয়সা তুলব আমরা,' বললেন মহিলা। 'এমন বেশ কয়েকটি সংস্থা আছে আমাদের।' বার্কলের চোখ দেখছে রানা। 'জর্জিয়া ও আলাবামার যেসব গরিব পরিবারের সাধ্য নেই হেল্‌থ্‌ ইন্সুরেন্স করার, তাদের চিকিৎসা-ব্যয় তুলতে আয়োজন হয়েছে ওই রাইফেল শুটিং।' দুঃখিত মুখে হাসলেন মিস ট্রুলি। 'গত গ্রীষ্মে ফ্রি চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে খুলেছি নতুন উইং। ভর্তি করা হচ্ছে ক্যান্সারে আক্রান্ত বাচ্চাদের। এত ভাল কাজ হচ্ছে দেখে ভেবেছি, আরও বড় করব ওই উইং। এ বছরের রাইফেল প্রতিযোগিতা থেকে যে টাকা আসবে, সেসব খুব কাজে লাগবে। আমার আমন্ত্রণে সাড়াও দিয়েছেন কয়েকজন

স্পন্সর।'

'সত্যিই ভাল কাজে ব্যয় হবে টাকা, মিস ট্রুলি,' বলল রানা। ওর চোখ সরল না বার্কলের চোখ থেকে।

'আমার সঙ্গে কিন্তু যাবে, রানা,' বললেন মেরিয়ান। 'দেখো, দারুণ কাটবে সময়।'

লালচে হয়ে গেছে বার্কলের দুই গাল। গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আমার মনে হয়, বিরক্ত হবে রানা। কী দরকার ওকে কষ্ট দেয়ার? তাই বলছি, মিস ট্রুলি...'

'ওখানে সত্যিই দারুণ লাগবে আমার,' এক কথায় সুদক্ষ বক্তা স্টিভ বার্কলের জবান বন্ধ করে দিল রানা।

পঁচিশ

স্যাভানা শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে যাজক স্টিভ বার্কলের বাড়ি। ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে সকাল। জর্জিয়া উপকূলের ভেজা জলবায়ুর জন্যে হাঁফ লেগে যাচ্ছে সবার। সমতল জমিতে আকাশছোঁয়া সারি সারি ওক গাছ। হাইওয়ে থেকে যত দূর চোখ যায়, ঘন সবুজ অরণ্য।

বড় রাস্তার পাশে *শুটিং টুর্নামেন্ট* লেখা ব্যানার দেখে হাইওয়ে থেকে সরু এক ব্যক্তিগত রাস্তায় নামল রানা। চলেছে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। সামনে ও পেছনে কিছু গাড়ি। দু'মাইল যাওয়ার পর বাঁক নিয়ে রানা পৌঁছে গেল বিশাল এক সবুজ ঘাসের মাঠের প্রান্তে। একদিকে রাখা অন্তত তিন শ' গাড়ি। ওটাই পার্কিং লট। ওখানে গিয়ে গাড়ি রাখল রানা। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে পড়েই ঝাপটা খেল কড়া রোদের।

শোফার চালিত লিমো নিয়ে ভোরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন মহা উৎসাহী মিস ট্রুলি। আশা করছেন কয়েক লাখ ডলার পাবেন দাতব্য সংস্থার জন্যে। একের পর এক ফোন এসেছে বলে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেনি রানা, কারা স্পন্সর করছে শুটিং প্রতিযোগিতা। চারপাশ দেখল রানা। পার্কিং লটের একদিকে মিস ট্রুলির রাজকীয় সাদা লিঙ্কন কন্টিনেন্টাল লিমাযিন।

মাইলের পর মাইল জুড়ে স্টিভ বার্কলের ব্যক্তিগত জমি। শুধু সামনের মাঠ কমপক্ষে চার একর। আরও কয়েক একরের হবে আশপাশের অন্যান্য মাঠ। ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে দর্শকরা। কোথাও কোথাও জটলা। ছোট কিছু স্টল ও তাঁবু থেকে বিক্রি হচ্ছে খাবার ও সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক। সবমিলে জড় হয়েছে অন্তত তিন হাজার মানুষ। ভাপসা গরমেও হাসিখুশি সবাই। পরিবেশ পিকনিকের মত। ছোটাছুটি করে খেলছে বাচ্চারা। পেছনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে একদল মা।

সুষ্ঠুভাবেই আয়োজন করা হয়েছে এই অনুষ্ঠান। খবর দেয়া হয়েছে টিভি চ্যানেলে। তাদের লোক আছে প্রধান মাঠের ফটকের পাশে। ব্যস্ত হয়ে ভিডিয়ো তুলছে ক্যামেরাম্যান। মাইক বা প্যাড হাতে এদিক-ওদিক ঘুরছে সাংবাদিকরা।

মস্তবড় মাঠের মাঝে বিশাল রঙিন তাঁবু। চারদিকে লেখা: মেরিয়ান ট্রুলি ট্রাস্ট। একটু দূরে কাগজের প্লেটে খদ্দেরদেরকে ভাজা মুরগির মাংস, মাখন মেশানো পোড়া ভুট্টা, কয়েক ধরনের বার্গার ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পরিবেশন করছে একদল ব্যস্ত তরুণ। আরেক দিকে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের স্টল। আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে যেন দুর্ঘটনা না ঘটে, তাই ওখান থেকে বিলি হচ্ছে গান সেফটি লিফলেট। পাশেই বিক্রি করা হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বই, পত্রিকা, ইয়ার ডিফেণ্ডার, হান্টিং গিয়ার ও শুটিঙের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র।

রোদ থেকে বাঁচতে বেড়ার আড়াল নিয়ে শুটিং রেঞ্জে চোখ বোলাল রানা। চমৎকার সেটআপ। দু'সারি গাছের মাঝে টার্গেট। প্রথমটা এক শ' গজ দূরে, তারপর পাঁচ শ' এবং শেষে এক হাজার গজ দূরে কাগজের টার্গেট। আরও পেছনে মাটির টিলা। ওটা ঠেকাবে বুলেট। নইলে গুলি যেত পরের স্টেট-এ। শুটিং দেখতে আসা দর্শকদের জন্যে দড়ি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আলাদা প্রাঙ্গণ। শুটারদের জন্যে মাটিতে পাশাপাশি পেতে দেয়া হয়েছে ম্যাট ও রাইফেল রেস্ট। প্রধান শুটিং রেঞ্জের সামান্য দূরে চলছে ছোট সব প্রতিযোগিতা। ছোটদেরও আছে রেঞ্জ। সেখানে কীভাবে নিরাপদে গুলি করা যায়, বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছে এনআরএ-র লোক। ব্যবহার করা হচ্ছে ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র।

বিচারকের তাঁবুর পাশের খুঁটিতে বোর্ডে সেঁটে দেয়া হয়েছে মূল প্রতিযোগিতার সঠিক সময় লেখা কাগজ। আজ সকালে শেষ হয়েছে ছোট বোরের অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। একপাশে ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লেখা হয়েছে বিজয়ীদের নাম। অবশ্য, দিনের সেরা আকর্ষণ হচ্ছে ওপেন ক্লাস ফুলবোর রাইফেল শুটিং। ওটা দেখতেই জড় হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। এরই ভেতর ফায়ারিং পয়েন্ট-এ পৌঁছে গেছে শুটাররা। যে যার মত কিট বক্স খুলে ব্যস্ত হয়ে প্রস্তুত করছে ইকুইপমেন্ট।

শুটিঙের ব্যাপারে আগ্রহ নেই রানার। এখানে এসেছে বার্কলেকে বাগে পেতে। আড়ালে সরিয়ে নেবে লোকটাকে, তারপর তার পেট থেকে বের করবে সব কথা।

কী করবে মনে মনে গুছিয়ে নিয়েছে রানা। সহজ পরিকল্পনা। বার্কলে নিজের দোষ স্বীকার না করলে, পিটিয়ে হাড় ভাঙবে তার। জেনে নেবে কোথায় রেখেছে ক্যাথি হার্বার্টকে। মেয়েটা বেঁচে আছে না খুন হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করছে না বার্কলের ভবিষ্যৎ। ওই লোককে মরতেই

হবে মউরোসের অকাল মৃত্যুর জন্যে। সরিয়ে নিয়ে তার মগজে বুলেট গেঁথে দেবে রানা। এবং কাজটা করবে ঠাণ্ডা মাথায়। এরপর সোজা ফিরবে বাংলাদেশে।

বার্কলে এই মুহূর্তে কোথায়, তা নিয়ে ভাবছে রানা। দূরে দেখল বিশাল ম্যানশন। চওড়া বারান্দার বাইরের দিকে সাদা সব পিলার। ওদিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। মন চাইছে, এখনই ওখানে গিয়ে লোকটাকে ধরে।

বাড়িটার ওপর থেকে চোখ সরাতেই একটু দূরে দেখল স্টিভ বার্কলেকে। তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। লোকটা ভিড় বা ক্যামেরা থেকে সরবে না, সেটা ভুলে গিয়েছিল। মেরিয়ান ট্রুলি ট্রাস্টের বড় তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দৈনিক পত্রিকার ফোটোগ্রাফাররা প্রায় ঘিরে রেখেছে তাকে। ঠোঁটে চওড়া হাসি ঝুলিয়ে নিয়েছে বার্কলে। থামছে না নকল ওই হাসি। ওখানেই আছেন মেরিয়ান ট্রুলি। রাজকীয় পোশাক। আজ কাজের শেষ নেই ভদ্রমহিলার। সঙ্গে একদল সহকারী। রানা ওদিকে পা বাড়াতেই ওকে দেখলেন মিস ট্রুলি। হাত নাড়লেন হাসিমুখে। পাল্টা হেসে হাত নাড়ল রানা।

ভদ্রমহিলার কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই রানার চোখে চোখ পড়ল স্টিভ বার্কলের। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা। ভাব দেখে মনে হলো, তার জরুরি কোনও কাজ পড়ে গেছে। হনহন করে হেঁটে মিলিয়ে গেল ভিড়ের ভেতর।

'পরে দেখা হবে,' বিড়বিড় করল রানা।

মিস ট্রুলির কাছে পৌঁছে যেতেই ওর বাহুতে হাত রাখলেন তিনি। 'দারুণ, তাই না? হাজার হাজার দর্শক এসেছে শুটিং দেখতে!' ঝলমল করছে তাঁর চোখ-মুখ। 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই বিশেষ একজনের সঙ্গে।' লালচে-হলুদ চুলের মোটা এক মহিলার দিকে ফিরলেন তিনি। পঁচিশ বছর বয়সী দারুণ আকর্ষণীয় চেহারার এক জাপানি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন মহিলা।

'মিনা, আমাদের ববি কই?' ব্যস্ত সুরে জানতে চাইলেন মিস ট্রুলি।

'ওই যে, বোধহয় পৌঁছে গেছে,' বলল মহিলা।

'অনেক দেরি করে এসেছে,' বললেন মিস ট্রুলি। 'বকা না দিয়ে উপায় নেই।'

রানার চোখে চোখ রেখে হাসল জাপানি মেয়েটি।

ভদ্রতা করে মৃদু নড করল রানা।

'রানা, এসো,' ওর বাহু ধরে রওনা হলেন মেরিয়ান।

পার্কিং লটের দিকে চলল ওরা। গভীর আলাপে তলিয়ে গেলেন মিনা ক্র্যানডন ও মেরিয়ান ট্রুলি। একটু পিছিয়ে পড়েছে রানা। ওর পাশে হাঁটছে জাপানি মেয়েটা।

'আমার নাম তাকিয়োনা মুতিয়ামি,' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'আপনি...?'

'রানা, মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'মেরিয়ান ট্রুলি ট্রাস্টে কাজ করেন?'

মাথা দোলাল সুন্দরী। 'একটু আগে আপনার কথাই বলছিলেন মিস ট্রুলি।'

'তাই? ...নিশ্চয়ই জানেন ববি কে?'

'মিস ট্রুলির প্রটেজিদের একজন,' বলল তাকিয়োনা। 'পয়সা নেই এমন শত শত গরিব ছেলে-মেয়েকে স্কুল ও কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন তিনি। তাদেরই একজন ববি বোবাক। বয়স মাত্র উনিশ, অথচ এরই ভেতর হয়ে উঠেছে জর্জিয়ার সেরা চ্যাম্পিয়ন রাইফেল মার্কস্‌ম্যান। ওর ট্রেনিঙের সমস্ত খরচ দেয়া হয় ট্রাস্ট থেকে। মিস ট্রুলির আশা, একদিন হয়তো পুরো আমেরিকার হয়ে অলিম্পিকে অংশ নেবে ববি।'

'বাহ্, গুড!' বলল রানা।

'এবারের শুটিঙে বিশেষ বাড়তি আকর্ষণ রেখেছেন মিস ট্রুলি। বাজির পটে নিজে থেকে দিয়েছেন এক লাখ ডলার।

একই কাজ করতে অনুরোধ করেছেন বড়লোক বন্ধু ও বান্ধবীদেরও। আশা করছেন, ওসব টাকা জিতে নেবে ববি বোবাক। সেক্ষেত্রে পাবে সে অন্তত পাঁচ লাখ ডলার। সব দিয়ে দেবে শিশু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে। তবে বোবাকের বিরুদ্ধে লড়বে অন্তত পাঁচটা স্টেট-এর চ্যাম্পিয়নরা। এটা ভাবতে গিয়ে বুক কাঁপছে আমাদের।'

'শিশুদের জন্যে উইঙের কথা আমাকে বলেছেন মিস ট্রুলি,' বলল রানা।

বিমর্ষ চেহারায় মাথা দোলাল তাকিয়োনা মুতিয়ামি। 'খুব খারাপ লাগে বাচ্চাদের এত কষ্ট দেখলে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই কি কেউ আছে আকাশে?'

পার্কিং লটে পৌঁছে গেছে ওরা। পোঁতা খুঁটিতে বাঁধা দড়ি দিয়ে সাধারণের গাড়ি থেকে আলাদা করা হয়েছে শুটারদের গাড়ি রাখার জায়গা। খুব কাছে শুটিং রেঞ্জ।

'ওই যে বোবাক,' আঙুল তাক করল তাকিয়োনা।

ওদিকে তাকাল রানা। মার খাওয়া চেহারার পুরনো এক পন্টিয়াক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণাঙ্গ এক তরুণ। পাশেই ওর বন্ধু। সে শ্বেতাঙ্গ। সমানই হবে বয়স। পরনে টি-শার্ট ও হাঁটুর কাছে ছেঁড়া জিন্সের প্যান্ট। নাকের ওপর পুরু কাঁচের চশমা। দেখে রানার মনে হলো, সে যেন গভীর চিন্তায় ডুবে যাওয়া হতাশ বিজ্ঞানী। পেছনের ডালা থেকে বের করেছে রাইফেলের কালো কেস।

'ববি বোবাক আবার চশমাওয়ালা নয় তো?' জানতে চাইল রানা।

ফিক করে হেসে ফেলল তাকিয়োনা মুতিয়ামি। 'না। ওর নাম মিক্কো গোযি। গোলাগুলি ওর কাজ নয়। তবে গিটার পেলে জাদু দেখিয়ে দেয়।'

রানাদের দিকে খেয়াল নেই ওদের। বন্ধুর কথা শোনায় সমস্ত মনোযোগ ববি বোবাকের। ডানহাত রেখেছে গাড়ির

পেছন ডালার ভেতর। ঘাসের মধ্যে রাইফেলের কেস নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মিক্কো গোযি। বোধহয় কৌতুক বলছে সে। হঠাৎ মাথা পিছিয়ে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল ববি। হাসছে মিক্কোও। পুরু লেন্সের ওদিকে বুজে গেছে দুই চোখ। হাসতে হাসতে হঠাৎ গাড়ির পেছনের ডালাটা ধুম্ করে বন্ধ করল ও। লোহার ভারী ঢাকনি ভয়ঙ্করভাবে চেপে বসল বোবাকের ডানহাতের চার আঙুলে।

হাসতে হাসতেই খেঁক-শেয়ালের মত করুণ এক আর্তনাদ ছাড়ল ছেলেটা। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে গুঁজে দিল দুই উরুর মাঝে। নাচতে শুরু করেছে ঘুরে ঘুরে।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলেন মেরিয়ান ট্রুলি। 'হায় ঈশ্বর! দেখি তো, বাছা, কী হয়েছে?'

'সর্বনাশ! কী হয়েছে?' ওদিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠেছে তাকিয়োনা।

প্রচণ্ড ব্যথায় নরকে পৌঁছে গেছে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ। বেচারার আঙুলের কী অবস্থা দেখল রানা। একেবারে থেঁতলে গেছে মাংস। চোট পেয়েছে আঙুলের হাড়। দরদর করে পড়ছে রক্ত।

'আঙুল নাড়তে পারবে?' জানতে চাইল রানা।

সে-চেষ্টা করতে গিয়ে জোরেশোরে বোবার মত গুঙিয়ে উঠল বোবাক।

'বোধহয় ভেঙে গেছে দু'একটা হাড়,' বলল রানা।

'একটু দূরেই ফার্স্ট-এইড তাঁবু,' বললেন মিস ট্রুলি। কড়া চোখে দেখলেন হতবাক মিক্কো গোযিকে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, মুখ ফ্যাকাসে। 'ওরা একবার দেখুক, তবে আমার মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত ডাক্তারের কাছে।'

'মিস ট্রুলি ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা।

তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে গাল কুঁচকে ফেলেছে ববি।

হতাশ সুরে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমার যে আজ এখানে শুটিং করার কথা?'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই লাউডস্পিকারে ঘোষণা দেয়া হলো: একটু পরেই শুরু হতে যাচ্ছে ভারী ক্যালিবারের রাইফেল শুটিং। শুটাররা, দয়া করে যে-যার মত চলে যান ফায়ারিং লাইনে।

সময় নষ্ট না করে ফার্স্ট-এইড তাঁবুতে ঢুকল ওরা। বোবাকের থেঁতলে যাওয়া আঙুল দেখল নার্স। ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে জানাল, দেরি না করে যেতে হবে হাসপাতালে। ওখানে হাতের এক্সরে করাতে হবে বোবাককে।

'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়,' তর্ক করতে চাইল ববি।

'তুমি কি বামহাতি?' জানতে চাইল বয়স্কা নার্স। মাথা নাড়ল তরুণ। 'তা হলে এই আঙুল দিয়ে ট্রিগার টিপতে পারবে না। শুটিঙের কথা ভুলে যাও।'

প্রায় কাঁদতে কাঁদতে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল ছেলেটা। ব্যথা ও হতাশায় ভেঙে পড়েছে। ওর গাড়ির দিকে চলেছে সবাই। পায়ে পায়ে পেছনে চলেছে মিক্কো গোযি। বন্ধুর সর্বনাশ করে দিয়েছে বলে বুক ভেঙে গেছে ওর। এই দুঃখজনক দুর্ঘটনার পরেও খুব শান্ত আছেন মিস ট্রুলি। অবশ্য রানা দেখল, তাঁর চোখে হতাশার ছায়া। নরম সুরে বললেন, 'জরুরি এখন তোমার হাসপাতালে যাওয়া। চিকিৎসা নিতে হবে।'

'কিন্তু লাখ লাখ ডলার ক্ষতি হয়ে গেল আপনার,' বলল বোবাক। 'বাচ্চাদের জন্যে খুলতে পারব না আমরা নতুন উইং।'

'তোমার কিচ্ছু করার নেই, বাছা,' মাথা নাড়লেন মেরিয়ান, 'পরের বছর হয়তো সুযোগ পাব আমরা।'

'বোবাকের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিযোগিতায় নামানো যায় না?' জানতে চাইল তাকিয়োনা মুতিয়ামি। 'ওর

কোনও বন্ধু?'

'বন্ধু বলতে মাত্র একজন,' বিড়বিড় করল ববি, 'কিন্তু মিক্কো তো সামনের দেয়ালেও গুলি লাগাতে পারে না।' চরম হতাশায় মাটিতে পড়ে থাকা ছোট এক পাথর লাথি মেরে দূরে পাঠিয়ে দিল সে।

রেঞ্জ থেকে শুরু হয়েছে রাইফেলের গর্জন। শুটাররা গরম করছে নল। শেষসময়ে আরও নিখুঁত করতে চাইছে নিশানা।

'এখুনি শুরু হবে শুটিং, অথচ বাতিল মাল হয়ে গেলাম,' আফসোস করল ববি বোবাক।

'আমি কি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?' আমতা আমতা করে বলল রানা।

ঝট্ করে ঘুরে ওকে দেখল তরুণ শুটার।

'তুমি, রানা?' বিস্ময় নিয়ে বললেন মেরিয়ান, 'গুলি করতে জানো?'

'একটু-আধটু তো জানিই,' বলল রানা।

পন্টিয়াক গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এখনও ঘাসের ওপর রাইফেলের কেস। ওটার পাশে চলে গেল রানা।

'শেষ রেঞ্জ এক হাজার গজ দূরে,' বলল ববি। আলতো করে ধরে রেখেছে আহত হাত। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'আপনার কি জানা আছে, অত দূরে কতটা ছোট দেখায় টার্গেটি?'

'খুব ছোট,' মাথা দোলাল রানা।

'আপনি যদি চেষ্টা করেন, আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল ববি। 'ব্যবহার করতে পারেন আমার রাইফেল। কিন্তু মনে রাখবেন, দাঁড়াতে হবে আর্ভিন ক্রাল্যের মত পেশাদার শুটারের বিরুদ্ধে। আরও আছেন আলাবামার জন বেঞ্জামিন। উনি ছিলেন মেরিন সার্জেন্ট। স্নাইপারদের ইনস্ট্রাকটার। এঁরা আছেন দুনিয়ার সেরাদের মধ্যে। ভেবে দেখুন, লজ্জার ভেতর পড়বেন কি না।'

কাঁধ থেকে থলির মত ব্যাগ ঘাসে নামিয়ে রাইফেলের কেসের পাশে বসল রানা। খুলে ফেলল ক্যাচ। সহজ সুরে বলল, 'দেখা যাক কী রেখেছ ভেতরে।'

ছাব্বিশ

কেস খুলে ভেতরে স্কোপ লাগানো রাইফেল দেখল রানা। 'ধরে দেখব তোমার রাইফেলটা, ববি?'

'ধরুন না,' বলল বোবাক।

সাবধানে ফোম থেকে রাইফেল নিল রানা। দ্রুত হাতে পরীক্ষা করল অস্ত্রটা। বোল্ট অ্যাকশন উইনচেস্টার মডেল ৭০। চেম্বার .৩০০ এইচ-অ্যাণ্ড-এইচ ম্যাগনাম। অত্যন্ত শক্তিশালী। বাধা না পেলে সরু বুলেট প্রতি সেকেণ্ডে পৌঁছে যাবে দু'হাজার ফুট। এমন এক রাইফেল, বহু দূরের টার্গেটে জাদু দেখিয়ে দিতে পারে দক্ষ শুটারের হাতে। সেরা আগ্নেয়াস্ত্রের একটা। যন্ত্রটা প্রায় নিখুঁত করতে গিয়ে শত শত ঘণ্টা খাটতে হয়েছে গানস্মিথকে। কম্পিটিশন গ্রেড ব্যারেল। দেখার মত অ্যাকশন। যে স্কোপ আছে, ওটার দাম রানার ভাড়া করা পুরনো ক্রাইসলার গাড়ির দ্বিগুণ হবে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ বের করে একটা শলা ঠোঁটে ঝুলিয়েই আবার রেখে দিল রানা যথাস্থানে। হয়ে উঠেছে পেশাদার স্নাইপার। 'রাইফেলের ব্যাপারে আমার জানা দরকার, এমন কোনও তথ্য, বোবাক?'

'পালকের মত হালকা হেয়ার ট্রিগার,' বলল ববি। 'সাবধানে ছুঁতে হবে।'

'ঠিক আছে। যিরো করা হয়েছে কতটা দূরে?'

'পয়েন্ট অভ এইম তিন শ' গজ,' বলল তরুণ।

মাথা দোলাল রানা। রাইফেল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে চোখ রাখল স্কোপে। সন্তুষ্ট হয়ে কেসে রেখে দিল রাইফেল। এবার খুলল ববির অ্যামিউনিশন বাক্স। তুলে নিল দীর্ঘ একটা কার্তুজ। 'নিজের হাতে অ্যামিউনিশন তৈরি করো?'

মাথা দোলাল বোবাক।

ওর চোখে নিজের তৈরি কার্তুজের প্রতি ভালবাসা দেখল রানা। টার্গেট শুটাররা নিজ হাতে নিখুঁত অ্যামিউনিশন তৈরি করতে গিয়ে ব্যয় করে দিনের পর দিন। ব্যবহার করে সেরা খোল, বুলেট ও গান পাউডার, প্রাইমার। পাকা হাতে কাজটা হলে ওই বুলেট হবে নির্ঘাত লক্ষ্যভেদী। অবশ্য শুটারকেও হতে হবে দক্ষ। সাদা কাগজের মধ্যে কালো বৃত্তে ছোট্ট গর্ত তৈরি করবে বুলেট, তাই পরিশ্রম করে শুটার। যার গুলি অন্যদের তুলনায় কালো বৃত্তের যত বেশি কেন্দ্রে থাকবে, সে-ই হবে প্রথম।

একহাজার গজ দূরের মানুষকে গুলি করতে হলে লক্ষ্যস্থির করতে হয় ওপরে। একবার কঙ্গোয় বারো শ' গজ দূরে ভয়ানক বদ এক ড্রাগ-লর্ডের মাথায় তাক করেছিল একজন .৫০ ক্যালিবারের স্নাইপার রাইফেল। অনেকটা উঁচুতে তাক করতে হয়েছিল। ফলে গুলিটা নেমেছিল ওপর থেকে লোকটার চাঁদিতে। ছিঁড়েখুঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল লোকটা। হাইড্রোস্ট্যাটিক শকের ফলে এক শ' গজ দূরে গিয়ে পড়েছিল তার একটা বিচ্ছিন্ন হাত। ওর জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিলার ওপরে অপেক্ষা করেছিল সেই স্নাইপার। নামটা ছিল তার মাসুদ রানা।

অস্ত্রটা দিয়ে আজ মানুষ খুন করতে হবে না। সঠিকভাবে কালো কাগজ ফুটো করলেই হবে। কেমন হালকা মনে হলো রানার এই ফুর্তিভরা পরিবেশ।

‘পারবে ভাবছ, রানা,’ দুশ্চিন্তা নিয়ে জানতে চাইলেন মেরিয়ান ট্রুলি।

‘চেষ্টা করব,’ বলল রানা। ‘অনেক দিন হাতে রাইফেল নিই না।’

‘আমরা তোমার জন্যে প্রার্থনা করব, রানা। ববি, সোজা চলে যাও হাসপাতালে। মিক্কো, গাড়ি চালাতে পারবে, না ড্রাইভারের ব্যবস্থা করব?’

‘শুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাব না,’ বলল ববি। ‘নিজ চোখে দেখতে চাই কী হয়।’

লাউড স্পিকারে এল ম্যাচ রেফারির কণ্ঠ: এবার শুরু হবে ফুল বোর রাইফেলের প্রতিযোগিতা।

‘জলদি চলো,’ বললেন মিস ট্রুলি।

রাইফেলের কেস আর ওর ব্যাগ তুলে নিল রানা। চলল প্রতিযোগীদের সারির দিকে। রানার পিছু নিয়ে এল ববি বোবাক। ব্যথায় লালচে হয়ে গেছে চোখ। বামহাতে চেপে ধরেছে আহত আঙুল। ম্যাচ রেফারির সঙ্গে কথা বলতে গেলেন মিস ট্রুলি। বুঝিয়ে বলার পর নতুন শুটারকে প্রতিযোগিতায় নামতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন ম্যাচ রেফারি।

ফায়ারিং লাইনে হাজির তিরিশজন শুটার। দড়ি দিয়ে ঘেরা এলাকায় ঢুকে নিজের জায়গায় পৌঁছে গেছে রানা। শুটিং ম্যাটের একপাশে নামিয়ে রাখল ব্যাগ, অন্যপাশে রাইফেলের কেস। বের করে নিল উইনচেস্টার রাইফেল। হাতে সময় নেই যে দু’চারটা গুলি করবে, বা গরম করে নেবে ব্যারেল। প্র্যাকটিসের টার্গেট সরিয়ে নিয়ে এক শ’ গজ দূরে নতুন কাগজ লাগিয়ে দিচ্ছে রেঞ্জ অফিসাররা।

কানে ববি বোবাকের ইলেকট্রনিক ইয়ার ডিফেণ্ডার পরে নিল রানা। ম্যাটে শুয়ে তৈরি হলো গুলি করতে। টের পেল, লাফ দিচ্ছে ওর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড। অনেক দিন হলো

হাতে নেয়নি রাইফেল। বড় করে তিনটে দম নিতেই শান্ত হয়ে এল ওর হার্ট বিট।

পাশের ম্যাটের শুটারের দিকে তাকাল রানা। ওই লোকের পাশে সেনাবাহিনীর সবুজ, ধাতব অ্যামিউনিশন বাক্সে লেখাঃ জন বেঞ্জামিন।

এ লোকই মেরিন ফোর্সের স্নাইপার ট্রেইনার সার্জেন্ট। কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। জন বেঞ্জামিনের চোখ বলে দিল, এতকাল শুধু যে কাগজে গুলি করেছে, তা নয়। হাসল লোকটা। তবে ওই হাসি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। স্রেফ ভদ্রতা দেখিয়ে হেসেছে সে। ভাল করেই জানে, জিতে নেবে বাজির কয়েক লাখ ডলার। মন দিল নিজের রাইফেলের দিকে।

মুহূর্তের জন্যে অনিশ্চয়তা বোধ করল রানা। স্কোপের মাঝ দিয়ে দেখল টার্গেট। মাত্র এক শ' গজ দূরেই প্রথম কাগজ। ডিনারের প্লেটের মত। ভেতরে কালো পিরিচে বৃত্তাকার সব রিং। একদম মধ্যে কালো ছোট্ট রিং। শুটাররা বলে এক্স-রিং। বড়জোর কয়েনের সমান। ওখানে লাগলে শুটার পাবে দশ পয়েন্ট। তার পাশের রিঙে লাগলে নয় পয়েন্ট। আরও দূরের সব রিঙে গুলি লাগলে কমতে থাকবে পয়েন্ট।

সহজ আইন মেনে করা হয় রাইফেল প্রতিযোগিতা। প্রথমে এক শ' গজ দূরের টার্গেটে গুলি করবে শুটাররা। তারপর পাঁচ শ' গজে, শেষে এক হাজার গজ দূরে। প্রতিটি টার্গেটে দশটা করে গুলি করবে। নব্বুইয়ের নিচে নম্বর পেলে বাদ দেয়া হবে যে-কাউকে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন। একবার শ্বাস নিয়ে রাইফেলে ম্যাগাযিন ভরল রানা। টেনে নিল উইনচেস্টারের বোল্ট।

চুপ করে অপেক্ষা করছে।

নীরব হয়ে গেছে দর্শকরা।

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল রানা। ফায়ারিং লাইনের বিশ গজ দূরে দড়ির ওদিকে রয়ে গেছেন মেরিয়ান ট্রুলি, তাকিয়োনা মুতিয়ামি, তাদের সহকারীরা, ববি বোবাক আর মিকো গোযি। মিস ট্রুলির কনুইয়ের কাছে স্টিভ বার্কলে। শীতল চোখে দেখছে রানাকে।

গুলি শুরু করতে নির্দেশ দিলেন রেফারি।

সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। চট্ করে কষল ব্যালিস্টিক অঙ্ক। টার্গেটের কয়েক ইঞ্চি নিচে তাক করল ক্রসহেয়ার। লক্ষ্যভেদ করতে হবে তিন শ' গজ দূরে জিরো করা রাইফেল দিয়ে।

ওর বামে 'বুম্!' করে উঠল জন বেঞ্জামিনের রাইফেল। মাযলের কাছে লাফিয়ে উঠল কিছুটা ধুলো।

দম নিয়ন্ত্রণ করল রানা। টার্গেটের ওপর সামান্য উঠছে-নামছে সাইটের ক্রসহেয়ার। একটু সরছে এদিকে বা ওদিকে। ভুরু থেকে রানার চোখে নামতে চায় লোনা জল। মৃদু মাথা নেড়ে ঘাম সরিয়ে দিল চোখ থেকে।

মনের আয়নায় ভেসে এল মউরোসের মুখ। পেভমেণ্টে বোমা বিস্ফোরণে ক্ষত-বিক্ষত কিছু লাশ। দুটো ছবি। ওরা অ্যাবেলিনো থ্যানাটস ও ক্যাথি। নরক ভোগ করছেন হার্বার্ট দম্পতি। স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা জোয়ি। ওর সন্তান কখনও পাবে না বাবার আদর। এসব হয়েছে মাত্র একজন লোভী, ভণ্ড লোকের কারণে। সে স্টিভ বার্কলে। তার দৃষ্টি নিজের ওপর টের পেল রানা।

প্রচণ্ড রাগের প্রতিক্রিয়া নানানভাবে দেখায় মানুষ। কারও নষ্ট হয় মনোযোগ, ভোঁতা হয় চিন্তা, এসব বহুবার দেখেছে রানা। কিন্তু ওর নিজের তা নয় না। রাগের স্রোত অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে জানে ও। বহুগুণ মনোযোগ আসে নিজের কাজে। রাইফেলের প্রতিটি কৌশল মাথায় রেখে শক্ত হাতে অস্ত্রটা ধরেছে ও। তাকাল স্কোপের ভেতর দিয়ে। সাইটের

দৃশ্যটা এখন একদম পাথরের মত স্থির। পরিষ্কার দেখল টার্গেট। রাইফেল মনে মনে তাক করল স্টিভ বার্কলের কপালে।

ট্রিগারটাকে মৃদু স্পর্শ করল রানার তর্জনীর শেষ কড়া। কট্ শব্দে ডেবে গেল বাঁকা, পুরু পাত। রানার কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রাইফেল। ঝাঁকি খেয়ে স্কোপ থেকে সরে গেল ওর চোখ। নতুন করে কালো বৃত্তে ফিরিয়ে আনল নিশানা। স্কোপের মাঝ দিয়ে পরিষ্কার দেখল, কালো কাগজে তৈরি হয়েছে খুব ছোট একটা গর্ত। ওর প্রথম গুলি কেটে দিয়েছে এক্স-রিঙের কিনারা।

একেবারে খারাপ নয়, ভাবল রানা।

অল্পক্ষণেই বুঝল, অনভ্যাসে হারিয়ে যায়নি দক্ষতা।

প্রথম দশটা গুলির পর ত্রিশজন শুটারের মাঝ থেকে বাদ পড়ল সাতজন। বিরতি দেয়া হলো বিশ মিনিটের। এই সময়ে পুরনো কাগজ সরিয়ে পাঁচ শ' গজ দূরে টাঙিয়ে দেয়া হলো নতুন টার্গেট। প্রথম টার্গেটের চেয়ে একটু ছোট দেখাচ্ছে ওটা। তবুও সাইটের মাঝ দিয়ে দেখা গেল ভালভাবেই।

আরম্ভ হলো দ্বিতীয় রাউণ্ড। রানা জানে, পাঁচ শ' গজ দূরে বুলেট লাগাতে হলে বাদ পড়বে অনেকেই। তাই হলো, রয়ে গেল মাত্র নয়জন শুটার। তাদের একজন রানা। ওর মতই টিকে গেছে এক্স-মেরিন স্নাইপার সার্জেন্ট জন বেঞ্জামিন এবং আরও ক'জন নাম করা শুটার। আবারও রানার দিকে তাকাল সে, এখন আর মুখে হাসি নেই।

জন বেঞ্জামিনের দিকে মনোযোগ নেই রানার। চোখ স্টিভ বার্কলের ওপর। শুটিং দেখতে রয়ে গেছে লোকটা। চেহারায় এখন চাপা ভয়। নীরব ভয়ঙ্কর এক বার্তা দিচ্ছে রানার জ্বলন্ত চোখ। মন থেকে চাইছে, ওকে ভয় পেতে শুরু করুক লোকটা। বুঝেও গেছে, ওর নীরব উপস্থিতি কাঁপিয়ে

দিচ্ছে তাকে।

পাঁচ শ' গজের টার্গেট নামিয়ে নেয়ার পর টিকেছে মাত্র কয়েকজন। এবার শুরু হবে সত্যিকারের পরীক্ষা। এমন কী শক্তিশালী স্কোপের ম্যাগনিফায়িং লেন্স দিয়েও খুব ছোট দেখাল এক হাজার গজ দূরের টার্গেট। সাবধানে রাইফেল স্থির রেখে ট্রিগার টিপলেই হবে না, বহু দূরের রেঞ্জে হিসেব কষতে হবে এক শ' রকমের। বাতাস ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে বুলেট, সেটা মাথায় রাখতে হবে। ভুললে চলবে না বুলেটের গতিপথ ও মাধ্যাকর্ষণের টান। দূরে গুলি লাগাতে চাইলে বেশ কয়েক ফুট ওপরে তাক করতে হবে রাইফেলের নল। ওখানেই দক্ষ স্নাইপারের কৃতিত্ব।

গুলি শুরু করার নির্দেশ দিলেন রেফারি। বোল্ট টেনে স্কোপের ভেতর দিয়ে তাকাল রানা। প্রায় দেখাই যাচ্ছে না ছোট্ট টার্গেট। ওটা ছাড়া দুনিয়ার আর সব কথা ভুলে গেছে ও। মনের চোখে দেখছে পয়সার মত কালো কিছু। ওখানে লাগাতে হবে বুলেট।

ট্রিগার স্পর্শ করল রানা। টানল বোল্ট। ছিটকে বেরিয়ে গেল খরচ করা খোল। ঠেলে দিল বোল্ট। চেম্বারে ঢুকেছে নতুন বুলেট। টার্গেটে গুলি পাঠাল রানা। হাতের ভেতর জীবন্ত প্রাণীর মত লাফিয়ে উঠছে রাইফেল। আবারও টেনে নিল বোল্ট। হারিয়ে গেছে ও নিজের গভীর কোনও জগতে। রাইফেল, টার্গেট আর ও ছাড়া যেন কিছুই নেই পৃথিবীতে। ফুটো করতে হবে কাগজের ওই ছোট্ট গোল দাগ। রাইফেল যেন ওর হাতের বাড়তি অংশ। এখন এমন কী অস্তিত্ব নেই স্টিভ বার্কলেরও। এক এক করে গুলি করছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ফুরিয়ে গেছে গুলি। স্কোপ দিয়ে দেখল কেমন হয়েছে ফলাফল।

আস্তে করে চাপা শ্বাস ফেলল। টার্গেটে মাত্র একটা ফুটো, এবড়োখেবড়ো। ওর দশটা গুলি ভেদ করেছে এক্স-

রিং। পারফেক্ট স্কোর। জিতে গেছে ও।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দূর থেকে গল্ফ্ কার্টে চেপে ছুটে এল রেঞ্জ অফিসাররা। তাদের নেতা ফলাফল ঘোষণা দিতেই হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকরা। সমান রেযাল্ট করেছে দু'জন শুটার। একজন রানা, অন্যজন জন বেঞ্জামিন।

রানার দিকে এগিয়ে এল এক্স-মেরিন। হাত বাড়িয়ে দিল। 'দারুণ শুটিং, দোস্ত। কোথা থেকে শিখলে?'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'বাংলাদেশ আর্মি। কমাণ্ডো ট্রেইনিং।'

'আপনারা সমান পয়েন্ট পেয়েছেন,' বললেন রেফারি। 'এবার কী করতে চান?'

রানার দিকে চেয়ে হাসল জন বেঞ্জামিন। 'কী করবে ভাবছ, দোস্ত?'

'আমি যা করতে চাইব, মেনে নেবে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল লোকটা।

'তা হলে এক শ' গজ দূরে রাখা হোক আমার পছন্দের টার্গেট,' বলল রানা। 'গুলি করা হবে মাত্র একবার। যে জিতবে, তাকে বিজয়ী হিসেবে মেনে নেবে অপরজন।'

'মাত্র এক শ' গজ? ঠাট্টা করছ?'

জবাব দিল না রানা।

'ঠিক আছে,' রেফারির দিকে চেয়ে চোখ টিপল বেঞ্জামিন।

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকালেন রেফারি।

এক শ' গজ দূরে থাকবে টার্গেট। দুই শুটার ও রেফারির সঙ্গে চলল কর্তৃপক্ষের কয়েকজন।

এক শ' গজ গিয়ে হঠাৎ ঘাসে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। 'একমিনিট।' জুতোর ফিতে ঠিক করে নিচ্ছে ও। অন্যরা ব্যস্ত দুটো স্ট্যাণ্ডে কাগজের টার্গেট টাঙাবার কাজে।

কাজ শেষ হলে আবারও ফায়ারিং লাইনের দিকে চলল সবাই। রানাও ফিরল নিজের রাইফেলের পাশে। উৎসুক চোখে ওকে দেখছে দর্শকরা। অবাক হয়ে চেয়ে আছেন মিস ট্রুলি। এখনও তাঁর কনুইয়ের কাছে স্টিভ বার্কলে। চোখে শীতল দৃষ্টি। বরফঠাণ্ডা চাহনি ফেরত দিল রানা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ভণ্ড যাজক। চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকাল নিজের পায়ের দিকে।

ম্যাটে শুয়ে পড়ল রানা। চোখ পড়ল এক শ' গজ দূরের টার্গেটে। ঘাড়ে তপ্ত রোদ। গরমে ভেজা দর্শকদের গুঞ্জন ছাপিয়ে তুমুল উৎসাহে চিচিচিকচিক শব্দে ডাকছে ঘুর্ঘুরে পোকা। রানাকেই প্রথমে গুলি করতে বলা হলো।

ঝাড়া তিন মিনিট লক্ষ্যস্থির করার পর ওর তর্জনীর মৃদু স্পর্শে দেবে গেল ট্রিগার। 'বুম্!' শব্দে লাফিয়ে উঠল রাইফেল। টার্গেটের ওপর থেকে সরে গেল স্কোপ।

ক'সেকেণ্ড পর জোর গুঞ্জন তুলল দর্শকরা। অনেকের হাতে বিনকিউলার ও স্পটিং স্কোপ। কিন্তু অবাক কাণ্ড! টার্গেটে রানার গুলির কোনও ফুটোই নেই!

'মিস হয়ে গেছে, দোস্ত,' চওড়া হাসি দিল জন বেঞ্জামিন। 'অনেক দূর দিয়ে গেছে বুলেট।'

স্কোপের ভেতর দিয়ে দেখল রানা। মৃদু হাসল। বলল, 'আমার পছন্দের টার্গেটটা দেখো।'

'একমিনিট!' হঠাৎ বলে উঠল এক স্পটার, 'নিচের দিকে দেখো, নিচের দিকে! কাগজের টার্গেটে গুলি করেনি মিস্টার রানা।'

এবার দেখতে পেয়েছে জন বেঞ্জামিন। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

টার্গেটের সামনে ছেঁটে রাখা খাটো ঘাস। ওগুলো ছাপিয়ে উঁকি দিচ্ছে মাটিতে পুঁতে রাখা দুটো ম্যাচের কাঠি। একটা থেকে আরেকটা তিন ইঞ্চি দূরে। মৃদু হাওয়ায় ওই দুটোর

একটা শলা থেকে জ্বলছে কমলা শিখা।

'গুলি করে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে দিয়েছে বিদেশি শুটার,' চিৎকার করে উঠল এক মধ্যবয়স্ক লোক।

সবই দেখেছে ববি বোবাক। দড়ি সরিয়ে ছুটে এল রানার দিকে। চোখদুটো বিস্ফারিত। বেসুরো হয়ে গেল কণ্ঠ: 'হোলি শিট! আপনি কি মানুষ না অপদেবতা?' হাঁ করে রানাকে দেখছে। দুই সেকেণ্ড পর ঝুপ করে বসে ওর পা স্পর্শ করে কপালে হাত ঠেকাল। 'ওরে বাবা! আপনি আমার চিরকালের ওস্তাদ!'

বেড়ে উঠেছে দর্শকদের গুঞ্জন। হতবাক হয়ে রানাকে দেখছে অনেকে। 'বুড়ো হয়েছি প্রতিযোগিতায় রেফারিং করতে করতে, কিন্তু এর চেয়ে ভাল শুটিং আর দেখিনি,' বললেন রেফারি। চাপড়ে দিলেন রানার কাঁধ। 'এক কোটিবারেও কঠিন একবার এমন শুটিং করা।'

'এটা সম্ভব?' বলল বেঞ্জামিন। 'ওখানে যখন ছিল, তখন বোধহয় আগুন জ্বেলে এসেছে।'

মাথা নাড়লেন রেফারি। 'উপায় ছিল না। এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যেত কাঠি। এ কারণেই এবারের শুটিঙে বাড়তি সময় নিয়েছিলে, তাই না, মিস্টার?'

মৃদু হাসল রানা।

'এক শ' গজ দূর থেকে গুলি করে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে দেয়া?' বিড়বিড় করল ববি বোবাক। চোখ পিটপিট করতে করতে উঠে দাঁড়াল। ব্যথা ভুলে মুখে এখন চওড়া হাসি।

'এবার তোমার পালা,' বেঞ্জামিনকে বলল রানা। 'এখনও রয়ে গেছে দ্বিতীয় ম্যাচের কাঠি।'

'কোত্থেকে শিখলে এমন দুর্দান্ত শুটিং?' শ্বাস ফেলল এক্স-মেরিন সার্জেন্ট।

'বাংলাদেশ আর্মি,' একই জবাব দিল রানা, 'কমাণ্ডো ট্রেনিঙে।'

‘ইউএস আর্মিতে এসব শেখায় না।’ আফসোস করে মাথা নাড়ল জন বেঞ্জামিন। নামিয়ে ফেলল মেরিন স্নাইপার রাইফেল। ‘আমার সাধ্য নেই শুট করব তোমার মত। চেষ্টাই করব না। ভাল করেই জানি কখন হার মেনে নিতে হয় সত্যিকারের ওস্তাদের কাছে।’ রানার হাত ধরে জোরেশোরে ঝাঁকাতে লাগল সে।

‘এই বেচারার মাত্র একটাই ডানহাত, ওটা আস্ত রাখো, দোস্ত,’ কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা।

লজ্জা পেয়ে ওর হাত ছাড়ল প্রাক্তন মেরিন।

প্রতিযোগিতা শেষ।

রাইফেলটা কেসে রাখল রানা। ল্যাচ লাগিয়ে ববির কাছে ফেরত দিল কালো কেস। বামহাতে ওটা ধরেছে তরুণ। বেদম ব্যথা সহ্য করেও হাসছে খুশিমনে।

কর্তৃপক্ষের জটলার কাছে রানা যেতেই এগিয়ে এলেন মিস ট্রুলি। জড়িয়ে ধরলেন ওকে। কানে ফিসফিস করে বললেন, ‘রানা, এতই ভয়ে ভয়ে ছিলাম, আরেকটু হলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতাম।’

‘এবার ববিকে পাঠাতে হবে হাসপাতালে,’ মনে করিয়ে দিল রানা। টের পেল, পাশেই কে যেন। ঘুরে দেখল সুন্দরী তাকিয়োনা মুতিয়ামি, চোখে তার অকুণ্ঠ প্রশংসা।

‘ওকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাব হাসপাতালে,’ বলল মেয়েটা। ‘লজ্জায় পালিয়ে গেছে মিক্কো গোযি। আপাতত ওর দেখা পাব না।’

মৃদু নড করল রানা। ‘থ্যাঙ্ক ইউ।’ ববি বোবাকের দিকে তাকাল ও। ‘আঙুলের যত্ন নিয়ো।’

‘নেব। তবে একটা কথা, যা দেখালেন, এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।’ বোবাকের বাহু ধরে পার্কিং লটের দিকে রওনা হয়ে গেল মুতিয়ামি, এখনও রানার বিজয়ে হাসছে খুশিতে।

রানার বাহু আঁকড়ে ধরে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন মিস ট্রুলি। এমনসময় হাজির হলেন ম্যাচ রেফারি। রানাকে বললেন, 'চলুন, বুঝে নেবেন পুরস্কার। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে সাংবাদিকরা।'

'পরে,' বলল রানা। ভিড়ের মাঝে কাকে যেন খুঁজছে ওর চোখ। একটু আগে যেখানে ছিল স্টিভ বার্কলে, ওই জায়গায় কেউ নেই। 'বার্কলে কোথায় গেলেন?' মিস ট্রুলির কাছে জানতে চাইল ও।

'বাড়িতে। বলল, ফোন এসেছে। কিন্তু... তুমি, রানা... পুরস্কার ফেলে চললে কোথায়?'

'জরুরি একটা ব্যাপারে আলাপ আছে মিস্টার বার্কলের সঙ্গে। এখুনি না গেলেই নয়।'

সাতাশ

দূর থেকে রাজকীয় মনে হয় স্টিভ বার্কলের প্রাসাদ। সামনে নিয়ো-ক্লাসিক ফ্যাসেড ও পাথরের দীর্ঘ সাদা সব কলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠে সদর দরজা পেরিয়ে গেল রানা। সামনেই পড়ল হলওয়ে। ঠিকভাবে মেরামত হয়নি পুরনো বাড়ি, নইলে থাকত মিস ট্রুলির ম্যানশনের মতই রাজসিক।

সামনের একটা দরজা পেরিয়ে এল এক মেয়ে। বোধহয় স্টাফ, হাউসকিপার অথবা পিএ। রানাকে দেখে বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ।

'বার্কলে কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি কে?'

‘গেছে কোথায়?’

‘জানি না,’ মাথা নাড়ল মেয়েটা। তবে ওর নার্ভাস চোখ গেল একটু দূরের পেঁচানো সিঁড়ির ওপর। আর কিছু জানার দরকার নেই রানার। মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে একেকবারে টপকাতে লাগল দুটো করে সিঁড়ির ধাপ। পেছনে আপত্তি তুলছে মেয়েটা। ওকে পাত্তা না দিয়ে ওপরতলায় উঠে এল রানা। সামনেই গ্যালারি। দু'পাশে সারি সারি ঘরের দরজা। প্রথমটা খুলে দেখল রানা। ভেতরে কেউ নেই। দরজা খুলতে খুলতে এগোল ও।

চতুর্থ দরজা খুলতেই মস্ত ঘরের পেছনে এক ডেস্কে স্টিভ বার্কলেকে পেল রানা। দড়াম করে কবাট বন্ধ করে চলল ডেস্কের দিকে। বুঝে গেছে, এটা লোকটার স্টাডিরুম। নেই পর্যাপ্ত আসবাবপত্র। দেয়ালে কিছু দাগ আছে শুধু— ওখানে আগে ঝুলত বড় পেইন্টিং। দারিদ্র্যের ছাপ সব কিছুতে। এখনও মেরিয়ান ট্রুলির কাছ থেকে এক শ' মিলিয়ন ডলার পায়নি লোকটা।

রানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল স্টিভ বার্কলে। একটু কাঁপছে সে। ডেস্কে আধখালি বুর্বোনের বোতল আর একটা গ্লাস।

‘আমাদের ভেতর কথা আছে, তা ভুলে গেছ?’ বলল রানা।

চামড়া মোড়া চেয়ারে বসে পড়ল বার্কলে। ডেস্কের কোণে বসল রানা। দু'ফুট দূরে যাজক।

ধুম্ করে খুলে গেল ঘরের দরজা। প্রায় দৌড়ে ভেতরে ঢুকল প্রকাণ্ড দুই লোক। পরনে সুট। রানাকে দেখে গম্ভীর হলো চেহারা। বাদামি লোকটা ঝামেলা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ‘স্যর, কোনও সমস্যা?’

‘ওদের ফেরত পাঠাও,’ বলল গম্ভীর রানা। ‘নইলে ওদের হাত-পা ভাঙার দায় তোমাকেই নিতে হবে।’

হাতের ইশারা করল বার্কলে। ‘সব ঠিক আছে। তোমরা

যাও।'

রানাকে একবার দেখে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকদু'জন। পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

'তুমি বাইবেলের ব্যাপারে আলাপ করতে আসোনি,' বলল বার্কলে।

'না, জানতে এসেছি তোমার পেটের কথা। গোপন করবে না কিছুই।'

'না হলে?'

ক্যানভাস ব্যাগ থেকে .৪৭৫ লাইনবাউ রিভলভার বের করল রানা। সরাসরি তাক করল বার্কলের বুকে। 'আগেই দেখেছ, এক হাজার গজ দূরের টার্গেটে লাগাতে পারি বুলেট। এই দূরত্বেও তোমাকে লাগাতে পারব।'

'বুঝলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্কলে। 'এসো, আলাপ করা যাক।'

'ক্যাথি হার্বার্ট কোথায়?'

'চাইলেও এর জবাব দিতে পারব না।'

'ভালভাবে ভাবো, নইলে প্রথমে যাবে তোমার পা দুটো।'

'আগেই বলেছি, জবাব দিতে পারব না। জানিই তো না ওই বদমাশ মেয়ে কোথায় গেছে।'

'আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে যেয়ো না,' বলল রানা।

'ভাবলে কী করে যে আমি কিছু করেছি?'

'ওই মেয়ে ব্ল্যাকমেইল করছিল তোমাকে। ঠিক করেছিলে আর টাকা দেবে না।'

'দিয়েছি তো,' প্রতিবাদের সুরে বলল বার্কলে, 'দ্বিধা করিনি। ক্যাশ টাকা পেলে বাকিটাও দেব। আগেই বলেছি, দেব। আমি এককথার মানুষ।'

নল উঁচু করে বার্কলের মাথায় রিভলভার তাক করল রানা। নীরব ঘরে ক্লিক্ আওয়াজে কক হলো হ্যামার।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে বার্কলের ভুরুতে। ভয় নিয়ে চেয়ে

আছে রিভলভারের মাযলের দিকে। 'মস্তবড় কোনও বিপদে পড়েছে মেয়েটা, তাই না? কী করেছে?'

'আমার কাছে জানতে চাইছ?'

'ওর কোনও ক্ষতি করিনি,' বলল বার্কলে। কাঁপা কণ্ঠে ভয়। 'শুধু অনুসরণ করতে পাঠিয়েছি দু'জনকে।'

'গ্রিস পর্যন্ত গেছে তারা। পরের ঘটনা আমার জানা আছে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল বার্কলে। 'বুঝলাম না তোমার কথা।'

'খেলা বন্ধ করো, বার্কলে।'

'তুমি বললে গ্রিসের কথা। এসবের ভেতর গ্রিস এল কোত্থেকে?'

'গ্রিসে বোমা রেখেছিলে বলে খুন হয়েছে আমার বন্ধু জ্যাঁ মউরোস,' গুড়গুড় করে উঠল রানার কণ্ঠ। 'লোক দিয়ে খুন করিয়েছ অ্যাবেলিনো থ্যানাটসকে। কিডন্যাপ করেছ ক্যাথি হার্বার্টকে। কান পেতে শোনো, মারা পড়েছে তোমার পাঠানো দুই খুনি ক্রিস্টিনা পার্কার আর ব্রয়েটার ব্ল্যাকউড।'

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে হতবাক স্টিভ বার্কলের।

'ভাল করেই জানি, তোমার লোক ভেঙে দিয়েছে পিছলা সিম্পসনের পাদুটো,' বলল রানা।

ডানহাত ওপরে তুলল বার্কলে। 'একমিনিট! মস্ত কোনও ভুল করছ, রানা। ক্রিস্টিনা আর ব্ল্যাকউডের নাম বাপের জন্মেও শুনিনি। এ-ও জানি না, মউরোস আর থ্যানাটস কে। তবে ওই পিছলা সিম্পসন— ওকে চিনি। কিন্তু ওর ঠ্যাং ভাঙতে লোক পাঠাব কেন? ওকে তো নগদ টাকা দিয়েই দিয়েছি। আমি শুধু মিস ট্রুলির ম্যানশনে আমার ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে চোখ রাখতে পারে ওই বেশ্যা মেয়েটার ওপর।'

প্রথমবারের মত দ্বিধায় পড়ল রানা। বুকের দিকে অস্ত্র ধরলে ঘাবড়ে যায় সাধারণ মানুষ। গুলি করা হবে জানলে

দেরি করে না পেটের সব উগরে দিতে। বার্কলেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। সত্য বলছে প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তা হলে এর কথা সত্যি হয় কীভাবে! 'মিথ্যা বলছ, বার্কলে!'

মাথা নাড়ল ভণ্ড যাজক। 'একফোঁটা মিথ্যা বলছি না।' হাত তুলে মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করল। 'যা জানি, সবই বলব। তবে আগে সরাও ওই কামান। যখন-তখন আমার ইয়ে বেরিয়ে যাবে।'

হ্যামার নামিয়ে রিভলভার সামান্য নিচু করল রানা।

খুক-খুক করে কেশে নিল বার্কলে, বুর্বোনের বোতল তুলে ঢকঢক করে গিলল মদ। বোতল নামিয়ে বামহাতে মুছল ভুরুর ঘাম।

'একদম প্রথম থেকে শুরু করো,' বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ বার্কলে। 'তুমি তো জানো, মিস ট্রুলির কাছ থেকে পুরো এক শ' মিলিয়ন ডলার আসছে আমার কাছে। জানা নেই আমার, কীভাবে জানলে। জানতে চাইও না।'

মাথা দোলাল রানা। 'বলতে থাকো।'

'টাকার অভাব নেই মিস ট্রুলির। টাকার কুমির বললেও ভুল হবে, উনি হাজার হাজার কোটি টাকার নীল ড্রাগন। অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর, যিশু আর বাইবেলকে। সত্যিকারের ভাল ক্রিশ্চিয়ান। মেরিয়ান যখন বললেন, আমার সংগঠনে এক শ' মিলিয়ন ডলার দেবেন, খুব খুশি হলাম। তুমিও খুশি হতে হঠাৎ আকাশ থেকে এত টাকা পড়লে। কিন্তু একটু পর মহিলা বললেন, তাঁর ইচ্ছে সত্ত্বেও আপাতত দিতে পারবেন না এক পয়সাও। সব টাকা আটকে আছে নানান হোল্ডিং, ট্রাস্ট আর রিয়াল এস্টেটের ব্যবসায়। এমন নয় যে চাইলেই যে কাউকে লাখ লাখ ডলার দিতে পারবেন। এসব শুনে একদম দমে গেলাম।'

'আর তারপর উদয় হলো ক্যাথি হার্বার্ট,' বলল রানা। 'ঘাবড়ে গেলে, মেরিয়ান ট্রুলির কান ভাঙাবে ওই মেয়ে। পরে আর পাবে না ওই এক শ' মিলিয়ন ডলার।'

'হ্যাঁ, ভয় পেলাম,' রেগে গেছে বার্কলে। 'ক্যাথির মত শয়তান ডাইনী জীবনেও আর দেখিনি। কখন যে কী করে বসবে, তার ঠিক নেই। টাকা পাব ভাবছি, এমনসময় ইংল্যাণ্ড থেকে এসে মেরিয়ানের কোল জুড়ে বসল বদমাইশ বেটি। বলতে লাগল, দুর্দান্ত এক প্রজেক্টে কাজ করতে চায়। সেজন্যে চাই বড় ফাণ্ড। কোটি কোটি টাকা লাগবে। এসব শুনে পাথর হয়ে গেলাম। এমনিতেই মেরিয়ানের স্বামী, ছেলে-মেয়ে নেই। এখন যদি সব দিয়ে দেয় ওই বেশ্যাকে, ঠেকাতে পারব? ওদের সম্পর্কও মা-মেয়ের মত। এ অবস্থায় তুমিও আমার মতই হিসাব কষতে, রানা। বুঝে গেলাম, ওই বেশ্যার কাছে হেরে যাব।' আরেক ঢোক বুর্বোন গিলল বার্কলে। 'তারপর যখন সত্যিই দেখলাম ওই বেশ্যাকে, বুঝে গেলাম— মহিলাকে নয়, তাঁর কোটি কোটি টাকা ভালবাসে সে। বড় বড় কথা বললে হবে কী, সব আসলে মিথ্যা। বেশ্যাটা চায় দামি দামি মদ গিলবে আর যার-তার সঙ্গে শোবে। ওকে তুলনা করা যায় লোভী স্বর্ণসন্ধানীর সঙ্গে।'

'ওকে চিনতে পেরেছ, কারণ তুমি নিজেও তা-ই,' বলল রানা।

রাগের আগুন জ্বলে উঠল বার্কলের দু'চোখে। 'বলো, কী করা উচিত ছিল আমার? দিতে চাইছে নিজে থেকে অত টাকা, মানা করে দেব? দশ বছর হলো প্রকাশ করেছি আমার বই। যা পেয়েছি, সব শেষ। ধার নিয়েছি অনেকের কাছ থেকে। ভীষণ চাপ আসছে আমার ওপর। কীভাবে সংগঠন চালাব ভাবতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। এর ভেতর কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে বেশ্যা ইংরেজ মেয়েটা।'

'বাড়ির আসবাবপত্র আর পেইণ্টিং বিক্রি করছ অনেক

দিন ধরে,' বল্‌ল রানা।

'উপায় নেই। ফক্কির হওয়ার দশা আমার। মিস ট্রুলি ওই টাকা দেবেন, সেই আশায় বসে আছি। টাকা না পেলে সব বিক্রি করে ভিক্ষার থালা হাতে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।'

'ফালতু পেঁচাল বাদ দিয়ে মূল কথায় এসো,' বলল রানা।

'ঠিক আছে। মিস ট্রুলির সামনে ধার্মিক হয়ে ওঠে মিস হার্বার্ট। ওর চেয়ে ভাল মেয়ে নেই। পরনে লম্বা স্কার্ট, ফুল হাতা ব্লাউয। যাচ্ছে খ্রিস্টানদের সব ধর্মানুষ্ঠানে। কিন্তু জেনে গেলাম, শহরের শতখানেক যুবকের চাহিদা মিটিয়েও ওর নিজের খাঁই মেটে না।'

'এসব জেনেছ তোমার লোকদের কাছ থেকে?'

মাথা দোলাল বার্কলে। কপাল থেকে মুছল ঘাম। 'ক্যাথি হার্বার্টের পিছু নিল আমার দু'জন লোক। জানলাম সব। বুঝে গেলাম, পচাতে হবে মেয়েটাকে। কাদা ঘাঁটতেই বেরিয়ে এল সব। মিস ট্রুলির আড়ালে তাঁরই গেস্টহাউসে চলত রাতের পর রাত যৌনানুষ্ঠান। একইসঙ্গে মিলিত হতো দুই থেকে তিনজন যুবকের সঙ্গে। তাদেরই একজন পিছলা সিম্পসন। এতজন, নাম মনে রাখা যায় না। সাড়া ফেলে দিয়েছিল স্যাভানা শহরের যুব সমাজে।'

এরপর কী বলবে বার্কলে, বুঝে গেছে রানা। 'তাই লোক দিয়ে ক্যাথির কীর্তি ভিডিয়ো করালে। ওসব দৃশ্য দেখিয়ে তিক্ত করে দিলে মিস ট্রুলির মন।'

'জানতে পারেননি, কে পাঠিয়ে দিয়েছে ওই ভিডিয়ো,' বলল বার্কলে। 'চিঠিতে লেখা হয়েছিল: "*আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, মিস ট্রুলি।*" কাউকে কিছু বলেননি। কিন্তু পরেরবার ডিনারে গিয়ে টের পেলাম, পরিবেশটা ঝড়ের আগের মুহূর্তের মত থমথমে। বুঝলাম, রেগে গেছেন তিনি। আমার লোকের করা ভিডিয়ো কাজ করেছে ঠিকভাবে।

আবারও আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন মিস ট্রুলি। ওই এক শ' মিলিয়ন ডলার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।'

'কিন্তু তোমার ওপর খেপে গেল ক্যাথি,' বলল রানা।

'বুঝল, যেভাবেই হোক মিস ট্রুলিকে বিগড়ে দিয়েছি। এর ক'দিন পর আমেরিকা ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা। ভাবলাম, এ জীবনে আর নাম শুনব না বেশ্যাটার। কিন্তু কয়েক দিন পরেই ফোন করল মড়াখেকো কুত্তীটা।'

'জানি। পঁচিশ হাজার ডলার চেয়ে বসল। পরে নেবে দশ মিলিয়ন।'

'তা হলে তো সবই জানো,' বলল বার্কলে। 'দিয়ে দিলাম পঁচিশ হাজার ডলার। বলে দিলাম, টাকা পেলে তখন বাকি অংশও দেব। কোনও সমস্যা নেই।'

'এত সহজে দিয়ে দেবে? কেন?'

'জানতে চাইছ কেন? মিথ্যা তো বলিনি। দেব বলেছি, তাই দেব। কিন্তু এরপর যা হয়েছে, সেসবের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এবার, তুমি কিছু না মনে করলে বিদায় নাও। অনেক কাজ পড়ে আছে।' উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে লোকটা।

'বসো, কথা আছে,' আবার রিভলভার তুলল রানা।

'বিশ্বাস করছ না আমার কথা?'

'পরের সব জানাও। কী ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে এত টাকা দিতে রাজি হলে?'

ধপ্ করে চেয়ারে বসল বার্কলে। 'ও, এজন্যেই গতকাল রাতে ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে এত কথা বলেছিলে?'

'উকিল পিছলা সিম্পসন যে বাক্স এনেছিল, ওটার ভেতর কী ছিল?'

'একটা হাঁড়ির টুকরো। আর কিছু না।'

রানার মনে পড়ল, অক্সফোর্ডের সামারটাউনে লাঞ্চের সময় প্রফেসর হার্বার্ট বলেছিলেন, প্রাচীন কিছু পটারি খুঁজে

পেয়েছে ক্যাথি।

'দশ মিলিয়ন ডলার কেন দিতে হবে মৃৎশিল্পের ভাঙা টুকরোর জন্যে?' জানতে চাইল রানা।

'জানি না,' বলল বার্কলে।

'ফাজলামো করছ?' কঠোর হলো রানার চোখ। 'হাঁড়ির টুকরো দেখাল, আর পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে দিলে— এর কী ব্যাখ্যা?' আবারও হ্যামার ওপরে তুলল। 'ঝেড়ে কাশো।'

'কার্বন ডেট করিয়ে দেখেছি আমি ওটা,' বিমর্ষ মুখে বলল বার্কলে। 'ওটা ওই সময়ের।'

'কোন্ সময়ের?'

মুখ নিচু করল বার্কলে। 'ওই হাঁড়ির টুকরো বুক অভ রেভেলেশন লেখার আমলের।'

'তো?'

'ওই টুকরো দেখিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ওই সময়ের অনেক কিছুই আছে ওর কাছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্কলে।

'কী আছে?'

'প্রমাণ। বেশ্যাটা হুমকি দিয়েছে, তার কাছে আছে প্রাচীন গ্রিসের সব মৃৎশিল্প। ওখানে লেখা আছে বিবলিকাল সব তথ্য। প্রমাণ করে দেবে, সেন্ট জন কখনও বুক অভ রেভেলেশনের লেখক ছিলেন না।'

'তো?'

'তাতেই তো সব। আমার মাথায় বাজ ফেলেছে ওই হারামজাদী। বাড়তি আর কিছু জানা নেই। বেটির কথা অবিশ্বাস করে মরতে চাই না। সত্যিই যদি ফাঁস করে দেয় বুক অভ রেভেলেশন ভুয়া, আমি শালা শেষ।'

'মিথ্যা প্রমাণিত হবে, সন্ত জনের সঙ্গে স্বপ্নে কথা হয়নি তোমার।'

চোর-চোর চেহারা করে মাথা নাড়াল বার্কলে।

মৃদু হাসল রানা। 'তা হলে বলছ, আসলে সন্ত জনের

সঙ্গে কথা হয়নি তোমার?'

'পুরনো আমলের লোক...' বিড়বিড় করল বার্কলে, 'মরেছে দু'হাজার বছর আগে। কথা বলব কী করে?'

'হুম্।'

'বইয়ে নিজের কথায় জোর দিতে তাকে টেনে এনেছি,' কাতর সুরে বলল বার্কলে। 'নইলে আমার কথা শুনত না কেউ। মানত না আমি শেষ সময়ের সেরা বাইবেল প্রচারক।'

'তাই মিথ্যা লিখলে? বোকা বানাতে চাইলে সবাইকে?'

'বুক অভ রেভেলেশনের ওপর ভর করে লিখেছি ওই বই। সব ভেস্তে যেত ওই বেশ্যার মাত্র এক তুড়িতে।' উদাস হয়ে জানালা দিয়ে দূরে তাকাল বার্কলে। 'আমেরিকার অন্তত দশ লাখ মানুষ মনে করে, সন্ত জনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে আমার। নিজে বলেছে: সে-ই লিখেছে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী। এদিকে শত শত বছর ধরে থিয়োলজির স্কলাররা প্রমাণ খুঁজছে, ওটা লিখেছে অন্য কেউ। এখন কোথা থেকে এসে মাটি খুঁচিয়ে একগাদা হাঁড়ি বের করে আমার পোঁদে বাঁশ দিতে চাইছে ওই শয়তান বেশ্যা বেটি।'

'বাহ্, মুখটাকে তো পালিশ করে ফার্স্টক্লাস বানিয়েছ!' প্রশংসা ঝরল রানার কণ্ঠে। 'তাহলে সব গোপন রাখবে ও দশ মিলিয়ন ডলার পেলে?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বার্কলে। 'আমাকে তা-ই বলেছে। ঝুঁকি নেয়ার সাহস নেই। দুই পয়সার ছাত্রী নয়, নামকরা স্কলার। নিজে লিখেছে অ্যাকাডেমিক বই। তার কথা বিশ্বাস করবে না, এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে। যদি টিভিতে বলে, ওর কাছে প্রমাণ আছে? আর তারপর সত্যিই যদি প্রমাণ করে দেয়? তখন? ওর এককথায় মাটিতে মিশে যাব আমি। শেষ হবে আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার সব আশা।'

'হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে এক শ' মিলিয়ন ডলার।'

দুঃখিত চেহারায় মাথা দোলাল বার্কলে। 'ফোনে আমাকে বলেছিল, সব বলে দেবে মিস ট্রুলিকে। প্রমাণ করে দেবে, আমি আসলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঠকবাজ।'

'কথা মিথ্যা নয়,' বলল রানা, 'নিজেই স্বীকার করেছ।'

জানালা দিয়ে দূরে চেয়ে রইল বার্কলে। কিছুক্ষণ পর ঘুরে তাকাল রানার চোখে। 'ঠিকই বলেছ। আমি ঠকবাজ। প্রতারক। কিন্তু এর বেশি কিছু নই। কারও ক্ষতি করিনি। কাউকে পাঠাইনি গ্রিসে। বোমা ফাটানো আর পা ভাঙার ব্যাপারে জড়িত নই। মাত্র দু'বার দেখেছি উকিল পিছলা সিম্পসনকে। যখন বাক্সটা নিয়ে এল, আর আরেকবার টাকা দেয়ার সময়। ব্যস। টাকা দেয়ার পর চলে যায় সে।' লালচে হয়ে গেল বার্কলের গাল। ডেস্কের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল। 'আমি বাইরে যাব। চাইলে গুলি করো, আপত্তি নেই। তবে গুলি করলে মনে রেখো, নিরপরাধ লোককে খুন করেছ।'

'পরে যদি বুঝি মিথ্যা বলেছ, আবারও ফিরব আমি,' বলল রানা, 'সেক্ষেত্রে খুন হবে। এক হাজার গজ দূর থেকে মরবে, না কাছ থেকে গুলি খেয়ে, টেরও পাবে না। কথাটা মাথায় রেখো।'

স্টিভ বার্কলেকে দরজার দিকে যেতে দেখল রানা। বুঝে গেছে, একটা কথাও মিথ্যা বলেনি আতঙ্কিত ওই লোক। মস্ত ভুল ভেবেছে ও।

আটাশ

প্রথম যখন রাজনীতির কর্দমাক্ত মাঠে হাঁটতে থাকেন সিনেটর হেনরি শোফেল্ড, তিনি ছিলেন অতি বড়লোক বাবার নির্বোধ, উচ্ছৃঙ্খল সন্তান। মনে আশা, হবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাঁর বাবা মন্ট্যানার কাঠুরে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে হয়েছিলেন কোটিপতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তবে তাঁর ছেলে হেনরি জীবনেও কোনও পরিশ্রম করেননি। ব্যবসায় মন দেয়ার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক জরুরি ছিল ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়া। সময় কাটিয়েছেন গল্‌ফ্‌ বল গর্তে ফেলা বা শতখানেক বান্ধবী নিয়ে তুমুল আড্ডায়। এ ছাড়া আছে মাছ ধরা ও প্রিয় পোর্শে ৯৫৯ নিয়ে ঝড়ের বেগে বহু দূরে চলে যাওয়া।

গত দু'বছর আগের কথা। হেনরি শোফেল্ডের চিফ অভ স্টাফ, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও তাঁর কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার রনসন থর্ন ভাবছিল, তার বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বছর, তাই এখনও সুযোগ আছে নতুন ক্যারিয়ার গড়ে নেয়ার। যে রাজনীতিকে মজার খেলা মনে করে, তার কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিত। চরম বোকামি হচ্ছে আস্ত গাধা হেনরি শোফেল্ডের পেছনে পরিশ্রম দিয়ে।

হতাশ হয়ে পদত্যাগ করবে ঠিক করেছে, এমনসময় ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। বলা উচিত, আসলে দুটো ঘটনা। তাতেই পাল্টে গেলেন হেনরি শোফেল্ড। আর এ কারণেই জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগ পেয়ে গেল রনসন থর্ন।

হেনরি শোফেল্ডের পঞ্চাশতম জন্মদিনের মাত্র ক'দিন পর

ঘটল প্রথম ঘটনা। ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে মণ্ট্যানায় বাড়ি ফিরবেন বলে এয়ারপোর্টে বিমানে উঠবেন হেনরি, এমনসময় হঠাৎ করেই তাঁর মনে হলো: উচিত হবে না বিমানে ওঠা। মাথার ভেতর কে যেন বলে উঠল: প্রাণে বাঁচতে চাইলে ভুলেও উঠবে না ওই বিমানে। খুব অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, উঠছেন না বিমানে। পরের বিমানে ফিরবেন বাড়ি। পনেরো মিনিট পর রানওয়ে থেকে আকাশে উঠতে গিয়ে ক্র্যাশ করল ওই বিমান। বাঁচল মাত্র কয়েকজন। তাঁর জীবনে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তা দশ মুখে বলতে লাগলেন তিনি।

দ্বিতীয় ঘটনা তাঁর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন তিনি। গতি তুমুল। উড়ে চলেছে পোর্শে গাড়ি। সামনেই একটু দূরে বাঁক। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, ব্রেক কষে থেমে যেতে হবে। দেখবেন সূর্যাস্ত আর সোনালি-নীল আকাশ। গাড়ি থামিয়ে পুরো দশ মিনিট প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলেন তিনি। তারপর পোর্শে নিয়ে ছুটে চললেন বাড়ির দিকে। এক মাইল যাওয়ার পর চমকে গেলেন চ্যাপ্টা হওয়া এক বাস দেখে। পাহাড়ি ভূমিধস প্রায় পিষে দিয়েছে বাসটাকে। ঊনচল্লিশজন যাত্রীর মধ্যে বাঁচল মাত্র তিনজন। হিসেব কষে সিনেটর শোফেল্ড দেখলেন, ঠিক যে সময়ে বাসটাকে চাপা দিয়েছে ভূমিধস, ওই একই সময়ে ওখানে থাকার কথা ছিল তাঁরও। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে থেমে গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গেছেন তিনি।

এর শুধু একটা কারণই খুঁজে পেলেন সিনেটর। দু'বার তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন ঈশ্বর। তার কারণ, আরও জরুরি কোনও কাজে হেনরিকে দরকার তাঁর। এসব ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। দ্বিতীয়বারের মত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে বদলে গেল সিনেটরের চিন্তা-ভাবনা। পরের আঠারো মাসে নাটকীয়ভাবে পাল্টে নিলেন রাজনৈতিক দর্শন।

প্রথমবারের মত নিজে থেকে কাজ করতে শুরু করলেন তিনি। মানসিকভাবে হয়ে উঠলেন প্রাপ্ত-বয়স্ক। অন্তর থেকে তাঁকে ভালবেসে ফেলল তাঁর অনুসারীরা। দুই-দুইবার প্রাণে বেঁচে জীবনের মূল্য বুঝে গেছেন তিনি। সময় নষ্ট না করে নামলেন মানুষের সেবায়। তখনই টের পেলেন, সমাজের বিশেষ একাংশ থেকে পাচ্ছেন বুক ঢালা সমর্থন। আগে ওসব মানুষ পাত্তাও দিত না তাঁকে। এদেরকে কখনও হিসেবের ভেতরেই রাখেনি রনসন থর্ন। যিশু ফিরবেন, আর ফুরিয়ে এসেছে পৃথিবী, এটা মেনে নিয়েই জীবন পার করছে আমেরিকার বহু মানুষ। তাদের সংখ্যা পাঁচ কোটিরও বেশি। দুর্ঘটনার কবল থেকে বেঁচে এদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছেন হেনরি শোফেল্ড। এর ভাল দিক ঠিকই বুঝল রনসন থর্ন। পাঁচ কোটি ভোটারের সমর্থন মানেই হোয়াইট হাউসে বসবাসের অনেকটা কাছে পৌঁছে যাওয়া।

নিজের কপাল দেখে অবাক হয়েছিল থর্ন। চিরকালের হারামজাদাটা খাটছে প্রেসিডেন্ট হতে! কাকতালীয় হোক বা অলৌকিক কিছু, জনগণের তৈরি মস্ত এক ঢেউয়ের মাথায় চেপে বসেছেন হেনরি। এখন থর্নের কাজ ওই ঢেউ থিতিয়ে যাওয়ার আগেই সাগর পার করে তাঁকে সৈকতে তুলে দেয়া। ঠেলে তুলতে হবে জগদ্দল শোফেল্ডকে হোয়াইট হাউসে।

হঠাৎ বাইবেলে নাক গুঁজে নানানদিক বুঝতে চাইল থর্ন। বসের অনড় বিশ্বাস: ফুরিয়ে এসেছে পৃথিবীর সময়। বুক অভ রেভেলেশনে আগেই লেখা হয়েছে এসব। প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করল থর্ন। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আমেরিকার মানুষের গভীর বিশ্বাস হতবাক করল তাকে। এরা ধরে নিয়েছে, যেহেতু মিথ্যা নয় বাইবেল, কাজেই যে-কোনও সময়ে নরকের মত হয়ে উঠবে এই বিশ্ব। এ থেকে দুটো দিক বুঝল থর্ন। প্রথমটা কাউকে বলবে না, নইলে শয়তানের পুত্র ভাববে ওকে লোকে। দ্বিতীয় দিক: এতদিন

ধর্মের নাম ভাঙিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা চায়নি কেউ। অথচ, সোনার ওই মস্তবড় খনি পেয়েছে সে। আমেরিকায় কখনও ওই খনি থেকে সোনা তোলেনি কেউ।

চুপচাপ আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়তে লাগল থর্ন। প্রবল স্রোতের মত জনগণের সমর্থন পেলেন শোফেল্ড। আমেরিকার যেখানেই গেছেন, শুধু একবার তাঁকে দেখতে ছুটে এসেছে লাখ লাখ ভোটার। বক্তৃতা দিতে গেলে উপচে পড়েছে অডিটোরিয়াম। টিভি ও রেডিয়োতে বক্তৃতা দিলে কান পেতে শুনেছে অন্তত কয়েক কোটি মানুষ। মাত্র কয়েক মাসে সিনেটর শোফেল্ড হয়ে উঠেছেন প্রেসিডেন্টের চেয়েও জনপ্রিয়। হুড়মুড় করে আসছে তাঁর ফাণ্ডে ডোনেশন।

থর্ন বুঝে গেল, এই সবে শুরু।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর পূর্ণবিশ্বাস রেখেছে কোটি কোটি আমেরিকান নাগরিক। চাইছে সত্যি হোক সব। মিথ্যা যেন না হয় ঈশ্বরের ইচ্ছে। এরফলে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ হলে মরবে শত শত কোটি মানুষ— তাতে কী, ভবিষ্যদ্বাণী তো ফলবে! ম্যাড়মেড়ে জীবনে কম কথা নয় ওটা পাওয়া। ঝরবে কোটি মানুষের রক্ত, ধ্বংস হবে পৃথিবী, কিন্তু তারপর বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করবেন ঈশ্বর। কে না চাইবে স্বর্গে যেতে?

কিন্তু বাইবেলে লেখা আছে: ঈশ্বর সবাইকে স্বর্গে নেয়ার আগে পৃথিবী জুড়ে আসবে ভীষণ কষ্টের সময়। সেসব সহ্য করতে হবে ধার্মিক মানুষকেও। কিন্তু সে সময়ে কোটি কোটি মানুষকে পথ দেখাবার জন্যে লাগবে সত্যিকারের নেতা। এমন একজন, যে কিনা হবে নবী মুসার মত, বা যিশুর মত। যে কিনা প্রতিটি পদে দেখাবে পথ।

সিনেটর শোফেল্ডকে নিয়ে দিনের পর দিন ভেবেছে রনসন থর্ন। নিরেট বোকাসোকা লোক হেনরি শোফেল্ড। তিনি মস্ত এক নেতা হলে, কেমন হবে তাঁর আচরণ? বাইবেল

বিশ্বাসীদের ভোটে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পা রাখলে, পেছন থেকে গোটা দেশটাকে, শুধু এই দেশ কেন, গোটা পৃথিবীকে চালাতে পারবে থর্ন।

কিন্তু সফলতা চাইলে আগে লাগবে প্রাকৃতিক সহায়তা। ঘটতে হবে বাইবেলের সব ঘটনা। সেটা প্রায় অসম্ভব। তবে একদল যোগ্য লোক সঙ্গে থাকলে, হয়তো সম্ভব প্রেসিডেন্ট হিসেবে হেনরি শোফেল্ডকে হোয়াইট হাউসে বসিয়ে দেয়া।

এসব নিয়ে ভাবছে রনসন থর্ন, এমনসময় সামাজিক এক অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে পরিচয় হলো এক লোকের। সে বিশ্বাস করে ফুরিয়ে গেছে পৃথিবীর আয়ু। মাত্র কয়েক দিন আলাপে থর্ন জেনে গেল, ওই লোক কাজ করে ইউএস ইন্টেলিজেন্সে। ছোটখাটো অফিসার নয়। তার কাছ থেকেই থর্ন জানল, আমেরিকার সরকারের লাখ লাখ কর্মচারী ও কর্মকর্তা মনে করে, সময় হয়েছে পৃথিবী ধ্বংসের।

এ তথ্য পেয়ে গতি এল থর্নের পরিকল্পনায়। পরিচিত লোকটার মাধ্যমে জোগাড় করল সমমনা অনেককে। প্রত্যেকে সিআইএ বা এধরনের সংগঠনে চাকরি করছে বা করেছে। তাদেরই একজন সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট। দুনিয়ার কী হলো, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই তার। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অঢেল টাকা পেলেই খুশি। ওই লোক এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল থর্ন। এ দলে ভিড়ে গেল অ্যামেটের পরিচিত অসুস্থমস্তিষ্ক অনেকে। মাঝখানে হেনরি শোফেল্ডকে রেখে, তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে গোটা দেশ শাসন করবে তারা। দলের প্রধান হবে রনসন থর্ন।

দেখতে না দেখতে মাত্র কয়েক দিনে তারা গড়ল গোপন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। বহু হিসাব কষে স্থির হলো, কীভাবে পৃথিবীর বুকে আনা হবে মহাপ্রলয়।

বিশাল পরিকল্পনা তাদের। তবে ওটা সহজ-সরল।

প্রথমে বাধাতে হবে যুদ্ধ।

এমন এক যুদ্ধ, বিশ্বাসীরা ভাববে: ফলতে শুরু করেছে বুক অভ রেভেলেশনে লেখা বাইবেলের বাণী।

কাজটা কঠিন হবে না।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুদ্ধ বাধবে মধ্যপ্রাচ্যে।

ওটা পাকিয়ে তোলা খুব সহজ।

বাইবেল অনুযায়ী, যুদ্ধ হবে সেটা তো ঈশ্বরেরই ইচ্ছে!

তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যুদ্ধে একটু শুধু হাত লাগাবে থর্নরা।

ডিনামাইটের পাহাড়ে এক ফুলকি আগুন ফেলার মত হবে ব্যাপারটা।

রাগে-দুঃখে পাগল হয়ে উঠবে সাধারণ মুসলিমরা।

কীভাবে তাদেরকে উস্কে দেবে, আগেই স্থির করেছে থর্ন ও তার দলের নেতারা।

এখন রয়ে গেছে শুধু সবুজ সঙ্কেত দেয়া।

সব দোষ চাপবে ইসলামের পুরনো শত্রু ইহুদি জাতির ঘাড়ে। নানান দেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে গেলে, মুসলিমদের তরফ থেকে ইহুদিদের ওপর আসবে চরম হামলা।

আগুন ও পাথরের কথা তো আগেই আছে বাইবেলে। সবাই ধরে নেবে, বলা হয়েছে পারমাণবিক বোমার কথা।

যত বাড়বে যুদ্ধের উন্মাদনা, আমেরিকার কোটি কোটি ভোটার ভাববে: শেষ হচ্ছে পৃথিবী! তারা সত্যিকারের কোনও ভাল নেতার ওপর রাখতে চাইবে বিশ্বাস। আর সেক্ষেত্রে কে ঠেকাবে হেনরি শোফেল্ডকে!

মনে হতে পারে, খামোকা নিরীহ মানুষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া চরম নিষ্ঠুরতা। খুন হবে কোটি কোটি ইহুদি ও মুসলিম। মরবে কিছু আমেরিকান নাগরিকও। তবে তাতে কিছুই যাবে আসবে না রনসন থর্নের। তার যুক্তি পাক্কা, সহজ, সুন্দর ও কাজের। ক্ষমতা পেতে ব্যবহার করবে মহাপ্রলয়ের বুলি। ধীরে ধীরে গড়ছে সে হেনরি শোফেল্ডকে।

গড়ছে নিজ ভবিষ্যৎ। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আছে, এমন এক নেতাকে সামনে রেখে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করবে সে।

কিন্তু হেনরি শোফেল্ডের আছে এক প্রতিযোগী। এখনও অত শক্তিশালী নয় সে। বহু দিন ধরেই বাজাচ্ছে মহাপ্রলয়ের ঢাক। থর্নের কথায় তার ওপর চোখ রাখছে একদল সিআইএ এজেন্ট। সত্যি বলতে, চোখ রাখা হয়েছে ধর্মীয় সব সংগঠনের বড় নেতাদের ওপরেই। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক যাজক স্টিভ বার্কলে। জর্জিয়া থেকে দাঁড়াতে চাইছে গভর্নর পদে।

আপাতত প্রেস কনফারেন্সের জন্যে হেনরি শোফেল্ডের সঙ্গে লিমোতে চেপে চলেছে রনসন থর্ন। উথাল-পাতাল করছে মন। রওনা হওয়ার আগে খারাপ খবর শুনে বাজ পড়েছে মাথায়। নতুন করে গণ্ডগোল বেধেছে ক্যাথি হার্বার্টের কারণে।

হাজারো একর জুড়ে সিনেটর শোফেল্ডের এলাকা। বিশাল প্রাসাদের মত বাড়িটাও দেখার মত সুন্দর। নিজের প্রকাণ্ড অফিসে পায়চারি করছে রন থর্ন। গত মাসে যা ঘটেছে, অস্থির লাগছে তার। মস্ত জানালা দিয়ে দেখল অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য।

পায়চারি থামিয়ে ডেস্ক থেকে নিল দুধের বোতল। বসে পড়ল আরামকেদারায়। রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে চালু করল দেয়ালে ঝুলন্ত বিশাল টিভি।

গত তিনমাসে যত অনুষ্ঠানে গেছেন হেনরি শোফেল্ড, সেগুলোর ডিভিডি করিয়ে নিয়েছে সে। নিয়মিত দেখছে এসব প্রোগ্রাম। ভবিষ্যতে আরও ভাল কিছু করা যায় কি না, সেসব নিয়ে ভাবছে। নানাদিক থেকে আগলে রেখেছে শোফেল্ডকে। সেজন্যে মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে নিল থর্ন। নিরেট গাধাটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ নয়। ও নিজে লিখে দিয়েছে

প্রতিটি বক্তৃতার বক্তব্য। ফলে সাধারণ ভোটারদেরকে মাতিয়ে তুলছে সিনেটর।

আজ অনুষ্ঠান থেকে ফিরবে, এমনসময় অডিটোরিয়ামের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল লম্বা চুলের এক ছাত্র। জিজ্ঞেস করল ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক একটা বিষয়ে।

টিভি স্ক্রিনে মন দিল থর্ন। রিমোট টিপে গেল ডিভিডির নির্দিষ্ট অংশে। হাত তুলেছে ছাত্র। তার দিকে ঘুরে গেছে ক্যামেরা। 'সিনেটর, অনেক স্কলার মনে করেন বুক অভ রেভেলেশন আসলে বাইবেলের অংশই নয়। এ বিষয়ে আপনার কী বক্তব্য?'

টিভিতে দু'জনকে দেখাল দুটো ক্যামেরা।

হাসলেন শোফেল্ড। কণ্ঠ শান্ত, 'এ বিষয়ে সবই পড়েছি, কিন্তু টলিয়ে দিতে পারেনি কেউ আমার বিশ্বাস।'

ছাত্র এবার বলল, 'কিন্তু যদি প্রমাণ হয় বুক অভ রেভেলেশনের লেখক নন সেন্ট জন, ওসব বক্তব্য ঈশ্বরের নয়— তখন? তাতে কি নষ্ট হবে আপনার বিশ্বাস, স্যর?'

লাইভ টিভিতে অনুষ্ঠানের সময় চেয়ারের হাতল খামচে ধরেছিল রনসন থর্ন।

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করেছেন শোফেল্ড, তারপর আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলেছেন, 'সত্যি যদি দেখা যায় কোনও স্কলার প্রমাণ করে দিলেন, সেন্ট জন ওই বই লেখেননি...' নাটকীয়তার জন্যে থেমে গেলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'তো ধরে নেব নতুন করে ভাবতে হবে আমাকে। তবে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিশ্চয়ই পাব নতুন ইঙ্গিত। তখন এগোব নতুন বিশ্বাস বুকে নিয়ে।' চওড়া হেসেছেন সিনেটর। 'খুশি হব এই ভেবে যে আমাদের মত অসংখ্য মানুষকে অত কষ্টের মাঝ দিয়ে যেতে হবে না।'

কথাগুলো শুনে খুশি মনে হেসেছে দর্শকরা।

সে সময়ে ওই বিষয়ে কিছু ভাবেনি থর্ন। কিন্তু পরে এখন

মনে হচ্ছে, সবাইকে নিয়ে বিপদেই আছে সে।

জর্জিয়ার স্টিভ বার্কলের ওপর যারা চোখ রেখেছিল, আগেই জানিয়ে দিয়েছে, বুক অভ রেভেলেশনের কোনও ব্যাপারে বার্কলেকে ব্ল্যাকমেইল করছে কেউ। এর আরেক অর্থ, ব্ল্যাকমেইলারের হাতে আছে জোরালো প্রমাণ। হয়তো তার কারণে অদূর ভবিষ্যতে বাতিল হবে বাইবেলের ওই অংশ। কথাটা ভাল লাগেনি থর্নের। লাগার কথাও নয়।

খোঁজখবর নিতেই জানল, ব্ল্যাকমেইলার এক যুবতী। আগে ক্যাথি হার্বার্ট নামটা শোনেনি থর্ন। কিন্তু গুগল ঘাঁটতে গিয়েই বাড়ল দুশ্চিন্তা। স্কলার মেয়ে। সে যদি প্রমাণ করে দেয় নিউ টেস্টামেন্টের ওই অংশ বানোয়াট, স্রেফ মাঠে মারা পড়বে ওদের সমস্ত পরিকল্পনা!

শুধু তা-ই নয়, বাতিল অংশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে খ্রিস্টান ধর্মের গুরুরা। হেনরি নিজে বলেছেন, বুক অভ রেভেলেশন ভুয়া প্রমাণ হলে, খুশি মনে মেনে নেবেন স্কলারদের কথা। সেক্ষেত্রে মহাপ্রলয় হবে বলে যে কোটি কোটি আমেরিকান নাগরিক বসে আছে, তারাও ভাববে নতুন করে। তখন আর হেনরি পাবেন না তাদের ভোট। অর্থাৎ, যতই স্বপ্ন দেখুক থর্ন, ঠেলেও আর হোয়াইট হাউসে তুলতে পারবে না হেনরি শোফেল্ডকে।

ব্যবসায়ী মানুষ থর্ন, মগজও চলে যৌক্তিকভাবে। এই অবস্থায় কী করা উচিত, সেটা বুঝতে বেশিক্ষণ লাগেনি তার।

প্রথমে ভেবেছিল, পয়সা ঢেলে বন্ধ করে দেবে ক্যাথি হার্বার্টের মুখ। স্টিভ বার্কলের কাছ থেকে দশ মিলিয়ন ডলার চাইছে মেয়েটা। কার কাছ থেকে ওই টাকা আসছে, তা তার মাথার ব্যথা নয়। দরকার হলে বিশ মিলিয়ন দেবে থর্ন। কিন্তু এরপর কিছু দিন যেতে না যেতেই যদি আরও টাকা দাবি করে ওই মেয়ে? যদি টাকা নেয়ার পরেও ফাঁস করে সব? উপায় আছে ব্ল্যাকমেইলারকে বিশ্বাস করবার?

এরপর দ্বিতীয় চিন্তা যেটা এল, ওটা অনেক যৌক্তিক। গায়েব করে দিতে হবে ওই মেয়েকে। তার পেট থেকে বের করতে হবে কোথায় রেখেছে সে-সব প্রমাণ। ওগুলো ধ্বংস হলে, এবং মেয়েটাকে গায়েব করে ফেললে, প্রমাণ বলতে কিছুই থাকবে না।

দলের ওপরের দিকের একজনের সঙ্গে কথা বলল থর্ন। সিআইএর ওই লোক কাজটা দিল ক্যাল অ্যামেটকে। ওই লোক আবার কাজ দিল জুনিয়র অফিসার ও প্রাক্তন ক'জন অফিসারকে। কোর্ফিউ দ্বীপে গিয়ে মেয়েটাকে কিডন্যাপ করল তারা। ঠিকই বন্দি হলো ক্যাথি, কেউ জানল না কোথায় আছে সে। কিন্তু গজিয়ে গেল নানান সমস্যা। এদিকে বাড়তি সময় নেই থর্নের হাতে। যা করার করতে হবে দ্রুত।

ডিভিডি মেশিন বন্ধ করে আরামদায়ক চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল থর্ন। টিপছে মাথার তালু। পাশে ছোট এক টেবিলে কাঠের বউলে অসংখ্য চকলেট। ওখান থেকে তিনটে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরল সে। খাওয়া শেষ করে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। টিপতে লাগল বাটন।

দ্বিতীয়বারের মত ডায়াল হওয়ার পর কল রিসিভ করল সিআইএ এজেন্ট।

'জরুরি কথা আছে,' বলল থর্ন। চুপচাপ শুনল ওদিকের বক্তব্য। তারপর বলল, 'না। তুমি এসো। আমি একা। কয়েক দিনের জন্যে গাধাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি ছুটিতে।'

'তিন ঘণ্টা লাগবে পৌঁছুতে,' বলল সিনিয়র সিআইএ এজেন্ট।

'দু'ঘণ্টার ভেতর হাজির হবে,' নির্দেশ জারি করল থর্ন।

ঊনত্রিশ

হাইওয়ে থেকে নেমে নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টের সামনের পার্কিং লটে থামাল ডক্টর মাল্ডুন ভাড়া করা হোণ্ডা গাড়ি। ব্রিফকেস নিয়ে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল। একবার গুঙিয়ে উঠল শরীরের ব্যথায়। গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়েছে বহু দূর। আড়মোড়া ভেঙে ডলে নিল দুই চোখ।

ধুলো ভরা উত্তপ্ত বাতাস ও কালো ধোঁয়া নাকে-মুখে ছুঁড়ে সাঁই করে পাশ কাটিয়ে গেল বড় একটা ট্রাক। আড়ষ্ট পায়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল ডাক্তার মাল্ডুন। ভেতরে খদ্দের নেই বললেই চলে। কোণের বুথে গিয়ে বসল সে। অর্ডার দিল কফির। কিছুক্ষণ পর লালচে যে জিনিস এল, ওটাকে আর যাই হোক, কফি বলা যেতে পারে না। নাক-মুখ কুঁচকে ওই জিনিসই দুই ঢোকে গিলে ফেলল ডাক্তার।

নিজের হাতের দিকে চেয়ে পার করে দিল পুরো ত্রিশ মিনিট। সময় থাকতে ড্রাগটা নিয়ে রওনা হওয়া উচিত। অন্তত আরও দু'ঘণ্টা লাগবে ওই ফ্যাসিলিটিতে ফিরতে।

তিক্ত হাসল ডাক্তার মাল্ডুন।

এরা ওটাকে আবার বলে ফ্যাসিলিটি!

নির্জন এলাকায় প্রায় পরিত্যক্ত একটা হোটেলে বেআইনী সব কাজে জড়িয়ে গেছে সে। নির্যাতন করছে কিডন্যাপ করা নিরীহ এক নিরপরাধ মেয়েকে।

পাশের চেয়ারে রাখা ব্রিফকেস দেখল ডাক্তার মাল্ডুন। ওটা টেবিলে তুলে খুলল ডালা। ভেতর থেকে বের করে নিল

ছোট একটা বোতল। টেবিলে নামিয়ে রাখল ওটা। পানির মত স্বচ্ছ এক শ' মিলি লিটারের ড্রাগ। মনে হচ্ছে সাধারণ হার্বাল ওষুধ। কিন্তু ওটা আসলে কী, ভালভাবেই জানে মাল্ডুন। রেস্টুরেন্টের কফির পটে ওই জিনিস ঢাললে, অন্তত ত্রিশজন সুস্থ লোক একদিনে চিরকালের জন্যে বদ্ধউন্মাদ হয়ে যাবে।

প্রথমে বকবক করবে তারা, বাদ রাখবে না পেটের কোনও কথা বলতে। বেরিয়ে আসবে তাদের যত ভয়, রাগ, নোংরামি, তিক্ততা, আবেগ ও হিংস্র সব চিন্তা। পুরো অতীত মনে পড়বে হুড়মুড় করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলবে এমন। এত মানসিক অত্যাচারে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় মানুষটা হবে উন্মাদ। এই ড্রাগের কোনও অ্যান্টিডোট নেই।

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ডাক্তার মাল্ডুন। এমন ভয়ঙ্কর ড্রাগ তুলে দিচ্ছে সে ক্যাল অ্যামেটের হাতে।

কেন?

যাতে এই ড্রাগ প্রয়োগ করা যায় মেয়েটার ওপর।

সারাজীবনের জন্যে শেষ হয়ে যাবে বেচারি।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরল মাল্ডুন। ভাবছে: কী করে এসবের ভেতর নাক গুঁজে দিলাম?

কেন আজ তার এ অবস্থা, ভাল করেই জানে সে।

ছোট্ট একটা ভুল করেছিল অতীতে। ভেবেছিল ওটার কথা ভুলে গেছে সবাই। কিন্তু তা নয়। ওই ছোট্ট ভুল আজ শেষ করে দিচ্ছে তাকে।

গরীব পরিবার থেকে এসেছে ডিক মাল্ডুন। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সমাজে সম্মানের অবস্থানে পৌঁছুতে। তার বাবা ছিল ডেট্রয়েটের এক ফ্যাক্টরির মজুর। মা ঝাড়ু দিত কয়েকটা অফিসে। বাবা-মা প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিল ওকে কলেজে পড়াবার জন্যে। মাল্ডুনও গর্বিত করেছিল তাদেরকে।

গ্র্যাজুয়েশন করেছে মেডিসিনের ওপর। এরপর বেছে

নিয়েছে নিউরোলজি ও সাইকিয়াট্রি। চব্বিশ বছর বয়সেই হয়ে উঠেছে স্পেশালিস্ট ডাক্তার। তেতাল্লিশ বছর বয়সে একজন সফল মানুষ। নিউ ইয়র্কে নিজের প্রাইভেট প্র্যাকটিস তো ছিলই, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পেল শিক্ষকতার সুযোগ, সেই সুবাদে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। হাম্পটনে পুরো দুই একর জমিতে বাগান, সুইমিং পুল, স্টেবল ও বিশাল বাড়ি। কী নেই তার। সুন্দরী প্রিয় স্ত্রী আর দুই মেয়ে। ওরা ঘুরে বেড়ায় এস্টেটে আরবি ঘোড়ায় চড়ে। বিলাসিতার জীবন। রাজা-রানির মত আরামে আছেন মাল্ডুনের বাবা-মা। সবই ছিল ঠিক।

অতীতের ভূত যে আবারও চেপে বসবে মাল্ডুনের ঘাড়ে, কখনও ভাবতে পারেনি। প্রথম বছরে বাড়ি থেকে কলেজে এসে ঘাবড়ে গিয়েছিল আঠারো বছরের মাল্ডুন। হোস্টেলের রুমে ওর সঙ্গে থাকত রজার হোগার্থ।

কখনও ছেলেটাকে ভুলতে পারবে না মাল্ডুন। ওই ছেলে ছিল নামকরা এক উকিলের সন্তান। পড়ত দু'ক্লাস ওপরে। মাঝে মাঝেই বেড়াতে যেত ফ্রান্স ও ইতালিতে। মাল্ডুনের মনে হতো ওসব চাঁদে যাওয়ার মত। ওর তুলনায় দুনিয়া সম্পর্কে অনেক বেশি বুঝত ওই ছেলে। ফুঁকত হাভানা সিগার। চিনত কোন্ ওয়াইন ভাল। পড়ত টলস্টয়ের বই। পুরো ছয় মাস দূর থেকে দেবতার মত তাকে দেখল মাল্ডুন। ভাবল, সামলে নিতে পারবে বুকের লালসা।

না, বুঝতে দেবে না সে কাউকে।

কিন্তু যে রাতে রজার ওকে দিল শ্যাম্পেন, তখন এক পর্যায়ে মাতাল হয়ে তাকে চুমু দিতে চাইল মাল্ডুন।

শেষমেশ চুমু আর দেয়া হয়নি, কিন্তু তার পরদিন ঘর বদল করে অন্য কোনও রুমে চলে গেল ছেলেটা।

এর ক'মাস পর জেসির সঙ্গে পরিচয় হলো মাল্ডুনের। ভুলে গেল অতীতের ওই পীড়াদায়ক স্মৃতি। এরপর পেরিয়ে

গেল বছরের পর বছর।

কিন্তু আজ থেকে চোদ্দ মাস আগে, কী যেন হলো ওর মনে। চমকে গেল ওই নতুন সুন্দর ছাত্রকে দেখে। কোঁকড়ানো কালো চুল, চকচকে জলপাইয়ের মত মসৃণ ত্বক, বড় বড় বাদামি দুই চোখ। হঠাৎ করেই আবারও আগের সেই অনুভূতি ফিরল মাল্ডুনের বুকে। অধৈর্য হয়ে উঠল বুক। মনে হলো, বাঁচবে না ওই ছেলেকে কাছে না পেলে। ওই একই অবস্থা বোধহয় ওই সুন্দর ছেলেরও। মধ্যবয়স্ক মোটা ধরনের এক লেকচারারকে কেন ওর ভাল লাগছে, জানতেও চাইল না মাল্ডুন। তবে প্রথমে ছেলেটাকে এড়াতে চাইল। রাজি হলো না ছেলেটার আমন্ত্রণে। না, ছেলেটার কথায় নির্জন ক্যাফেতে বসে কফি পান করবে না সে।

তারপর একদিন চমকে গেল।

মাল্ডুনের স্ত্রী জেসি জানাল, প্রথম বর্ষের ছাত্রদেরকে ডিনারের দাওয়াত দেবে বাড়িতে। ঠেকানো গেল না ওর স্ত্রীকে। প্রতিবাদ করতে গেলে সেটা অযৌক্তিক দেখাত।

সে-রাত ছিল ঝড়বৃষ্টির।

কিচেন থেকে ড্রিঙ্ক নিয়ে ড্রইংরুমে যাবে মাল্ডুন, এমনসময় তার বাহু স্পর্শ করল কেউ। দু'সেকেণ্ড পর বুঝল, স্ত্রী নয়, ওর পেছনে সেই ছেলে!

আকাশের বিজলির আলোয় হঠাৎ চমকে উঠে পরস্পরকে চুমু দিল ওরা। এরপর ভেঙে গেল মাল্ডুনের সব বাঁধ। কলেজের পার্কিং লটে নিয়মিত গাড়ির ভেতর ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা দু'জন। তবে মাল্ডুনকে প্রতিবার ঝুলিয়ে রাখল ছেলেটা। একটা না একটা কারণে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারল না মাল্ডুন। কামনার কারণে হয়ে গেল পাগল। প্রিয় ছাত্রের হোস্টেল ঘরের বাইরে জানালায় হানা দিতে লাগল রাতে।

যদি একবার দেখতে পায় ওই ছেলেকে?

স্ত্রীকে বলত, জরুরি কাজে ব্যস্ত সে।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই কলেজ পাল্টে ফেলল ওই ছেলে। খোঁজ নিয়ে মাল্ডুন জানল, ট্র্যান্সফার হয়ে চলে গেছে সে ইউসিএলএ-য়।

কিন্তু মন ভেঙে যাওয়ার চেয়েও বড় সমস্যা এল মাল্ডুনের সামনে। ছেলেটা চলে যাওয়ার কয়েক দিন পর এল ডাকে বড় একটা প্যাকেট। সব ছবির। দেখলে যে-কেউ বুঝবে, কারা চুমু দিচ্ছে পরস্পরকে।

একটা চিরকুটে পেল মাল্ডুন ছোট একটা চিঠি:

নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। আপনার সহায়তা আমাদের দরকার।

প্রথমে মাল্ডুন ভেবেছিল, সব খুলে বলবে স্ত্রীকে। কিন্তু পরে ভাবল: খেপে যাবে জেসি, বুঝতে চাইবে না কিছুই। চলে যাবে মেয়েদুটোকে নিয়ে বহু দূরে। মামলায় হেরে খুইয়ে বসবে বাড়ি এবং প্রায় সব। শোকে পাথর হবে ওর বাবা-মা। শুধু তাই নয়, কলেজ কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় তুলে ধরা হবে নোংরা ছবি। চাকরি তো যাবেই, ছড়িয়ে পড়বে স্ক্যাণ্ডাল। বন্ধ হবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস।

ক'সপ্তাহ পেরোবার পর, যোগাযোগ করা হলো মাল্ডুনের সঙ্গে। পুরো বিশ মিনিট কথা বলল ওদিকের লোকটা। বক্তব্য তার সোজা। এদিক-ওদিক হলে মস্ত বিপদে পড়বে সে। জেসিকে বলতে হবে, নামকরা এক ডাক্তার যেতে পারছেন না বলে জরুরি এক সেমিনারে যোগ দিতে হচ্ছে মাল্ডুনকে।

এরপর থেকে এমন সেমিনারে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ি ছেড়ে দূরে থাকতে হলো তাকে। জানল না, কাজ করিয়ে নিচ্ছে কারা। সবসময় দিয়েছে যথেষ্ট টাকা। বারবার ভেবেছে সে, বাধ্য হয়ে দিচ্ছে চিকিৎসা-সেবা। এ ছাড়া উপায়ও নেই তার।

এরা গাড়িতে করে পৌঁছে দেয় এয়ারপোর্টে। বিমান থেকে নামার পর আরেক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় ধূসর সব

দালানে। ওখানে থাকতে হয় দিনের পর দিন। জানার উপায় নেই কোথায় আছে।

ধূসর রঙের ঘরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয় রোগীকে। বন্দি তারা। তাদের ওপর প্রয়োগ করতে হয় অস্বাভাবিক ওষুধ। কখনও ভুলিয়ে দেয় কারও কারও স্মৃতি। জানতে হয়েছে রোগীর মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা। অথচ, ওর জানা নেই, এরা কেন রোগী। তবুও করেছে নানান পরীক্ষা। সেগুলো এমন সব চিকিৎসা, যেগুলো আছে বলেই জানত না।

প্রতিরাতে ঘুম ভেঙে দরদর করে ঘেমে ওঠে মাল্ডুন। ভয়ানক সব ঘটনার সাক্ষী সে। অথচ, মানুষের ওপর ওসব এক্সপেরিমেণ্ট করা ভীষণ অনুচিত। গর্হিত অপরাধ।

দু'একবার কালো সুট পরা লোকদের অবাধ্য হয়েছে সে। তখন আবারও এসেছে ওসব ছবি, সঙ্গে হুমকি।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা বেশি অস্বাভাবিক। অন্য এক দলের মাধ্যমে এসেছে অনুরোধ ও হুমকি। যেতে হয়েছে মণ্ট্যানার প্রত্যন্ত, বুনো এক এলাকায়। যে পুরনো বাড়িতে উঠেছে, ওটা অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে পরিত্যক্ত। সিআইএ বা অন্য কোনও ইণ্টেলিজেন্সের তরফ থেকে ওখানে ডাকা হয়নি মাল্ডুনকে। যে রোগী, সে-ও বিপজ্জনক নয়। মনে করার কোনও কারণ নেই, মেয়েটি দেশের জন্যে ক্ষতিকর। সহজ-সরল রূপসী যুবতী, অ্যাক্সিডেণ্টে হারিয়ে ফেলেছে স্মৃতি। আর তাকেই ওই ভয়ঙ্কর ড্রাগ ব্যবহার করে চিরকালের জন্যে বদ্ধউন্মাদ করতে চলেছে সে!

মাল্ডুনকে খুন করবে বলে ভয় দেখিয়েছে ক্যাল অ্যামেট। কম নয় তার দলের অন্য এজেণ্টরাও। একমাত্র নারী এজেণ্ট ওই কালো চুলের সুন্দরী মেয়েটা শুধু ব্যতিক্রম। আচরণও মানুষের মত। কিন্তু প্রয়োজনে যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তা বোঝা যায় চোখ দেখে।

টেবিলে রাখা স্বচ্ছ তরল ভরা ছোট্ট বোতল আবারও

দেখল মাল্ডুন। অন্তরের গভীরে বুঝল, চাইলেও ড্রাগ দিতে পারবে না নিরীহ ওই মেয়েটাকে। ঠিক করে ফেলল, প্রথম সুযোগেই বেচারিকে সরিয়ে নেবে ওই অবৈধ কারাগার থেকে। এরপর সোজা ফিরবে নিউ ইয়র্কে, সব খুলে বলবে জেসিকে। তাতে সর্বনাশ হলে, তা-ই হোক। আর সহ্য করতে পারছে না সে এই প্রচণ্ড মানসিক চাপ।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথে চলল মাল্ডুন। ভাবছে কীভাবে সরাবে মেয়েটাকে। ছোট এক শহরে থেমে জেনারেল স্টোর থেকে কিনল টুকিটাকি জিনিস। গাড়ির পেছনের বুটে লুকিয়ে ফেলল ওসব। তারপর চলল আঁকাবাঁকা, জঙ্গুলে পথে পরিত্যক্ত হোটেলের উদ্দেশে।

অনেকক্ষণ ড্রাইভ করে পৌঁছুল হোটেলের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে দরকারি জিনিসটা নিয়ে রাখল ওভারকোটের ভেতর-পকেটে। নতুন করে আটকে নিল বোতাম। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠল কাঁচের দরজার সামনে। পাশেই দেয়ালে সিকিউরিটি প্যানেল। ওখানে কোড দিতেই ক্লিক আওয়াজ তুলল দরজা। খুলে গেছে লক। কাঁচের কবাট ঠেলে হোটেলে ঢুকল সে।

নাকে লাগল তেলাপোকা ও ইঁদুরের মলমূত্রের দুর্গন্ধ। বদ্ধ পরিবেশ। রঙচটা করিডোর ধরে হেঁটে চলল মাল্ডুন। কেউ নেই আশপাশে। চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। গুমট বাতাস। ঘেমে উঠছে ভুরু। দুরুদুরু করছে বুক।

এলিভেটরে চেপে উঠে এল ওপরতলায়। বরাবরের মতই করিডোরে শেষমাথায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কালো সুট পরা এক এজেন্ট। কড়া চোখে এগিয়ে আসতে দেখছে ডাক্তার মাল্ডুনকে।

‘এত ভারী কোট কেন, ডক?’ জানতে চাইল সে।

‘ঠাণ্ডা লেগেছে,’ বলল মাল্ডুন। কথা ঠিক, তা প্রমাণ

করতে নাক টানল বারকয়েক।

'আপনি তো দরদর করে ঘামছেন।'

'ফ্লু ধরেছে বলেই তো এই অবস্থা ' দরজা দেখাল মাল্ডুন। 'ভেতরে যেতে চাই।'

'আপনার তো এখন ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা নয়,' বলল এজেন্ট।

'জরুরি বলেই ফিরেছি,' একটু থমকে গিয়ে বলল ডাক্তার। 'আমার ব্ল্যাকবেরি ওই ঘরে।'

'এই এলাকায় কোনও সিগনাল নেই, ডক।'

'কথা ঠিক। কিন্তু ফোনটা লাগবে। দরকারি অনেক তথ্য আছে ওটার ভেতর।'

'আপনার সাবধান হওয়া উচিত,' বলল এজেন্ট।

'কথা ঠিক। সরি।'

'একমিনিটের বেশি থাকবেন না,' বলে দিল লোকটা।

'থ্যাঙ্ক্স্,' দুর্বল হাসি দিয়ে দরজার কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল মাল্ডুন। পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। শুনল, ক্লিক আওয়াজে আটকে গেছে লক।

ঘুমিয়ে ছিল ক্যাথি হার্বার্ট, পায়ের আওয়াজ পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল খাটে। বিস্ফারিত চোখে তাকাল মাল্ডুনের দিকে। বরাবরের মত সাদা কোট নেই ডাক্তারের পরনে। চুল সব এলোমেলো।

'আমার এখানে থাকার কথা নয়,' ফিসফিস করে বলল মাল্ডুন। 'যা বলব, মন দিয়ে শুনবে। কোনও প্রশ্ন তুলবে না। তোমাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমি।'

এজেন্ট ভাবছে, সময় হয়েছে কফি ব্রেকের, এমনসময় ঘর থেকে এল ধুপ-ধাপ আওয়াজ। মারামারি করছে দু'জন? ঘাড় কাত করে আরও মনোযোগ দিল এজেন্ট। পরক্ষণে লক খুলে দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে।

মেয়েটা চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে বিছানার পাশে। বুকের কাছে দুই হাঁটু। কাঁপছে থরথর করে।

অবাক চোখে তাকে দেখল এজেন্ট।

মেয়েটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে ডাক্তার মাল্ডুন। মুখ তুলে তাকাল সে। 'চরমভাবে অসুস্থ। এখন চাই আধুনিক চিকিৎসা।'

'কী হয়েছে এর?' চমকে গিয়ে জানতে চাইল এজেন্ট।

'অজানা এপিসোড,' বলল ডাক্তার মাল্ডুন। 'আমি ভেতরে ঢুকতেই জেগে গেল। পরক্ষণেই শুরু হলো কাঁপুনি। একমিনিট... আমার গাড়িতে এ রোগের ওষুধ আছে।' মেঝে ছেড়ে উঠে দরজার দিকে রওনা হলো মাল্ডুন।

'আমার কী করা উচিত?'

'কিছুই করবেন না। স্পর্শ করবেন না ওকে। আপাতত পাশে থাকুন।'

ক্যাথির দিকে পাথরের মূর্তির মত চেয়ে রইল সচকিত এজেন্ট। প্রবল ঝড়ে পড়া পাতার মত কাঁপছে মেয়েটা। ভিজে গেছে মাথার চুল। দু'ঠোঁটের কোণে সাদা ফেনা। আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার দশা হলো এজেন্টের। ভাল করেই জানে, ওর পাহারায় সময়ে মেয়েটার কিছু হলে প্রাণে বাঁচতে দেয়া হবে না ওকে। তবে কপাল ভাল, ঠিক সময়ে এসেছে ডাক্তার লোকটা।

ওটাই ছিল এজেন্টের শেষ চিন্তা।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মাল্ডুন। ওভারকোটের ফ্ল্যাপ খুলে বেল্ট থেকে নিয়েছে বেসবল ব্যাট। আবার ফিরেছে ঘরে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কলেজে ভাল বেসবল খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু এখন লোকটার মাথা চুরমার করতে গিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে। অথচ, ব্যাট না চালিয়ে উপায় নেই। আরও শক্ত হাতে ধরল ব্যাট। পরের সেকেণ্ডে নামাল এজেন্টের মাথার ওপর। ব্যাটের আঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল

মাল্ডুনের দুই বাহু। মাথার তালু ডেবে গেছে মগজের ভেতর, হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল এজেন্ট। স্থির হয়ে গেল কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে। নিথর লাশ।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ক্যাথি। মুখ থেকে থু-থু করে ফেলল অ্যালকা-সেল্ট্‌যারের গুঁড়ো। একহাতে মুছল ঠোঁটের কোণে জমা ফেনা। চোখে আতঙ্ক নিয়ে দেখল এজেন্টের রক্তাক্ত মাথা।

'চলো,' প্রায় ফিসফিস করল মাল্ডুন। হাত থেকে ফেলে দিল ব্যাট। ওভারকোট খুলে পরিয়ে দিল মেয়েটাকে। হাত ধরে বেরিয়ে এল করিডোরে। পেছনে আটকে দিল দরজা।

এদিক-ওদিক দেখছে ক্যাথি। ডাক্তারের পিছু নিয়ে এল হোটেলের পেছনদিকের ফায়ার একযিটের কাছে। এদিকটা ব্যবহার করে না এজেন্টরা। এতদিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে এখন হাঁটতে গিয়ে বড্ড দুর্বল লাগছে ক্যাথির। তবুও ডাক্তারের তাড়া খেয়ে প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

পাঁচতলা নেমে চারপাশ দেখে নিল ডাক্তার। বেরিয়ে এল ফায়ার ডোর পেরিয়ে। সামনেই করিডোর ফাঁকা। ক্যাথির বাহু ধরে দৌড় দিল মাল্ডুন। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেয়েটা। থেমে ওকে টেনে তুলল ডাক্তার।

'আস্তে হাঁটুন,' চাপা স্বরে বলল ক্যাথি।

'দেরি করা যাবে না। বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। একটু দূরেই আমার গাড়ি।'

সামনের দরজা খুলেই চমকে গেল মাল্ডুন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওই মেয়ে এজেন্ট। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে পাথর হয়েছে ওরা।

নড়ল না মেয়েটা। মুখে টুঁ শব্দ নেই।

অন্তর থেকে তাগিদ পেল মাল্ডুনঃ দৌড়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে! বাহু ধরে ক্যাথিকে টেনে নিয়ে চলল সে।

'আমাদেরকে দেখেছে,' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল ক্যাথি।

জবাব দিল না মাল্ডুন। সামনেই একটু দূরে বেরোবার ফয়ে। ক্যাথিকে বাধ্য করছে দৌড়াতে।

দশ গজ দূরেই সামনের ফয়ে।

পাঁচ গজ।

কয়েক সেকেণ্ড পর সদর দরজার শীতল হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরল মাল্ডুন। আর তখনই নির্জন করিডোরে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠ: 'কোথায় যাবে ভেবেছ, অ্যাঁ?'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মাল্ডুন। করিডোরে মাত্র কয়েক গজ দূরে ক্যাল অ্যামেট! পাশেই মহিলা এজেন্ট রেবেকা ট্রিপলার। পেছন থেকে ছুটে আসছে আরও দুই এজেন্ট, হাতে পিস্তল!

কোট থেকে গাড়ির চাবি নিয়েই ক্যাথির হাতে গুঁজে দিল মাল্ডুন। এতটা দৌড়ে এসে হাঁফিয়ে গেছে। চাপা স্বরে বলল, 'নীল গাড়ি। বেরিয়ে যাও। দেরি কোরো না।' সে ভাল করেই জানে, মেয়েটাকে গুলি করবে না এরা। এখন আর নিজের কথা ভাবছে না ডাক্তার মাল্ডুন।

সামনে বাড়ল অ্যামেট। ঊরুর পাশে ঝুলছে পিস্তল।

দ্বিধায় পড়ে গেছে ক্যাথি।

'যাও!' চিৎকার করল মাল্ডুন।

'কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, ক্যাথি,' শান্ত স্বরে বলল অ্যামেট। মৃদু হাসছে। চলে গেল মেয়েটার কাছে। 'বাইরে গহীন জঙ্গল। এখানে আমাদের সঙ্গে নিরাপদে আছ তুমি।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথি। অসহায় চোখে দেখল ডাক্তার মাল্ডুনকে। ওর চোখ গেল এজেন্টদের দিকে। চোখ সরিয়ে নিল মহিলা এজেন্ট।

তিন পা ফেলে ক্যাথির কবজি শক্ত হাতে ধরল অ্যামেট। একটানে সরিয়ে নিল দরজার কাছ থেকে। ঘাড়ে এক ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলল অন্য দুই এজেন্টের বাড়িয়ে দেয়া হাতে। সরে যেতে চাইল ক্যাথি। চেষ্টা করল লাথি মারতে। কিন্তু

গত ক'দিন নিয়মিত খাবার খায়নি, দুর্বল। অনায়াসেই ওকে আটকে রাখল দুই এজেন্ট। ঘুরে ডাক্তারের দিকে চলল ক্যাল অ্যামেট।

'দয়া করে ওঁকে মারবেন না,' কাতর সুরে বলল ক্যাথি, 'ওঁকে...'

আরেক টানে ওকে করিডোর ধরে নিয়ে চলল দুই এজেন্ট। বদ্ধ করিডোরে বিকট আওয়াজে 'গুডুম্!' করে উঠল পিস্তল। কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল ক্যাথি।

কাঁচের দেয়ালে ছিটকে লেগেছে টকটকে লাল রক্ত। পিছলে অ্যামেটের পায়ের কাছে পড়ল ডাক্তারের লাশ।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ক্যাথি। ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওপরের ঘরে।

ত্রিশ

দুপুর দেড়টা। এইমাত্র স্টিভ বার্কলের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রানা। শুটিং রেঞ্জে এখনও চলছে ছোটখাটো কিছু প্রতিযোগিতা। দূরে ঝলমলে তাঁবুর কাছে মিস ট্রুলিকে দেখল রানা। তাঁকে ঘিরে রেখেছে একদল সাংবাদিক। মহিলা জানলেন না, বিদায় না নিয়েই ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে গাড়ির কাছে চলে এসেছে রানা। একা কোথাও বসে ভাবতে হবে ওকে।

ক্রাইসলার গাড়িতে চেপে ফিরতি পথ ধরল রানা। কিছুক্ষণ পর হাইওয়েতে উঠে লক্ষ্যহীনভাবে চলল দক্ষিণ-পশ্চিমে। পেরোল আল্টামাহা নদীর সেতু। দু'পাশে সবুজ

ফসলে ভরা দিগন্ত-জোড়া লালচে মাটির খেত। তারই মাঝে দূরে দূরে একটা-দুটো কাঠের কুটির।

সোনালি আগুন ঢালছে গনগনে সূর্য।

ক'টা ট্রেইলার পাশ কাটাল রানা। ভিক্ষা পাবে ভেবে ওর গাড়ির দিকে এসেছিল জনাকয়েক কিশোর-কিশোরী। এদেরকে দেখলে বোঝা যায়, এখন আর সেই স্বপ্নের দেশ নেই আমেরিকা। ঘণ্টাখানেক চলার পর পেছনে পড়ল সব লোকালয়, চারপাশে থাকল বিরান, নির্জন এলাকা।

নিজেকে চরম ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে রানার।

জীবনে নানান ভুল করেছে, কিন্তু আগে কখনও এভাবে বোকা বনতে হয়নি ওকে। ধরে নিয়েছিল বার্কলে দোষী। সে তো নয়ই, অন্য কাউকে সন্দেহ করবে, তেমন কেউও নেই।

সত্যিকারের সুযোগ-সন্ধানী লোক বার্কলে। বাটপার, কিন্তু কিডন্যাপ বা খুন করেনি।

তিক্ত চেহারায় মগজ খেলাচ্ছে রানা।

মনে গাদা-গাদা প্রশ্ন।

অথচ হাতে নেই জরুরি কোনও সূত্র।

হয়তো আর বেঁচেই নেই ক্যাথি মেয়েটা?

হয়তো আছে কোর্ফিউ দ্বীপেই?

কী কারণে ওকে আমেরিকায় আনবে কেউ?

ক্রিস্টিনা মেয়েটার মুখের কথা বিশ্বাস করেছিল ও।

হয়তো তাকে জানানো হয়েছিল ভুল তথ্য।

পুরনো মৃৎশিল্প পেয়েছে বলে বার্কলেকে ব্ল্যাকমেইল করছিল ক্যাথি। পিছলা সিম্পসনকে বলেছিল, ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে বড়লোক হবে ও। বাস্তবে কী পেয়েছিল মেয়েটা?

প্রমাণ দিলে সত্যিই হয়তো হোঁচট খেয়ে পড়বে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের একাংশ।

ঠিক কথাই বলেছে বার্কলে: একদল স্কলার বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন হাতে বারুদ পাওয়ার জন্যে। ওটা

পেলেই দমাদম গুলি ছুঁড়বেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে সরিয়ে ফেলা হবে বাইবেল থেকে বুক অভ রেভেলেশন। চিরকালের জন্যে সর্বনাশ হবে বার্কলের। ধুলায় মিশে যাবে তার সুনাম।

ওই ধরনের প্রমাণ মিললে সেটা ডেড সি স্ক্রল বা টুরিন শ্রাউডের চেয়ে কম আলোড়ন তুলবে না। হয়তো আরও বেশি কিছু হবে, পাল্টে যাবে বাইবেল।

কিছু প্রশ্ন বারবার জাগছে রানার মনে।

ক্যাথি প্রমাণ করে দিলে আসলে মস্ত ক্ষতিটা কার?

কে সে?

নিশ্চয়ই কেউ আছে, যে চাইছে সব গোপন করতে?

হয়তো ওসব প্রাচীন পটারির আছে অন্য কোনও মূল্য? আর সেজন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা নেই ওই লোকের।

এসবই ওর ধারণা বা আন্দাজ।

হাজারো সম্ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে রানা।

কিছু করতে হবে ওকে।

কিন্তু কী করবে, সেটাই তো ওর জানা নেই!

তা হলে কি গ্রিসে ফিরে নতুন করে খুঁজবে সূত্র? বাগে পেলে ঝামেলা করবে পুলিশ ক্যাপ্টেন অ্যানেস্তাসিয়ো।

নাকি ফিরে যাবে অক্সফোর্ড শহরে?

হাল ছেড়ে স্বীকার করে নেবে পরাজয়?

প্রফেসরকে বলবে, 'সরি, ফিরিয়ে আনতে পারলাম না আপনাদের মেয়েকে।'

একদম ভেঙে পড়বেন প্রবীণ দম্পতি।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজে চটকা ভাঙল রানার। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল পেছনে আসছে পুলিশের ক্রুযার। ছাতে জ্বলছে লাল-নীল আলো। কর্কশ আওয়াজে আবারও বেজে উঠল সাইরেন। রানাকে রাস্তার পাশে থামতে নির্দেশ দিচ্ছে ইণ্ডিকেটর বাতি। রাস্তা থেকে সরে নুড়িপাথরে খড়মড় আওয়াজ তুলে কিছু দূর গিয়ে থামল রানা।

পেছনে এসে হাজির হলো পুলিশের ক্রুযার। দুই গাড়ির ওড়ানো ধুলো ঘিরে ফেলল চারপাশ। আয়নায় রানা দেখল, পেছনের গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে দুই পুলিশ অফিসার। একজন হেঁটে আসছে ওর দিকে, অন্যজন ক্রাইসলারের পেছনের দিকে।

এটা রুটিন চেক নয় বা স্পিডিং টিকেটের জন্যে থামানো হয়নি, বুঝে গেল রানা। বামদিকের পুলিশ বেল্ট থেকে বের করেছে রিভলভার। ডানদিকের লোকটার হাতে খাটো নলের পাম্প শটগান। ওকে থামানো হয়েছে অন্য কোনও গুরুতর অভিযোগে। দুই পুলিশ অফিসারকে লেলিয়ে দিয়েছে যে-লোক, আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে সে এদের।

হুইলে দু'হাত রেখে চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা। অফিসারদের দিকে চেয়ে ভাবছেঃ আমাকে বেছে নিল কেন? আমার সম্বন্ধে কী জানে এরা?

উদ্যত রিভলভার হাতে ওর জানালায় থামল অফিসার। তর্জনীর ইশারা দিল কাঁচ নামাতে। পুরনো গাড়ি, হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে জানালার কাঁচ নামাল রানা। পুলিশের বয়স হবে বড়জোর চব্বিশ। বিস্ফারিত হয়েছে চোখদুটো। নার্ভাস।

'ইঞ্জিন বন্ধ করুন,' নির্দেশ দিল সে।

সাবধানে হাত সরিয়ে চাবি মুচড়ে দিল রানা। ইঞ্জিনের গর্জন থামতেই চারপাশে শোনা গেল ঝিঁঝিঁপোকার টানা আওয়াজ।

'লাইসেন্স,' বলল অফিসার। 'হাত সাবধানে নাড়বেন।'

কচ্ছপের গতি তুলে প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লাইসেন্স বাড়িয়ে দিল রানা। প্রায় ছোঁ দিয়ে ওটা নিল অফিসার। কয়েক সেকেণ্ড দেখল লাইসেন্স, তারপর মাথা দোলাল সঙ্গীর উদ্দেশে। ভাব দেখে মনে হলো, নীরবে যেন বলছে, 'হ্যাঁ, এ-ই সে লোক!' আরও নার্ভাস হয়ে গেছে সে।

'গাড়ি থেকে নামুন,' চড়া গলায় নির্দেশ দিল। 'হাত

এমন জায়গায় রাখবেন, যেন চোখের সামনে দেখি।'

গাড়ির দরজা খুলে ধীরেসুস্থে নামল রানা। হাত রেখেছে মাথার ওপর। চোখ পুলিশের চোখে। অ্যাড্রেনালিনের কারণে উত্তেজিত যুবক অফিসার। মৃদু নড়ছে রিভলভারের নল। ওটা তাক করা সরাসরি রানার বুকে।

রিভলভারটা মাত্র দু'ফুট দূরে। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন মডেল নাইন্টিন। দু'ভাবে গুলি করা যায়। অ্যাকশন কক করা থাকলে আঙুলের স্পর্শে ফেলা যায় হ্যামার। অথবা, ব্যবহার করতে হবে ডাবল অ্যাকশন মোড। ট্রিগার টিপলেই ঘুরবে সিলিণ্ডার, উঠে এসে বুলেটের পেছনে আঘাত হানবে হ্যামার। তাতে জোরে টানতে হবে ট্রিগার। কাজটা যেমন কঠিন, লক্ষ্যভেদ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। অবশ্য, ভাল গানস্মিথ ওটার ওপর কাজ করলে, পাখির পালকের স্পর্শেও বেরোবে গুলি।

কক করা নয় রিভলভার। আধসেকেণ্ড বাড়তি পাবে রানা। সামনে বেড়ে তরুণ পুলিশকে বেসামাল করে কেড়ে নেবে অস্ত্র। পরের আধসেকেণ্ডে ঘুরেই রিভলভার তাক করবে শটগানধারী পুলিশের দিকে। গুরুতর আহত করবে না এদেরকে। স্রেফ অচেতন করে ফেলে যাবে।

কিন্তু এর ফলে শুরু হবে বাজে ঝামেলা। সেটা চাইছে না রানা। 'কী কারণে আমাকে থামানো হলো?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

অস্ত্র দিয়ে ক্রাইসলার গাড়ি দেখাল অফিসার। 'হাত হুডের ওপর রাখুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে ইঞ্জিনের তাপে গরম হুডে হাত রাখল রানা। তিন গজ দূর থেকে ওকে কাভার করল শটগানধারী পুলিশ। অন্যজন ফিরল পুলিশ ক্রুযারে। কথা বলছে রেডিয়োতে। গলার আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, আরও নার্ভাস হয়ে উঠেছে যুবক।

কয়েক সেকেণ্ড পর ধুলোর মাঝে ভারী চাকার আওয়াজ শুনল রানা। নিচু গর্জন ছাড়ছে ভি-এইট ইঞ্জিন। গাড়ির হুড থেকে হাত না সরিয়ে ঘাড় কাত করে তাকাল ও। এইমাত্র পুলিশ ক্রুযারের পেছনে থেমেছে দুটো কালো এসইউভি শেভ্রলো। নতুন করে আকাশে উড়ল ধুলো। একটু পর নেমে গেল। দুই গাড়ির টিনটেড কাঁচ থেকে প্রতিফলিত হলো সূর্যের সোনালি আলো।

খুলে গেল কয়েকটা দরজা। দুই গাড়ি থেকে নামল পাঁচজন। প্রথম গাড়ির আরোহী দু'জন পুরুষ ও এক সুন্দরী মেয়ে। অন্য গাড়ির যাত্রী দু'জন। এদের পরনে চমৎকার কালো সুট। বয়স্কজনের মুখে অসংখ্য ভাঁজ। চুল ব্যাকব্রাশ করা। চোখে কালো সানগ্লাস। বয়স হবে পঞ্চাশ। শরীর চিকন। তানপুরার তারের মত টানটান। আসছে রানার দিকে। মুখে কুৎসিত হাসি। হাঙরের অসমান ও চোখা দাঁতের কথা মনে পড়ল রানার। দলে সবচেয়ে কম বয়স মেয়েটার। বড়জোর পঁচিশ। রূপসী, কুঁচকে রেখেছে ভুরু। ঝিরঝিরে তপ্ত হাওয়ায় দুলছে কালো চুলের পুরু বেণী।

দুই পুলিশ অফিসারকে ব্যাজ দেখাল বয়স্ক লোকটা। 'স্পেশাল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট। বাকি কাজ করব আমরা, অফিসার্স।'

জীবনে দেখেনি, এমন চেহারায় ব্যাজ দেখল দুই পুলিশ অফিসার। কয়েক সেকেণ্ড পর নামিয়ে ফেলল অস্ত্র।

দলের এক এজেন্টের উদ্দেশে মাথা দোলাল অ্যামেট। ওই লোক গেল রানার গাড়ির প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজায়। ঝটকা দিয়ে ওটা খুলে সিট থেকে নিল ক্যানভাসের ব্যাগ। কোটের পকেট থেকে রাবারের দুটো সার্জিকাল গ্লাভ বের করে হাতে পরল ক্যাল অ্যামেট। অন্য এজেন্টের হাত থেকে নিল রানার ব্যাগ। হাতড়াতে লাগল ভেতরে।

হাসতে হাসতে ব্যাগ থেকে বের করল .৪৭৫ লাইনবাউ

রিভলভার। ‘যা ভেবেছি! দেখেছ ভেতরে কী?’ হাত থেকে ফেলে দিল ক্যানভাসের ব্যাগ। ওটা পড়ল ধুলোর মধ্যে তার পায়ের পাশে। গ্লাভ পরা দু’হাতে ধরেছে বিশাল রিভলভারটা, দেখছে প্রশংসার দৃষ্টিতে। খুলল লোডিং পোর্ট। বারকয়েক ঘুরিয়ে নিল সিলিণ্ডার। তারপর কাউবয়ের মত ট্রিগার-গার্ডে আঙুল ভরে চরকির মত ঘোরাল রিভলভার। তার হাসিতে যোগ দিল আরেক এজেন্ট। ঘুরে রানার দিকে তাকাল অ্যামেট। মুখে বেপরোয়া হাসি। ‘দারুণ অস্ত্র!’

কোনও জবাব দিল না রানা। ভাবছে, এরা কী চায়, বা কী করবে?

ওর কাছে ঘেঁষে এল এজেন্টরা।

রানার চোখে তাকাল মেয়েটা।

সুন্দরীর চোখে ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা দেখল রানা। এখন আর কুঁচকে নেই ধনুক ভুরু।

মোবাইল ফোন বের করে কল দিল ক্যাল অ্যামেট। ‘হ্যাঁ, বলছি। ভাল খবর। পেয়ে গেছি মিস্টার মাসুদ রানাকে। ...ওকে।’

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। এরা এজেন্ট কি না সন্দেহ আছে। হাবভাব অস্বাভাবিক।

পকেটে ফোন রেখে দুই পুলিশ অফিসারের দিকে তাকাল অ্যামেট। ‘তোমাদের আর লাগবে না।’ মাছি তাড়াবার মত করে হাতের ইশারা করল সে।

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই অফিসার, তারপর তিক্ত চেহারায় চলল ক্রুযারের দিকে। গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ধরেছে, এবার উঠে পড়বে সিটে, এমনসময় পেছন থেকে ডাক দিল অ্যামেট: ‘একমিনিট! একটা কথা জানাতে চাই।’

চোখ সরু করে তার দিকে তাকাল তরুণ অফিসার। ‘কী বলবেন?’

আবারও হাঙুরে হাসি দিল ক্যাল অ্যামেট। ভাব দেখে

রানার মনে হলো, লোকটা বলবে, 'বুঝতেই পারছ কী বলব, আবার জানতে চাও কেন, দোস্ত?'

চোখ সরু করে ভারী রিভলভার দেখল অ্যামেট, পরক্ষণে হ্যামার তুলে অস্ত্রটা তাক করল তরুণ অফিসারের মুখ লক্ষ্য করে। বেচারা আছে মাত্র দশ ফুট দূরে!

একত্রিশ

মণ্ট্যানা, সিনেটর হেনরি শোফেল্ডের প্রাসাদোপম বাড়ি।

খ্যার-খ্যার আওয়াজ তুলল স্টিলের পুরু কেবল। নড়ে উঠে মসৃণভাবে চলল কেবল কার। হু-হু করে বইছে পাহাড়ি শীতল দমকা হাওয়া। থরথর করে কেঁপে সামান্য এদিক-ওদিক দুলছে ক্যাপসুলের মত ধাতব কার। ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক।

পাহাড়ের এত ওপর থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালবাসে রনসন থর্ন। ওই যে বহু নিচে উপত্যকা। মাইলের পর মাইল ঘন সবুজ অরণ্য। এখানে এলেই নিজেকে ঈশ্বরের মত মনে হয় তার। চাইলেও ছুঁতে পারবে না কেউ, পারবে না ক্ষতি করতে। সে যেন উড়ন্ত ঈগল, আকাশ থেকে দেখছে অসহায় শিকার। কারও সাধ্য নেই শুনবে গোপন কথা। তুমুল হাওয়ায় দুনিয়ার সেরা লিসেনিং ডিভাইসও কাজ করবে না। গোপন ইকুইপমেন্ট আছে কি না তা দেখতে প্রতি সপ্তাহে দু'বার করে তল্লাসি করা হয় সিনেটরের বাড়ি। তবুও আকাশে ঝুলন্ত এই কেবল কার-এ নিজেকে বেশি নিরাপদ বোধ করে থর্ন। সেজন্যেই গোপন বিষয়ে আলাপ করতে

হলে সবসময় চলে আসে এখানে।

পুরো পাঁচ শ' গজ দৈর্ঘ্যের কেবল। পাহাড়ে সিনেটরের বাড়িতে বোর্ডিং প্ল্যাটফর্ম। রওনা হয়ে নামা যায় উপত্যকার আরেকপ্রান্তের প্ল্যাটফর্মে। কেবল কার থেকে রিমোট কণ্ট্রোল ব্যবহার করে যে-কোনও জায়গায় থামতে পারে থর্ন। জরুরি আলাপের জন্যে বেছে নেয় ঠিক মাঝের জায়গাটা। পুরো এক হাজার ফুট নিচে সবুজ অরণ্য।

অন্য কেউ আসে না এখানে। সেই আমলে কয়েক হাজার একরের রেঞ্জ কেনার পর, অনেক টাকা খরচ করে কেবল কার বসিয়ে নিয়েছিলেন সিনেটর শোফেল্ডের বাবা। ভেবেছিলেন, স্ত্রী ও ছেলে পছন্দ করবে রকি পর্বতের ওপর থেকে উপত্যকায় নেমে যেতে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বা ছেলের ভাল লাগেনি খেলনাটা। বহু বছর হয়েছে কবরে গেছেন সিনেটরের বাবা। যখন বেঁচে ছিলেন, একমাত্র ছেলের নিরেট অযোগ্যতা দেখে অত্যন্ত হতাশ ছিলেন।

কণ্ট্রোল বুথের দিকে রিমোট তাক করল রনসন থর্ন। টিপল মাঝের লাল বাটন। ছাতের ওপর থেকে এল ক্ল্যাং-ক্লাং আওয়াজ। কাজ শুরু করেছে পুলি। থরথর করে কেঁপে থেমে গেল কেবল কার। কোটের পকেটে রিমোট রেখে জানালা দিয়ে বিস্তৃত উপত্যকা দেখল থর্ন। কেবল কারের সঙ্গে দুলছে মৃদু। এতটা ওপরে সাঁই-সাঁই বইছে পাহাড়ি হাওয়া।

উপত্যকার দিক থেকে ফিরে সঙ্গীকে দেখল রনসন থর্ন। দরদর করে ঘামছে তার সঙ্গীর মুখ। 'তোমার তো এতদিনে অভ্যেস হয়ে যাওয়ার কথা।'

'বুক কাঁপে। এত নিচে পড়লে...'

হঠাৎ মিলিয়ে গেল থর্নের হাসিটা। কড়া গলায় বলল, 'নতুন রিপোর্ট দাও।'

নার্ভাস হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'এখনও তেমন কিছু বলেনি ক্যাথি হার্বার্ট। আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

‘আগেও এই কথা বলেছ। আমরা ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি কেন? আমার ভুল না হলে এখনও খুঁজে বের করতে পারোনি ওই উকিলকে।’

‘পিছলা সিম্পসন?’

‘অন্য কোনও উকিল ফস্কে গেছে হাত থেকে? আছে এমন কেউ, যার কাছে আছে ক্যাথি হার্বার্টের সংগ্রহ করা প্রমাণ? ওই লোক কিন্তু ডুবিয়ে দেবে আমাদেরকে।’

‘আমরা খুঁজছি লোকটাকে।’

কড়া চোখে সঙ্গীকে দেখল রন থর্ন। ‘খেয়াল রেখো, যেন বেশি দেরি না হয়। সহজ কাজ। সেটাই পারছ না? ক্রিস্টিনা আর বয়েটারের কী খবর? কোথায় তারা? নতুন কোনও খবর দিয়ে অবাক করে দাও আমাকে। ...পাওয়া গেছে ওদের লাশ?’

‘না, এখনও পাইনি। তবে মনে হচ্ছে, ওরা আর কখনও ফিরবে না।’

আপত্তি নিয়ে হাত নাড়ল থর্ন। চেয়ে আছে নিচের পাহাড়ি উপত্যকায়। ‘তার মানে, তোমার কাছে ভাল কোনও সংবাদ নেই?’ কোটের পকেট থেকে চকোলেট নিয়ে মোড়ক খুলল সে। ‘খাবে দু’একটা?’

মাথা নাড়ল সিআইএর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, চেহারায় উদ্বেগ। কাশল খুক-খুক করে। ‘আরেকটা ঘটনা ঘটেছে।’ পায়ের পাশ থেকে ব্রিফকেস তুলল সে। ডালা খুলে থর্নের হাতে দিল সরু কার্ড ফোল্ডার।

চকোলেট চিবুতে চিবুতে ফাইল খুলল থর্ন। প্রথমে তার চোখে পড়ল ব্লো-আপ করা পাসপোর্ট সাইযের ফোটো। কালো চুলের এক যুবক। ‘এ কে?’

‘নাম মাসুদ রানা। বাঙালি। দুর্ধর্ষ লোক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেরা এজেন্ট। কয়েক দিন আগে আমাদের এজেন্টরা রিপোর্ট দিয়েছে, ওই লোক ছিল গ্রিসের

কোর্ফিউ দ্বীপে। দেখা করেছিল জ্যাঁ মউরোসের সঙ্গে। তুমি তো জানো, ওখানে ক্যাফেতে ছিল ওই ফরাসি...'

'ইতিহাসের প্রফেসরের মত লেকচার প্রয়োজন পড়বে না,' তাকে থামিয়ে দিল থর্ন। 'ওই ফরাসি লোকটা খুঁজছিল ক্যাথি হার্বার্টকে। আলাপ করেছিল গাধা এক গ্রিক লোকের সঙ্গে। কিন্তু আমি তো ভেবেছি, চুকে গেছে ওসব ঝামেলা।'

'আমরাও তা-ই ভেবেছিলাম। থ্যানাটসকে মেরে ফেলার পর, ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পুলিশ ধরে নেয় ড্রাগ লর্ডদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার। এরপর বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয় ফরাসি মার্সেনারি মউরোসকে। কিন্তু সেসময়ে বেঁচে যায় মাসুদ রানা। এটা আমরা জানতে পারি ক্রিস্টিনা আর বয়েটারের কাছ থেকে। তার দু'এক দিনের ভেতর জেনে গেলাম, কে আসলে ওই মাসুদ রানা।'

ফোটোর পাতা সরিয়ে পরের পৃষ্ঠায় চোখ ফেলল রনসন থর্ন। মউরোসের বিষয়ে তথ্য। ওটা বাদ দিয়ে পড়তে লাগল রানার ডোশিয়ে। ধীরে ধীরে কুঁচকে গেল দুই ভুরু। কমিয়ে দিয়েছে পড়ার গতি। টের পেল, বুক আঁকড়ে আসছে তার। দশ মিনিট পর পড়া শেষে মুখ তুলে তাকাল। 'পড়ে দেখেছ?'

আস্তে করে মাথা দোলাল তার সঙ্গী।

'অকল্পনীয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বয়সী মেজর। পদকের শেষ নেই। যোগ দিয়েছিল বিসিআই-এ। এমন কী সিআইএরও কোনও এজেন্ট নেই, যাকে তুলনা করা যাবে তার সঙ্গে। এ লোক তো অস্ত্র ভরা রোবট! এমন কী আমেরিকার প্রেসিডেন্টও নিরাপদ নয় তার কাছ থেকে! আমার দলে এর মত মানুষ থাকলে আর কিছুই চাইতাম না।'

'নীতি নিয়ে চলে, কারও কথায় নাচার লোক নয়,' বলল সিআইএ কর্মকর্তা। 'নিজের আছে ডিটেকটিভ এজেন্সি। আছে সাগরগামী সব জাহাজের বহর। মেক্সিকো, উরুগুয়ে, পেরু এবং বহু দেশে গেছে অনেক অভিযানে। নামও করেছে

শখের আর্কিওলজিস্ট হিসেবে। দু'হাতে সাহায্য দেয় দুস্থদের সংস্থায়। কয়েকবার জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি-সাগর চুঁড়ে খুঁজে বের করেছে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে। অনেকে বলেঃ দুঃসাহসী বাঙালি অভিযাত্রী। কিন্তু দুঃখের কথাঃ ওই হারামজাদা আমাদের দলে যোগ দেবে না কখনও।'

'ভাবছ, সে-ই শেষ করেছে ক্রিস্টিনা আর বয়েটারকে?'

'তা ছাড়া আর কে?'

ফাইল বন্ধ করল থর্ন। 'কী হচ্ছে আসলে? আর্কিওলজির অ্যাকাডেমিক এক মেয়ের সঙ্গে কীসের সম্পর্ক ওই লোকের? ওই মেয়ের পিছু নিয়েছে কেন সে?'

'জানি না। হয়তো কাজ করত ওই মেয়ের হয়ে।'

ঝট্ করে সঙ্গীর চোখে তাকাল থর্ন। 'তা হলে সবই জানে মাসুদ রানা। গোপন নেই কিছুই।'

'হতে পারে।'

'তার মানে, আরও খারাপ হয়ে উঠছে পরিস্থিতি,' চোখ পাকিয়ে সঙ্গীকে দেখল থর্ন। 'একে একে খুন করবে মাসুদ রানা আমাদের এজেন্টদেরকে। তাদের পেট থেকে বের করবে নতুন তথ্য। এর অর্থ বুঝতে পারছ? নিরাপদ নই আমরা কেউ!'

'জানি,' ঢোক গিলল সিআইএ কর্মকর্তা।

'জানো, এখন কোথায় আছে ওই বাঙালি কুকুরটা?'

'ওই ব্যাপারেই এসেছি কথা বলতে। সে আছে এখন আমেরিকায়।'

'কী বলছ!'

'হ্যাঁ। গত দু'দিন আগে আটলাণ্টার ইউএস ইমিগ্রেশন পেরিয়ে মিশে গেছে ভিড়ে।'

হতাশায় মাথা ঝুলে গেল থর্নের। 'আর বলছ, ওকে খুঁজে বের করতে পারেনি সিআইএ?'

'দেরিতে এয়ারপোর্টে পৌঁছায় আমাদের লোক। তারপর

আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

চোখে রাগ নিয়ে সঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল থর্ন। তিক্ত হয়ে গেছে মন।

'সতর্ক থাকতে হবে,' বলল তার সঙ্গী। 'আমাদের এটা কিন্তু অফিশিয়াল এজেন্সি বিযনেস নয়, থর্ন। এ-ও মাথায় রাখতে হবে, সাধারণ কেউ নয় মাসুদ রানা।'

'তোমার লোকের জন্যে লাখ লাখ ডলার খরচ করি,' বলল থর্ন। 'ওদিকে মাসুদ রানা একা। মাত্র একজন সে। তোমার হাতে আছে অন্তত বিশজন এজেন্ট। দরকার হলে সাহায্য নিতে পারবে আরও এক শ' এজেন্টের কাছ থেকে। মাসুদ রানা কি এতই বুদ্ধিমান, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে তোমাদেরকে?'

রেগে গেছে সিআইএ অফিসার। 'তোমার প্রতিটি কথা মেনে নিয়েছি আমরা। ধরে এনেছি ক্যাথি হার্বার্টকে। খতম করেছি থ্যানাটসকে। বোমা ফাটাতে ডেকেছি সলোমনকে। এসব সহজ কাজ নয়। এটা তো আর প্রেস কনফারেন্স করার মত কিছু না। মাত্র একটা ভুল হলেই ডুবে যাব সবাই।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল রন থর্ন। 'আমি যদি আগে বুঝতাম যে তোমার লোক এত গাধা, পুরো সমস্যা দূর করতে ভাড়া করতাম সলোমন রুশদিকে।'

'সলোমন মার্সেনারি,' আপত্তির সুরে বলল সিআইএ কর্মকর্তা। 'কোনও নীতি নেই তার।'

'সে কী বিশ্বাস করে আর কী বিশ্বাস করে না, সেটা দিয়ে কী হবে? স্বয়ং শয়তান হোক না সে! কাজ হলেই হলো!'

'নীতি না থাকলে আমাদের চলবে না।'

কড়া চোখে বন্ধুকে দেখল থর্ন। 'ও, তুমি ভাবছ, আমরা কাজ করছি ঈশ্বরের হয়ে? কান পেতে শোনো আমার কথা, আমরা করছি ব্যবসা। আর প্রথম কথা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা করা, এবং শেষ কথাও মুনাফা। সলোমন রুশদি হলে শেষ

করত তার কাজ। অন্ধ লোকও পিছু নিতে পারবে, এমন ছেঁড়া সুতো পেছনে ফেলে যেত না সে।'

এর জবাবে কিছু বলতে গিয়ে হাঁ করল সিআইএর উর্ধ্বতন অফিসার। কিন্তু বেজে উঠল তার মোবাইল ফোন। কোটের পকেট থেকে ওটা নিয়ে থর্নের দিক থেকে ফিরে কল রিসিভ করল সে। কণ্ঠ মৃদু। কয়েক সেকেণ্ড পর কপালে উঠল ভুরু। 'ঠিক বলছ তো? ওকে! ভাল করেই জানো কী করতে হবে।' ফোন রেখে থর্নের দিকে ফিরল সে। ঠোঁটে এখন বিজয়ীর চওড়া হাসি।

'কী?' জানতে চাইল থর্ন।

'ক্যাল অ্যামেট। ধরে ফেলেছে মাসুদ রানাকে।'

প্রথমবারের মত হাসল থর্ন। 'গুড! ভেরি গুড! বাঙালি হারামিটাকে নিয়ে গিয়ে এখন বের করুক পেট থেকে সব।'

'তুমি তো জানো, আমি ওখানে থাকতে পারব না,' বলল সিআইএ অফিসার, 'কেউ দেখে ফেললে তাকে খুন করতে হবে।'

'তা ঠিক আছে। তবে আমি যাব। দেখতে চাই কী ধাতু দিয়ে তৈরি ওই লোক।'

'আমার মনে হয় না তোমার ঝুঁকি নেয়া উচিত।'

'ঝুঁকিটা নেব,' জোর দিয়ে বলল থর্ন। 'নিজ হাতে শেষ করব মাসুদ রানাকে।'

বত্রিশ

বিকট আওয়াজে 'বুম!' করে উঠেছে প্রকাণ্ড রিভলভার।

চারপাশে ছড়িয়ে গেল ওই ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। লাল রঙ ভরা ভর্তায় পরিণত হলো তরুণ পুলিশ অফিসারের চেহারা। ভারী বুলেটের আঘাতে পিছিয়ে গিয়ে ধুলোয় ধপ্ করে পড়ল বেচারা। প্রাণটা যাওয়ার আগে বারকয়েক ছুঁড়ল পা।

আবারও .৪৭৫ রিভলভার তাক করল অ্যামেট। পরের সেকেণ্ডে কিছু বোঝার আগেই খুন হলো দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার। প্রচণ্ড আঘাতে বিস্ফোরিত হয়েছে তার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। সব ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পুলিশ ক্রুযারের উইণ্ডশিল্ডে ছলাৎ করে লাগল একগাদা রক্ত। টুঁ শব্দ না করে ধুলোয় আছড়ে পড়ল বয়স্ক পুলিশ অফিসার।

কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না কেউ।

খোলা এলাকায় মিলিয়ে গেছে ভারী বুলেটের গর্জন। ধুলোর ভেতর নিথর পড়ে আছে দুই পুলিশ অফিসার। তাদের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট।

তার দিকে চেয়ে আছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর তাকাল অন্যান্য এজেন্টের দিকে। দাঁত বের করে হাসছে তাদের একজন। অন্য দু'জন নিস্পৃহ। মহিলা এজেন্টের চোখে অনিশ্চয়তা। এ ধরনের খুনের জন্যে হয়তো তৈরি ছিল না।

'দুর্দান্ত ঝাঁকি দেয়,' খুশিমনে বলল অ্যামেট। এক হাতে বুঝতে চাইছে রিভলভারের ওজন। আরেক হাতে খুলে ফেলল সানগ্লাস। তিক্ত চোখে তাকাল রানার চোখে। 'তুমি তো দেখছি মস্ত বিপদে জড়িয়ে গেছ, মিস্টার রানা।'

ক্রাইসলার গাড়ি থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। আঙুল তুলে লাশগুলো দেখাল। 'ওদেরকে খুন করলে কেন?'

'আমি তো খুন করিনি,' সহজ সুরে বলল অ্যামেট। 'তুমি করেছ। নিজ চোখে দেখেছি আমরা সবাই। এটা তোমার রিভলভার। সবখানেই তোমার আঙুলের ছাপ রয়েছে।'

‘আমার কাছ থেকে কী চাও তোমরা?’

হাঙুরে হাসি দিল অ্যামেট। ‘জরুরি কিছু প্রশ্নের জবাব। এখান থেকে তোমাকে সরিয়ে নেয়ার পর জানতে চাইব সব।’

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেছে হাসি। আবারও কক করল রিভলভার। নযল ঠেকাল রানার কপালে। ‘আমরা তোমাকে গ্রেফতার করছি, মাসুদ রানা— তুমি পুলিশ-হত্যাকারী বর্বর এক জানোয়ার!’

অন্যান্য এজেন্টের দিকে তাকাল রানা। দলে তারা পাঁচজন। আরও অন্তত দু’জন আছে টিনটেড কাঁচের ওদিকে। অ্যামেটের সঙ্গে ওর দূরত্ব আর অন্যদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখল রানা। চোখ ফিরল অস্ত্রের নলের ওপর। আবারও দেখল ক্যাল অ্যামেটকে। আজ দ্বিতীয়বারের মত ওর দিকে তাক করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। তরুণ অফিসারকে সহ্য করেছিল, কারণ সে ছিল আইনের ভেতর। কিন্তু কোনও কারণ নেই এই লোকটার বেআদবি সহ্য করার।

তা ছাড়া, লড়াইয়ের বড় একটা কৌশলে ভুল করেছে লোকটা। এতকাল শত্রুর মুখের কাছে ধরেছে খাটো নলের গ্লক বা সিগ সাওয়ার। এখন সে হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজিত, অথবা অন্যদেরকে বোঝাতে চাইছে, যে-সে লোক নয় সে। এসব দেখানো হয় সিনেমায়। এই লোক ভুলে গেছে, হাণ্টিং রিভলভারের মাযল আপাতত আছে রানার মাথা থেকে মাত্র চার ইঞ্চি দূরে।

আর্মি বা বিসিআই-এ প্রথমেই শেখানো হয়: শত্রুর খুব কাছে নেবে না নিজের অস্ত্র। নইলে নিজেই খুন হবার সম্ভাবনা থাকে। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বেপরোয়া শত্রু, তাই দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। বহুবার ট্রেনিঙে দেখানো হয়েছে, কীভাবে কেড়ে নিতে হবে অস্ত্র। ওই বিদ্যা বহুবার প্রাণরক্ষা করেছে রানার।

মাত্র এক সেকেণ্ড ভাবল রানা।

পারবে তো?

এরা সিআইএ এজেন্ট।

পাঁচজন।

ওর নিজের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

দ্বিধা এল একটু। পরক্ষণে ভাবল, আরে, গাধা, এই জীবনে দ্বিতীয়বার তো আর মরতে হবে না তোকে!

পরক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। খপ্ করে রিভলভারের নল ধরেই গায়ের জোরে ঠেলল ক্যাল অ্যামেটের মুখের দিকে। রিভলভারের খাঁজ কাটা কাঠের বাঁট কড়াৎ শব্দে ঢুকল স্পেশাল এজেন্টের মুখের গহ্বরে।

মার খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল লোকটা। ফাটা ঠোঁট থেকে ঝরঝর করে নামল রক্তের স্রোত। আরেক টানে অ্যামেটের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে কড়া একটা লাথি লাগাল রানা ওর হাঁটুর ওপর। ভারসাম্য হারিয়ে ধুলোয় পড়ল অ্যামেট। সাপের মত মুচড়ে উঠছে ব্যথায়। দু'হাতে ধরেছে আহত মুখ। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরোল কয়েকটা ভাঙা দাঁত।

বসে নেই রানা। অন্যরা নড়ার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ধুলোয়। একটানে ব্যাগ নিয়ে পৌঁছে গেল ক্রাইসলারের দরজার হ্যাণ্ডেলের পাশে। পরক্ষণে দরজা খুলে সরে গেল ওটার আড়ালে। দরজাটাকে রেখেছে ঢালের মত করে। ওই একই সময়ে অস্ত্র বের করতে হোলস্টারে ছোঁ দিল এজেন্টরা।

গাড়ির ভারী দরজায় ঠক-ঠক শব্দে বিঁধল এক পশলা গুলি। রিভলভার কক করেই পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ল রানা। এরা সরকারী এজেন্ট, আমেরিকার বুকে দাঁড়িয়ে এদের বিরুদ্ধে গুলি করলে পড়বে মস্ত বিপদে।

হ্যাঁ, অনুচিত গুলি করা। নিতান্ত বাধ্য না হলে...

ওর অন্তর জানাল, উপায় নেই তোর খুন না করে।

সাইটে পেল এক এজেন্টকে। আহত করতে চাইলে ভাল অস্ত্র নয় লাইনবাউ। কাঁধে বুলেট লাগলেও ছিঁড়ে নিয়ে যাবে কাঁধ থেকে গোটা হাত। অতিরিক্ত রক্ত হারিয়ে ও শকের কারণে মরবে লোকটা। এজেন্টের বুক লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। বুম করে উঠে ওর হাতের ভেতর লাফ দিল দানবীয় রিভলভার। ওর টার্গেট মাটিতে পড়ল করাতে কাটা গাছের মত।

পাঁচ গুলির রিভলভার। এখন আছে দুটো বুলেট।

ক্রাইসলারের ভারী দেহে লাগছে একরাশ গুলি। ক্ষত-বিক্ষত দরজার পেছনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ওর দিকে পিস্তল তাক করেছে মেয়ে এজেন্ট। সরাসরি সাইটের মাঝ দিয়ে দেখছে। এবার ট্রিগার টিপলেই খুন হবে রানা।

কিন্তু কেন যেন রানার মনে হলো, ওকে গুলি করবে না ওই মেয়ে। কাজেই পাশের এজেন্টকে গুলি করল রানা। বুকে বুলেট বিঁধতেই কয়েক পাক খেয়ে কালো এক এসইউভির গায়ে গিয়ে পড়ল সে।

কালো শেভ্রোলে থেকে নেমে পড়ল আরও দুই এজেন্ট। টান দিয়ে হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তল।

এখান থেকে সরতে হবে, বুঝে গেল রানা। লাফিয়ে উঠল ক্রাইসলারের ড্রাইভিং সিটের সামনের গভীর অংশে। সিটে রিভলভার রেখে একহাতে মুচড়ে দিল চাবি। গিয়ার ফেলে অন্যহাতে ঘোরাল স্টিয়ারিং হুইল। হাত দিয়ে চাপ দিল অ্যাক্সেলারেটরে। হোঁচট খেয়ে রওনা হলো মস্ত গাড়ি। ধুলোয় বনবন করে ঘুরছে চাকা। পুরো খুলে গিয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে দরজা। অন্ধের মত প্রায় বিশ গজ ড্রাইভ করল রানা। ভেতরে ঢুকছে অজস্র বুলেট। চুর-চুর হচ্ছে জানালার কাঁচ। রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে গাড়ি। তবে যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি হয়েছে ভেবে এবার সিটে উঠে বসল রানা। রিয়ার ভিউ

মিররে দেখল, নিজেদের গাড়ির দিকে ছুট দিয়েছে এজেন্টরা। অ্যামেটকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করছে সুন্দরী ওই এজেন্ট। চাকা পিছলে রানার পেছনে রওনা হলো দুই কালো এসইউভি।

আঁকাবাঁকা সরু ফাঁকা রাস্তায় ফুল স্পিড তুলতে চাইল রানা। ভারী গাড়ি নিয়ে চলেছে রাস্তার মাঝ বরাবর। পেছন থেকে ওভারটেক করতে এলে বাধা দেবে ডানে-বামে সরে। উইণ্ডশিল্ড এখন মাকড়সার জাল। রিভলভারের নল দিয়ে বাড়ি মেরে কাঁচ ঝরিয়ে দিল রানা। শোঁ-শোঁ করে ভেতরে ঢুকল তপ্ত হাওয়া। বহু দূর পর্যন্ত সরল রেখার মত গেছে রাস্তা। ওপরে উঠছে স্পিডোমিটারের কাঁটা। গতি ঘণ্টায় আশি মাইল। তারপর নব্বুই। পুরনো ক্রাইসলারকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে রানা। তবে লেজের কাছেই আছে এজেন্টদের দুই গাড়ি। রানার রিভলভারে আছে মাত্র একটা বুলেট। লাইনবাউ এমনই অস্ত্র, গাড়ি চালাবার সময় আধুনিক অটোমেটিক পিস্তলের মত রিলোড করতে পারবে না। শিকারীদের অস্ত্র। ব্যবহার করে ধৈর্য আছে এমন মানুষ। একটা একটা করে বের করতে হবে বুলেটের খোসা। গুলিও ভরতে হবে একটা একটা করে। তাতে প্রয়োজন যথেষ্ট সময়।

পেছনে 'বুম!' করে উঠল একটা অস্ত্র।

কুঁজো হয়ে গেল রানা। উড়ে গেল উইং মিরর এবং জানালার পিলারের একাংশ। নানাদিকে ছিটকে গেছে প্লাস্টিক ও ধাতব টুকরো। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল রানা।

এসইউভির জানালা দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ বের করেছে এক এজেন্ট। চুল ও পোশাক ধরে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে দমকা হাওয়া। হাতে পেটমোটা শটগান। তাক করছে আবারও। 'বুম্!' করে উঠল অস্ত্রটা। ক্রাইসলারের ভেতরে ঢুকল সীসার অসংখ্য পেলেট। খুবলে গেল রানার পাশের

সিটের চামড়া ও ফোম।

এঁকেবেঁকে যেতে যেতে হাত ঘুরিয়ে পেছনে রিভলভার নিল রানা। এটাই ওর শেষ গুলি। তাক না করেই টিপে দিল ট্রিগার। দানবীয় রিভলভারের প্রচণ্ড রিকয়েলে ওর মনে হলো ভেঙে গেছে কবজিটা। প্রায় কামানের গোলার মত বুলেট পেছনের জানালার অবশিষ্ট কাঁচ উড়িয়ে গিয়ে ঢুকেছে এসইউভির ভেতর। রিয়ার ভিউ মিররে রানা দেখল, হঠাৎ করেই বাঁক নিল গাড়িটা। পরক্ষণে উল্টে পড়ল রাস্তার ধারে। জানালা থেকে পড়ে গাড়ির নিচে ছেঁচে গেছে বন্দুকধারী এজেন্ট। কয়েক ডিগবাজি খেয়ে আরেকদিকে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। রাস্তায় ছড়িয়ে গেছে ভাঙাচোরা সব পার্টস্। ওসব এড়াতে একপাশে সরল দ্বিতীয় এসইউভি। নতুন করে গতি তুলছে ওটা।

পুরনো ক্রাইসলারটাকে ঝড়ের বেগে নিয়ে চলেছে রানা। 'বুম! বুম!' শব্দে কান ফাটিয়ে দিচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র।

বামে বাঁক নিয়েছে সরু রাস্তা। দু'পাশে ছোটবড় গাছ ও ঘন ঝোপ। সবচেয়ে কম ঘন দিকে ক্রাইসলার চালাল রানা। সামনেই পড়ল বৃদ্ধ এক লোক, পেছনে দড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা খচ্চর। বৃদ্ধকে দেখে একেবারে শেষসময়ে বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা। রাস্তা থেকে ঝাঁপিয়ে গভীর ঝোপের মধ্যে পড়ল গাড়ি। ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকল অসংখ্য ডালপালা। এত জোরে ধুম্ করে নিচে পড়ল ক্রাইসলার, আরেকটু হলে সিট ছেড়ে উড়াল দিত রানা। ঝর্নার খাড়া তীর লক্ষ্য করে হুড়মুড় করে নামছে গাড়ি।

এক সেকেণ্ড রানার মনে হলো, সামনেই ঝর্না এড়াবার সোজা পথ। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে দেখল, একটু দূরে মস্ত এক গাছের গুঁড়ি। এখন আর এড়াতে পারবে না চাইলেও।

অন্তত পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটছে ক্রাইসলার। সাঁই করে গিয়ে লাগল গাছের কাণ্ডে। প্রচণ্ড বেগে সামনে হুমড়ি খেল

রানা। ফটাস্ শব্দে খুলল এয়ারব্যাগ। আকাশে উঠেছে ক্রাইসলারের পেছনদিক। বনবন ঘুরছে চাকা। গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। নাকে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ভারী গাড়ি, তারপর চিত হয়ে পড়ল বিকট শব্দে। ছাত এখন মেঝে।

ক'সেকেণ্ডের জন্যে হতচকিত হয়েছে রানা। কানে ঝনঝন শব্দ। ঠোঁটে রক্তের লবণ। তারপর টের পেল, উল্টে আছে ও। বুকের কাছে স্টিয়ারিং হুইল। উঠে এসে দুই কাঁধে চাপ দিচ্ছে ছাত।

দূরে ছুটন্ত পদশব্দ। মড়াৎ করে ভাঙল ডাল। ... আওয়াজ। চিৎকার করে উঠল কেউ: 'ওই যে! ওখানে!'

ড্যাশবোর্ডে লাথি মেরে শরীর হিঁচড়ে ভাঙা জানালা দিয়ে বেরোতে চাইল রানা। দু'হাতের জোরে ঘুরিয়ে নিল শরীর। ভাঙা গাড়ি থেকে বেরোল প্রায় ক্রল করে। থামল ওখানে। হাত বাড়িয়ে ক্রাইসলারের ভেতর থেকে নিল ব্যাগ আর গুলিশূন্য লাইনবাউ। খালি হাতে লড়ার চেয়ে গুলিহীন অস্ত্রও অনেক ভাল।

রানা আছে ঘন ঝোপ ও গাছের জটলায়। জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে সব। তারকাঁটার বেড়ার মত হাত ও মুখে খচ-খচ করে লাগছে কাঁটা। উঠে দাঁড়িয়ে গাড়ির কাছ থেকে সরে যেতে লাগল রানা। বাজে অ্যাক্সিডেন্টের ফলে কাজ করছে না মাথা। হাঁফাচ্ছে হাপরের মত। উত্তেজনায় লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একবার দেখল চারপাশ। প্রতিটি পদে বাধা দিচ্ছে গভীর কাঁটাঝোপ। পেছনে মানুষের কণ্ঠ। আসছে এজেন্টরা। যে-কোনও সময়ে ধরা পড়বে ও।

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ঝোপ ভেঙে ছুটল দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য রানা। এড়িয়ে গেল নিচু এক ডাল। পরক্ষণে দেখল, ক'ফুট দূরে এক এজেন্ট। অস্ত্র ওপরে তুলল সে। তবে মাটিতে দেহ পিছলে যেতে দিল রানা। তুলে রেখেছে ডান পা। ওর বুটের গোড়ালি সরাসরি লাগল এজেন্টের উরুর পাশে। ধুপ করে

পড়ল লোকটা। টাশ্ শব্দে বেরিয়ে গেল হাতের নাইন এমএম পিস্তলের বুলেট। দূরের এক গাছে বিঁধল ওটা। উঠে বসেই লোকটার মাথায় গায়ের জোরে রিভলভারের বাঁট নামাল রানা। এতই জোরে, মুহূর্তে জ্ঞান হারাল এজেন্ট, হাতে এখনও পিস্তল। হান্টিং রিভলভারটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে এজেন্টের নাইন এমএম পিস্তল নিয়ে নিল রানা। ম্যাগাযিন প্রায় ভরা। কালো অস্ত্রটা মনে দিল নিরাপত্তার অনুভূতি। কিন্তু গুলির শব্দ শুনেছে অন্য এজেন্টরা। ছুটে আসছে এদিকে। পেছনের ঝোপে ক'জনের চিৎকার ও পায়ের আওয়াজ। বেশি দূরে নেই তারা।

উঠে দৌড় শুরু করল রানা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে পায়ের নিচে লালচে মাটি হলো পিছলা জমি। সামনেই ঝর্না। ওটা পেরোতে চাইল রানা। ছুটছে পাথরের সব চাঁইয়ে পা ফেলে। ঝর্না পেরিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে যেতে লাগল খাড়া তীর বেয়ে। সামনের জঙ্গল আরও গভীর। জায়গায় জায়গায় পড়ে যাওয়া গাছ। জন্মেছে অসংখ্য কাঁটাঝোপ। খোঁচা খেতে খেতে কিছু দূর যাওয়ার পর ঘাস ভরা এক জায়গায় পৌঁছুল রানা। ওপরে গেছে ঢিবির মত জমিন। পেছনে শুনল চিৎকার। ঢিবি বেয়ে উঠে যেতে চাইল রানা। ভাবছে, সুযোগ আছে সরে যাওয়ার।

তখনই শুনল কপ্টারের জোরালো খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ। ঘাসে ভরা ঢিবি পেরিয়ে কাত হয়ে এল যান্ত্রিক ফড়িং। উচ্চতা বড়জোর বিশ ফুট। আসছে ছোঁ দেয়া বাজপাখির মত। নাক নিচু, লেজ আকাশে। রোটরের দমকা হাওয়া মাটিতে নুইয়ে দিল ঘাস ও ঝোপগুলোকে। প্রচণ্ড বাতাস ছিঁড়তে চাইছে রানার চুল ও পোশাক।

কপ্টারের দুই দরজায় দেখা দিয়েছে দুই এজেন্ট। হাতে অটোমেটিক রাইফেল। দু'সেকেণ্ড পর রানার ওপর স্থির হলো অস্ত্রদুটোর মাযল। ঘুরেই দৌড় শুরু করল রানা। পেছনের

জমিতে লাগল একরাশ গুলি। সামনে ধসে পড়া এক গাছ দেখে ওটার ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। পরক্ষণে হেলিকপ্টার ওপর দিয়ে যাচ্ছে দেখে গুলি পাঠাল। কালো ফিউজেলাজে লাগল বুলেট। তৈরি হলো একসারিতে তিনটে গর্ত। রোটরের ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে লালচে ধুলো, ছেঁড়া সবুজ পাতা ও ঘাস। নাকের কাছে গাছের সারি দেখে কাত হয়ে সরল হেলিকপ্টার। আবারও ঘুরে আসছে রানার দিকে।

এয়ারক্রাফট বা মিলিটারি রাইফেলের বিরুদ্ধে লড়তে তৈরি করা হয়নি নাইন এমএম পিস্তল। কিন্তু এ ছাড়া কোনও অস্ত্র নেই রানার কাছে। হেলিকপ্টারের দিকে পিস্তলটা তাক করে গুলি পাঠাল পর পর পাঁচবার। কিছুই হলো না শত্রুপক্ষের। ছুটে আসছে হেলিকপ্টার। রানার ওপর রাইফেল তাক করল এজেন্টরা। পায়ে লাল লেসারের আলো দেখে লাফিয়ে সরে গেল রানা। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, তার পেছনের গাছের কাণ্ডে বুলেট লেগে চারদিকে ছিটকে গেল স্প্লিণ্টার। পরের সেকেণ্ডে গুলির আওয়াজ শুনল রানা। আগেই দৌড় দিয়েছে ঝোপে ঢুকতে। পেছনের মাটিতে ঠক-ঠক শব্দে লাগছে বুলেট।

রানা ঝোপে ঢুকতেই ওপর দিয়ে গেল হেলিকপ্টার। ঘন ঝোপে প্রায় অন্ধের মত ছুটছে ও। টপকে যাচ্ছে বড় পাথর ও শেকড়। বারকয়েক সামলে নিল আছাড় খেতে গিয়ে। ঝোপঝাড় সরিয়ে দৌড়ে চলেছে। দু'বাহুতে বিঁধছে ছোটবড় কাঁটা। কিছুক্ষণ ছোটার পর হঠাৎ করেই পেছনে পড়ল গাছের সারি। আবারও পৌঁছে গেছে ঘাস জমিতে।

কিন্তু ওখানে একা নয় রানা।

আগেই ঘাসজমিতে হাজির হয়েছে দুই এজেন্ট। অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। যার হাতে শটগান, আগে তাকেই গুলি করা উচিত, ভাবল রানা। এত কম রেঞ্জে পিস্তলের গুলির চেয়ে বহুগুণ বিপজ্জনক নলকাটা বন্দুকের

শতখানেক পেলেট। কিন্তু বন্দুকওয়ালাকে খতম করলে অন্য এজেন্টের পিস্তলের গুলিতে মরবে ও।

মাত্র এক সেকেণ্ড ভাবল রানা। পরের সেকেণ্ডে দেখল পেছনের ঝোপ ভেঙে পৌঁছে গেছে আরও ক'জন এজেন্ট। ডানে মেয়েটা। পেছনে স্পেশাল এজেন্ট অ্যামেট। প্রথম দু'জনের পাশে আরও এক এজেন্ট।

শত্রু সবমিলে পাঁচজন, অস্ত্র হাতে ঘিরে ফেলেছে ওকে।

আপাতত কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। সহজ ভঙ্গিতে পিস্তলটা মাটিতে ফেলে মাথার ওপর হাত তুলল রানা।

অস্ত্র তাক করে ওকে দেখছে মেয়েটা, কুঁচকে গেছে ভুরু। চোখের দৃষ্টি পড়ল রানা। পালাতে গিয়ে মস্ত ভুল করেছে ও। তবে ওর খারাপ কিছু হোক, যেন চাইছে না সুন্দরী মেয়েটা। কেন চাইছে না, কে জানে! কালো চোখ বলছে, এখানে থাকতে না হলে খুশি হতো সে।

অগ্নিদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে ক্যাল অ্যামেট। মুখে ধুলো-কাদা আর থকথকে রক্ত। অর্ধেক গোঙানি আর অর্ধেক ধমকের সুরে নির্দেশ দিল লোকটা।

সামনে বেড়ে রানার দু'হাত ধরল দুই এজেন্ট। পিঠে ধাক্কা দিয়ে উপুড় করে মাটিতে ফেলা হলো ওকে।

রানা টের পেল, প্লাস্টিকের কেবল টাই কামড়ে ধরেছে ওর দুই কবজি। কোমরে নামল কারও হাঁটু। ঠেকিয়ে দেয়া হলো মাথায় পিস্তলের নল। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ ব্যথা পেল রানা। সজোরে পিঠে গেঁথে দেয়া হয়েছে ইঞ্জেকশনের সুঁই।

অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল অ্যামেট: 'বাঙালি কুত্তার বাচ্চা, তুই এখন মড়ার মত ঘুমাবি।'

রানার মনে হলো কোথায় যেন হারিয়ে যেতে গিয়ে টুপ করে ডুব দিয়েছে কোনও কূপে। চারপাশে মানুষের কণ্ঠ। তবে কমছে আওয়াজ। তারপর ঘুটঘুটে কালো আঁধারে তলিয়ে গেল ও।

তেত্রিশ

ধূসর ধোঁয়াটে মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে আতঙ্ককর সব দুঃস্বপ্ন দেখছে রানা। হঠাৎ কাদের কথা শুনে ঘুম ভাঙল ওর। চোখের পাতা সামান্য খুলে দেখল চারপাশ। ছোট এক ঘরের কোণে কর্কশ এক ম্যাট্রেসে পড়ে আছে ও। দেয়ালের শেকলে আটকে রাখা হয়েছে হাতদুটো। চোখ আরও সামান্য খুলে কবজি দেখল রানা। স্টিলের হ্যাণ্ডকাফ কামড়ে ধরেছে মাংস। বাম কবজির দীর্ঘ শিকল গেছে দেয়ালে গেঁথে রাখা ধাতব এক পাইপে। ওই একই শিকলে আটকা পড়েছে ডান কবজির হ্যাণ্ডকাফ।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, অন্য কেউ নেই ঘরে। এবার হ্যাঁচকা টানে চাইল কবজি ছোটাতে। সম্ভব হলো না। দেয়ালে গভীরভাবে গেঁথে আছে পাইপ।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা।

রাত আটটা আটত্রিশ মিনিট।

অর্থাৎ, ধরা পড়ার পর পেরিয়ে গেছে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। জানা নেই কোথায় আছে।

আবারও চারপাশ দেখল রানা।

ও আছে পুরনো আমলের কোনও মিট লকারে। জানালা নেই। দরজা বলতে রিভেট করা অ্যালিউমিনিয়ামের পুরু কবাট। বহু দিন ব্যবহার করা হয় না এই গুদাম। মেঝেতে অন্তত এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। দেয়ালে মাকড়সার ঝুল। বদ্ধ বাতাসে ইঁদুরের মলমূত্রের দুর্গন্ধ।

বাইরে কণ্ঠস্বর। পদশব্দ। ধাতব দরজার নিচের অংশ দিয়ে একচিলতে হলদে আলো দেখল রানা। খুট-খাট আওয়াজে খুলছে প্যাডলক তালা। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুম্ করে সরে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল দুই লোক। তাদের একজন কাঠির মত চিকন। মুখে-হাতে ফোলা রগ। ঈগলের থাবার মত কুঁকড়ে আছে দু'হাতের মুঠো। মাথার ক্রুকাট চুল ধূসর। অন্যজন বোধহয় বড় কোনও প্রতিযোগিতায় হারা ওয়েইটলিফ্টার। ব্যায়াম বাদ দিয়ে প্রতিদিন খেয়েছে প্রচুর ক্রাফ্ট্ পনির, তাতেই হয়ে উঠেছে তিন শ' পাউণ্ডের হাতি। নেড়া ছোট্ট মাথাটা মোটেও মানাচ্ছে না বিশাল দেহে। চিবুকে ছাগলের মত কালো চুটকি দাড়ি।

এদের পরনে কালো সুট, সাদা শার্ট ও চকোলেট টাই। ঝুঁকি নিচ্ছে না কোনও। কয়েক ফুট পেছনে রয়ে গেছে চিকন কাঠি। সরাসরি রানার মাথায় তাক করে রেখেছে পিস্তল। এগিয়ে এল মোটকু, সামান্য ঝুঁকে খুলল রানার বাম কবজির হ্যাণ্ডকাফ।

'তোমাদের রুম সার্ভিস জঘন্য,' মন্তব্য করল রানা।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে মিনিটখানেক হাসল ওয়েইটলিফ্টার, তারপর সতর্ক না করেই হ্যাঁচকা টানে রানার দ্বিতীয় কবজি থেকে খুলল ব্রেসলেটের মত কাফ। দেয়াল ও পাইপের মাঝের জায়গা থেকে ছুটিয়ে এনে নিজের হাতে নিল শেকল।

চুপচাপ লোক দু'জনকে দেখছে রানা।

এরা দ্রুত, অভ্যস্ত এবং পেশাদার।

হাতদুটো মুক্ত বলে সেকেণ্ডের জন্যে রানার মনে হলো: চেষ্টা করবে এদেরকে ঘায়েল করে বেরিয়ে যেতে?

পালোয়ান কাছেই, মুখে মদের গন্ধ। চার সেকেণ্ডে তাকে খুন করতে পারবে রানা।

কিন্তু সমস্যা চিকন পাটকাঠি। শকুনের দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। তাক করে রেখেছে পিস্তল।

না, তেড়িবেড়ি করলে সরুর হাতে খুন হবে ও।

পালোয়ান খপ্ করে ধরল ওর কবজি, আবারও পরিয়ে দিল হ্যাণ্ডকাফ। জিনিসটা ছোট, কামড়ে ধরছে মাংস। সামনে ঝুঁকল ওয়েইটলিফ্টার, রানার গলার কাছের শার্ট খামচে একটানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। কর্কশ কণ্ঠে বল্ল, 'হাঁটো।'

তার চোখে চোখ রাখল রানা।

লোকটার চোখে কোনও ভাব নেই।

'হাঁটো,' আবারও বলল পালোয়ান। ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়াল রানাকে।

প্রতিটা পদক্ষেপে অনুসরণ করছে চিকন পাটকাঠির পিস্তল। মিট লকার থেকে বেরোতেই সামনে পড়ল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কিচেন। লকারের মতই পরিত্যক্ত। ধুলোভরা মেঝের টাইলের কোণে কিছু বস্তা। ভেতরের জিনিসপত্র গেছে ইঁদুর ও ছুঁচোর পেটে। ওঅর্ক টপ ও সিঙ্কে পাতিল ও নানান আকারের বাসন। বহু বছর পানির স্পর্শ পায়নি। শেলফের তৈজসপত্র আর কাঁচের জিনিস ঢেকে গেছে মাকড়সার জালে। চপিং বোর্ডে গাঁথা বড় একটা কিচেন ছুরি।

কোনও রেস্টুরেণ্ট বা হোটেল এটা, ভাবল রানা।

অনেক বছর আগে বন্ধ হয়েছে ব্যবসা।

বাতাস শীতল। ভেজা দেয়ালের জন্যে মনে হচ্ছে না এমন।

আসলে ও আছে কোথায়— ভাবছে রান্না।

পিঠে ধাক্কা দিয়ে কিচেন পার করাল লোকদু'জন। ডাবল ডোর পেরোবার পর শুরু হলো রঙচটা, দীর্ঘ এক করিডোর। কিছুদূর যাওয়ার পর স্টিলের এক দরজার সামনে থামানো হলো ওকে। ওদিকে বোধহয় পুরানো সার্ভিস লিফ্ট্। দেয়ালে স্টিলের প্লেটে বাটন। টিপ দিল পালোয়ান। সরসর শব্দে খুলল দু'ভাগের ধাতব কবাট। পিঠে পিস্তলের নলের খোঁচা

খেয়ে এলিভেটরে উঠল রানা। ভেতরে কিচেনের মতই বাসি গন্ধ। ঘুরে দেয়ালে হেলান দিল ও। এবার ভেতরে ঢুকল চিকন কাঠি। পিস্তলের মাযল চেয়ে আছে রানার মাথার দিকে। সবার শেষে ঢুকল পালোয়ান। তার ভারী ওজনের জন্যে ক্যাট-ক্যাট শব্দে নড়েচড়ে উঠল এলিভেটরের মেঝে। বাটন টিপল সে। দরজা বন্ধ হতেই নানান আওয়াজ তুলে উঠতে লাগল এলিভেটর।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে পৌঁছে খুলে গেল দরজা। ধাক্কা দিয়ে এলিভেটর থেকে রানাকে বের করল পালোয়ান। এগিয়ে চলল ওরা করিডোর ধরে। দেয়ালে নিচের দিকে কালো সব দাগ। তেলাপোকা, ইঁদুর ও ছুঁচোর গায়ের দুর্গন্ধ এখানে অনেক বেশি।

'হাঁটতে থাকো,' ধমকের সুরে বলল পালোয়ান। আগে আগে চলেছে সে। ধীর গতিতে হেঁটে চলেছে রানা। পিস্তলের নল দিয়ে পেছনে খোঁচা দিচ্ছে সরু কাঠি।

আরেকটা এলিভেটরে চেপে তৃতীয়তলায় উঠল ওরা। এবারের করিডোরও পরিত্যক্ত, দেয়াল রঙচটা। পাশ কাটিয়ে গেল কয়েকটা দরজা। পুরনো হোটেলের রুম, জায়গায় জায়গায় কালচে হয়েছে দরজার পিতলের প্লেট। ছত্রিশ নম্বর দরজার সামনে থামল পালোয়ান। নক করল তিনবার। ভেতর থেকে ঘোঁৎ করে উঠল কেউ। এগিয়ে এল পদশব্দ, তারপর খুলে গেল দরজা।

সামনে হিলহিলে এক লোক দেখল রানা। চুল তার ব্যাকব্রাশ করা।

'চিনি তোমাকে,' বলল রানা, 'দাঁতের ব্যথার কী অবস্থা?'

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল ক্যাল অ্যামেট। ঠোঁট ফাঁক হতেই দেখা দিল ভেতরে কালো চৌকো গর্ত। 'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো,' দলের অন্য দু'জনকে নির্দেশ দিল সে। ফোলা ঠোঁটের কারণে বিকৃত শোনাল কণ্ঠ।

পিঠে ধাক্কা খেয়ে ঘরে ঢুকল রানা। আরেক গুঁতো খেয়ে বসল সামনের চেয়ারে। ধৈর্যশীল লোকের মত কোলে রেখেছে শেকলে আটকানো হাতদুটো।

অফিস হিসেবে অযত্নের সঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে এই ঘর। কয়েকটা চেয়ার, একটা কমদামি ডেস্ক, তার ওপর একটা ডিভিডি প্লেয়ার আর মনিটর ছাড়া আর কিছুই নেই। রানার মনে হলো না, এই জঘন্য হোটেল কক্ষে সিনেমা দেখাতে ধরে আনা হয়েছে ওকে।

দরজা বন্ধ করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল ক্যাল অ্যামেট। আলতো করে স্পর্শ করল ফাটা ঠোঁট ও বেগুনি চোয়াল। তাকাল রানার দিকে। দৃষ্টিতে গোখরো সাপের বিষ।

ঘরের অন্য লোকটাকে চিনল না রানা। সে আছে ডেস্কের পেছনে। হাসতেই ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। আছে আনন্দে। বয়স বেশি হলে চল্লিশ। সুঠামদেহী। দীর্ঘ নয়, আবার খাটোও নয়। পরনে দামি কোট। মাথার চুল লালচে। কবজির ঘড়িটা নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি, হীরা খচিত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। কাউকে ভয় না দেখিয়েই অনায়াসে নেয় নেতৃত্ব। জন্মেছে নির্দেশ দিতে। সবসময় সব কাজে এগিয়ে থাকে বলে দেখতে পায় ভবিষ্যৎ সমস্যা। অত্যন্ত বিপজ্জনক।

'ভাল জায়গা বেছে নিয়েছ,' বলল রানা।

আবারও হাসল লোকটা। 'তা-ই ভাবছ তুমি?' কণ্ঠটা বেশ নাকী। কথা বলার সময় অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করে দু'হাত। 'ভাল লেগেছে এই হোটেল? হাউ স্ট্রেঞ্জ! ভাল লাগতেই পারে, তোমরা বাঙালিরা তো ফকিরের জাত। আমার মনে হচ্ছে, এই হোটেল নোংরা, পরিত্যক্ত আস্তাবল। এটা চালু রাখতে গিয়ে কত খরচ হচ্ছে, ভাবতে গেলে খারাপই লাগে। কাজ শেষ হলে, এই নরক থেকে আশি মাইল দূরে সভ্য এলাকায় আমাকে নিয়ে যাবে পাইলট।'

'তুমি বেশি কথা বলো,' বলল রানা।

'তুমিও তা-ই করবে,' বলল লোকটা। একটু মলিন হলো হাসি।

'মনে তো পড়ছে না আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

'আমার নাম থর্ন। আর আগে থেকেই চেনো এজেন্ট ক্যাল অ্যামেটকে।' পকেট থেকে সরু চকোলেট বার নিয়ে মোড়ক খুলল সে। 'চকোলেট পছন্দ করো, মিস্টার রানা?'

'করি, কিন্তু এখন চাই না,' মাথা নাড়ল রানা। 'দাঁতের ডাক্তার অখুশি হবে, কাজেই অ্যামেটকে ওই জিনিস দেয়া ঠিক হবে না তোমার।'

কঠোর চোখে রানাকে দেখল অ্যামেট।

হাসল থর্ন। 'রসিকতা মন্দ লাগে না। তবে হাসতে নয়, এখানে এসেছি জরুরি কাজে। তুমি ঝামেলা না বাড়ালে খুশি হব। তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কিছু তথ্যের জন্যে।'

'কিছুই জানি না, কাজেই অনর্থক সময় নষ্ট করছ,' বলল রানা।

'তোমার পেট থেকে সবই বেরোবে, মাসুদ রানা,' বলল থর্ন।

'ভুল ভাবছ।'

'এতকাল কী করেছ, সেটাও জানি। সিআইএর প্রতিটা কমপিউটারে আছে তোমার ছবি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। ভুল করলে আমাদের পথে কাঁটা হয়ে।' গম্ভীর হয়ে গেল থর্ন। 'ক্যাথি হার্বার্টের হয়ে কাজ করছিলে?'

'না, তবে খুঁজছি ওই মেয়েকে।'

'কেন?'

আট দিন আগে ওই মেয়েকে চিনতাম না, ভাবল রানা। কোনও জবাব দিল না থর্নের প্রশ্নের।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'মার্সেনারি মউরোস আর

বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা গেল গ্রিসের এক দ্বীপে ক্যাথি হার্বার্টকে খুঁজতে। তা কি এমনি এমনিই? চিনত না তারা ওই মেয়েকে?'

নিরেট সত্যি জানাল রানা, 'ওর বাবার অনুরোধে ঠিক করি খুঁজে দেব ওকে। কাজটা দিই আমার বন্ধু মউরোসকে।'

'ব্যস, এ-ই?'

'হ্যাঁ, আর কিছু বলার নেই।' কড়া চোখে থর্নকে দেখল রানা। 'বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হলো মউরোসকে। ধারণা করলাম, ওই কাজ করেছে স্টিভ বার্কলে। পরে কথা বলেছি ওর সঙ্গে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল ভুল। এখন জানি, মউরোস, থ্যানাটস ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষের খুনের পেছনে আছ তুমি। জানতে চাইছ, কোথায় আছে ক্যাথির অবশিষ্ট ওস্ট্রাকা। ওসব দেখিয়েই বার্কলেকে ব্ল্যাকমেইল করছিল সে।' কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বলল রানা, 'জবাব পেলে তোমার প্রশ্নের। এবার জবাব দাও আমার প্রশ্নের: কী করবে ওসব ওস্ট্রাকা দিয়ে? কেন করছ এসব? হঠাৎ করে ধার্মিক হয়ে উঠেছে সিআইএ?'

'এসব তোমার না জানলেও হবে,' বলল থর্ন।

'ওস্ট্রাকা যদি এতই জরুরি, খুনের আগে ক্যাথির কাছ থেকে জেনে নিলে না কেন কোথায় রেখেছে ওগুলো?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল থর্ন। 'ভাবছ খুন করেছি ওকে?'

'ক্যাথি জীবিত থাকলে আমার কাছ থেকে এসব জানতে চাইতে না।'

'ক্যাথি জীবিত,' বলল থর্ন, 'শুধু তা-ই নয়, আছেও এই হোটেলেই। একটু পর ওর সঙ্গে দেখা হবে তোমার।'

বিস্মিত হয়ে ভাবল রানা: খুন হয়নি মেয়েটা! সেক্ষেত্রে হয়তো কোনও সুযোগে ওকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। মুখে বলল, 'পুরো দু'সপ্তাহ পেয়েও ওর মুখ থেকে কিছু বের করতে পারোনি? তোমরা তো জানতাম কঠোর মনের লোক।'

তর্জনী রানার বুকে তাক করল অ্যামেট। 'সব তোমার পেট থেকে বের করব, শালা!'

'তোমার ফোঁকলা মুখটা বন্ধ রাখাই ভাল,' বলল রানা। 'চারকোনা, কালো ফাঁক দেখতে বড় বিশ্রী লাগছে। নকল দাঁত লাগিয়ে নিয়ো যত জলদি পার।' থর্নের দিকে ফিরল। 'আমার ধারণা: ওই মেয়েও জানে না কোথায় আছে ওস্ট্রাকা, ঠিক?'

নিস্পৃহ চেহারায় ওকে দেখল থর্ন। চিবিয়ে চলেছে চকোলেট।

'কোর্ফিউ দ্বীপে ক্যাথির সঙ্গে একই সময়ে হারিয়ে গেছে ওর স্কুটার,' বলল রানা, 'মেয়েটা যাচ্ছিল থ্যানাটসের পাহাড়ি বাংলোয়। কিন্তু ওকে কিডন্যাপ করল তোমার লোক। তারা অ্যামেটের মতই পেশাদার। ভয় লাগিয়ে দিল, ফলে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ক্যাথি। ওকে হাতে পেয়েও জানতে পারোনি কিছু। চোট পেয়েছে মাথায়। হয়েছে অ্যামনেযিয়া। তোমরা ভাবতে লাগলে, আর কখনও স্মৃতি ফিরবে না ওর।'

বুকে দু'হাত ভাঁজ করে বলল থর্ন, 'চালাক লোক তুমি, রানা। দুর্ভাগ্য, তোমার মত লোক নিজের দলে পেলাম না।'

'সত্যিই, তোমার নোংরা কাজে জুটল অ্যামেটের মত বাঁদর। তলিয়ে যাবে এ কারণেই।'

'তুমি তো বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই টের পাচ্ছ, রেগে গেছি তোমার ওপর?' বলল থর্ন, 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে মুখ খুলতে হবে তোমাকে।'

'কিছু জানলেও তোমাকে জানাতাম না।'

'আছ মস্ত বিপদে। দুই পুলিশ খুনের দায়ে পুঁতে ফেলবে সিআইএ এজেন্টরা তোমাকে।'

'অ্যামেট তাদের খুনি,' বলল রানা। 'আমি নই।'

'সাক্ষ্য দেবে কয়েকজন। বলবে খুন করেছ তুমি। তার ওপর আছে গ্রিসের দুই এজেন্ট। ওদের খুনের সঙ্গেও জড়িয়ে

যাবে। চাইলেও বাঁচবে না।'

চুপ করে থাকল রানা।

হাসল থর্ন। 'দেখি একটু জাগিয়ে দিতে পারি কি না তোমার স্মৃতি।' হাতের ইশারা করল অ্যামেটকে। ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির দিকে রিমোট তাক করে বাটন টিপল সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট। দপ্ করে চালু হলো টিভি। এক সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, দেখানো হচ্ছে কীসের দৃশ্য।

চমৎকার রঙিন ছায়াছবি।

ক্যাফের টেরেসে বসে আছে মউরোস।

মিউট করে রাখা হয়েছে আওয়াজ।

কয়েক সেকেণ্ড ছায়াছবি দেখল থর্ন।

এইমাত্র চেয়ারে মউরোসের মুখোমুখি বসল রানা।

কী যেন বলছে মউরোস।

বল নিয়ে হাজির হলো বাচ্চা ছেলেটা।

লাফ দিয়ে রাস্তায় চলে গেল বল।

পিছু নিল পিচ্চি।

ছুটে আসছে ওর দিকে ভ্যান।

উঠে দাঁড়াচ্ছে মউরোস।

একটু পরেই ফাটবে বোমা।

'কী দেখাবে?' বলল রানা। বন্ধুর মৃত্যুদৃশ্য দেখতে হবে ভেবে গলা শুকিয়ে গেছে ওর।

ঠোঁট বাঁকিয়ে চোয়ালের হলদে দাঁত বের করে হাসল অ্যামেট। বসের নির্দেশ পেয়ে পয করল দৃশ্যটা।

ছড়িয়ে যেতে গিয়েও মনিটরে থেমে গেছে শকওয়েভ। কিন্তু ততক্ষণে বিস্ফোরণের ধাক্কা লেগেছে মউরোসের দেহে। ছেঁড়া লাল কম্বলের মত ছিটকে পড়ছে রানার বন্ধু।

ওই দৃশ্য দেখে তৃপ্তির ছাপ পড়ল ক্যাল অ্যামেটের মুখে।

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছে রানা। নতুন কিছু দেখছে।

বোমা ফাটার সময় ভ্যানের ওদিকে রাস্তায় বাচ্চাটাকে

আগলে রেখেছিল রানা। তখন প্রায় কিছুই দেখতে পায়নি।

এই ইমেজ তোলা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য অ্যাংগেল থেকে।

ছড়িয়ে পড়ছে বিস্ফোরণ।

বোঝা যাচ্ছে কোথায় ছিল ওই বোমা।

তিক্ত সব স্মৃতি মনে পড়ল রানার।

বাচ্চাটা খেলছিল বল হাতে।

কাছের টেবিলে এক লোক, সঙ্গে ল্যাপটপ কমপিউটার। বাচ্চাটাকে ধমকে উঠেছিল সে।

পিচ্চিকে খুনির চোখে দেখেছিল বোমাবাজ।

এই ডিভিডি দেখার পর ওই দৃশ্য কখনও ভুলবে না রানা। মনে আছে ওই লোকের মুখটা।

মউরোস আর রানা আলাপ করছে, তখন চলে গেছে ওই লোক। যে-কোনও ক্যাফেতে এটাই স্বাভাবিক, কফি ও নাস্তার পর চলে যাবে যে-যার পথে। কিন্তু চারপাশে আরও মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল রানার।

পয করা স্ক্রিনে লাল আগুন ও নানান কিছুর ভাঙা টুকরো। সেসবের মধ্যে আছে ভাঙা এক ল্যাপটপের কেসিং, টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পড়বে দূরে।

টিভি স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে থর্নের দিকে তাকাল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তা হলে ভুল ভাবিনি। তোমরাই রেখেছিলে ওই বোমা।'

বাতাসে হাত নাচাল থর্ন। 'আমি ব্যবসায়ী মানুষ। বোমা পেতে রাখার কাজ আমার নয়। তবে যারা রাখে, তাদেরকে পয়সা দিই।'

'এই রেকর্ডিং আমাদের দুই এজেন্টের, তারপর হারিয়ে গেছে ওরা,' বলল অ্যামেট। 'ওরা কোথায়, মাসুদ রানা?'

'সৈকতে,' বলল রানা, 'কাঁকড়া খেয়ে শেষ করার আগেই হয়তো পাবে ওদের লাশ।'

হাসল থর্ন। 'ও, তুমি চাও প্রতিশোধ নিতে?'

‘মন দিয়ে শোনো।’ শীতল চোখে থর্নকে দেখছে রানা। ‘মরতে হবে তোমাকে। আমার হাতে।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ, বাঁচবে না অ্যামেটও। খুঁড়ে নিয়েছ যে-যার কবর।’

নীরবতা নেমেছে ঘরে।

ফ্যাকাসে হলো থর্নের চেহারা। নার্ভাস হাসল। ‘ভেবেছি বুঝতে পারবে পরিস্থিতি। উল্টে হুমকি দিয়ে বিপদ বাড়াচ্ছ নিজের।’

‘চিনে গেছি তোমাদের,’ বলল রানা, ‘অর্থাৎ, তোমরা ঠিক করেছ, প্রাণে বাঁচতে দেবে না আমাকে। কাজেই কোথায় আছে ওসব ওস্ট্রাকা তা জানলেও মুখ খুলতাম না।’

বাস্কেটে চকোলেটের মোড়ক ফেলল থর্ন। ‘বুঝলাম। তবে সহজে মরার পথ আছে, আবার এমনও উপায় আছে যে অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে মরবে।’

‘ভেবে বের করব কোন্ পথে তোমাকে নরকে পাঠাব,’ বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল থর্ন। ‘তুমি সত্যিই বোকা। তা হলে দেখাচ্ছি একটা জিনিস।’ আবারও অ্যামেটের দিকে ইশারা করল সে। ডিভিডি প্লেয়ারের বাটন টিপল সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট। ডিস্ক চেঞ্জারের খর-খর আওয়াজ তুলে সরে গেল আগের ডিভিডি, সেটার জায়গায় এল আরেকটা।

কয়েক সেকেণ্ড কালো থাকল মনিটর। তারপর দেখা দিল ক্লোয-আপ দৃশ্য। মোটা এক লোক। ঘর্মাক্ত। কাদামাখা। আছে নোংরা এক সেল বা খাঁচার ভেতর। দু'হাতে ধরেছে পুরু শিক। উজ্জ্বল আলো পড়েছে তার মুখে। চোয়াল ও গালে তাজা ক্ষত। ফুলে আছে ডান চোখ।

‘দেখছ সিআইএ আর্কাইভের ক্লাসিফায়েড ডিভিডি,’ বলল থর্ন। ‘তোমাকে জানতে হবে না কীজন্যে ওই লোকের এই হাল। শুধু মাথায় রাখো, ওর কাছে ছিল জরুরি তথ্য।

ওগুলো প্রয়োজন ছিল সিআইএর। খুব শক্ত মনের লোক ছিল। তোমার মত। সহ্য করেছে সব রকম নির্যাতন। ঠিক করেছিল হারবে না। ...ক্যামেরা যুম হলে দেখতে পাবে তার পায়ের দগদগে ঘা। একটা একটা করে উপড়ে নেয়া হয়েছে প্রতিটা আঙুলের নখ। যে-কোনও সময়ে দেখবে দৃশ্যটা। ...ওই যে।'

ছায়াছবির দিকে মনোযোগ দিল রানা, ঘুরে অন্যদিকে সরে গেল থর্ন। দেখবে না বীভৎস দৃশ্য। 'বুঝতেই পারছ, আমি আমলা। মানুষ সত্য বললে খুশি হই। কিন্তু কাউকে নির্যাতন করলে তা দেখতে পারি না। রক্ত একেবারেই সহ্য হয় না আমার।'

'ফোনে হুকুম দিলে মানুষের খুনের দায় নিতে হয় না, তাই না?' বলল রানা।

কথাটা পাত্তা দিল না থর্ন। 'আমি চাইলে পিটিয়ে ভর্তা করা হবে তোমাকে। উপড়ে নেয়া হবে হাত ও পায়ের নখ। ছিঁড়ে নেয়া হবে অণ্ডকোষ। দেয়া হবে বৈদ্যুতিক শক। বারবার চুবিয়ে তোলা হবে প্রায়-ফুটন্ত পানিতে। পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে ছাত থেকে। শুধু একবার নির্দেশ দিলেই এসব হবে। তোমার যা অতীত, ভাল করেই জানো কী ধরনের হয় নির্যাতন। কিন্তু এসব আমার ইচ্ছে নয়। অ্যামেটের ইচ্ছে তোমার ওপর নির্যাতন করা হোক, তা-ও চাইছি না। রক্ত ঝরানো বা হাত-পা ভাঙা আমার লাইন না। সবসময় পছন্দ করি পরিষ্কার ক্লিনিকাল কাজ। অবশ্য, কারও কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করতে হলে...' হাসল থর্ন। 'নিজের চোখে দেখো কী হয়েছে ওই লোকের।'

তার কথা শুনছে রানা। মন দিয়েছে মনিটরে। এইমাত্র চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে লোকটাকে। শক্ত করে ধরে রেখেছে দু'জন গার্ড। ইউনিফর্মটা চেনার উপায় নেই। তৃতীয় এক লোক এসে নির্যাতিত লোকটার ঘাড়ে

গেঁথে দিল সিরিঞ্জ। ডাবিয়ে দিল প্লাঞ্জার।

কোটের প্রকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করল থর্ন। বোতলে স্বচ্ছ কোনও তরল। ডেস্কে ঠক্ করে রাখল বোতলটা। কোটের অন্য পকেট থেকে নিল ছোট চামড়ার কেস। চেইন টেনে খুলে জিনিসটা রাখল বোতলের পাশে। কেসের ভেতরে সিরিঞ্জ। 'তুমি কি জানো, রানা, এই ভায়ালে কী আছে?'

বোতলটা দেখল রানা। 'শুনেছি ওই জিনিস ব্যবহার করছে সিআইএর একদল হারামি লোক।'

হাতের ইশারায় অ্যামেটকে পয করতে বলল থর্ন 'তোমার জানার কথা, এটা কাজে সেরা। পাওয়া কঠিন। কপাল মন্দ, জোগাড় করেছে যে ডাক্তার, তাকে রাখতে পারিনি আমাদের মাঝে পৃথিবীতে।' মনিটর দেখাল থর্ন। 'দেখো, ওই লোকটা ছিল কিন্তু তোমার মতই হ্যাঁকড়া। বহুবার বলেছে, কিছুই জানে না সে। এত নির্যাতনেও পেট থেকে বেরোয়নি কিছু। কিন্তু ইঞ্জেক্ট করার পর মনের বাঁধ ভাঙল তার। বলতে লাগল সারাজীবনের সমস্ত অপকর্মের কথা। বাদ থাকল না কিছু। ...এই তরলের ভাল দিক, সব জেনে নেয়ার পর খুন করতে হয় না কাউকে। ...খেয়াল করো কী ঘটে।'

আবার রিমোটের বাটন টিপল অ্যামেট।

নয়গুণ জোরে চলল ইমেজ। তারপর আবারও হলো স্বাভাবিক। এখন নতুন অ্যাংগেল থেকে দেখানো হচ্ছে দৃশ্যটা। আলোও অন্যরকম। আছে ওই লোক, কিন্তু বদলে গেছে সে। মার-খাওয়া, ভয়-পাওয়া বন্দি এখন বদ্ধউন্মাদ। কর্কশ গলায় চিৎকার করছে প্রাণপণে। ঝাঁকি দিচ্ছে সেলের শিক ধরে। জলাতঙ্কে আক্রান্ত বাঁদরের মত বিস্ফারিত চোখে দেখছে এদিক-ওদিক। বেরিয়ে এসেছে দুই পাটি হলদে দাঁত। ফাটা ঠোঁটের কোণে সাদা পিচ্ছিল ফেনা। ওই লোক

এখন আর মানুষ নয়, যেন আছে অন্য কোনও গ্রহে।

'পুরো পাগল,' বলল থর্ন, 'ওই একই লোক মাত্র ছয় ঘণ্টা আগে ছিল স্বাভাবিক মানুষ। আর কখনও সুস্থ হবে না। বেশিরভাগ সময় একঘণ্টা পর পাগল হয়। তবে কেউ কেউ দু'ঘণ্টাও টিকতে পেরেছে। ফলাফল সেই একই। দিনের পর দিন মানসিক রোগে ভুগে একসময় পাগলাগারদে অকাল মৃত্যু। বুঝতে পেরেছ, রানা, আমার কথা?'

তৃপ্তির হাসি হাসল ক্যাল অ্যামেট। পয করল ইমেজ। ডেস্কে নামিয়ে রাখল রিমোট। বুকে ভাঁজ করেছে দুই হাত।

ঢোক গিলতে গিয়েও জোর করে ঠেকাল রানা। 'বুঝতে পেরেছি।'

'গুড। এবার ভাবার জন্যে সময় দিচ্ছি তোমাকে।'

চুপ করে আছে রানা।

সোনার হাতঘড়ি দেখল থর্ন। 'এখন বাজে সোয়া নয়টা। সময় পাচ্ছ দশটা পর্যন্ত। আবারও দেখা হবে দশটার পর। আশা করি এরপর সব খুলে বলবে। নইলে দেখবে সিরাম দেয়া হলে কী বলে ক্যাথি হার্বার্ট। হয়তো অনেক কথাই বলবে মেয়েটা। মজাই লাগবে শুনতে। তারপর ভোরে আবারও তোমাকে পাঠাব ওর ঘরে। নিজ চোখে দেখবে কী ধরনের জন্তু হয়েছে মেয়েটা।' মৃদু হাসল থর্ন। 'ততক্ষণে বহু দূরে চলে গেছি। আরাম করে চুমুক দিচ্ছি ক্রুগের গ্লাসে। তৃপ্তির সঙ্গে স্ক্রিনে দেখছি কীভাবে ইঞ্জেকশন দেয়ার পর পাগল হয়ে উঠছ তুমি। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না, নিজে আমি ব্যবস্থা করে তোমাকে পাঠাব আমেরিকার সেরা পাগলাগারদে। বাকি জীবন মাথা ঠুকবে ফোম লাগানো দেয়ালে।'

'যারা আয়কর দেয়, উচিত হবে তাদের টাকা এভাবে নষ্ট করা?' আপত্তির সুরে বলল ক্যাল অ্যামেট। 'তার চেয়ে হাত-পা ভেঙে বুকে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে কোনও গলিতে

ফেলে দিলেই তো হয়।'

'আমার মন্দ লাগবে না মাসুদ রানা বদ্ধউন্মাদ হলে,' চিন্তার সুরে বলল থর্ন। 'ঠিক আছে, যথেষ্ট কথা হয়েছে। অ্যামেট, দলের লোকদের বলুন একে সরিয়ে নিতে।'

দরজা খুলল অ্যামেট। করিডোরে অপেক্ষা করছে হাতি ও ঢ্যাঙা পাট কাঠি। 'যাও, গিয়ে মাসুদ রানাকে ভরে দাও মিট লকারে।' মোটকুর দিকে আঙুল তুলল সে। 'জিমসন, দরজার বাইরে পাহারায় থাকবে। আর, ম্যাকার্থি, লোকটাকে রেখে এসে দেখা করবে আমার সঙ্গে।'

'হাতে পাচ্ছ মাত্র পৌনে একঘণ্টা,' রানাকে বলল থর্ন।

খুদে মাথার হাতি ঘরে ঢুকে খপ্ করে ধরল রানার কনুই। 'চল্, শালা!'

চেয়ার ছেড়ে কনুই থেকে লোকটার হাত ঝেড়ে ফেলল রানা। চলেছে দরজার দিকে। তবে কবাটের সামনে থমকে গেল। ঘুরে তাকাল থর্নের চোখে। নরম সুরে বলল, 'একটু আগে কী বলেছি, ভুলে যেয়ো না, থর্ন।' করিডোরে বেরিয়ে গেল রানা।

ঠোঁটে টিটকারির হাসি নিয়ে ওকে দেখল ক্যাল অ্যামেট। বন্দিকে নিয়ে করিডোর ধরে এলিভেটরের দিকে চলেছে তার দুই স্যাঙাৎ। থর্নের দিকে ফিরল সে। রানার কথায় একটু নড়ে গেছে আমলা।

'মনে করুন, এরই ভেতর ইতিহাস হয়ে গেছে মাসুদ রানা,' বলল ক্যাল অ্যামেট।

চৌত্রিশ

পায়চারি করছে রনসন থর্ন। নীরবে সিগারেট ফুঁকছে ক্যাল অ্যামেট। পেরিয়ে গেল পাঁচ মিনিট। তারপর দশ।

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' বলল অ্যামেট। 'রিল্যাক্স করুন।'

'আমি কখনও সময় নষ্ট করি না,' হাতঘড়ি দেখল থর্ন। 'আপনার সিগারেটের ধোঁয়া বিরক্ত করছে আমাকে। ...দেরি করছে কেন আপনার লোক ম্যাকার্থি? ওকে না বলেছিলেন চট্ করে ফিরে আসতে?'

'চলে আসবে,' বলল অ্যামেট। 'আসার পথে হয়তো টয়লেটে গেছে।'

বিরক্তি নিয়ে মাথা নাড়ল থর্ন। কঠোর হলো চোয়াল। হাত বোলাল চুলের ভেতর। 'কোনও গোলমাল হয়েছে। আমি টের পাচ্ছি, নিশ্চয়ই...'

'কী যে বলেন। বাঘের খাঁচার চেয়েও কঠিন ওই মিট লকার থেকে বেরোনো। ওখানে বসে প্রাণপণে ভাবছে মাসুদ রানা।'

'তাই? নিজের চোখে দেখতে চাই। খারাপ অনুভূতি হচ্ছে আমার।'

'কেন যে এত ঘাবড়ে যান,' মাথা নাড়ল অ্যামেট। 'ঠিক আছে, চলুন, দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

'শুধু আমরা নামব নিচে? না, ডাক দিন আপনার আরও কয়েকজনকে।'

'আমাকে ধরে এই দালানে আছে মোট বারোজন

এজেন্ট। তবুও ভয় পাচ্ছেন? আসলে...'

'ভয় পাচ্ছি না। সতর্ক হচ্ছি। যা বলেছি, তা-ই করুন। ক্যাথি হার্বার্টকে যে দু'জন পাহারা দিচ্ছে, তারা ছাড়া অন্যরা যেন যায় আমাদের সঙ্গে।' আপত্তি তুলতে হাঁ করল ক্যাল অ্যামেট, কিন্তু কঠোর সুরে বলল থর্ন, 'যা বলছি, সেটা করুন।'

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে রেডিয়ো নিয়ে বলল অ্যামেট, 'ক্যাশকে নিয়ে মেয়েটার ঘরের বাইরে থাকো, রেবেকা। অন্যরা সবাই চলে এসো আমার অফিসে।'

পেরিয়ে গেল আরও পাঁচ মিনিট, তারপর প্রায় একই সময়ে অফিসের সামনের করিডোরে জড় হলো সাতজন এজেন্ট। সাবধানে ঘর ছেড়ে করিডোরে বেরোল রন থর্ন। সবার আগে চলেছে অ্যামেট। চেহারায় বিরক্তি ও তিক্ততা।

'এলিভেটর ব্যবহার করব না,' বলল থর্ন। 'সিঁড়ি বেয়ে নামব।'

'ভয় পেয়েছেন রানার কথায়,' টিটকারির সুরে বলল অ্যামেট। 'এতটা আশা করিনি।'

'সতর্ক থাকা ভাল,' বলল থর্ন। 'বুদ্ধিমানরা তাই করে।'

আরেকবার মাথা নাড়ল অ্যামেট। 'তাই বলে এত ভয় পেলে...' কিছুক্ষণ পর ডাবল ডোর ঠেলে কিচেনে ঢুকল সে। পরক্ষণে হয়ে গেল পাথরের মূর্তি। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। 'হায়, ঈশ্বর!'

'এমনই কিছু হবে ভেবেছি,' বিড়বিড় করল থর্ন।

'কিন্তু হলো কী করে?'

চট্ করে চারপাশ দেখল থর্ন। 'মাসুদ রানা সাধারণ কোনও এজেন্ট নয়। আগেই আপনার বোঝা উচিত ছিল।'

মেঝেতে ভাঙাচোরা কাঁচ ও বাসন। সেসবের ভেতর পড়ে আছে ম্যাকার্থি ও জিমসন। টিউব লাইটের সাদা আলোয় মেঝেতে গড়িয়ে চলেছে রক্তের সরু দুটো খাল।

জিমসনের মাথার তালুতে গেঁথে আছে বৃত্তাকার কী যেন। ঝুঁকে ওটা দেখল থর্ন। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, জিনিসটা ওয়াইন গ্লাসের ভাঙা অংশ। গভীরভাবে ঢুকেছে মগজে। জিমসনের একটু দূরে কাত হয়ে পড়ে আছে চিকন ম্যাকার্থি। নীল হয়ে গেছে চেহারা। চিবুকের কাছে ঝুলছে লম্বা জিভ। গলা কেটে গভীরে গেছে স্টিলের শিকল। মেঝেতে হ্যাণ্ডকাফ। পাশেই ছোট্ট চাবি। কোট পরা দুই এজেন্টের শোল্ডার হোলস্টার এখন খালি।

পরস্পরের দিকে তাকাল রনসন থর্ন ও ক্যাল অ্যামেট।

'এই দালানে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা,' বলল সিআইএ এজেন্ট।

'সন্দেহ নেই। এবার তাকে খুঁজে বের করুন।'

'তা তো বটেই,' বলল অ্যামেট।

'নইলে সর্বনাশ হবে। খুন হব আমরাই। কথা বুঝতে পেরেছেন?'

'ভাববেন না,' বলল অ্যামেট, 'অপেক্ষা করুন অফিসে।'

'জীবনেও না। আমি চলে যাচ্ছি। এই হোটেল এখন আমার জন্যে নিরাপদ নয়।'

'কারও জন্যেই নিরাপদ নয়।'

'দরকার হলে জান দেবেন, তেমনই কথা হয়েছে। তবে আমার কথা আলাদা। সর্বোচ্চ নেতার কিছু হলে সর্বনাশ হবে।' আঙুল তুলে তিনজন এজেন্টকে দেখাল থর্ন। 'অ্যাই, তোমরা! আমাকে এস্কোর্ট করে নিয়ে যাবে। বিপদ হওয়ার আগেই সরিয়ে নেবে আমাকে।' ঘুরে রওনা হলো থর্ন। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'অ্যামেট?'

'কী?'

'জীবিত চাই মাসুদ রানাকে। বুঝতে পেরেছেন?'

'ধরে আনব, এই তো? ঠিক আছে।'

প্রায় দৌড়ে লবিতে পৌঁছুল থর্ন। পিস্তল হাতে পেছনে

কাভার দিচ্ছে তিন এজেন্ট। হোটেল ভবনের দরজা খুলে ডানে ছুটল থর্ন। একটু দূরেই পার্কিং লটে চকচকে এক রুপালি বেল হেলিকপ্টার। থর্নকে ছুটে আসতে দেখেছে পাইলট। কফির ফ্লাস্ক রেখে মোটর চালু করল সে। ধীর গতি তুলে ঘুরতে লাগল রোটর। দৌড়ে এসে দরজা খুলে সিটে চাপল থর্ন। তিন মিনিট পর গাছের সারির ওপর দিয়ে বহু দূরে মিলিয়ে গেল হেলিকপ্টারটা।

কাপুরুষ রনসন থর্ন বিদায় নিতেই নিজের এজেন্টদের জড় করল ক্যাল অ্যামেট। 'ঠিক আছে, মনে রেখো, ওই লোক একা। জিমসন আর ম্যাকার্থি নেই। কিন্তু আমরা এখনও দশজন। পালাতে পারবে না মাসুদ রানা।' রেডিয়োতে বলল অ্যামেট, 'ক্যাশ, আগের জায়গায় আছ?'

'হ্যাঁ।'

ইয়ারফোনে কথাটা শুনে বলল অ্যামেট, 'সঙ্গে রেবেকা?'

'জী, স্যর।'

মাথা দোলাল অ্যামেট। দলের উদ্দেশে দিল পিস্তলে ঝাঁকুনি। 'ম্যাকেঞ্জি, ব্রাঞ্চ, তোমরা দু'জন ওপরতলায় গিয়ে মেয়েটাকে পাহারা দাও। ওখানেই যাবে রানা।' নিষ্ঠুর হাসল অ্যামেট। 'ওই মেয়েকে চাই ওর।' সবাইকে দেখল সে। ঠিক করে নিচ্ছে ট্যাকটিক। চার এজেন্টকে টপকে ক্যাথি হার্বার্ট পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না রানা। এদিকে দল তৈরি করে ছয়জন মিলে তাড়া করে কোণঠাসা করবে বাঙালি কুকুরটাকে। 'বেজো, মার্কো, তোমরা আমার সঙ্গে এসো। ক্লিভার, টনি আর ভার্ন্যানন, তোমরা সার্চ করবে হোটেলের বামদিক থেকে। রেডিয়োতে যোগাযোগ রাখবে। ওকে দেখলেই দেরি করবে না খুন করতে। জীবিত ধরার দরকার নেই, অনেক বেশি বিপজ্জনক ওই লোক।'

'রনসন থর্ন বলেছেন খুন না করতে,' বলল ভার্ন্যানন।

'ওই কাপুরুষের কথায় নাচলে বাঁচা কঠিন,' জিভ দিয়ে

দাঁতের পেছনে তালু স্পর্শ করল অ্যামেট। মনে পড়েছে, এখন নেই চারটে দাঁত। 'আমি চাই, আগামী দশ মিনিটের ভেতর ওই হারামজাদার লাশ ফেলে দেবে তোমরা। ঠিক আছে, চলো এবার।'

পঁয়ত্রিশ

ধীরগতি ছিল সিআইএর দুই খুনি। তাদের প্রতি কোনও করুণা কাজ করছে না রানার মনে। কী ঘটছে তা ভাবতেও পারেনি লোকদু'জন।

লাশ ফেলে দেয়ার পর মোটকু এজেন্টের কোটের পকেট থেকে পেয়েছে হ্যাণ্ডকাফের চাবি। দু'জনের কাছেই ছিল সাইলেন্সারওয়ালা বেরেটা। গুলিভরা ম্যাগাযিন। ডান হিপ পকেটে রেখেছে একটা পিস্তল, পেছনের পকেটে অন্যটা। একবার দেখেছে কী আছে কিচেনে। চপিং বোর্ড থেকে খুলে নিয়েছে ছুরি। স্টেইনলেস স্টিলের করাতের মত দাঁতওয়ালা ফলা এখনও ধারালো। ওটা গুঁজে রেখেছে বেল্টে।

এরই মধ্যে ঠিক করেছে কীভাবে বেরোবে এখান থেকে। কিচেনে চারকোনা একটা হ্যাচ সরিয়ে দেখেছে পুরনো এক ডাম ওয়েটার। গর্তটা তিনফুট বর্গাকৃতির। দেয়ালের প্যানেলে প্লাস্টিকের তিনটে বাটন। দুটোর ওপর তীর আঁকা। একটা দেখাচ্ছে ওপরের দিক, অন্যটা নিচের দিকে। মাঝের বাটনের ওপর ঝাপসা লেখা: স্টপ।

ডাম ওয়েটার ওপরে পাঠাবার বাটন টিপল রানা। আশা করছে, এত বছর পরেও কাজ করবে কিচেন থেকে খাবার

পাঠানো বা বাসন ফেরত আনার এলিভেটর। ভোঁতা 'দুম্প' আওয়াজ শুনল রানা। ঝাঁকি খেয়ে এক ইঞ্চি ওপরে উঠল খুদে এলিভেটর।

স্টপ বাটন টিপে ওপরে ওঠা ঠেকাল রানা। চলবে। এঁটে যাবে ও। ভেতরে গ্রিস ও ইঁদুরের পয়মালের গন্ধ। ডাম ওয়েটারে চেপে বসল রানা। হাত বাড়িয়ে টিপে দিল ওপরের বাটন। ঝাঁকি খেয়ে উঠতে লাগল ডাম ওয়েটার। পলকের জন্যে দেখল এবড়োখেবড়ো সিমেন্টের দেয়াল। ওটা নামছে নিচে, চট্ করে হাত ফেরত নিল রানা। কাঁপতে কাঁপতে উঠছে প্রাচীন এলিভেটর। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে পিস্তল পরীক্ষা করল রানা। জানা নেই ওপরে কী অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

ওপর থেকে এল কর্কশ আওয়াজ। যে-কোনও সময়ে ছিঁড়বে পুরনো কেবল। পতনের জন্যে তৈরি হলো রানা। এল না নতুন কোনও আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর আরেক ঝাঁকুনি দিয়ে থামল ডাম ওয়েটার। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে তিন ফুট বর্গাকৃতির ডাবল ডোর খুলল রানা। যা ভেবেছে। এটা হোটেলের বার। পৌঁছে গেছে কাউন্টারের পেছনে ছোট এক সার্ভিং এরিয়ায়। হ্যাচ থেকে নেমে এল রানা। ওই বদ্ধ জায়গা থেকে বেরোতে পেরে খুশি। ধুলোভরা বার কাউন্টারের সঙ্গে প্রায় মিশে গেল ছায়ার মত।

রানার ধারণা: কিচেন থেকে উঠে এসেছে দোতলায়। এবার খুঁজে নিতে হবে ক্যাথিকে। বোধহয় ওপরের কোনও ঘরে আছে সে। কিন্তু এটা স্রেফ আন্দাজ। মেয়েটার কাছে পৌঁছাবার আগে বোধহয় বাধা হয়ে উঠবে অন্তত এক ডযন এজেন্ট এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্র। অবশ্য, আপাতত ভেবে লাভ নেই। পরের সমস্যার সমাধান পরেই খুঁজবে।

পিস্তলের সেফটি অফ করে নীরবে বাররুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। ডান থেকে বামে ঘুরছে মাযল। প্রায়ান্ধকার

করিডোরে চলেছে পায়ে পায়ে। সতর্ক চোখে এড়াচ্ছে না কিছুই। দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে ছায়ার ভেতর। মনোযোগ গভীর। সতর্ক হয়ে উঠেছে স্নায়ু। আওয়াজ করছে না হাঁটার সময়। দূর থেকে এল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। লবির কাছে কথা বলল কেউ। ওকে খুন করতে ছড়িয়ে পড়েছে সিআইএ এজেন্টরা। একেকটা দলে থাকবে দুই থেকে তিনজন। অন্তত দুটো দল। তার মানে, ক্যাথি হার্বার্টকে পাহারা দিতে রয়ে গেছে দু'একজন। তারা থাকবে মেয়েটার ঘরে, বা বাইরের করিডোরে।

সামনের করিডোর L-এর মত। শুরু হয়েছে চওড়া এক হলওয়ে। দু'পাশে একের পর এক রুম। একটা দরজা খানিকটা খোলা। ওখান থেকে আসছে ধুলোভরা আলো। ওই ঘর বোধহয় আগে ছিল টিভি রুম।

পাথরের মূর্তি হয়ে থামল রানা। উল্টো দিক থেকে দৌড়ে আসছে কারা যেন। তিনজন। ছায়ায় মিশে যেতে চাইল রানা। খোলা দরজা থেকে আসা আলোয় চট্ করে ওকে দেখবে না কেউ। দুই ফুট দূর দিয়ে গেল তারা। দু'জনের কাঁধ চাপড়ে দিতে পারত রানা। নীরবে অফ করল পিস্তলের সেফটি।

তৃতীয় লোকটা দুই গজ যাওয়ার পর করিডোরে বেরোল রানা। কোনও সুযোগ না দিয়ে গুলি করল এজেন্টের মাথার পেছনে। দৌড়ের ভেতর খসে পড়ল লোকটা, লিনোলিয়াম মেঝেতে পিছলে গিয়ে থামল কয়েক ফুট দূরে। অন্যরা কী ঘটেছে বোঝার আগেই আরও দু'বার গুলি করল রানা। কাশির রোগীর খুক-খুক আওয়াজ তুলেছে সাইলেন্সার। ভীষণ দুই ঝাঁকি খেয়ে পরস্পর বাড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল দুই এজেন্ট। হাত থেকে ছুটে মেঝেতে গড়িয়ে দূরে গিয়ে থামল দুই পিস্তল।

তিন এজেন্টের তিন পিস্তল সংগ্রহ করল রানা। ওগুলোও

বেরেটা। একই মডেলের। পিস্তল থেকে বের করে নিয়ে পকেটে রাখল ম্যাগাযিনগুলো। লাশ তিনটে টপকে দেখল লোকগুলোকে। অতি সতর্ক না হলে হেড-শট কখনও নেয় না কেউ। মনে তিক্ত অনুভূতি হলো রানার।

প্রাচীন আমলের মিলিটারি ট্যাকটিশিয়ানরা বলত, শত্রুকে পাল্টা হামলার সুযোগ দিতে না চাইলে, প্রথমেই উচিত মাথায় আঘাত করা। বুদ্ধিমানের কাজ প্রথম সুযোগে শত্রুকে খুন করা। যদিও তা কসাইয়ের মতই নিষ্ঠুর কাজ।

রানা ব্যবহার করেছে হাই পাওয়ারের হ্যাণ্ডগান। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে মাথায় গুলি করে তিন এজেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে যমের বাড়িতে। ১৪৭-গ্রেইন সেমি-জ্যাকেটেড হলো-পয়েন্ট বুলেট চুরমার করেছে খুলি। দু'পাশের দেয়ালে ও মেঝেতে মগজের টুকরো। আঠালো রক্তের আঁশটে গন্ধে ভরে গেছে করিডোর। সিনেমার দৃশ্যের মত সহজ নয় বিষয়টি। ছিটকে আসা রক্ত এড়াতে বাম হাতে মুখ আড়াল করে তিনটে দেহ সার্চ করল রানা। ও নিজে খুন হয়ে না গেলে আবারও এই হোটেলে আঘাত হানবে মৃত্যুদূত।

নিঃশব্দে হাঁটছে রানা।

ছত্রিশ

করিডোর ধরে ছুটে চলেছে সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট। প্রতিবার বাঁক নেয়ার সময় সামনে বা দরজার দিকে তাক করছে পিস্তল। করিডোরের বেশিরভাগ বাতি নষ্ট, দপদপ করে আলোছায়া তৈরি করছে একটা টিউব লাইট।

জায়গায় জায়গায় ঘন ছায়া বা অন্ধকার। স্তূপ করে রাখা পুরনো কার্ডবোর্ডের কয়েকটা বাক্সে পা বেধে পড়তে গিয়েও সামলে নিল অ্যামেট। বিড়বিড় করে গালি দিল কপালকে। রেডিয়ো মুখের কাছে তুলে বলল, 'ক্লিভার? তুমি কোথায়?'

ওদিক থেকে সাড়া নেই।

'শালার কপাল,' বিড়বিড় করল অ্যামেট, 'ক্যাশ। ওখানে আছ তো?'

'কপি। আমরা ওপরেই আছি। এদিকে আসেনি মাসুদ রানা। আপনি দেখতে পেয়েছেন?'

'না। হারামজাদা ভূতের মত। ঠিক আছে। আউট।'

আরেকটা বাঁক নিয়েই বাতাসে ইঁদুরের মলমূত্রের সঙ্গে রক্তের আঁশটে গন্ধ পেল অ্যামেট। সামনে করিডোরের মেঝেতে তিনটে কালো স্তূপ। বেজো আর মার্কোকে হাতের ইশারায় থামতে বলল সে। থেমে গেল তারা। ঝুঁকে দেখল তিন মৃত এজেন্টকে।

'পাঁচজনকে নিয়েছে,' বলল বেজো। 'আমরা যেন ইঁদুর, বিড়ালের মত আমাদের সঙ্গে খেলছে।'

'আলাদা হয়ে খুঁজতে যাওয়া উচিত হয়নি,' বিড়বিড় করল এজেন্ট মার্কো।

রাগে দাঁতে দাঁত পিষল অ্যামেট। দাঁতের ব্যথায় আরেকটু হলে গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠত। ভুরু ও চোখ থেকে ঝেড়ে ফেলল ঘাম। 'আরও লোক লাগবে। চাই অন্তত আরও বিশজন।'

'আর কোনও লোক নেই,' কাঁপা গলায় বলল বেজো।

'হারামজাদাকে ধরতে দরকার হলে ডেকে আনব এক শ'জনকে,' মেঝেতে থুতু ফেলল অ্যামেট। 'একবার ফোন করলেই হবে।' কী যেন ভাবল কয়েক মুহূর্ত। এই হোটেলে এজেন্টদের পৌঁছুতে লাগবে অন্তত কয়েক ঘণ্টা। ফোন করতে হবে উপকার পেয়েছে এমন সব এজেন্টকে। সবাইকে

সংগঠিত করতে হলেও চাই সময়।

আরেকটা চিন্তা আসতেই বলল অ্যামেট, 'ঠিক আছে, মন দিয়ে শোনো। এখানে ঘুরঘুর না করে সোজা ওপরতলায় যাব আমরা। ওখানে সবাই আছে। সাতজন আমরা। ওই লোক ইবলিস হলেও আমাদেরকে টপকে যেতে পারবে না ক্যাথি পর্যন্ত।' তিক্ত হাসল সে। 'এদিকে ওই বেশ্যাটাকে দেব ইঞ্জেকশন। দেরি করব না কাজটা করতে। অপেক্ষার খেলা এবার শেষ। জেনে নেব হারামজাদি কী জানে।'

'রনসন থর্ন কিন্তু খেপে যাবে,' বলল বেজো।

'মরুক শুয়োরের বাচ্চা, কাপুরুষ। লিডার হয়েছে! ওর তো উচিত ছিল আমাদের পাশে থাকা!'

তিন লাশ টপকে করিডোর ধরে দৌড়ে চলল তারা। প্রথম এলিভেটরে উঠে বাটন টিপল অ্যামেট। প্রথমে উঠবে তৃতীয়তলায়। কথা বলছে না কেউ, মুখ ফ্যাকাসে। দুলতে দুলতে উঠছে এলিভেটর। থেমে গেল কয়েক সেকেণ্ড পর। খুলে গেল দরজা। নিজের অফিসের দিকে দৌড়ে গেল অ্যামেট।

দরজা সামান্য খোলা। ভেতরে আলো।

ভাবতে ভাবতে ছুটছে অ্যামেট। মনে পড়ল, দরজায় তালা মেরে তারপর গেছে সে।

পিস্তল বাগিয়ে ধরল অ্যামেট। ভীষণ ভয়ে পেটের ভেতর পাক খাচ্ছে নাড়িভুঁড়ি। থরথর করে কাঁপছে হাতের অস্ত্রটা। মনে মনে ধমক দিল নিজেকে: শান্ত থাক্, শালা!

পিস্তল সামনে তাক করে বামহাতে কবাট ঠেলল অ্যামেট। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজে খুলছে দরজা। আরও একটু ঠেলে দিল সে। ভেতরে ঢুকেই সিনেমার দৃশ্যের মত চারপাশে ঘুরিয়ে নিল পিস্তলের মাযল। ভীষণ কাঁপছে তার বুক।

অফিস ফাঁকা। ডেস্ক থেকে হাওয়া হয়েছে ক্যানভাসের

ব্যাগ আর কেমিক্যালের বোতলটা।

'রানা...' চাপা শ্বাস ফেলল ক্যাল অ্যামেট, 'ওই শালা এসেছিল!'

পেছন থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে মার্কো।

সাঁইত্রিশ

অফিসের বাইরে বিলাপ করে উঠল কেউ। আধ সেকেণ্ডের জন্যে পরস্পরকে দেখল অ্যামেট ও মার্কো। তারপর হ্যাণ্ডেল মুচড়ে দরজা খুলে লাফিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এল অ্যামেট। পেছনে মার্কো।

বাইরে নামছে রাতের আঁধার। ছায়ায় কালচে হয়ে উঠেছে হোটেল ভবন। ঝট্ করে দেয়ালের বাতির সুইচ অন করল অ্যামেট। জ্বলল না আলো। অন্ধকারে চোখ চালিয়ে কাকে যেন অভিশাপ দিল সে। নরম সুরে ডাকল, 'বেজো।'

জবাব দিল না কেউ।

প্রায়ান্ধকারে চকচক করছে মার্কোর চোখের সাদা অংশ।

'ও... কো... কোথায় যাবে...'

কথা শেষ করতে পারল না এজেন্ট মার্কো। অ্যামেটের মুখে ছলাৎ করে লাগল তপ্ত একরাশ রক্ত। খুক্ করে উঠেছে সাইলেন্স্ড্ পিস্তল। অ্যামেটের গায়ে ঢলে পড়ল মার্কো। গলা থেকে বেরোল গরগরার আওয়াজ। সে খামচে ধরতে চাইল বসের বাহু, তারপর পিছলে পড়ল করিডোরের মেঝেতে। বারকয়েক পা ছুঁড়ল, গলা থেকে বেরোচ্ছে বিশ্রী ঘড়ঘড় আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর থামল সব নড়াচড়া।

'আমি খুন করব তোকে, কুত্তার বাচ্চা!' বেসুরো চিৎকার ছাড়ল ক্যাল অ্যামেট। সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে পিস্তল। টিপে দিল ট্রিগার। ম্যাগাযিন খালি না করে থামল না। ইজেক্ট করল ম্যাগাযিন। ভরে নিল নতুন একটা। করিডোরের সামনে ও পেছনে খরচ করল পনেরোটা গুলি। আগে কখনও এত দ্রুত ট্রিগারে টান দেয়নি।

গুলিশূন্য হতেই থামল গরম হয়ে ওঠা পিস্তল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল অ্যামেট। হাঁফাচ্ছে ভয়ে। রাতের চাদর নেমে আসছে বলে আরও অন্ধকার হয়েছে করিডোর। মাকড়সার জালে ভরা এক জানালা থেকে এল ভোঁতা ধূসর আলো। নিজে অন্ধকারে আছে অ্যামেট। ঘুরে এগোতে লাগল আঁধারে। এখন চাই কাজ করে এমন একটা বাতির সুইচ। একটা সুইচ পেয়ে টিপে দিল। জ্বলল না বাতি।

তখনই অ্যামেটের গলায় চেপে বসল ছুরির শীতল ফলা। বরফের মূর্তি হলো স্পেশাল এজেন্ট। হাত এখনও বাতির সুইচের ওপর।

তার পেছন থেকে হিমশীতল ভরাট কণ্ঠ বলল, 'জানতাম ফিরবে। তাই সরিয়ে ফেলেছি করিডোরের সব বাল্‌ব্‌।'

ঢোক গিলতে চাইছে ক্যাল অ্যামেট, কিন্তু ছুরির ফলা ঠেকে আছে অ্যাডাম্‌স্‌ অ্যাপলে। কাটা পড়বে গলা। 'রানা?' ফিসফিস করল সে।

'জেনে নাও, কাউকে কিচেনে আটকাতে চাইলে ধারে কাছে রাখবে না ধারালো ছুরি,' বলল রানা। 'কেউ আহত হতে পারে।'

'কী করতে চাও?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল অ্যামেট।

'মাথাটা কেটে নেব।'

প্রাণের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে স্পেশাল এজেন্ট।

'তবে ক্যাথির কাছে নিয়ে গেলে, আপাতত বাঁচবে,' বলল রানা।

‘ওকে পাহারা দিচ্ছে,’ রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলল অ্যামেট।

‘নিজের লোক সরিয়ে দেবে,’ বলল রানা, ‘সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। সঙ্গে থাকবে তুমি। দেখিয়ে দেবে কোন্ পথে যাব। যাওয়ার পথে তোমার কাছ থেকে জেনে নেব, কী হচ্ছে আসলে।’

কাঁপা গলায় বলল অ্যামেট, ‘আমি শুধু নির্দেশ পালন করি। হুকুমের দাস। আসল লোক ওই থর্ন।’

‘সঠিক সময়ে ওর সঙ্গে দেখা করব,’ বলল রানা। ‘তবে আমার ধারণা, তুমি নিজেও কম জানো না। বলা যায় না, তোমার ওপর প্রয়োগ করতে পারি ওই সিরাম।’

‘খুন হবে, মাসুদ রানা।’

‘তোমার আগে না,’ অ্যামেটের গলায় ক্ষুরধার ছুরি ঠেকিয়ে বলল রানা, ‘এগোও।’

এলিভেটরে ঢুকে চতুর্থতলার বাটন টিপল অ্যামেট। ক্যানভাস ব্যাগে ছুরি রাখল রানা। অন্য হাতের বেরেটার মাযল চেয়ে থাকল সিআইএ এজেন্টের মাথা লক্ষ্য করে।

হুইস্ শব্দে খুলল এলিভেটরের দরজা। অ্যামেটের বামহাত পিঠের ওপরে ঠেলে করিডোরে তাকে বের করল রানা। আরেক হাতে তৈরি পিস্তল। রঙ করা হয়েছে করিডোরের দেয়াল। বাতাসে নতুন রঙের গন্ধ। সাজিয়ে নিয়েছে এই তলার সবকিছু। তবে সেটা করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে।

‘এখানে কারা থাকে?’ জানতে চাইল রানা।

‘শুধু ওই মেয়ে,’ বলল অ্যামেট। ‘আর বিশজন এজেন্ট। বাঁচার উপায় নেই তোমার।’

‘ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই,’ বলল রানা। ‘বকবক বন্ধ করে হাঁটো।’

দরদর করে ঘামতে ঘামতে ধীর পায়ে হাঁটছে ক্যাল অ্যামেট। হাঁপিয়ে উঠছে ব্যথায়। বাহু মুচড়ে রেখেছে রানা।

আরেকটু চাপ দিলেই মড়াৎ করে ভাঙবে সিআইএ এজেন্টের কাঁধের হাড়। সামনে বামে বাঁক নিয়েছে করিডোর। প্রায় নিঃশব্দে পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সতর্ক। চোখ এড়াচ্ছে না কিছু। টের পেল, অ্যামেটের টানটান উত্তেজনা। যে-কোনও সময়ে মুখোমুখি হবে অন্য এজেন্টদের। অ্যামেটকে ছেড়ে সামান্য পিছিয়ে গেল রানা, হাতে উঠে এল দ্বিতীয় পিস্তল।

বাঁক ঘুরল ওরা। দশ গজ দূরে শেষ করিডোর। ওদিকে একটা দরজা। প্লেটে লেখা: রুম চার শ' চৌত্রিশ। দরজার সামনে তিন এজেন্ট। তাদের দু'জন পুরুষ, অন্যজন মহিলা অ্যামেটের পেছনে পিস্তল হাতে রানাকে দেখে ঝট্ করে যার যার পিস্তল বের করেছে তারা। চিৎকার করে কী যেন বলল দুই পুরুষ এজেন্ট।

আগেও এই তিনজনকে দেখেছে রানা। বিশেষ করে মনে আছে সুন্দরী মেয়েটাকে। বেসবল ক্যাপের নিচে কালো বেণী মেয়েটার পেলব হাতে মানাচ্ছে না অতিরিক্ত বড় নাইন এমএম পিস্তল। অবশ্য, ভালই জানে নিজের কাজ। কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার চোখে। চেহারা দেখে মেয়েটার মনের কথা পড়তে ব্যর্থ হলো রানা।

বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে ক্যাল অ্যামেটের শরীরটাকে। বামহাতের পিস্তলের মাযল ঠেকিয়ে দিয়েছে এজেন্টের মাথার পাশে। করিডোরের তিন এজেন্টের দিকে তাক করেছে ডানহাতের পিস্তল। একই কাজ করছে তারাও।

'আমি ক্যাথি হার্বার্টকে চাই,' বলল রানা, 'ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। নইলে খুন হবে তোমাদের বস।'

ক্যাল অ্যামেটকে সামনে রেখে এগোচ্ছে রানা। মাত্র পাঁচ গজ দূরে দরজা। টের পেল, দপদপ করে লাফ দিচ্ছে ওর কপালের পাশের শিরা। আড়ষ্ট চেহারায় ওকে দেখছে তিন

এজেন্ট। সবার আঙুল ট্রিগারে। পিস্তলের মাযল নিষ্কম্প। যে-কেউ আক্রমণে গেলেই বদ্ধ করিডোরে উঠবে গুলির ঝড়। সবাই এত কাছাকাছি, গুলি ফস্কে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

'অ্যামেটের পিছন থেকে সরে মেঝেতে পিস্তল রাখো!' চিৎকার করল ডানদিকের এজেন্ট।

তার চোখের মণির নড়াচড়া দেখল রানা। তখনই টের পেল, পেছনে পৌঁছে গেছে কেউ। সরে যেতে এক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলেছে রানা। প্রায় একইসময়ে ঘটতে লাগল সব। শক্তিশালী একটা হাত খপ্ করে ধরল রানার বাম বাহু। ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল অ্যামেটের মাথায় ঠেকিয়ে রাখা ওর পিস্তল। পরক্ষণে রানার কানে নামল প্রচণ্ড এক ঘুষি। পলকে ওর ঘোলা চোখে ঝিলিক দিল অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো। লাফ দিয়ে রানার কাছ থেকে সরে গেল অ্যামেট। চারদিকে শুরু হলো সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তলের গুলির খুক-খুক আওয়াজ। বাম কাঁধে নাইন এমএম গুলি লাগতেই ডেলটয়েড পেশির ব্যথায় পাগল হয়ে উঠল রানা।

কিন্তু এখন সময় নেই ওদিকে মন দেয়ার। ঘুরেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে পেছনের হামলাকারী এজেন্টের গলায় গুলি করল রানা। কাটা কলা গাছের মত ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ছে লোকটা। কিন্তু খপ্ করে তাকে ধরে নিজের সামনে আনল রানা। থ্যাপ-থ্যাপ আওয়াজে লোকটার দেহে ঢুকল অন্তত ছয়টা গুলি। কিন্তু তাকে গায়ের কাছে ধরে রাখতে গিয়ে পা পিছলে মেঝেতে পড়ল রানা। ওর ওপর চাপল ভারী লাশ। মেঝেতে কনুই লাগতেই ছুটে গেল রানার বামহাতের পিস্তল। লাথি মেরে লাশ সরিয়ে দেখল, প্রাণভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে দুঃসাহসী সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট! বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেল করিডোরের ওদিকে। চলেছে বোধহয় এলিভেটরে চাপতে।

এগিয়ে এসেছে তিন এজেন্ট। বাড়িয়ে ধরেছে পিস্তল।

সবার লক্ষ্য রানার বুক। লালচে পাথরের মত চেহারা করেছে মেয়েটা।

লড়াই করে জিতবে না, বুঝে গেল রানা।

তিনজনের পিস্তলের বিরুদ্ধে ওর মাত্র একটা অস্ত্র।

তিন এজেন্টকে ফেলে দেয়া অসম্ভব।

চিত হয়ে পড়ে আছে রানা। গুলি পাঠাল শত্রুর উদ্দেশে। বেছে নিয়েছে বামদিকের লোকটাকে। পরক্ষণে মাযল সরিয়ে তাক করতে চাইল অন্য লোকটার দিকে।

কিন্তু... দেরি হয়ে গেছে অনেক!

রানা দেখল, ট্রিগারে চেপে বসেছে লোকটার আঙুল।

শূন্যে পাশ কাটাবে ওদের দুটো বুলেট।

তুই খুন হয়ে গেলি, ভাবল রানা।

পরক্ষণে পাল্টে গেল পরিস্থিতি।

এক পা পিছিয়ে গেছে মেয়েটা, সরাসরি গুলি করল পুরুষ এজেন্টের শোল্ডার ব্লেডের মাঝে। বিস্ময়ে মস্ত হাঁ করল লোকটা। হাত থেকে মেঝেতে খটাং শব্দে পড়ল পিস্তল। এক সেকেণ্ড পর মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল এজেন্ট।

নীরবতা নামল করিডোরে। বেঁচে আছে মাত্র দু'জন।

চোখে বিস্ময় নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। আগুন জ্বলছে কাঁধে। মস্ত সব লাফে বুকের পাঁজর ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে হৃৎপিণ্ড। ভুরু থেকে টুপ করে দু'ফোঁটা ঘাম পড়ল মেঝেতে। মেয়েটার দিকে পিস্তল তুলল রানা। একই কাজ করেছে ওই মেয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরের চোখে চেয়ে রইল ওরা।

চলছে নীরব চালমাত।

একটার সঙ্গে আরেকটা প্রায় ঠেকে আছে দু'জনের পিস্তলের মাযল। রানা টের পেল, বাম বাহু বেয়ে কুলকুল করে নামছে গরম রক্ত। ভিজে গেল আঙুল। ধোঁয়াভরা করিডোরে নৈঃশব্দ্য ভাঙল মেঝেতে রক্তের ফোঁটার টুপটুপ

শব্দ।

'অস্ত্রটা নামিয়ে রাখো,' বলল রানা।

'নিজেরটা নামাও,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

'আর সবাই মারা গেছে। রয়ে গেছ তুমি আর অ্যামেট।'

'তুমিই তা হলে বিসিআই-এর কিংবদন্তী সেই মাসুদ রানা?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'অনেক নাম শুনেছি তোমার। এখানে এসেছ কেন?'

'ওর বাবা-মার কাছে ফেরত দেব ক্যাথিকে।'

'ওকে সরিয়ে নিতে চাও? আমিও তা-ই চাই।'

'প্রমাণ দাও তুমি মিথ্যা বলছ না।'

ধীরে ধীরে ঝুঁকে মেঝেতে পিস্তল রাখল মেয়েটা। পিছিয়ে গেল কয়েক ফুট। সরাসরি তাকাল রানার চোখে। 'বুঝতেই পারছ, তোমার পক্ষে আছি। বিশ্বাস করতে পারো আমাকে।'

অস্ত্র না নামিয়ে ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল রানা। 'তুমি কে? খুন করলে কেন দলের লোকটাকে?'

'আমার নাম রেবেকা ট্রিপলার। সিআইএ এজেন্ট। তবে ওদের দলের কেউ নই।'

'এর কোনও প্রমাণ দিতে পারবে?'

'এরা সাধারণ এজেন্ট নয়। কাজ করেছে অন্য কারও হয়ে। জড়িয়ে গেছে বেআইনী সব কাজে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল রানা, এখনও মেয়েটার বুকে তাক করে রেখেছে পিস্তল। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ক্যাথি কোথায়?'

দরজাটা দেখাল রেবেকা। 'দরজার ওদিকে। এসো, দু'জন মিলেই দরজা খুলি। অ্যামেট লোক জোগাড় করবে। হাতে বাড়তি সময় পাব না।'

'আসলে কী হচ্ছে, সেটা আমার জানা দরকার,' বলল রানা।

‘যতটা জানি, বলতে আপত্তি নেই। তবে পরে শুনো।’

কুঁজো হয়ে মেয়েটার পিস্তল তুলে নিল রানা। বাম কাঁধের ব্যথায় মনে হলো খুন হয়ে যাবে। কুঁচকে গেছে ভুরু।

রানা বেল্টে পিস্তল গুঁজতে বলল রেবেকা, ‘বিশ্বাস করতে পারো আমাকে।’

‘হয়তো... পরে,’ বলল রানা। ‘খোলো ওই দরজা।’

বামদিকের এজেন্টের ভারী লাশ চিত করতে গিয়ে মৃদু গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা। মৃতদেহের প্যান্টের পকেট থেকে নিল চাবি। রক্তে ভিজে গেছে রেবেকার আঙুল। হাত মুছে নিল লাশের শার্টে। তিন পা ফেলে চলে গেল দরজার সামনে, দু'সেকেণ্ড পর খুলে গেল তালা।

‘তুমি আগে ঢোকো,’ বলল রানা।

কবাট খুলে ঘরে পা রাখল রেবেকা। পিছু নিল রানা। হাতে তৈরি পিস্তল। ক্যাথির কারাগারের চারপাশে তাকাল ও।

মেয়েটা নেই এই ঘরে!

আটত্রিশ

কয়েক সেকেণ্ড পর বিছানার তলা থেকে এল করুণ এক কোঁ-কোঁ আওয়াজ। রেবেকা সরে গেছে দেয়ালের কাছে। ‘ওখানেই থাকো,’ বলে খাটের নিচে উঁকি দিল রানা।

বিশ বছর পর আবারও ক্যাথি হার্বার্টের সঙ্গে দেখা হলো ওর। সে এখন হাসিমুখ ফোটোর মেয়েটা নয়। চেহারা ফ্যাকাসে। শুকিয়ে গেছে গত দু'সপ্তাহের মানসিক চাপে।

রানাকে দেখে ভীষণ ভয়ে কুঁকড়ে যেতে চাইল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কড়া শোনাল রানার কণ্ঠ, 'ক্যাথি, আমি তোমার শত্রু নই।' কাঁধের ব্যথায় পাগল হওয়ার দশা ওর। 'আমার নাম মাসুদ রানা। এসেছি তোমাকে সরিয়ে নিতে। তোমার বাবা পাঠিয়েছেন আমাকে।'

কমল না ক্যাথির ভয়। সরে যেতে চাইল দেয়ালের দিকে।

'বেরিয়ে এসো,' বলল রানা। 'বাড়ি পৌঁছে দেব। আর ভয় নেই।'

আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে মেয়েটার।

হাতে সময় নেই মিষ্টি কথা বলবে রানা। খপ্ করে স্টিলের বিছানার ফ্রেম একটানে সরাল ক্যাথির ওপর থেকে। এবার ধরল মেয়েটার কবজি। ভয়ের চোটে ফুঁপিয়ে উঠল ক্যাথি। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার চোখে।

'জানি, অনেক কষ্টের মাঝ দিয়ে গেছ,' বলল রানা, 'তবে আর ভয় নেই। আমার সঙ্গে এসো।' টান দিয়ে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে দিল ও।

তখনই ক্যাথির চোখ পড়ল রেবেকা ট্রিপলারের ওপর। ঝটকা দিয়ে হাত টেনে নিতে চাইল মেয়েটা। কাঁপা গলায় বলল, 'ওই মেয়ে ওদের দলের!'

'শান্ত হও, ক্যাথি,' বলল রেবেকা, 'রানা আর আমি মিলে তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'না-না! এ ওদের দলের!' রানার হাত থেকে ছুটে যেতে চাইল ক্যাথি। চড়ে গেছে গলা।

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, পরক্ষণে চোয়ালে জোরালো জ্যাব খেয়ে নীরবে জ্ঞান হারাল ক্যাথি। ওকে ডান কাঁধে তুলল রানা। ব্যথায় মনে হলো ছাত ফুঁড়ে স্বর্গে পৌঁছে যাবে।

'এটা কোনও কাজ হলো?' আপত্তির সুরে বলল রেবেকা।

কাঁধের ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা, 'কাজের মত কাজ।' দরজা পেরিয়ে করিডোরে পা রাখল ও। দেখা নেই ক্যাল অ্যামেটের। সাবধানে এগিয়ে চলল রানা ও রেবেকা। টপকে গেল এজেন্টদের লাশ। রানার বাম বাহু বেয়ে দরদর করে পড়ছে রক্ত। পেছনের মেঝেতে লাল ফোঁটা। ভিজে গেছে শার্ট।

এলিভেটরের কাছে পৌঁছে ওরা দেখল, হাওয়া হয়েছে ওটা। রানা দেয়ালের বাটন টিপতেই নিচে শুনল রওনা হয়েছে লোহার পুরনো বাক্স।

'পিছিয়ে যাও,' দরজার দিকে পিস্তল তাক করল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা খুলতে দেখল, ভেতরে কেউ নেই। নেমে এল ওরা একতলায়। লবি ফাঁকা। ক্যাথির অচেতন দেহ হাতির মত ভারী লাগছে রানার। ডানহাতে ঝেড়ে ফেলল কপালের ঘাম। থাকতে চাইছে সতর্ক। তবে কমে যাচ্ছে মনোযোগ।

ডানদিক দেখাল রেবেকা। 'ওদিক দিয়ে বেরোতে হবে।'

দ্রুত পায়ে হেঁটে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

হঠাৎ ঘর্মাক্ত দেহে রাতের শীতল হাওয়ায় হাড় পর্যন্ত কাঁপ ধরল রানার। থমকে দাঁড়াল। প্রথমবারের মত দেখছে চারপাশ।

পাথুরে, উঁচু এক ঢিবির ওপর এই পরিত্যক্ত হোটেল। সরু রাস্তা গেছে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। দূরে এবড়োখেবড়ো, আকাশছোঁয়া বিশাল পর্বতশ্রেণী। সূর্যের শেষ আলোয় লাল ও সোনালি হয়ে গেছে ওগুলো। দেখার মত দৃশ্য। নিজের ভেলা ভাসিয়ে পুবের কালো আকাশে উঠেছে মস্ত এক রুপালি চাঁদ। চারপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে গভীর সবুজ অরণ্য।

রেবেকার দিকে তাকাল রানা। 'আমরা কোথায় আছি?'

'মণ্ট্যানার চিনুক থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে। একমাত্র রাস্তা ওটা।' সরু, আঁকাবাঁকা পথ দেখাল মেয়েটা। 'চারপাশে

লক্ষ লক্ষ একর জমি জুড়ে ঘন জঙ্গল।'

'আমরা মণ্ট্যানায় কেন?'

'সেটা আমি জানি না।'

হোটেলের বাইরে রয়েছে কয়েকটা গাড়ি।

'আমরা ওটা নেব,' একটু দূরে জিএমসি ফোর-হুইল-ড্রাইভ দেখাল রানা।

ওই জিপের পাশে গেল রেবেকা। ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে নামিয়ে দিল সান ভাইযর। ওটার ওপর ছিল চাবি। মেয়েটার হাতে টুপ করে পড়ল ওটা। 'আমি গাড়ি চালাব।'

পেছনের দরজা খুলে আস্তে করে সিটে ক্যাথিকে শুইয়ে দিল রানা। গুঙিয়ে উঠে নড়ল মেয়েটা। ঘুষি মারতে হয়েছে বলে বেশ বিব্রত বোধ করছে রানা। তবে এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নয়। রেবেকার পাশের সিটে চাপল রানা।

চালু করতেই গর্জে উঠল জিপের ইঞ্জিন। আওয়াজের ওপর দিয়ে বলল রেবেকা, 'সিটের নিচে ফার্স্ট-এইড কিট পাবে।'

বাক্সটা সংগ্রহ করে ভেতরটা ঘাঁটল রানা। আছে ব্যাণ্ডেজ, সার্জিকাল টেপ ও কাঁচি। একটা টিউবে কোডিন ট্যাবলেট। দুটো বড়ি গিলে আহত কাঁধ সিটের পেছনে চেপে ধরে রেখে হেলান দিয়ে বসল রানা। হয়তো তাতে থামবে রক্তক্ষরণ।

হোটেল-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলল জিপ। দু'পাশ থেকে চেপে এসে পথরোধ করতে চাইছে জঙ্গল।

'এই পথে বেশি দূর যেতে পারব না,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা। 'একটু পর হাজির হবে সিআইএ বা এফবিআই-এর অন্তত চল্লিশজন এজেন্ট। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কোনও ট্র্যাকে নেমে যেতে পারো কি না দেখো।'

'তুমি পাগল নাকি? জঙ্গলে হারিয়ে যাব।'

'ওটাই বাঁচার একমাত্র উপায়।'

ভাল ড্রাইভার রেবেকা ট্রিপলার। পিছলা; এবড়োখেবড়ো

রাস্তায় ঝড়ের বেগে চলেছে বিশাল জিএমসি জিপ।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর ডানে জঙ্গলের মাঝে ধুলোর সরু এক পথ দেখাল রানা। 'ওদিকে যাও।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁক নিয়ে অসমতল ধুলোর পথে পিছলে নামল জিপ। শুরু হলো বেদম ঝাঁকুনি। হেডলাইটের আলোয় ছিটকে পেছনে যাচ্ছে দু'পাশের গাছের ডালপালা। সড়াৎ-সড়াৎ শব্দে লাগছে উইণ্ডশিল্ডে।

রক্তাক্ত শার্ট সরিয়ে কাঁধের ক্ষত দেখল রানা। মাংসল অংশে বিঁধেছে বুলেট। ওর মনে হলো না লেগেছে হাড়ে। এখনও রয়ে গেছে প্রায়-ভরা উইস্কির ফ্লাস্ক। ক্ষতের ওপর সোনালি তরল ঢালল রানা। মুখ কুঁচকে গেল ব্যথায়। ফার্স্ট-এইড কিট থেকে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে শক্ত করে বাঁধল আহত কাঁধের ক্ষত।

স্বাভাবিক গতির চেয়ে জোরে জিপ নিয়ে চলেছে রেবেকা। চট্ করে একবার রানাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেশি খারাপ?'

'না, ভাল,' বিড়বিড় করল রানা। কোডিন রক্তে মিশে যাওয়ায় ভোঁতা হয়েছে ব্যথা।

'তা হলে খারাপ। রয়ে গেছে বুলেট। ওটা বের করতে হবে।'

'মন দিয়ে গাড়ি চালাও,' বলল রানা।

নানান বাঁক নিয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকেছে ধুলোর পথ। তবে ছয় মাইল যাওয়ার পর চারপাশ থেকে চেপে ধরল জঙ্গল। প্রায় অন্ধের মত এগোতে হলো ঝোপের মাঝে। পেছনের সিটে টলমল করে উঠে বসল ক্যাথি। ডলতে লাগল চোয়াল। আরেক হাতে ধরে রেখেছে দরজার হ্যাণ্ডেল। বারবার এদিক ওদিক কাত হয়ে বদ্ধ মাতালের মত চলেছে জিএমসি জিপ।

জঙ্গলে সতর্ক চোখ রেখেছে রেবেকা। দুই হাতে আঁকড়ে

ধরেছে স্টিয়ারিং হুইল। আরও ক' মাইল যাওয়ার পর গতি নেমে হলো কচ্ছপের সমান। তারপর হারিয়ে গেল পথের সামান্য আভাসটাও। কাঁটাঝোপের কালো মস্ত এক সাগরে নাক গুঁজে এগিয়ে চলল জিপ। শুরু হয়েছে প্রেয়ারি। ঝিকঝিক করছে অসংখ্য নক্ষত্র। আকাশের পটভূমিতে দূরে ভাঙা দাঁতের মত এবড়োখেবড়ো পাহাড়শ্রেণী।

'মণ্ট্যানার হাই লাইন,' বলল রেবেকা। 'ওখানে মিলেছে বিশাল বিস্তৃত জমি আর রকি পর্বতমালা। জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই এদিকে।'

আরও বারো মাইল কোনওমতে এগোল ওরা, তারপর আরও রুক্ষ হলো জমি। এখানে-ওখানে পাথর ও মোটা গাছের শেকড়। বুনো পথে এগোতে হচ্ছে এঁকেবেঁকে। ড্রাইভ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রেবেকা। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইছে মনোযোগ। কিন্তু একটু পর হঠাৎ করেই ভীষণভাবে বামে ঝুঁকে গেল জিএমসি জিপ। কাত হয়ে পড়তে গিয়েও যেন সামলে নিল ওটা। পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, পায়ের জোরে পতন ঠেকাল রানা। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে ক্যাথি। থেমে গেছে গাড়ি। বড় এক গর্তে আটকা পড়েছে একদিকের চাকা। অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে উঠে যেতে চাইল রেবেকা। কিন্তু ওঠার নাম নেই, ধুলোর মধ্যে বনবন করে ঘুরল শুধু চাকা। কাকে যেন অভিশাপ দিল রেবেকা।

দরজা খুলে নামল রানা। ডানহাতে চেপে ধরেছে কাঁধের ক্ষত। রক্তক্ষরণ থামলেও ওর শার্ট ও প্যাণ্ট এখন কালো। অন্ধকারে টলে উঠল রানা। ভীষণ ব্যথায় ঘুরছে মাথা। ঠাণ্ডা ঘাম নামছে দুই জুলফি বেয়ে। ঝোপের ভেতর পাথুরে এক গভীর গর্তে আটকা পড়েছে জিপ।

'এটা তুলতে হলে ট্র্যাক্টর লাগবে,' বলল রানা। 'এখান থেকে হাঁটব আমরা।'

কথা শুনে চোয়াল ঝুলে গেল ক্যাথির। 'মাই গড! আপনি ভেবেছেন হাঁটব? এটাই আপনার উদ্ধার করার আইডিয়া?'

'তা হলে হেঁটো না,' বলল রানা, 'বসে থাকো। গল্প করো র‍্যাটলস্নেক আর গ্রিজলি ভালুকের সঙ্গে।' রেবেকার দিকে ফিরল ও। 'আকাশ থেকে চট্ করে চোখে পড়বে। লুকিয়ে ফেলতে হবে গাড়িটা।'

'ভাবছ হেলিকপ্টারে চেপে আসবে?'

ক্লান্ত হাসল রানা। 'তুমি হলে কী করতে?'

গাড়ি থেকে সরিয়ে নেয়ার মত সব নামিয়ে ফেলল রানা ও রেবেকা। পেছনে ছিল কয়েকটা ব্ল্যাঙ্কেট, বোতলজাত পানি, একটা ম্যাগলাইট, ক'বাক্স ম্যাচ, বিনোকিউলার ইত্যাদি। নিজের ব্যাগে সব ভরল রানা। বাদ পড়ল না ফার্স্ট-এইড কিট। কাজটা শেষ করে দেখতে বেরোল জঙ্গুলে উপত্যকার আশপাশ। ফেরার সময় সঙ্গে আনল ডালপালা ও ঝোপঝাড়। ওগুলো দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল জিপ। রেবেকার পাশে কাজে হাত লাগিয়ে মনে অন্তত এক শ'টা প্রশ্ন জন্ম নিল রানার। বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করতে পারবে মেয়েটাকে। পরে জেনে নেবে সব। আগের কাজ আগে।

বারকয়েক ঝোপ-ঝাড় নিয়ে আসার পর উঁচু স্তূপের নিচে ঢাকা পড়ল গাড়িটা। চাঁদের রুপালি আলোয় দেখতে হলো মস্ত এক ঝোপের মত। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল রানা। তুলে নিল ডান কাঁধে ভারী ব্যাগ। লাইন তৈরি করে রওনা হলো তিনজন।

পাথুরে জমি। পথ দেখাল জ্যোৎস্নার আলো। বারবার পিছিয়ে পড়ছে ক্যাথি। বাধ্য হয়ে ওকে নিজের কাছাকাছি রাখল রানা। ধরে রেখেছে কনুই। রেগে আগুন হয়ে আছে মেয়েটা, অসমতল পাথর বা শেকড়ে হোঁচট খেলেই বারবার অভিযোগের আঙুল তুলছে রানার দিকে।

ক্যাথিকে পাত্তা দিল না রানা। মাঝে মাঝে কালো

আকাশে চোখ রেখে দেখে নিচ্ছে নক্ষত্র। রেবেকা বলেছে, চিনুকের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ওই হোটেল। উত্তরদিকে নগর-সভ্যতা। হয়তো পাবে কোনও রাস্তা বা কোনও ফার্ম। বিশ্রাম নিয়ে তারপর ভাববে কোথায় যাবে। রানা বুঝে গেছে, আগে হোক বা পরে, সাহায্য নিতে হবে ডাক্তারের। দেরি করলে পচতে শুরু করবে বুলেটের ক্ষত। ভাগ্য ভাল, মাত্র কিছু দিন আগেই নিয়েছে টিটেনাস। তবে অনেক কম আঘাতেই কখনও কখনও শুরু হয়ে যায় গ্যাংগ্রিন।

বহুক্ষণ হাঁটছে রানা। বুঝতে পারছে, ফুরিয়ে এসেছে শক্তি। আবারও বেড়ে গেছে কাঁধের ব্যথা। আরেকবার পেইন কিলার নেয়ার ইচ্ছে জোর করে দমন করল রানা। বেহিসেবী হয়ে বড়ি খরচ করা উচিত হবে না। হাঁটতে হবে বহু দূরের পথ, সহ্য করতে হবে আরও অনেক ব্যথা।

উনচল্লিশ

ক্রমেই খাড়া হয়েছে জঙ্গুলে উপত্যকার জমিন। রানা, রেবেকা ও ক্যাথির কান-গাল-নাক প্রায় বরফ করে দিয়ে বইছে শোঁ-শোঁ ঠাণ্ডা হাওয়া। ক্লান্ত পায়ে নীরবে হাঁটছে ওরা। এতই পরিশ্রান্ত, এমন কী অভিযোগ করাও বাদ দিয়েছে ক্যাথি।

উপত্যকার মেঝে থেকে দেড় শ' ফুট উঁচু লাইমস্টোনের পাহাড়ে উঠল ওরা। পাথরের চাতালে পেয়ে গেল মাঝারি একটা গুহা। ওটার মুখ অন্যদিকে, হু-হু করে ঢুকবে না শীতল হাওয়া। ভেতরে বুনো জন্তু আছে কি না ম্যাগলাইট

জ্বেলে দেখে নিল রানা। বছরের এ সময়ে এসব গুহায় আস্তানা গাড়ে গ্রিজলি ভালুক ও পাহাড়ি সিংহ। তবে গুহায় নেই শিকারের দেহাবশিষ্ট বা মলমূত্রের চিহ্ন।

আরামে শোয়ার জন্যে চারপাশ ঘুরে শুকনো পাতা ও ফার্ন জোগাড় করল রেবেকা ও অভিযোগবাজ ক্যাথি। ওই সময়ে ডালপালা সংগ্রহ করে গুহার ভেতর ছোট আগুন জ্বালল রানা। কাজটা করেছে এমনভাবে, সোজা ছাতে গিয়ে লাগবে ধোঁয়া, তারপর ধীরে ধীরে বেরোবে গুহামুখ দিয়ে। কিছুক্ষণ পর ভালভাবেই জ্বলে উঠল আগুন। আরও বাড়ছে কাঁধের টিসটিসে ব্যথা, ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল রানা। শুয়ে পড়ল রেবেকার আনা পাতার বিছানায়। একটু পর ওর পাশে এসে বসল রেবেকা। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রানার ভেজা ভুরু ও চুলে হাত বুলিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

ওদের উল্টোদিকে বসল ক্যাথি। পাত্তা দিচ্ছে না রেবেকা বা রানাকে। ব্ল্যাঙ্কেট মুড়িয়ে ওটাকে বালিশ বানিয়ে শুল মেয়েটা। সময় লাগল না ঘুমিয়ে পড়তে।

একটা কাঠি দিয়ে আগুন উস্কে দিচ্ছে রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এবার আলাপ করা যাক।'

'যা জানি, খুলে বলছি,' বলল রেবেকা। 'তবে অনেক কিছুই জানি না।'

'ক্যাল অ্যামেট সম্পর্কে বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেবেকা। 'আট মাস আগে আমাকে বলা হয় তার দলে যোগ দিতে। প্রথম থেকেই পছন্দ করতে পারিনি তাকে। ভীতিকর বাজে লোক। অন্য কোনও ইউনিটে ট্র্যান্সফারের জন্যে অনুরোধ করব, এমনসময় টের পেলাম, অস্বাভাবিক কিছু করছে এরা। স্টিভ বার্কলে নামের এক যাজকের ওপরে চোখ রাখার দায়িত্ব দেয়া হলো। ফোন ট্যাপ করলাম। ই-মেইল ঘাঁটলাম। চোখ রাখলাম লোকটার ওপর। কেন এসব কাজ করতে হবে, তার কোনও ব্যাখ্যা দিল না

কেউ।’

‘বলে যাও।’

‘কখনও কখনও রহস্যময় অনেক কাজই করে সিআইএ। সবসময়ে সেজন্যে ফিল্ড এজেন্টকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তা-ও নয়। কিন্তু এরা ছিল অন্যরকম। ফোনের ট্র্যান্সক্রিপ্ট দেখত শুধু ক্যাল অ্যামেট। আমি ছিলাম অন্ধকারে। বাধ্য হয়ে কান পাতলাম এদের দরজায়। তখনই জানলাম, গ্রিসে পাঠানো হয়েছে কয়েকজন এজেন্টকে।’

‘তাদের একজন ক্রিস্টিনা পার্কার,’ বলল রানা। ‘চিনতে তাকে?’

‘না, চিনতাম না। তবে একটা ফাইলে পেলাম তার নাম। গোপনে ফাইল ঘাঁটছি জানাজানি হলে মস্ত বিপদে পড়ব। ক্রিস্টিনা প্রাক্তন সিআইএ এজেন্ট। এখন চাকরিতে নেই।’

পৃথিবীতেই নেই, মনে মনে বলল রানা। চুপ করে আছে।

‘তারপর দশ দিন আগে,’ আবারও শুরু করল রেবেকা, ‘হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। তাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা দেখাল ক্যাল অ্যামেট। হয়ে গেল খিটখিটে। প্রতিদিন ফোন করতে লাগল অন্তত এক শ’বার। কাকে ফোন করছে, জানতে পারলাম না। এর দু’এক দিন পর দল গুছিয়ে নিয়ে সোজা মণ্ট্যানায় ওই হোটেলে চলে এল সে।’

‘সে সময়ে গ্রিস থেকে আনা হয়েছে ক্যাথিকে।’

মাথা দোলাল রেবেকা। ‘হেলেনা পর্যন্ত আনা হয়েছে প্রাইভেট জেটে করে। এরপর এসেছে হেলিকপ্টারে। আমাদের বলা হলো, গ্রিসের এক টেরোরিস্ট বমিঙের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী সে। কথাটা মানতে পারলাম না। গালগপ্প মনে হলো। এভাবে কাজে করে না সিআইএ। কখনও ওই হোটেলের মত হোল্ডিং ফ্যাসিলিটি আগে দেখিনি। বুঝলাম, এরা সরকারী খরচে নিজেদের বিশেষ কোনও কাজ করছে। ওপরের মহলে রিপোর্ট দেব ভাবছি, এমনসময় আরও সতর্ক

হয়ে গেলাম।'

'ওপর মহলে রিপোর্ট পাঠালে না কেন?'

'কারণ, তখনই ঘটল বাজে একটা ব্যাপার। লোকটার নাম ছিল ডিক মাল্ডুন। ডাক্তার। ভাল করে চিনতাম না তাকে। তবে মনে হয়েছিল, মানুষ হিসেবে সে খারাপ নয়। মুখে গুলি করে তাকে মেরে ফেলল ক্যাল অ্যামেট।'

'মানুষের মুখে গুলি করতে ভালবাসে অ্যামেট,' বলল রানা।

'এত ভয় পেলাম, গুবলেট হয়ে গেল মগজ। বুঝলাম, ওই দলে আমি একা। পরে মনে হয়েছে, কিছু করা উচিত ছিল।'

'নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে।'

'বুঝলাম না, কাকে বিশ্বাস করব। সেসময়ে হঠাৎ করে ফোনে নির্দেশ এল, আমাদেরকে যেতে হবে জর্জিয়ায়। এরপর ওখানে তোমাকে পেলাম আমরা। পরের কাহিনী তোমার জানা আছে।'

'প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, তুমি ওই দলে অন্যরকম,' বলল রানা।

ওর চোখে তাকাল রেবেকা। 'তোমাকে গ্রেফতারের নামে কিডন্যাপ করছে, সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার উচিত ছিল তাদেরকে বাধা দেয়া। ক্ষমতা বা সাহস ছিল না বলে টুঁ শব্দ করতে পারিনি।'

'তোমার কিছু করার ছিল না। বাধা দিলে ওই দুই পুলিশের মতই খুন হতে। নিজেদের পথে কাউকে বাধা বলে মনে হলে বিনা দ্বিধায় খুন করে এরা।'

আগুনের লালচে আভার মাঝ দিয়ে ঘুমন্ত ক্যাথিকে দেখল রেবেকা। 'আমার জানা নেই, ওই মেয়ের কাছ থেকে কী চাইছে এরা। তবে ওটা খুব দরকার এদের।'

'এতই বেশি, ভাবতেও পারবে না,' বলল রানা। পরের

পনেরো মিনিটে প্রথম থেকে সব খুলে বলল ও।

দু'চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রেবেকার। বোমা বিস্ফোরণের বর্ণনার সময় হতবাক হয়ে রানার চোখে চেয়ে রইল। এক এক করে প্রতিটি জটিল পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা। বাদ পড়ল না কিছু। উকিল পিছলা সিম্পসন। স্টিভ বার্কলে। মেরিয়ান ট্রুলির এক শ' মিলিয়ন ডলার। ক্যাথির আবিষ্কার। ব্ল্যাকমেইল।

রানার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনল রেবেকা। ও থেমে যেতে নামল রাতের নীরবতা। বিস্ময় নিয়ে ওর চোখে চেয়ে আছে রেবেকা। থর্ন এবং তার দলের নিষ্ঠুরতা বুঝে হাঁফ ধরে গেছে ওর। বড় করে দম নিল। 'কী ভয়ানক! অথচ মনে হচ্ছে সব সিনেমার কাহিনী! ...কিন্তু চাইছে কেন সামান্য পটারি? থিয়োলজির একটা জিনিস এত জরুরি কেন? কী করবে ওটা দিয়ে?'

'কত দিন তোমরা চোখ রেখেছ স্টিভ বার্কলের ওপর?'

'মাসের পর মাস।'

'এজন্যেই বুঝতে পেরেছে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্যাথি। মেয়েটা ব্ল্যাকমেইল করছিল স্টিভ বার্কলেকে। ফোনে কান পেতে সবই জেনেছে। এরপর বার্কলের অফিসে বাক্স নিয়ে উকিল পিছলা সিম্পসন গেলে খেয়াল করেছে সব। আরও তথ্য পাওয়ার জন্যে হামলা করেছে পরে উকিলের ওপর। লোকটার প্রাক্তন প্রেমিকা ওখানে হাজির না হলে মেরেই ফেলত নির্যাতন করে।'

ভুরু কুঁচকে ভাবছে রেবেকা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তার মানে, বলতে চাইছ দুর্ঘটনাবশত জালে জড়িয়ে গেছে ক্যাথি হার্বার্ট?'

'স্টিভ বার্কলে সবকিছুর চাবি,' বলল রানা, 'তাকে ঘিরেই ঘুরছে সব। তবে সেটা সে জানেও না। বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে: কী কারণে বার্কলের ওপর চোখ রাখা হলো?'

নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। কারও কাছে কোনও জবাব নেই।

'ভয়ানক কোনও পরিকল্পনা আছে,' বলল রেবেকা। 'এটা বুঝতে পেরেছি।'

'কী ধরনের পরিকল্পনা?'

'জানতে পারলে ভাল হতো।'

'কে এই থর্ন?' জানতে চাইল রানা।

অবাক হয়েছে রেবেকা।

'হোটেলে অ্যামেটের সঙ্গে ছিল সে। মাঝারি আকারের লোক। দামি কোট। দেখতে পুলিশ বা এজেন্টদের মত নয়। সবকিছুর মূলে আছে সে। তার কাছে জবাবদিহি করে ক্যাল অ্যামেট।'

'আগে কখনও শুনিনি থর্নের নাম,' বলল রেবেকা।

বাড়ছে রানার কাঁধের ব্যথা। আরাম করে বসার জন্যে গুহার দেয়ালে হেলান দিল। তীরের মত খচ-খচ করে খুঁচিয়ে চলেছে ক্ষতটা। ব্যথা ও শীতে একবার শিউরে উঠল রানা। অত্যন্ত জটিল বিষয়ে অতিরিক্ত ভাবতে গিয়ে ক্লান্ত।

উদ্বিগ্ন চোখে ওকে দেখল রেবেকা। 'অনেক ব্যথা, তাই না? রয়ে গেছে কিছু কোডিন পিল।'

'আগামী কালকের জন্যে রাখতে হবে,' বিড়বিড় করল রানা।

'বুলেটের জায়গাটা একবার দেখতে দাও।'

একটু কেঁপে গেল রানার কণ্ঠ, 'আমি ঠিক আছি।'

'মরে গিয়ে আমাকে দায়ী করে যাবে, তা হবে না,' বলল রেবেকা, 'আমাদের দু'জনেরই দরকার পরস্পরের সাহায্য।' এগিয়ে বসে রানার শার্টের বোতাম খুলতে লাগল মেয়েটা। বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেল রানা। খুব সাবধানে শার্ট সরিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলল রেবেকা।

'আগেও এ ধরনের কাজ করেছ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

‘তিনবছর ছিলাম মেডিকেল স্কুলে। এরপর সিআইএতে যোগ দিয়েছি অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। এর চেয়ে বড় ভুল জীবনে আর করিনি।’ ম্যাগলাইটের আলো ফেলে রানার বুক ও কাঁধ দেখছে রেবেকা। ফ্যাকাসে কিছু দাগ দেখে বলল, ‘আগেও গুলি লেগেছে।’

‘কখনও কখনও।’

‘বেশ কয়েকবার।’ ঝুঁকে রানার কাঁধের ক্ষত দেখছে রেবেকা। ‘ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না, রানা। তবে বের করতে হবে বুলেট। উচিত হাসপাতালে যাওয়া।’

‘প্রশ্নই ওঠে না,’ বিড়বিড় করল রানা। এতই দুর্বল, কমে গেছে আপত্তি তোলার সাধ্য।

ওর মাথার পেছনে ভাঁজ করে ব্ল্যাঙ্কেট রাখল রেবেকা। দক্ষ হাতে ড্রেসিং করে বেঁধে দিল নতুন ব্যাণ্ডেজ। সাহায্য করল শার্ট পরে নিতে। আরেকটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে ঢেকে দিল দেহ। প্রায় ফিসফিস করে বলল, ‘এবার একটু ঘুমাতে চেষ্টা করো।’

আগুনের টিমটিমে আলোয় ওকে দেখল রানা। নিজের জন্যে ফার্নের বিছানা তৈরি করে শুয়ে পড়ল রেবেকা। কয়েক মিনিট পর রানা বুঝল, ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে ধীরে ধীরে উঠছে-নামছে মেয়েটার বুক। ঘুমিয়ে পড়েছে। বহুক্ষণ জেগে থাকল রানা। দূর থেকে এল কয়োটির ইয়াপ-ইয়াপ ডাক।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙতে দেখল, নিভন্ত আগুনের কমলা আভায় মাথা উঁচু করে ওকে দেখছে রেবেকা। মুখে এলিয়ে পড়েছে কালো চুল। ফুরিয়ে আসা আগুনের ধিকিধিকি আলোয় চকচক করছে ওর মায়াবী দু’চোখ।

ঘুমভরা স্বরে ফিসফিস করে বলল রেবেকা, ‘তুমি স্বপ্ন দেখছিলে। ভালবেসেছিলে কাউকে। পাওনি বা নাওনি।’

চুপ করে আছে রানা।

‘বিয়ে করলে না কেন ওকে?’ বিড়বিড় করল রেবেকা,

'হয়তো বাড়ি ফিরবে বলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করত।'

'তেমন কেউ নেই,' বলল রানা।

'চলে গেল কেন?'

চুপ করে থাকল রানা।

'বলবে না?'

'তোমার কেউ নেই?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছিল কেউ,' বলল রেবেকা, 'নাম ছিল বব। ভার্জিনিয়ায় একসঙ্গে বড় হয়েছি আমরা। পরে বুঝলাম, অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশতে হবে ওকে। সরে গেলাম।' বিষণ্ণ হাসল রেবেকা। 'মনটা দিয়েছি পরে সিআইএকে।'

নীরব থাকল রানা।

'ক্যাল অ্যামেট একটা কথা বলেছিল তোমার সম্পর্কে,' নরম সুরে বলল রেবেকা।

'কী বলেছে?'

'তুমি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক।'

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'ভুল বলেছে। ক্যাল অ্যামেটের মত লোক সত্যিকারের বিপজ্জনক জানোয়ার।'

'আমি কিন্তু তোমার ফাইল পড়েছি।'

নীরবে রেবেকার চোখ দেখল রানা।

মুখ থেকে চুল সরাল মেয়েটা। 'সিআইএতে তোমার ফাইল পড়েছি অন্তত বিশবার। তুমি ছিলে আমার হিরো।'

'তোমার অন্তর থেকে পতন হলো কবে আমার?' ক্লান্ত হাসল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রেবেকা। 'না, স্থান আরও ওপরে গেছে। সিআইএ এজেন্টদের মত করে নিরীহ মানুষ খুন করো না তুমি।'

'এসো, সেই খুশিতে ঘুমিয়ে পড়ি,' বিড়বিড় করল রানা। চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে থাকল ও।

চল্লিশ

মণ্ট্যানা।

পাহাড়ের ওপর সিনেটর হেনরি শোফেল্ডের প্রকাণ্ড বাড়ি।

রাত সাড়ে দশটার দিকে ফোনে কয়েকটা কথা শুনেই হতবাক হয়েছে রনসন থর্ন। পরিত্যক্ত হোটেল থেকে ফোন করে তার মাথায় বাজ ফেলেছে ক্যাল অ্যামেট।

প্রায় ডযনখানেক এজেন্টকে কাঁচ কলা দেখিয়ে ক্যাথিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে মাসুদ রানা। সঙ্গে সম্ভবত বন্দি হিসেবে নিয়ে গেছে আরেক এজেন্ট রেবেকা ট্রিপলারকে।

ক'সেকেণ্ড পর ভাষা ফিরে পেয়েছে থর্ন। রাগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ফোনে গাল বকে ভূত ছাড়িয়ে দিয়েছে ক্যাল অ্যামেটের। হাতের কাছে পেলে হয়তো মেরেই বসত।

কিন্তু ওই দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে থর্নের মগজ। তবে মন এত শান্ত হয়নি যে দানবীয় সোফায় বসে দেখবে নব্বই ইঞ্চি টিভির প্রোগ্রাম। পুরো ব্যাপারটা এখনও ঘোলাটে লাগছে তার কাছে।

অবশ্য, নিয়েছে জরুরি সিদ্ধান্ত। উচিত ছিল আগেই ওটা নিয়ে ভাবা। অনেক দেরি করে ফেলেছে সে।

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল থর্ন। অপেক্ষা করছে সাড়া পাওয়ার জন্যে।

ওদিক থেকে রিসিভ করল এক লোক।

'হ্যাঁ, আমি বলছি,' জানাল থর্ন।

'এখন এত রাতে...'

‘ওসব বাদ দাও। মন দিয়ে শোনো। হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সব। বদলে গেছে প্ল্যান। এবার শত্রুদের বোকা বানাতে আগে থেকেই কাজে নামব আমরা।’

ওদিক থেকে বড় করে শ্বাস নিল সিআইএর ঊর্ধ্বতন অফিসার। নিচু গলায় বলল, ‘এখন কেন?’

‘পাওয়া গেছে ভাল সুযোগ,’ বলল থর্ন, ‘আমরা যে পরিবেশ চাইছি, ঠিক তেমনই ওটা।’ ব্যাখ্যা দিতে লাগল সে।

‘সবাই ওখানে থাকবে? তাদের প্রেসিডেন্ট আর সুপ্রিম কাউন্সিলের চার সদস্য?’

হাসল রন থর্ন। ‘একই গম্বুজের নিচে। সম্মানিত আরও অনেকে থাকছে। বলতে পারো, একহাতে সবার গালে চড় কষিয়ে দেব আমরা। কেমন মনে হচ্ছে?’

‘কাজটা হলে তো খুব...’

‘সলোমনকে ডাক দাও। তিন দিন পর ওই অনুষ্ঠান। ওকে বলবে, ঠিকভাবে কাজ হলে ও পাবে দ্বিগুণের বেশি টাকা।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু আমরা আবার বেশি তাড়াহুড়ো করছি না তো?’ মৃদু কাঁপছে সিআইএ কর্মকর্তার কণ্ঠ, ‘অনেক বড় পদক্ষেপ।’

‘সত্যিই বড়,’ সায় দিল থর্ন, ‘কিন্তু সময় হয়েছে। হয় এখন কাজে নামতে হবে, নয়তো ভুলে যেতে হবে চিরকালের জন্যে। “আর দেরি করা হবে না,” বুক অভ রেভেলেশনের উক্তি। বুঝলে, আমিও বাইবেল পড়েছি। আরও দেরি হলে সর্বনাশ হবে আমাদের।’

‘মানব-ইতিহাসে আমাদের এসব কথা এক সময়ে হয়ে উঠবে মূল্যবান,’ বিড়বিড় করল সিআইএর ঊর্ধ্বতন অফিসার। ‘সিনেটর শোফেল্ড তৈরি তো?’

‘তৈরি করে নেব। ও নিয়ে চিন্তা নেই। টানতে শুরু করো

নিজের দিকের সুতো। আমার কাজ আমি করব।'

কল কেটে খুশি হয়ে উঠল থর্ন। গিয়ে থামল ড্রিঙ্ক কেবিনেটের সামনে। বরফের কুচি ভরা বাকেট থেকে ক্রুগের বোতলটা নিয়ে গ্লাসে ঢালল পাঁচ ইঞ্চি সোনালি তরল। নীরবে টোস্ট করল নিজের উদ্দেশে। আজকের এই সিদ্ধান্তের কারণে কিছুদিনের ভেতর সে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুরুষ। এক ঢোক শ্যাম্পেন গিলল সে। ধক-ধক করছে হৃৎপিণ্ড। শেষপর্যন্ত নিতে পেরেছে সিদ্ধান্ত। আর অপেক্ষা করবে না।

টেবিলে গ্লাস রেখে সোফায় শুল সে। চাপতে পারছে না উত্তেজনা। প্রকাণ্ড টিভির দিকে রিমোট তাক করে টিপল বাটন। স্ক্রিনে ভেসে উঠল তার সবচেয়ে প্রিয় স্যাটেলাইট পর্নো চ্যানেলের প্রচারিত নোংরা সব দৃশ্য।

কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখল থর্ন। তারপর আবারও বেজে উঠল টেলিফোন। অস্বাভাবিক সব গোঙানি ও শীৎকার মিউট করে কল রিসিভ করল সে।

আবারও ফোন করেছে সিআইএ কর্মকর্তা। 'সব ঠিক করা হয়েছে। তিন দিন পর।'

'সলোমন রুশদিকে বলে দিয়ো, ওর তুলনা হয় না।'

'সেটা সে আগেই জানে,' ফোন রেখে দিল লোকটা।

আবারও গ্লাসটা শ্যাম্পেনে ভরে নিল থর্ন। মিষ্টি তরল দুই ঢোক খেয়ে মুখ মুছল সিল্কের শার্টে। এবার ফোন করল অন্য এক নম্বরে।

তৃতীয় রিঙে ধরল ক্যাল অ্যামেট।

'আমি,' বলল রনসন থর্ন।

'এখনও খোঁজ নেই,' বলল অ্যামেট। ভাল করেই জানত ফোন করবে থর্ন। 'আমরা সার্চ শুরু করেছি। হাতে পেয়ে যাব। সবই আছে নিয়ন্ত্রণের ভেতর।'

'আগেও ওই কথা শুনেছি। যখন ওদেরকে পাবেন,

নিশ্চিত করবেন, যেন বেঁচে না থাকে।'

'সবাইকে মেরে ফেলব? ক্যাথি হার্বার্টও?'

'ওকে রেহাই দেয়ার কোনও দরকার নেই।'

'কিন্তু ওস্ট্রাকা...'

'ওই পর্যায় পেরিয়ে এসেছি,' বাধা দিল থর্ন। 'বদলে গেছে প্ল্যান। চালু করা হয়েছে জেরুযালেমের কাজ।'

'যিশু!'

'হ্যাঁ। এবার যিশুর মত কারও জন্যে অপেক্ষা করুন।'

'কবে শুরু হচ্ছে?' জোরে শ্বাস ফেলল অ্যামেট।

'তিন দিন পর,' বলল থর্ন, 'কাজেই ওদেরকে খুঁজে কবর দিন।'

'আনন্দের সাথে।'

একচল্লিশ

সোনালি রোদের ঝকঝকে সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলল রানা। নাকে এল রোস্ট করা মাংসের সুবাস। নতুন করে জ্বেলে নেয়া আগুনের পাশে বসে আছে রেবেকা ট্রিপলার। দুটো কাঠি দিয়ে ধরেছে মোটাসোটা এক ছেলা খরগোশ। চিড়বিড় আওয়াজে ফুটছে ওটার চর্বি।

'গন্ধ তো দারুণ!' বলল রানা।

কথা শুনে ঘুরে তাকাল মেয়েটা। ওর হাসিটা খুব মিষ্টি। এলোমেলো চুলে অপ্সরার মত দেখাল ওকে। 'তোমার খিদে লেগেছে। ভাল খবর।'

গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল রানা। খেয়াল করল

কীভাবে ধোঁয়া কমিয়ে রেখেছে রেবেকা। আগুনে টুপটাপ পড়ছে চর্বি। সিস্-সিস্ আওয়াজে রোস্ট হচ্ছে বেচারা মোটাতাজা খরগোশ। রানার চোখ এড়াল না রেবেকার দেহের সুন্দর বাঁকগুলো। আগে খেয়াল করেনি, মেয়েটা এত আকর্ষণীয়। ছিপছিপে শরীর, প্রতিটি নড়াচড়া সাবলীল।

রেবেকার জিন্স প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে বেরেটার বাঁট।

রানার ভাবনা যেন ধরতে পেরেছে। 'চাইলে ফেরত নিতে পারো। মন চায়নি যে ঘুম ভাঙিয়ে নিই। খুব খিদে লেগেছে ক্যাথির। একই কথা তোমার ব্যাপারেও। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোমাকে।'

খুব সাবধানে উঠে বসল রানা। মনে হলো করাত দিয়ে কেটে কাঁধ থেকে হাতটা নামাচ্ছে কেউ। বোতল থেকে কোডিন ট্যাবলেট নিয়ে দুটো বড়ি মুখে ফেলল ও। 'তোমার কাছে পিস্তল দেখে অস্বস্তি বোধ করছি না। রেখে দাও।'

আবারও হাসল রেবেকা। 'তো বিশ্বাস করছ আমাকে?'

'বিশ্বাস না করে উপায় আছে আমার?'

'তা ঠিক, সত্যিই উপায় নেই। তবে মানুষটা বোধহয় আমি অতটা খারাপ নই।' আগুন থেকে খরগোশ সরিয়ে সমতল এক পাথরে রাখল রেবেকা। ছুরির করাতের মত অংশ দিয়ে কাটতে লাগল। চার টুকরো হওয়ার পর ছোরার ডগা ব্যবহার করে এক টুকরো বাড়িয়ে দিল ক্যাথির দিকে।

বিরক্ত হয়ে নাক কুঁচকে ফেলল ক্যাথি। 'ওই গু-মুত আমি খাই না।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল রেবেকা। 'শক্তি হবে। খেয়ে নাও। সারাদিন হাঁটতে হবে আমাদের।'

'আমি ভেজিটারিয়ান।'

'গুড,' বলল বিরক্ত রানা। 'তা হলে বেশি পাব রেবেকা আর আমি। ক্যাথি যদি ভেবে থাকে ওকে কোলে করে নিয়ে

যাব, তো মস্ত ভুল ভাবছে।'

রেবেকার দিকে আঙুল তাক করল ক্যাথি। 'ওই মেয়ের সঙ্গে কোথাও যাব না। ওর জন্যেই খুন হয়েছে ডক্টর মাল্ডুন।'

'চাইনি খুন হন,' বলল রেবেকা, 'কিন্তু ঠেকাতেও পারিনি ওই হত্যাকাণ্ড।'

নাক দিয়ে ফোঁৎ আওয়াজ তুলে নিজের কোণে গুটিসুটি মেরে বসল ক্যাথি। রানা ও রেবেকাকে মাংস খেতে দেখে মুখ কালো করে ফেলেছে সে।

'ওর কথা বাদ দাও,' রেবেকাকে বলল রানা। 'খিদে নেই বোধহয়। ...বাহ্, রান্না তো চমৎকার!'

'আগে কখনও নাইন এমএম দিয়ে খরগোশ শিকার করিনি,' বলল রেবেকা। 'ভাবছিলাম, এক গুলিতে চারপাশে ছিটকে পড়বে সব।' পকেট থেকে রুমাল নিয়ে মুখ মুছল। উঠে গেল গুহামুখে। প্যান্টের পকেট থেকে নিল মোবাইল ফোন।

'ওটা রেখে দাও,' বলল রানা। 'এদিকে সিগনাল থাকলে সহজেই আমাদেরকে ট্র্যাক করবে।'

'ও, তাই তো! ঠিক! তবে প্রথম সুযোগে ল্যাণ্ড ফোন পেলেই কল দেব।'

'হ্যাঁ, তাই তো করবে,' তিক্ত স্বরে বলল ক্যাথি। 'ফোন দিয়ে ডেকে এনে ধরিয়ে দিতে হবে না আমাদেরকে!'

'তা না করলেও তোমাকে পাঠাব নিরাপদ কোথাও,' বলল রেবেকা। 'তারপর আমরা দু'জন মিলে খুঁজে বের করব আসলে কেন কী হচ্ছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'উপায় নেই। ক্যাথির দায় আমার। সিআইএর অন্য কাউকে ওর ধারে-কাছে যেতে দেব না। ওর বাবা-মাকে কথা দিয়েছি, পৌঁছে দেব বাড়িতে।'

'কিন্তু ওর কাছে তো কোনও দরকারি কাগজই নেই। বেরোবে কী করে ইউএস ছেড়ে?'

‘পৌঁছে দেব কাছের ব্রিটিশ কনসুলেট-এ। এসে নিয়ে যাবেন ওর বাবা-মা।’

‘আর তারপর?’

‘তারপর? যারা শুরু করেছে এসব, তাদের খুঁজব।’

‘একা? ভাবছ ওটাই সমাধান? আরও খুন করবে?’

‘খুন করতে চাই না,’ বলল রানা, ‘কিন্তু যারা আমার প্রিয় কাউকে খুন করেছে, আমি নিজে বেঁচে থাকলে ওরা বাঁচবে না।’

‘লড়বে কতজনের সঙ্গে?’

‘সেটা জানি না।’

মাথা নাড়ল রেবেকা। ‘এরই ভেতর দুই পুলিশ খুনের জন্যে তোমাকে খুঁজছে কর্তৃপক্ষ। দোষীদের কাছে পৌঁছুবার আগে নিজেই খুন হবে। আমার কথা শোনো। আমি বড় অফিসারদের সঙ্গে কথা বলব। আমার কথা বিশ্বাস করবে তারা। ভুলো না, আমি তোমার একমাত্র অ্যালিবাই।’

‘আমার মতই মস্ত বিপদে আছ তুমি,’ বলল রানা।

‘ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বোঝাব, তোমাকে খুন করতে চাইছিল বলে বাধ্য হয়ে এজেন্টদেরকে খুন করেছ তুমি।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘কীভাবে প্রমাণ করবে, অপরাধী বলে নিজ দলের কোনও এজেন্টকে খুন করেছ?’

চুপ করে থাকল রেবেকা।

ক্যাথির দিকে ঘুরে তাকাল রানা। রাগী চেহারায় চুপচাপ মহাশূন্য দেখছে মেয়েটা। ‘অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে তোমাকে,’ ক্যাথিকে বলল রানা।

‘আমাকে? কেন?’

‘কারণ, সব জানতে হবে আমার। কোথায় রেখেছ ওস্ত্রাকা?’

নাক ফুলিয়ে বলল ক্যাথি, ‘কী সব আবোলতাবোল কথা!’

'ডাক্তার মাল্ডুন বলেছিল, স্মৃতি ফিরছে তোমার,' বলল রেবেকা। 'এখনও কিছু মনে পড়ছে না?'

চেহারা বিকৃত করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল ক্যাথি। 'আমি বাড়ি ফিরতে চাই।'

'কী করে জানলে তোমার কোনও বাড়ি আছে?' ওর কাছে জানতে চাইল রানা, 'তোমার না কিছুই মনে নেই?'

মুখ তুলে কড়া চোখে ওকে দেখল মেয়েটা। 'ফালতু কথা বাদ দিয়ে আমাকে একা থাকতে দাও।'

'তোমার জানা নেই, তোমাকে খুঁজতে গিয়ে কীসের মাঝ দিয়ে গেছি,' বলল রানা, 'জানো না, তোমার বদমায়েসির জন্যে খুন হয়েছে কতজন নিরীহ মানুষ!'

'অত কঠোর হয়ো না,' বলল রেবেকা, 'ওরও সময় ভাল কাটেনি।'

চুপ করে থাকল রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে চাপ দিতে চাই না, ক্যাথি।'

'গতকাল আরেকটু হলে ভেঙে দিতে আমার চোয়াল,' অভিযোগের সুরে বলল ক্যাথি।

'সেজন্যে দুঃখিত,' মেয়েটার বাহুতে হাত রাখল রানা। কাঁধের ব্যথায় ওর মনে হলো, খুন হয়ে গেছে।

সরে বসল ক্যাথি।

'এবার রওনা হওয়া উচিত,' বলল রেবেকা। 'সামনে পড়ে আছে আস্ত দিন।'

আগুন নিভিয়ে দিল ও।

সবুজ পাতা দিয়ে খরগোশের অবশিষ্টাংশ মুড়িয়ে নিজের ব্যাগে রাখল রানা।

মালপত্র গুছিয়ে নিল ওরা, তারপর বেরোল গুহা ছেড়ে।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কিছুটা নামতেই শীতল পানির এক ঝর্না দেখাল রেবেকা। মুখ-হাত ধুয়ে নিল ওরা।

অনেক উঁচু উত্তরদিকের পাহাড়। পায়ের কাছে জন্মেছে

মাইলের পর মাইল ফার ও স্প্রুস গাছ। ওই জঙ্গল এড়াতে ঘুর পথে চলল ওরা।

'এমন হতেই পারেঃ সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাঁটলাম, কিন্তু দেখলাম না বসতি,' মন্তব্য করল রেবেকা। 'আমেরিকার অন্যতম বড় স্টেট, জনসংখ্যা কম। আমাদের বোধহয় অনুচিত হয়েছে রাস্তা থেকে সরে যাওয়া।'

মাত্র কয়েক মাইল যাওয়ার পর মনে মনে বলল রানা, ঠিকই বলেছিল রেবেকা। বারকয়েক মাছির মত পোকার গুঞ্জন ছাড়া পরের কয়েক ঘণ্টায় মাত্র একটা বড় এল্‌ক্‌ দেখেছে ওরা। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা, ওদেরকে দেখে ভূতের মত হাওয়া হলো মুহূর্তে।

থেমে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবারও রওনা হলো ওরা। বনবন করে ঘুরছে রানার মাথা। কাঁধে অসহ্য ব্যথা। আরও কয়েক শ' গজ হাঁটার পর বাধ্য হয়ে আবারও বসল ও।

'তোমার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না,' বলল রেবেকা। 'এক কাজ করি, এখানে বসে বিশ্রাম নাও। আমি একা এগিয়ে যাই। দেখে আসি সামনের এলাকা। হয়তো পাব কোনও রাস্তা বা খামারবাড়ি। দু'তিন ঘণ্টার ভেতর ফিরব।'

আপত্তি করার পর্যায়ে নেই রানা। মৃদু মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে। সতর্ক থেকো।'

হাসল রেবেকা। 'ভেবো না, নিজের দেখভাল ভালই পারি।' পিস্তল পরীক্ষা করে দেখল, তারপর কয়েক ঢোক পানি খেয়ে রওনা হলো নীরবে।

প্রথমবারের মত রানা টের পেল, মেয়েটা চলে যাচ্ছে বলে কেমন যেন খারাপ লাগছে ওর।

'ওই মেয়ে অ্যামেটকে নিয়ে ফিরবে,' রেবেকাকে হেঁটে যেতে দেখছে ক্যাথি। 'ভুল করলে, মাসুদ রানা।'

কথাটা পাত্তা দিল না রানা। 'ওর ফিরতে সময় লাগবে।

এসো, বিশ্রাম নেয়ার মত জায়গা খুঁজে বের করি।'

আশপাশে কিছুক্ষণ খোঁজার পর ভেঙে পড়া এক স্প্রুস গাছ পেল ওরা। কাত হয়ে আছে ওটার কাণ্ড। মোটা একটা ডাল ধরে বলল রানা, 'টেনে নামাতে সাহায্য করো।'

'তাতে কী হবে?'

'আশ্রয় তৈরি হবে। খোলা জায়গায় বসতে পারবে না। আকাশ থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে আমাদেরকে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল ক্যাথি। 'ওরা আমাদেরকে খুঁজছে, তাই না?'

মাথা দোলাল রানা।

আরেকটা ডাল ধরল ক্যাথি। দু'জন মিলে টান দেয়ায় কড়-কড় শব্দে ভেঙে পড়ল গাছটা। মাটির ওপরে বড় এক ঝোপের মত ছাউনি তৈরি হলো। ভেতরে ঢুকলে আকাশ থেকে দেখবে না কেউ। পাতার বাড়ির মধ্যে ঢুকে ব্যাগে হেলান দিয়ে বসল রানা।

ওর পাশে ব্ল্যাঙ্কেট পেতে শুল ক্যাথি। মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'খুব ক্লান্ত। খুন হয়ে যাচ্ছি পায়ের ব্যথায়। আর মাটিতে কিলবিল করছে হাজার হাজার পোকা। জেসাস, কী যে খুশি হতাম গরম পানিতে গোসল করতে পারলে!'

চুপ করে থাকল রানা। কিছুক্ষণ বকবক করার পর ক্যাথি বুঝল, ওর কথা শুনতে বয়ে গেছে লোকটার। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলে কী যেন ভাবতে লাগল সে। সময় পার হচ্ছে নীরবে। কোডিন ব্যথা কমিয়ে দিলেও দপ-দপ করছে রানার কাঁধের ক্ষত। ঝিমাচ্ছে ও, কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ছে। জেগে উঠে দেখছে হাতঘড়ি। আধ ঘণ্টার বেশি চলে গেছে রেবেকা।

'আমার খুব খিদে লেগেছে,' নালিশের সুরে বলল ক্যাথি।

ব্যাগ খুলে পাতা দিয়ে মোড়ানো খরগোশের মাংস বের করল রানা। পাতা খুলে এগিয়ে দিল ক্যাথির দিকে। 'খেয়ে

নাও। তোমার খিদে লাগবে ভেবেই এত কষ্ট করে শিকার করেছিল রেবেকা।'

'যা-তা খাব না।'

'তোমার খিদে লাগেনি, তাই না?'

'মারা যাচ্ছি খিদেয়।'

'দেখে তা-ই মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

বিরক্তির চোখে খরগোশের মাংস দেখল ক্যাথি। চোখ তুলে তাকাল রানার চোখে। আবার দেখল মাংস। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিল ছোট এক টুকরো মাংস। মুখে ফেলল। পরের টুকরোটা হলো আরও বড়। দুই টুকরো খাবার পর গোগ্রাসে মাংস খেতে লাগল সে। কিন্তু একটু পর যখন বুঝল ওকে খেতে দেখছে রানা, ভয়ানক তিক্ত চেহারা করল। ভাব দেখে মনে হলো ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিস্বাদ জিনিসটা খাচ্ছে। একবার ভঙ্গি নিল, যে-কোনও সময়ে বমি করে দেবে। আনমনে হাসল রানা। পুরো রোস্ট শেষ করে আঙুল চাটতে লাগল ক্যাথি। ওর দিকে মদের ফ্লাস্ক বাড়িয়ে দিল রানা। নরম স্বরে বলল, 'বুঝলাম, কত কষ্ট করে খেতে হলো। এটা গিলে ওটাকে পাঠিয়ে দাও পাকস্থলীতে।'

ফ্লাস্কের ক্যাপ খুলে শুঁকে দেখল ক্যাথি। খুশিতে চকচক করছে চোখ। এক চুমুকে সাবড়ে দিল অর্ধেক আগুনে তরল। ফেরত দিল ফ্লাস্ক। দু'ঢোক নিল রানা। আবার ফেরত দিল ক্যাথির হাতে। ফ্লাস্ক প্রায় খালি করে ফেলল মেয়েটা।

সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়েও ওর দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'ধূমপান ধীরে ধীরে খুন করে।'

'গুড। ধীরে ধীরেই তো মরতে চাই, হঠাৎ আচমকা খুন হতে আপত্তি আছে আমার।'

বিষণ্ন হাসল ক্যাথি। 'দু'সপ্তাহের বেশি হার্ড ড্রিঙ্ক পাইনি। ভীষণ মাথা ঘুরবে।'

‘শেষ করে ফেলো,’ বলে সিগারেট ধরাল রানা।

স্কচ শেষ করে ক্যাপ আটকে ওর হাতে ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিল ক্যাথি। শুয়ে পড়ল ব্ল্যাঙ্কেটে। চেয়ে আছে পাতার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের দিকে। ‘ভাল লাগছে মুক্ত পরিবেশে। এত দিন মনে হয়েছে, কূপে আটকে রেখেছিল ওরা।’

‘পৌঁছে দেব তোমাকে বাড়িতে,’ বলল রানা।

‘আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছ। তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি।’

‘সব সমস্যা দূর হওয়ার পর ধন্যবাদ দিয়ো,’ আবার চোখ বুজল রানা। বারবার গরম লাগছে, আবার শীত। আসছে কাঁপিয়ে দেয়া জ্বর। কাঁধ থেকে বের করতে হবে বুলেট।

‘বুঝলাম না, কী করে আমার বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় হলো তোমার,’ বলল ক্যাথি।

‘তোমার বাবা আমার চাচার বন্ধু ছিলেন।’

‘ও। দেখতে তো তুমি দারুণ, তোমার কোনও গার্লফ্রেণ্ড নেই?’

মাথা নাড়ল রানা।

‘তুমি সমকামী নও তো?’

‘মনে তো হয় না।’

‘ভাল-ভাল।’ রানার আরও কাছে ঘেঁষল ক্যাথি। মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল চুল। ‘বলো তো, কতটা সময় লাগবে রেবেকার ফিরতে?’

‘রেবেকা? কয়েক ঘণ্টা।’

‘ভাল লাগছে তোমার সঙ্গে কথা বলে,’ বলল ক্যাথি।

‘আমারও।’

‘আমাদের উচিত আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে নিজেদের ভালভাবে চেনা।’

মাথার ওপর সূর্য। পাতার ফাঁক দিয়ে আসছে সোনালি

রোদ। একটু সরে সোনালি আলোয় উরু পাতল ক্যাথি। 'গরম হয়ে উঠছি।' খুলে ফেলল ভারী জাম্পার। ঊর্ধ্বাঙ্গে এখন মশারির মত পাতলা টপ। রানার দিকে ঝুঁকল ক্যাথির লোভনীয় সফেদ দুই স্তন। মিটমিট করে হাসছে মেয়েটা।

'খুলে গেছে ওটা,' আঙুল তুলে পাতার ভেতর সোনার ব্রেসলেট দেখাল রানা।

'শিট! সবসময় খুলে যায়।'

'আরও সতর্ক হওয়া উচিত,' বলল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে ওটা দামি।'

'পেয়েছি আমার বড় মার কাছ থেকে।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল রানা। চুপ করে ভাবছে কী যেন। একটু পর হঠাৎ বলল, 'সব দোষ ছিল উইস্কির।'

'হ্যাঁ, ওই জিনিস পেটে গেলেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠি,' বলল ক্যাথি। খিলখিল করে হাসল। 'আরও পেলে মন্দ হতো না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মদের কথা বলিনি। বলেছি উইস্কির কথা। গাড়ি চাপা পড়েছে। মারা গেছে।'

বিস্ফারিত হলো ক্যাথির দুই চোখ। আড়ষ্ট হয়ে গেছে মেয়েটা। 'কখন? কীভাবে?'

'যখন কোর্ফিউতে পার্টিতে ব্যস্ত ছিলে, তখন।'

'বাবার হারামজাদা বন্ধু আমাকে কিছুই বলেনি,' রেগে গিয়ে বলল ক্যাথি। এক সেকেণ্ড পর একহাতে চেপে ধরল মুখ। বুঝে গেছে, কী করে বসেছে।

'না, ওরা কিছু বলেনি, কারণ আসলে ওটা ঘটেনি,' বলল রানা। 'মিথ্যা বলেছি। ওই কুকুর ঠিকই আছে। তবে প্রমাণ হলো ফিরেছে তোমার স্মৃতি।'

লালচে হয়ে গেল ক্যাথির মুখ। 'জানি না কেন কুকুরটার কথা মনে পড়ল। আর কিছুই তো মনে নেই।'

শক্ত হাতে মেয়েটার কবজি ধরল রানা। ভুলে গেছে

কাঁধের ব্যথা। 'গ্রিসে তোমার বাবার বন্ধু যে হারামজাদা তা জেনেছি। মাংস তুমি খাও না। ব্রেসলেট তোমার বড় মা-র। ...ক্যাথি, বুঝে গেছি, ভান করছ, আসলে জানো সবকিছুই।'

ঝটকা দিয়ে কবজি ছুটিয়ে নিতে চাইল ক্যাথি। 'আমাকে ছেড়ে দাও!'

আরও শক্ত হাতে কবজি ধরল রানা। 'আপাতত নয়। জীবনে প্রথমবারের মত সত্যি বলতে হবে তোমাকে।'

বেয়াল্লিশ

খুব জোরে ঝটকা দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিল ক্যাথি। প্রায় ক্রল করে বেরোতে চাইল ঝোপের তলা থেকে। পিছু নিয়েছে রানা, খপ্ করে ধরল মেয়েটার গোড়ালি। কিন্তু পেছনে লাথি ছুঁড়ল ক্যাথি। ওর পা সরাসরি লাগল রানার আহত কাঁধে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে ধুলোর ভেতর পড়ল রানা। গাছের ছাউনি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইল ক্যাথি। পেছন থেকে ডাকল রানা, 'কোথায় যাচ্ছ? হারিয়ে গেলে মরবে!'

গাছের মাঝ দিয়ে দৌড়ে চলেছে ক্যাথি। দু'হাতে সরিয়ে দিচ্ছে ডালপালা। কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর আর্তচিৎকার করে উঠল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে কেউ।

রেবেকা ট্রিপলার। দীর্ঘ পথ হেঁটে লাল ওর গাল। চুলে শুকনো পাতার টুকরো। ঝর্না পেরোবার সময় ভিজে গেছে জিন্সের প্যান্ট। 'ক্যাথি! কোথায় যাচ্ছ?'

আহত কাঁধ চেপে ধরে ওদের কাছে পৌঁছুল রানা। কালো আগুনের ফুলকির মত জ্বলছে ওর চোখের মণি। 'মিথ্যা বলে

লাভ হবে না, ক্যাথি। সব খুলে বলো।'

বিস্মিত হয়েছে রেবেকা। 'তোমাদের কী হয়েছে? ... নিয়ে এসেছি ভাল খবর। সামনের টিলা পেরোলেই একটা খামারবাড়ি। মাত্র দুই মাইল দূরে।'

'স্মৃতি আগেই ফিরেছে ক্যাথির,' বলল রানা। 'গতকাল থেকে ভান করছে।'

এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্যাথি। হাঁটু গেড়ে বসল ধুলোর ভেতর।

কড়া চোখে ওকে দেখল রেবেকা। 'কথা ঠিক, ক্যাথি?'

'মিথ্যার ঝুলি বন্ধ করো,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'কোথায় ওসব ওস্ট্রাকা? কী হচ্ছে এসব? ওস্ট্রাকা দিয়ে কী করবে থর্ন আর ক্যাল অ্যামেট?'

'জানি না,' ফুঁপিয়ে উঠল ক্যাথি।

'সত্য না বলা পর্যন্ত কোথাও যাচ্ছ না,' বলল রানা।

'সত্যিই বলছি!' চিৎকার করল ক্যাথি। 'আমার জানা নেই ওসব কেন চায় ওরা। আমি শুধু ওটার কথা বলে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছি স্টিভ বার্কলেকে!'

'ওগুলো কোথায়?' রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে রানার। 'জবাব দাও! ঝামেলা থেকে বেরোতে ওগুলো লাগবে। ধরিয়ে দিতে হবে লোকগুলোকে।'

ঝড়ের বেগে ক'বার মাথা নাড়ল ক্যাথি। ধুলো ভরা মুখে চোখের পানি কাদা তৈরি করছে। আবারও ফুঁপিয়ে উঠল, 'বলতে পারব না কোথায় আছে।'

'কেন পারবে না?' কড়া কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'কারণ... কারণ... না... বলতে পারব না!' অঝোরে কাঁদছে ক্যাথি। কাঁপা আঙুলে খামচে ধরল দুই গাল।

পাশে গিয়ে ক্যাথির বাহুতে হাত রাখল রেবেকা। 'ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। সব খুলে বলো। ওস্ট্রাকার ব্যাপারে শোনার পর ওই খামারবাড়িতে

যাব আমরা। বড় অফিসাররা এলে আমাদের ওপর হামলা করতে পারবে না কেউ।'

চোখ মুছে ভয় নিয়ে রানার দিকে তাকাল ক্যাথি। ফুঁপিয়ে উঠছে। বুকের কাছে ঝুঁকে গেল মাথা।

'কী?' জানতে চাইল রানা, 'দেরি করছ কেন?'

'বলতে পারব না... কারণ... আসলে ওসব তো নেই।' কাঁধ আরও ঝুঁকে গেল ক্যাথির। 'আর কিছু বলার নেই। সত্যি! মিথ্যা বলছি না! এবার খুশি হয়েছ তোমরা?'

দু'সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল রানা, তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী বললে?'

পা ফাঁক করে বসল ক্যাথি। ফিসফিস করল, 'সব ছিল মিথ্যা। সবই মিথ্যা। কোনও প্রমাণ আমার হাতে ছিল না। সব বানিয়ে বলেছি।'

কথাগুলো শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না রানার। জানতে চাইল, 'কিন্তু পিছলা সিম্পসনের মাধ্যমে বার্কলের কাছে পটারির টুকরো পাঠাও। ওটা সত্যিকারের জিনিস। কার্বন ডেট করিয়ে দেখেছে বার্কলে।'

কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়ল ক্যাথি। 'কার্বন ডেট দেখেছে ঠিক। সত্যিই ওই টুকরো সেই সময়ের। ব্যস, আর কিছুই না। ওই জন্যেই তো ওটা ব্যবহার করেছি ব্ল্যাকমেইলে। যে কোনও স্কলার বুঝবে, গায়ের সব লেখা অর্থহীন। আমার কাছে ছিল মাত্র দু'একটা টুকরো। আসল জিনিসটা হয়তো ছিল হিব্রু রেসিপি বা হিসাবের বইয়ের অংশ।'

চুপচাপ ওর দিকে চেয়ে রইল রানা। প্রচণ্ড রাগ চেপে বসছে মাথায়। উধাও হয়েছে কাঁধের ব্যথা। নিচু স্বরে বলল, 'সব মিথ্যা?'

'স্টিভ বার্কলে ফাঁদে পা দেবে কি না, তা-ও জানতাম না,' হড়বড় করে বলল ক্যাথি। 'তুরস্কে খননের সময় হঠাৎ

একরাতে বুদ্ধিটা এল। মনে হলো মিথ্যা বলে লোকটার কাছ থেকে অনেক টাকা হাতিয়ে নিতে পারব। ওই লোক সর্বনাশ করেছে আমার। নইলে মিস ট্রুলির কাছ থেকে পেতাম বাকি জীবন চলার মত টাকা। কিন্তু পচা একটা বই লিখে আমাকে বিপদে ফেলল লোকটা। মিথ্যা বলার জায়গা পায় না! সেন্ট জন গেছেন তার সঙ্গে গপ্প মারতে! আমি কি গাধা?' লজ্জায় লালচে হলো ক্যাথির গাল। 'টাকা পাওয়ার কথা ছিল আমার, অথচ সব পেয়ে যাচ্ছে বার্কলে।'

'যা বললে, সব সত্যি?' বলল রানা, 'সেন্ট জন আর বুক অভ রেভেলেশন সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নেই তোমার কাছে?'

'মিথ্যা বলছি না,' মুখ গোঁজ করে বলল ক্যাথি।

রাগে কাঁপছে রানা। মনে পড়ছে মউরোসের হাসিমুখ। অন্তরের চোখে দেখল, বিস্ফোরণে উড়ে গেল ওর বন্ধু। 'জানা নেই, কিছু যায়ও আসে না, তবে তোমার জন্যে সর্বনাশ হয়েছে অনেক মানুষের। বোমার আঘাতে মরেছে। বাদই দিই তোমার বাবা-মার কথা। নরকে বাস করছেন তাঁরা। ...খুন হয়েছে থ্যানাটস, এটা জেনেই বা তোমার কী?' দ্বিগুণ হয়ে ফিরল ব্যথা। রানার মনে হলো, জ্বলন্ত লোহার শিক ঢুকছে কাঁধের মাংসে।

ভয়ের চোখে ওকে দেখল ক্যাথি। বুজে ফেলল চোখ। মুখে রা নেই।

'কোর্ফিউতে বোমা ফেটে মরেছে অনেকে, জানতেও চাও না,' বলল রানা। 'কিন্তু তাদের মৃত্যুর দায় তোমার ওপর বর্তায়। যে ডাক্তার ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে মরল, তার কথাও ভুলে যেয়ো। তোমার সঙ্গে মিশেছে বলে বাজে এক মোটেলে এখন পড়ে আছে উকিল সিম্পসন। চুরমার করে দেয়া হয়েছে ওর দুই পায়ের হাড়। এসব হয়েছে, কারণ অন্যায় সুবিধা আদায় করতে গিয়ে তুমি বলেছ জঘন্য মিথ্যা।' ব্যথায় হাঁফিয়ে উঠল রানা। 'সবসময় মেয়েদেরকে

ছেলেদের সমান সম্মান দিয়েছি। কিন্তু তুমি যদি ছেলে হতে, ক্যাথি, স্রেফ পিটিয়ে খুন করতাম তোমাকে! জানোও না কী সর্বনাশ করেছ কতজনের! শুধু জানো নিজ স্বার্থ সিদ্ধির কূট কৌশল!'

নীরবতা নামল।

চুপ করে আছে ক্যাথি। ফুঁপিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় নড়ছে গাছের পাতা। অনেক ওপরের আকাশ থেকে এল শকুনের কর্কশ ডাক।

আরও কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল রেবেকা, 'তা হলে এবার কী করা উচিত আমাদের?'

জবাব দিল না কেউ।

গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে রানার। মনে হলো ক্লান্তিতে পড়ে যাবে মাটিতে। আবার ভিজে গেছে বামহাত। আঙুল থেকে টপটপ করে জঙ্গলের মাটিতে পড়ছে রক্ত। খেয়াল করেছে রেবেকা। চোখে ফুটে উঠল দুশ্চিন্তা।

দূর থেকে এল চাপা ধুপ-ধুপ শব্দ। মুখ তুলে তাকাল রানা। বহু দূরাকাশে দেখা দিয়েছে একটা বিন্দু। ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে ওটা।

'হেলিকপ্টার,' বলল রেবেকা। 'বোধহয় ওদের।'

'চলো, লুকাতে হবে,' বলল রানা। হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে ক্যাথিকে ঘুরিয়ে নিল ও। টলতে টলতে ঢুকল কাছের ঝোপে। ওর পিছু নিয়েছে রেবেকা। বসে পড়ল ওরা ঝোপের ভেতর। খুব কাছে বসেছে বলে রেবেকার চুলের সুবাস পেল রানা। ছুঁয়ে গেল দু'জনের হাত। টনটনে ব্যথা সহ্য করছে, তবুও মেয়েটা ওর পাশে আছে বলে ভাল লাগল রানার।

আকাশ-বাতাস ভরে উঠল হেলিকপ্টারের আওয়াজে। মাথার ওপর দিয়ে দূরে চলে গেল ওটা।

বড় করে শ্বাস ফেলল রেবেকা। 'রানা, তোমার কি মনে হয় ওই জিপ পেয়ে গেছে ওরা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না। সার্চ করবে পুরো এলাকা। আমি হলে তাই করতাম।'

'অ্যামেট ডেকে নেবে অন্তত পঞ্চাশজন এজেন্ট,' বলল রেবেকা।

মিলিয়ে গেল হেলিকপ্টারের সব আওয়াজ।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার রওনা হওয়া উচিত।'

তেতাল্লিশ

ভীষণ ক্লান্তিকর দুই মাইল কখনও ফুরাবে না, মারা পড়বে ও, টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে রানা। প্রতি পদক্ষেপে শেষ হয়ে আসছে শক্তি।

পথ দেখাচ্ছে রেবেকা। রানার ব্যাগ ওর হাতে। বারবার থামছে, সাহায্য করছে কঠিন জমিতে রানাকে এগোতে। নীরবে তিরিশ গজ পেছনে আসছে ক্যাথি। চেহারা ফ্যাকাসে। সাহস নেই রানার চোখে চোখ রাখবে। পাহাড়ি শেষ ঢালে জন্মেছে অসংখ্য পাইন গাছ। তার মাঝ দিয়ে নেমে চলেছে ওরা। সামনেই নদী।

'নদীটা পেরোতে হবে,' বলল রেবেকা। 'খুব খরস্রোতা, কিন্তু অগভীর।' রানার হাত ধরে পানিতে নেমে পড়ল ও।

কিছুটা যাওয়ার পর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রানা। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি থরথর করে কাঁপিয়ে দিল ওর সর্বাঙ্গ। দুই হাতে রানাকে টেনে তুলল রেবেকা। নরম সুরে বলল, 'আর মাত্র কয়েক ফুট।'

মুখ তুলে ওর নিশ্চয়তার মিষ্টি হাসি দেখল রানা। ভীষণ

ঘুরছে মাথা। দাঁতে দাঁত চেপে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। নদী পেরিয়ে শুয়ে পড়ল পাথুরে তীরে। কয়েক মিনিট পর এদিকের তীরে উঠল ক্যাথি। মানসিক জোর খাটিয়ে আবারও উঠে দাঁড়াল রানা। হেঁটে চলল। নদী-তীর থেকে খাড়া হয়ে উঠেছে জমি। কিছুক্ষণ পর উঁচু এক জায়গায় পৌঁছুল ওরা। ব্যাগ থেকে বিনোকিউলার নিয়ে নিচের উপত্যকা দেখল রেবেকা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'ওই যে খামারবাড়ি!'

ব্যথা ও ক্লান্তি সত্ত্বেও চমৎকার এক দৃশ্য দেখছে রানা। মাইলের পর মাইল জুড়ে খোলা প্রেয়ারি। শেষ দুপুরের সূর্যের সোনালি আলোয় বহু দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঝিকঝিক করছে সফেদ বরফ। রানার হাতে বিনোকিউলার দিল রেবেকা। ওটা চোখে তুলে একমাইল দূরে দুলন্ত ঘাসের ওদিকে খামারবাড়িটা দেখল রানা। পাহাড়ি এলাকায় ছোট্ট ফার্ম। কয়েকটা বার্ন, ওখানে সাদা রঙ করা বেড়ার ওপাশে কিছু ঘোড়া।

'কাউকে দেখছি না,' বলল রানা। 'চিমনিতে ধোঁয়াও নেই।'

'চলো, গিয়ে দেখি,' বলল রেবেকা।

ধীর পায়ে খামারবাড়ি পর্যন্ত যেতে রানার লাগল পৌনে একঘণ্টা। গেট পেরিয়ে ধুলোময় পথ মাড়িয়ে আউটবিল্ডিঙের কাছে পৌঁছুল ওরা। একটা খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রানা। বাড়ির দিকে চলেছে রেবেকা। বোর্ড দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে বাড়ির একটা জানালা। নিচে ইঁট দিয়ে মেরামত করা বারান্দার মেঝে ঘুণে খাওয়া।

দরজায় থাবা চালাল রেবেকা। 'হ্যালো? কেউ আছেন?'

জবাব দিল না কেউ। বারান্দা থেকে নেমে জানালা দিয়ে উঁকি দিল ও। ঘুরে তাকাল রানার দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল। 'মনে তো হয় না কেউ আছে!'

মাথার ওপর আগুন ঢালছে সূর্য। কপালে হাত রেখে চারপাশ দেখছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল দেহটা।

এক শ' গজ দূরে ঘাসের ভেতর ঘোড়ার খোঁয়াড়ের কাছে পড়ে আছে বৃদ্ধ। রানা টলতে টলতে ওদিকে রওনা হতেই ওর সঙ্গী হলো রেবেকা। একটু পর শিথিল দেহটার পাশে বসল ওরা। বৃদ্ধের পরনে পুরনো জিন্সের প্যান্ট। শার্টটা লাল চেক দেয়া। পাল্‌স্‌ দেখল রেবেকা। 'বেঁচে আছে।'

কাছের খোঁয়াড় থেকে বালতিভরা পানি আনল রানা। বরফ ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিল মানুষটার মুখে। গুঙিয়ে উঠল বৃদ্ধ। চোখ পিটপিট করে উঠে বসতে চাইল। মাথার চুল ও দাড়ি পেকে শন। রোদে পোড়া পাকা চামড়ার মতই তামাটে ত্বক। ব্যথায় কুঁচকে ফেলল গাল। চেপে ধরল একটা গোড়ালি। ওটা ফোলা, দেখল রানা।

'আছাড় মেরে নিচে ফেলেছে,' আঙুল তাক করে তরুণ এক ঘোড়া দেখাল বৃদ্ধ। একটু দূরে নিশ্চিন্তে ঘাস চিবুচ্ছে ওটা। এখনও লম্বা দড়িতে বাঁধা।

কড়া রোদে জ্বলছে চারপাশ।

'ভাববেন না, এবার রোদ থেকে আপনাকে সরিয়ে নেব,' বৃদ্ধকে বলল রেবেকা।

দশ মিনিট পর রেবেকা ও রানার সাহায্য নিয়ে লচকে যাওয়া বারান্দায় উঠল বৃদ্ধ। বাড়ির ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা পরিবেশ। প্রায় অন্ধকার এক প্যাসেজ পেরোলে সিটিং রুম। দেয়াল থেকে খসে আসছে ওঅলপেপার। একপাশে নিচু কাউচ, পঞ্চাশ দশকের। ওটার ওপর বৃদ্ধকে শুইয়ে দিল রানা ও রেবেকা। কপাল থেকে ঘাম মুছল রানা। গুটিয়ে তুলতে লাগল বৃদ্ধের প্যান্টের পায়া।

'বাজেভাবে মচকে গেছে, তবে ফাটল ধরেনি,' ঝুঁকে দেখল রেবেকা।

'কপাল ভাল যে তোমরা এসেছিলে,' বলল বৃদ্ধ, 'এদিকে

প্রায় কেউই আসে না।' চামড়া কুঁচকে যাওয়া চোখে দেখল রানার রক্তাক্ত শার্ট। 'নামটা আমার বার্টন ক্যাসল।'

'আমি মাসুদ রানা। ও রেবেকা ট্রিপলার।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে ক্যাথি। দূর থেকে দেখছে রানা, রেবেকা ও বৃদ্ধকে।

'ওই মেয়ের নাম কী?' জানতে চাইল ক্যাসল। 'ওর কি নাম বলতে কিছু নেই?'

'আছে,' বলল রানা। 'ওর নামঃ সত্যিকারের মহাবিপদ।' সাবধানে বুড়োর বুট খুলল ও। 'উঠানে দেখলাম অনেক কমফ্রি। জানেন, ওগুলো দিয়ে কীভাবে মলম তৈরি করতে হয়? ব্যথা কমবে, ফোলাও।'

'লাগবে না,' বলল বৃদ্ধ। 'কিচেনের তাক ভরা সব জার রেখেছে গোল্ডেন সান। সব রেড ইণ্ডিয়ান মলম। কাজও করে জাদুর মত।'

'গোল্ডেন সান কে?'

'খামারে আমাকে সাহায্য করে। দু'দিন আগে বদমাস এক ষাঁড়ের পেছনে গেছে। তারপর আর ফেরার নাম নেই।'

'দেখি দরকারি জার পাই কি না,' কিচেনের দিকে চলল রেবেকা। পিছু নিল ক্যাথি।

সতর্ক চোখে রানাকে দেখল বৃদ্ধ। 'তুমি কিন্তু, বাছা, রাস্তা থেকে বহু দূরে সরে গেছ। বুঝতে পারছি, ঘুরতে বেরোওনি।'

'ঠিকই ধরেছেন,' বলল রানা।

'আর আমার ভুল না হলে তোমাকে খুঁজতেই এসেছিল ওই হেলিকপ্টার। সরকারী লোকজন পছন্দ করি না আমি।'

'ওরা ছিল সিআইএর,' বলল রানা, 'খুঁজছে আমাদের তিনজনকে।'

'তোমাদেরকে খারাপ মানুষ বলে মনে হচ্ছে না,' বলল বার্টন ক্যাসল। 'আমার ক্ষতি করলে বা লুঠপাট করলে

আগেই করতে। জানি না কীসে জড়িয়ে গেছ, আর জানতেও চাই না। যত কম জানব, ততই কম বলতে পারব। কে কেমন, সেটা দেখেই তাকে বিচার করি।' মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'ওই হেলিকপ্টারে নরকের কীটের মত লোকটা অনেক নেমে এসেছিল। পরিষ্কার দেখেছে পড়ে আছি ঘাসের ভেতর। তাকে মজা পেয়ে হাসতে দেখেছি। সাহায্য না করে চলে গেছে। আজ একটু আগে তোমরা না এলে, আগামীকাল সকালেও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারতাম না। বুঝতেই পারছ, কোনও দলে যোগ দিতে হলে, ওই কুকুরের পক্ষে যাব না আমি।'

বড় এক সবুজ মলমের জার হাতে ঘরে ঢুকল রেবেকা। ওটা খুলে পরখ করল রানা। 'হ্যাঁ, কমফ্রি। এবার ব্যথা আর ফোলা কমবে।' মলম নিয়ে বৃদ্ধের আহত গোড়ালিতে মাখল ও। কাজটা শেষ করে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নাড়ল পা-টা। রেবেকার আনা টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দিল গোড়ালি। 'ঠিক আছে, আপাতত কয়েক দিন বিশ্রাম নিতে হবে।'

'তোমাকেও তো, বাছা, সুস্থ লাগছে না,' বলল বৃদ্ধ। 'আগেও গুলির ক্ষত দেখেছি।'

চরকির মত বনবন ঘুরছে রানার মাথা। জোর করে হাসল। 'না, ঠিক আছি।'

চিন্তিত চোখে ওকে দেখছে রেবেকা। চলে এল ওর পাশে। ঠিক তখনই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল রানা।

চুয়াল্লিশ

একটু পর পর সচেতন হয়ে আবারও জ্ঞান হারাচ্ছে রানা। এটা ঘটছে বারবার। একবার ফিরছে আলোময় জগতে, আবারও তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে, চিরকাল ধরেই চলছে এমন। একবার শুনছে কণ্ঠস্বর, দেখছে নড়াচড়া, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে সব।

আবছা মনে আছে, উঠে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে। ওর কাঁধ ছিল রেবেকার ঘাড়ে। ঢুকল একটা ঘরে। শুইয়ে দিল রেবেকা ওকে বিছানায়। টানটান ছিল সুতি চাদর। ভিজে গেল তাজা রক্তে। ওর ওপর ঝুঁকে এল রেবেকা। গভীর কালো চোখে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। আবারও চেতনা হারাল ও।

তবে এবার জ্ঞান ফিরে দেখছে, ও আছে অচেনা এক ঘরে। কাঠের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আসছে ভোরের লালচে আলো।

কিছুক্ষণ পর বালিশ থেকে মাথা তুলতে চাইল রানা।

কাজটা কঠিন।

কাঁধে নতুন ব্যাণ্ডেজ। ব্যথা আছে, কিন্তু তীব্র নয়।

বড় কোনও ঘরে আছে। নিচতলার মত নয়। সব পরিষ্কার। তকতকে। ব্যবহার করা হয় না এই ঘর। শুয়ে আছে তামার ফ্রেমের ডাবল খাটে। কারুকাজ করা বেড কাভার। ঘরের কোণে বেসিন। খাটের পাশে কাঠের রকিং চেয়ার। ওটার ওপর রাখা ওর কাপড়চোপড়। নতুন নীল ডেনিম শার্ট ও পরিষ্কার জিন্স প্যান্ট।

রানার পাশে অগোছালো হয়ে ঘুমিয়ে আছে রেবেকা। বেড কাভারে ছড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল। একটা হাত রানার ঊরুর ওপর। আনমনে ভাবল রানা, না জানি কত ঘণ্টা সেবা করে তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা!

নড়ে উঠল রেবেকা। চোখ মেলে সরাসরি তাকাল রানার চোখে। ঝট করে জেগে এভাবে সতর্ক হয় শুধু বুনো প্রাণী ও ট্রেইণ্ড পারসোনেল। হাই তুলে ধীরেসুস্থে জেগে ওঠা আর সতর্ক হওয়ার মাঝের সময়টা রেবেকার নেই। এখন নেই ওর সেই উলের জাম্পার। পরনে ফার্মের লাল চেক দেয়া শার্ট। ওটা অনেক বড় ওর তুলনায়। গিঁঠ মেরে নিয়েছে কোমরে।

'জীবিত জগতে স্বাগতম,' মিষ্টি হাসল রেবেকা।

'কাজটা তুমি করেছ?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'গভীরে যেতে হয়েছে, তবে বেরিয়ে এসেছে। হাড়ে লাগেনি বুলেট। একটু চ্যাপ্টা হয়েছে, তবে ফেটে ছড়িয়ে যায়নি।' বেডসাইড টেবিল থেকে ছোট একটা টিনের কাপ নিয়ে নাড়ল রেবেকা।

কাপ নিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। একটু চেপ্টে যাওয়া ছোট্ট বুলেট রীতিমত নিরীহ দেখাল। 'দু'বার প্রাণ বাঁচালে,' বলল রানা।

ওর হাত থেকে কাপ নিয়ে টেবিলে রাখল রেবেকা। ঠাণ্ডা হাতে স্পর্শ করল রানার কপাল। 'এখনও বেশ জ্বর। শুয়ে থাকো।'

বালিশে মাথা এলিয়ে দিল রানা। 'সরে যেতে হবে এখান থেকে।'

'আপাতত ক'দিন সেটা সম্ভব নয়। বার্টন ক্যাসল বলেছেন, আমরা যত দিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পারি।'

'কেমন আছেন উনি?'

'ঘুমুচ্ছেন। ঠিক হয়ে যাবেন।' হাসল রেবেকা। 'ওঁর ধারণা, আমরা বিবাহিত।'

‘ক্যাথি কোথায়?’

‘নিচের একটা ঘরে। খুব ক্লান্ত। ওর ওপর চাপ তৈরি করা ঠিক হবে না তোমার।’

‘সম্ভব হলে ওকে খুন করতাম।’

‘খুব লজ্জিত মনে হলো।’

‘লজ্জায় মুখ ঢাকা উচিত ওর।’

রানার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে রেবেকা। চোখের কাছ থেকে সরিয়ে দিল চুল। বাইরে বাড়ছে রোদ। দূরে চিঁহি-চিঁহি শব্দে ডাকল কয়েকটা ঘোড়া। পাল্টা চিৎকার ছাড়ল একটা কুকুর। ‘গিয়ে জন্তুগুলোকে খাবার দেব,’ বলল রেবেকা। ‘আপাতত উঠতে পারবেন না ক্যাসল।’

‘একটু অপেক্ষা করো।’

মৃদু হাসল রেবেকা। ‘ঠিক আছে।’

চুপ করে বসে থাকল ওরা। কিছুক্ষণ পর বলল রেবেকা, ‘তুমি অনেক স্বপ্ন দেখো। গতরাতে জ্বরের ভেতর প্রলাপ বকছিলে।’

‘তাই?’

মাথা দোলাল মেয়েটা। ‘ঘুমের ভেতরেও। তোমার জীবনে এসেছে কিছু মেয়ে। কেউ কেউ মারা গেছে। তাদের একজনের নাম ছিল লুবনা, আরেকজন রেবেকা সাউল। কেউ কেউ হারিয়ে গেছে ভুল বুঝে। ...বলবে, আসলে কেমন তোমার জীবনটা?’

চুপ করে থাকল রানা।

একটু পর নরম সুরে বলল রেবেকা, ‘গতকাল পোশাক খুলে তোমাকে শুইয়ে দিয়েছি বিছানায়। বের করেছি কাঁধ থেকে বুলেট। রক্তে ভিজে গিয়েছিল হাত। ক্ষতটা সেলাই শেষে ব্যাণ্ডেজ করেছি। স্নান করিয়ে পাশে বসে শরীর থেকে মুছে দিয়েছি ঘাম। জেগে ছিলাম প্রায় সারারাত। শুনেছি তোমার মনের গভীর দুঃখের সব কথা। কিন্তু তখন ছিলে প্রায়

অচেতন। এখন তা নও। যদি বলতে চাও কিছু, মন দিয়ে শুনব।'

'অনেক কথা যে,' বলল রানা। 'বলতে গেলে দিনের পর দিন লাগবে।'

'আমরা তো এখান থেকে সরে যেতে পারব না। বলতে শুরু করতে পারো।'

'আমার জীবনে ঘটেছে অনেক খারাপ ঘটনা।'

'সবার জীবনেই দুঃখজনক সব ঘটনা থাকে।'

'তা ঠিক।'

'জ্যাঁ মউরোস মারা গেছে, সেটা তোমার দোষে নয়,' বলল রেবেকা, 'নিজেকে দোষ দিয়ে চলেছ, এটা অযৌক্তিক। জানতে না কী ঘটবে। তুমি শুধু চেয়েছিলে তোমার বন্ধুকে সাহায্য করতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

'কী?' রানার চোখে তাকাল রেবেকা। 'নিজের ওপর দোষ টেনে এনো না। দায় তোমার ছিল না।'

বিড়বিড় করল রানা, 'ঘোড়াগুলোকে খেতে দেবে না? ...বাইরে কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না। আবার ফিরতে পারে হেলিকপ্টার।'

মৃদু হাসল রেবেকা। 'এত সহজে হাল ছাড়ার মেয়ে আমি নই।'

ওকে দেখল রানা। 'হয়তো ঠিকই বলেছ। দোষটা আমার ছিল না।' আবার চুপ করে গেল ও।

'কিন্তু আরও কিছু কথা আছে তোমার, বলে ফেলো।'

চোখ বুজল রানা।

'বললে একটু হালকা হবে বুক।'

কিছুক্ষণ পর ফিসফিস করল রানা, 'কিছু করতে হবে মউরোসের স্ত্রী আর ওর অনাগত বাচ্চার জন্যে। ...আর প্রতিশোধ নিতে হবে। ওদের জন্যে না হলেও, আমার নিজের

জন্যে। মউরোসের খুনিদের কেউ যেন না থাকে পৃথিবীর বুকে!'

পঁয়তাল্লিশ

তিল তিল করে পেরোচ্ছে সকাল। রানা টের পাচ্ছে, বেশ দ্রুতই ফিরছে ওর শক্তি। তাতেও হয়ে উঠছে অধৈর্য। নিজেকে সামলে গত ক'দিনের প্রতিটি ঘটনা মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

বারবার মনে পড়ছে থর্নের কথা।

লোকটা কে?

এজেন্ট নয়।

পুলিশও না।

ক্যাল অ্যামেটের মত যোদ্ধা নয়।

তবে নেতা সে।

সংগঠক।

মগজ খাটিয়ে চলে লোকটা।

হাতে আছে যা খুশি করার মত ক্ষমতা।

হয়তো কোনও রাজনৈতিক নেতা।

কিন্তু নামকরা কেউ নয়।

রেবেকা তার নাম কখনও শোনেনি।

এমন কেউ, যে কি না থাকে আড়ালে ছায়ার ভেতর।

স্টিভ বার্কলের বিষয়ে আগ্রহ আছে তার। ভাবছে, ক্যাথির ওস্ট্রাকা প্রকাশিত হলে ক্ষতি হবে তার।

ধর্ম আর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বার্কলে। চাইছে গভর্নর

হতে। এখনও হয়নি বড় নেতা। কিন্তু তার চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী কেউ টের পেয়েছে, বার্কলের ব্ল্যাকমেইলারের কারণে ক্ষতি হবে তার। ওই লোক নির্দেশ দিয়েছে বলে নোংরা সব অপরাধে নেমে পড়েছে থর্ন। প্রয়োজনে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করছে না।

কিন্তু রানার অন্তর বলছে, এসবের মধ্যে অন্যকিছু আছে। শুধু ক্ষমতার জোরে সিআইএর এজেন্টদের কাজে লাগাতে পারত না ওই লোক বা থর্ন। আরও বড় কিছু ঘটছে।

ভাবতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল রানা। কিন্তু অনেকক্ষণ পর আর সহ্য হলো না, বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। টলমল করছে ওর পা। ঘুরছে মাথা। তবে আগের চেয়ে জোর ফিরেছে শরীরে। পরনে একটা হাফপ্যান্ট। ওটা একবার দেখে নিয়ে বুকের দিকে তাকাল রানা। শক্ত করে বুক ও কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে রেবেকা।

জানালার সামনে গিয়ে থামল রানা। খামারের অন্য দালান ও খোঁয়াড় দেখছে। প্রেয়ারির বহু দূরে আকাশছোঁয়া নীল পাহাড়। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার খামারের ভেতরে চোখ বোলাল রানা। একটা বার্নের পাশে জং-ধরা প্রাচীন এক ফোর্ড পিকআপ ট্রাক। কিছুক্ষণ ওটা দেখার পর আনমনে মাথা দোলাল ও।

বেসিনের সামনে গিয়ে পানি ছিটিয়ে ভালভাবে ধুলো মুখ-হাত। ফিরে এল বিছানার পাশে, চেয়ার থেকে নিল জিন্সের প্যান্ট। ওটা নতুন। বত্রিশ ইঞ্চি কোমরের লোক ক্যাসল, তাঁর হতে পারে না। রানার দেরি হলো না প্যান্ট পরে নিতে। যেন ওর জন্যেই তৈরি। বোধহয় গোল্ডেন সানের। তার কথা বলেছিলেন ক্যাসল। ডেনিম শার্ট পরে নিল রানা।

নিচতলা থেকে আসছে কফির সুবাস।

নিচে নড়াচড়া করছে কেউ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিল রানা, তারপর

চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। কয়েক সেকেণ্ড পর ঢুকল বড়সড় কিচেনে। প্রকাণ্ড এক সিলিণ্ডারের গ্যাস ব্যবহার করে চুলায় কী যেন রাঁধছে রেবেকা। তুবড়ে যাওয়া এক প্যানে চিড়বিড় আওয়াজ তুলছে ভেড়ার মাংস।

রানা ঘরে ঢুকতেই অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল রেবেকা। ‘আরে, উঠে পড়েছ? আমি খাবার নিয়ে ওপরে যাচ্ছিলাম।’

‘বলো তো, ইউএসএর কোন্ রাজনৈতিক নেতা বাইবেল ব্যবহার করে ক্ষমতায় যেতে চাইছে?’ জানতে চাইল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে ওকে দেখল রেবেকা, তারপর বলল, ‘প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিল, স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন ইরাকে হামলা করতে।’

‘ওই অপদার্থের কথা বাদ। ঈশ্বরের লেজ ধরে প্রেসিডেন্ট হতে চাইছে কে?’

‘রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে চাইছে হাজার হাজার খ্রিস্টান নেতা,’ বলল রেবেকা, ‘কেউ কেউ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তবে আপাতত মনে পড়ছে না কারও নাম। কেন, হঠাৎ করে এই চিন্তা এল কেন তোমার মনে?’

‘না, বোধহয় ভুলই ভাবছি।’

‘তোমার তো শুয়ে থাকার কথা। বিশ্রাম নেয়া উচিত।’

‘অনেকটা শক্তি ফিরেছে।’

‘দেখে অবশ্য তা-ই মনে হচ্ছে। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে দুর্বল হবে। ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।’

‘এখন শোব না। বাইরে দেখেছি একটা পিকআপ ট্রাক। পুরনো। কিন্তু চালু হলে ওটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে যেতে পারব। ওটার যা দাম, তার দ্বিগুণ দেব মিস্টার ক্যাসলকে। পরে ভাল একটা কিনে নেবেন।’

‘শুনে ভালই লাগে, কিন্তু ওটা নিয়ে কোথাও যেতে পারব না,’ বলল রেবেকা। ‘চালু করতে গিয়ে টের পেয়েছি, ব্যাটারি ঠিক থাকলেও ওটার স্টার্টার মোটর নেই।’

'এসপিয়োনাজ এজেন্ট, ডাক্তার, গাড়ির মিস্ত্রী আর রূপবতী, গুণী মেয়ে— একইসঙ্গে এত কিছু!' হাসল রানা।

'কফিটাও খুব খারাপ বানাই না। খাবে এক কাপ?'

'ছাড়ে কে!' রেবেকার কাছ থেকে কফির মগ নিয়ে সাবধানে চুমুক দিল রানা। চমৎকার স্বাদ।

'খালি পেটে কফি খেয়ো না, তোমার জন্যে ফ্রেঞ্চ টোস্ট করেছি। আরও পাবে ভেড়ার ভাজা মাংস আর সেদ্ধ মটরশুঁটি।' রানার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে মুচকি হাসল রেবেকা। 'আগে কখনও ভদ্রমহিলা দেখোনি? ওই যে, যাদেরকে তোমরা বলো মা, বোন, প্রেমিকা, স্ত্রী বা মহিলা আত্মীয়স্বজন? ওই যে, যাদেরকে ছোট না করলে মোটেও ভাল লাগে না বেশিরভাগ পুরুষের?'

চুপচাপ চেয়ার টেনে বসে পড়ল হতবাক রানা। দু'মিনিট পর ওর সামনে নাজেল হলো স্তূপ করা দারুণ গন্ধের সুস্বাদু খাবার। খেতে গিয়ে মনে পড়ল ক্যাথির কথা। কণ্ঠ থেকে তিক্ততা সরাতে পারল না। 'কোথায় আমাদের মহারানি?'

'ঠিক করেছে ঘর থেকে বেরোবে না।'

'মিস্টার ক্যাসল?'

'তোমার মতই গোঁয়ার,' বলল রেবেকা। 'লেংচে লেংচে গিয়ে জন্তুগুলোকে খাবার দিচ্ছেন। বুড়ো কঠিন চিড়িয়া। আমাকে বলেছেন, আগে একসময়ে মেরিন ছিলেন।'

'ভিয়েতনাম?'

'কোরিয়া,' খসখসে কণ্ঠে বলল কেউ। ঘুরে তাকাল ওরা। দরজা খুলে এইমাত্র খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিচেনে ঢুকেছেন ক্যাসল। টেবিলের পাশে লাঠি রেখে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তাঁর সামনে খাবারের প্লেট রাখল রেবেকা। বিড়বিড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন বৃদ্ধ, তারপর খেতে লাগলেন গোগ্রাসে। চুপচাপ খাচ্ছে ওরা তিনজন। একটু পর বার্নের কাছে পুরনো পিকআপ ট্রাকের কথা তুলল

রানা।

'চালু হলে তোমাকে দিয়ে দেব,' বললেন ক্যাসল। 'বুঝলে, একটা পুরনো ছাউনির নিচে তারপুলিন দিয়ে ঢাকা আরেকটা ট্রাক পাবে। ইঞ্জিন নষ্ট। তবে কাজ করবে বোধহয় ওটার স্টার্টার মোটর। চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'চেষ্টা অবশ্যই করব,' বলল রানা।

রেবেকার দিকে তাকালেন ক্যাসল। 'অ্যাই, মেয়ে, তুমি কি বুলেট বের করেছ এই ছোকরার কাঁধ থেকে?'

মৃদু মাথা দোলাল রেবেকা। 'পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি।'

মাথা দোলালেন ক্যাসল। 'গুড। তা হলে ওদিকের ওই তাক থেকে সবুজ বোতলটা নাও।'

'ওটা দিয়ে কী হবে?' জানতে চাইল রানা।

'জাদুর মত কাজ করবে,' বললেন ক্যাসল। 'ইণ্ডিয়ান মলম। দেখবে দু'দিনে সেরে যাবে ঘা।'

রানার দিকে তাকাল রেবেকা। মাথা দোলাল রানা।

গিয়ে ওপরের তাক থেকে সবুজ বোতল এনে ছিপি খুলল রেবেকা। কুঁচকে গেল নাক বিটকেলে গন্ধে।

'গন্ধটা গুয়ের মত হলেও ফুলের নির্যাস দিয়ে তৈরি,' ভরসা দিলেন ক্যাসল।

রানার কাঁধের ব্যাণ্ডেজ খুলল রেবেকা। আঙুলে মলম নিয়ে মাখিয়ে দিল ক্ষতের ওপর। আবার করে দিল ব্যাণ্ডেজ।

'ঠিক দু'দিনে দেখবে ঠিক হয়ে গেছ,' বললেন ক্যাসল।

'বেচারা নাকটাকে দূরে রেখে এলে বুঝি ভাল ছিল,' বিড়বিড় করল রানা।

পাশের কাবার্ড থেকে একটা বোতল নিলেন ক্যাসল। বোতলের ভেতরে স্বচ্ছ তরল। 'খাওয়ার পর একটু ড্রিঙ্ক না নিলে চলে না। নেবে নাকি দু'এক পেগ?' রানা বা রেবেকা হাঁ বা না বলার আগেই তিনটে মগে পানির মত জিনিসটা

ঢাললেন তিনি। মগ বাড়িয়ে দিলেন ওদের সামনে। 'খুবই ভাল জিনিস। আমি নিজেই ডিসটিল করেছি।'

মগ তুলে চুমুক দিল রানা। বুঝে গেল, স্কচ উইস্কির অন্তত দ্বিগুণ তাকদ ওটার। 'পটিনের কথা মনে করিয়ে দিল। আইরিস মুনশাইন।'

'এক লোককে চিনতাম, উনসত্তর সালে ডজ জিপ চালাত ওই জিনিস দিয়ে,' বিড়বিড় করলেন ক্যাসল।

বৃদ্ধকে দেখছে রানা। কঠোর লোক উনি, কিন্তু অন্তরটা পরিষ্কার। 'আমাদেরকে থাকতে দিয়েছেন বলে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ,' বলল ও। 'ছেড়ে দিয়েছেন নিজের বেডরুম। সেজন্যে লজ্জিত বোধ করছি। আমাকে বার্নে থাকতে দিলেও হতো।'

থুতনির শনের মত পাকা দাড়ি খামচে ধরে চুলকে নিলেন ক্যাসল। দুঃখিত হেসে বললেন, 'ওই ঘর শেরির। এখন আর ওখানে থাকি না। ও বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতো যে তোমরা ওখানে থাকছ।'

রেবেকা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকাল। চুপ করে থাকল। কয়েক সেকেণ্ড পর কড়াৎ আওয়াজে খুলে গেল দরজা। ওদিকে চেয়ে ওরা দেখল, চেহারায় অনিশ্চয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথি।

'চেয়ার টেনে বোসো, লেডি,' বললেন ক্যাসল।

উঠে চুলোর কাছ থেকে এনে টেবিলে চতুর্থ প্লেট রাখল রেবেকা। ওটাও গরম খাবারে ভরা। 'এসো, খেয়ে নাও।'

এগিয়ে এসে বিমর্ষ চেহারায় চেয়ারে বসল ক্যাথি। খেতে লাগল চুপচাপ। ওকে পাত্তা দিল না রানা। খাবার শেষ করে মহা উৎসাহে জিভ দিয়ে প্লেট চাটতে লাগলেন ক্যাসল। কাজটা শেষ করে বললেন, 'আহা, কত দিন মেয়েদের হাতের রান্না খাইনি!' চেয়ারে হেলান দিয়ে এক চুমুকে শেষ করলেন জ্যোৎস্না তরল। এবার পকেট থেকে বেরোল চেপ্টে

যাওয়া এক প্যাকেট লাকি স্ট্রাইক সিগারেট। রানাকে একটা শলা দিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

ঘরের কোণে দেয়ালে ঝুলছে প্লাস্টিকের কমদামি ফোন। ওটার ওপর চোখ পড়েছে ক্যাথির। চোরের মত চেহারা করে রানাকে বলল, 'বাবা-মার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

মানা করতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু বলে উঠলেন ক্যাসল, 'ওটা কাজ করে না, মিস। গত দু'বছর ধরে ধুলো জমিয়ে রাখছে। আর বিল দিই না। শেরি মাঝে মাঝে ওর বোনের সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু ওই জিনিসটা আমার কখনও ভাল লাগেনি। সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভালবাসি আমি।' কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল পেছনে নিলেন। 'সবচেয়ে কাছে মেলভিলের খামারে ফোন। টিলা পেরোলে নয় মাইল দূরে।'

রেবেকার দিকে তাকাল ক্যাথি। 'তোমার সেল ফোন?'

'এদিকে রিসেপশন নেই,' বললেন ক্যাসল, 'মেলভিলের খামারেও নেই।'

'ও, তা হলে যাব মিস্টার মেলভিলের খামারে,' বলল ক্যাথি। 'আমাকে একটা ঘোড়া ধার দেবেন?'

'কোথাও যাওয়া উচিত হবে না তোমার,' সতর্ক করার সুরে বলল রানা।

তখনই উঠানে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেল ওরা। ধুলো ভরা জানালার কাঁচ দিয়ে দেখল চকচকে কালো এক ঘোড়ায় চেপে হাজির হয়েছে ব্রোঞ্জরঙা এক যুবক। ডেনিম জ্যাকেট থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে। জন্তুটার দড়িটা বেঁধে দিল খুঁটিতে।

'ও-ই গোল্ডেন সান,' বললেন ক্যাসল। 'বোধহয় পেয়ে গেছে ষাঁড়টাকে।' যুবকের সঙ্গে কথা বলতে চেয়ার ছেড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেলেন বাইরে।

জানালা দিয়ে আগ্রহ নিয়ে যুবককে দেখছে ক্যাথি। ওর

দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা বুঝে গেল, কী ভাবছে মেয়েটা। রেড ইণ্ডিয়ান যুবক সুদর্শন, পোক্ত শরীর, বয়স বড়জোর তেইশ। তার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে ক্যাথির।

'মনে রেখো কী বলেছি,' বলল রানা, 'বাড়ি ছেড়ে বেরোবে না। সিআইএর লোক খুঁজছে তোমাকে।'

জবাব দিল না ক্যাথি।

রেবেকার দিকে তাকাল রানা। 'চলো, গিয়ে দেখি চালু করতে পারি কি না পিকআপ ট্রাক।'

ছেচল্লিশ

'নাটবল্টুর ঘাট একবার ঘষা খেয়ে গোল হলে আর খুলতে পারবে না,' রানাকে সতর্ক করল রেবেকা।

বিশাল বার্নের দেয়ালের ফাটল গলে ধুলো ভরা মেঝে, বেড়ার খুঁটি, যন্ত্রপাতি, ড্রাম ভরা তেল, সারের বস্তা ইত্যাদি অসংখ্য মালপত্রের ওপর পড়েছে সূর্যের সোনালি রোদ। ওপরতলায় খড় রাখার জায়গায় কক্-করো-কক্ করছে মোরগ-মুরগি।

বার্নের একেবারে পেছনে আরও অনেক বেশি পুরনো এক পিকআপ ট্রাকের চেসিসের নিচে শুয়ে আছে রানা। মুখে পড়ছে লালচে জং। নাটবল্টু না খুললে সরাতে পারবে না স্টার্টার মোটর।

'চেইন রেঞ্চ নাও, কাজে আসবে,' রানার দিকে যন্ত্রটা বাড়িয়ে দিল রেবেকা।

স্প্যানার রেখে রেঞ্চ নিল রানা। মুখ তুলে তাকাল

রেবেকার দিকে। হঠাৎ করেই ওর মনে হলো, এত সুন্দরী মেয়ে বহু দিন দেখেনি। আগেও এমন হয়েছে ওর। রেবেকার কাঁধে ঝুলছে কালো বেণী। দু'এক গোছা চুল আলগা হয়ে আরও আকর্ষণীয় করেছে ওকে। গরম বার্নে শার্টের হাতা তুলে দিয়েছে কাঁধ পর্যন্ত। পেলব বাহুতে সামান্য তেল। চেক শার্টের তিনটে বোতাম খোলা। চোখের ওপর থেকে সরাল এক গোছা চুল।

'মেকানিক হয়েছ সিআইএতে চাকরি নিয়ে?'

হাসল রেবেকা। 'না। আমার চার ভাই। পাগল গাড়ির ব্যাপারে। ওদের পেছন পেছন ঘুরেই শিখেছি সব।'

চেইন রেঞ্চ ঠিক ঘাটে বসিয়ে মোচড় দিল রানা। কড়াৎ আওয়াজ তুলল নাটবল্টু। ঘুরে গেছে সামান্য। আসল কাজ শেষ। দুই মিনিটে স্টার্টার মোটর খুলে নিল রানা। বেরিয়ে এল পিকআপের তলা থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে কুঁচকে ফেলল ভুরু।

পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল রেবেকা। 'তাড়াহুড়ো না করলেও পারতে। কাজটা আমি করতে পারতাম।'

রেবেকার স্পর্শ মসৃণ ও উষ্ণ। 'এরই ভেতরে অনেক কাজ করে ফেলেছ,' বলল রানা।

ওর হাতে স্টার্টার মোটরের দিকে তাকাল রেবেকা। জিনিসটা জং-ধরা, ভারী। লেজে ঝুলছে তার। 'মনে করো কাজ হবে?'

'এখনও জানি না।'

রানার কাছ থেকে স্টার্টার মোটর নিল রেবেকা। কয়েক সেকেণ্ড ওর আঙুল স্পর্শ করে থাকল রানার আঙুল। ওটা প্রায় আদরের মত। মুখ তুলে দেখল রানাকে। 'আমার ভাল লেগেছে।'

ভুরু নাচাল রানা। 'কী বিষয়ে ভাল লাগল?'

‘এত কিছু হলো, এত বিপদ, তবুও আমি খুশি দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে। তবে একইসঙ্গে খারাপও লাগছে। চলে যাবে, আটকাতে পারব না। মাত্র শুরু করেছি চিনতে।’

চুপ করে আছে রানা।

পেরিয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

পরস্পরের চোখে চেয়ে রইল ওরা। স্টার্টার মোটরটা নামিয়ে রাখল রেবেকা।

মৃদু কেঁপে সামান্য খুলল রেবেকার দু’ঠোঁট। বিড়বিড় করল, ‘তুমি অনেক একা, তাই না?’ শক্ত করে ধরল রানার বাহু। ‘জানি, কাউকে কষ্ট দেবে না বলে দূরে থাকো। ওই একই অনুভূতি ছিল আমারও। ঠকাব না কাউকে। চিরকালের জন্যে বাঁধনে বাঁধতে চাইব না কাউকে।’

আরেকটু ফাঁক হলো রেবেকার ঠোঁট। আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার চোখে। দু’সেকেণ্ড পর লোভনীয়, উষ্ণ, ভেজা অধরে নামল রানার চির ক্ষুধার্ত ঠোঁট।

হারিয়ে গেল ওরা দু’জন।

একটু পর রেবেকাকে দু’হাতে তুলে নিল রানা। চলে গেল একটু দূরে খড়ের গাদার কাছে। আস্তে করে শুইয়ে দিল ওকে। নিজেও বসল পাশে। রানার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে রেবেকা।

কিছু বলার আগেই ওরা শুনল রোটরের ধুপ-ধুপ আওয়াজ। বাড়ির বাইরে গুলি। ওই আওয়াজ ছাপিয়ে এল ক্যাথির বেসুরো আর্তনাদ।

বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক্যাথি। বিরক্ত ও কামনার্ত। কতকাল পুরুষ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত!

একটু পর জানালা দিয়ে দেখল একশ’ গজ দূরে খোঁয়াড়ে গোল্ডেন সান। ট্রেনিং দিচ্ছে তরুণ এক ঘোড়াকে। ওই ঘোড়াই ফেলে দিয়েছিল ক্যাসলকে।

দূর নীলাকাশে তাকাল ক্যাথি। একফোঁটা মেঘ নেই। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে প্রেয়ারির সবুজ ঘাস। হঠাৎ করেই ওর মনে হলো, মরে যাবে বেরোতে না পারলে। কথা বলতে হবে গোল্ডেন সানের সঙ্গে। কী দারুণ আকর্ষণীয় ওই যুবক! যেন সিংহের মত শক্ত সব পেশি!

ওকে জড়িয়ে ধরলে কেমন লাগবে লোকটার?

আর তারপর, দু'জন মিলে...

না, আর তর সইছে না ওর।

কেমন কেমন লাগছে শরীরটা।

পাগলাটে সব চিন্তায় হাঁফিয়ে উঠল ক্যাথি।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ওর মনে পড়ল রানার কথা।

ওকে বলেছে বাড়ির ভেতরে থাকতে।

মরুক হারামজাদা!

লোকটা গাধা মনে করে ওকে?

হেলিকপ্টার আসার অনেক আগেই আওয়াজ পাবে ও।

অযথা নষ্ট করছে ভরা যৌবন!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা খোঁয়াড়ের দিকে চলল ক্যাথি। ভাল লাগছে রোদে তপ্ত খোলা হাওয়ায় হাঁটতে। দূর থেকে ওকে দেখেছে যুবক। জানেও না, ওকে দিয়ে খায়েস মিটিয়ে নেব, ভাবল ক্যাথি। ক্ষতি নেই, বরং দু'জনেরই লাভ। চওড়া হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে ইণ্ডিয়ান যুবকের কাছে পৌঁছে গেল ক্যাথি। 'হাই! আমি ক্যাথি। তুমি নিশ্চয়ই গোল্ডেন সান?'

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল যুবক। হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। 'খুশি হলাম পরিচিত হয়ে, ক্যাথি।'

প্রশংসা খুব পছন্দ করে ক্যাথি। প্রয়োজনে পাম্প দিতেও কম জানে না। মাত্র পাঁচ মিনিটে পটিয়ে ফেলল লাজুক রেড ইণ্ডিয়ান যুবককে।

গোল্ডেন সান ভাবছে: চাইলে কোথায় পাব সোনালি

চুলের এমন সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী? আজ যা আছে কপালে!

ছোট এক দালানের আড়ালে গেল ওরা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল দু'জন।

গোল্ডেন সানের শার্টের প্রায় সব বোতাম একটানে ছিঁড়ে ফেলল ক্যাথি। যুবককে কাছে পেতে হয়ে উঠেছে উন্মাদিনী।

হাঁ করে রূপসী ক্যাথিকে দেখতে দেখতে প্যান্টের বোতাম খুলছে গোল্ডেন সান। কিন্তু ওপর দিয়ে গেল কালো এক বড় ছায়া!

ওদের মনে হলো সূর্যের পেট চিরে এসেছে ওই কপ্টার। নাক নিচু, লেজ আকাশে। মাটি থেকে ঝাড়ু মেরে ধুলোবালি তুলছে ঝোড়ো হাওয়া। পরক্ষণে স্কিডে পা রাখল রাইফেল হাতে এক লোক। কেবিন থেকে এল একরাশ গুলি।

আগেই লাফিয়ে উঠে প্যান্ট টেনে নিয়ে দৌড় শুরু করেছে ক্যাথি। সিনেমার রেপের উত্তেজনাময় দৃশ্যের মতই পেছনে ছুটছে খলনায়ক গোল্ডেন সান। আকাশ থেকে এসে গুলি ছুঁড়ছে দেখে ভয়ে আত্মা উড়ে গেছে ওর!

ক্যাথি আর গোল্ডেন সানের পায়ের কাছে নাক গুঁজল এক পশলা গুলি। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল ক্যাথি। ভীষণ ভয়ে বিকৃত হয়েছে সুন্দর মুখ।

কপ্টার থেকে ফোকলা হাসছে ক্যাল অ্যামেট, হাতে এম-সিক্সটিন রাইফেল। আবারও গুলি ছুঁড়ল সে। আছে মহানন্দে, হাতে লাফিয়ে উঠছে অস্ত্র। কিন্তু হোঁচট খেয়ে ক্যাথিকে মাটিতে পড়তে দেখে কষ্টে বুক আঁকড়ে এল তার।

যাহ্, শেষ হয়ে গেল সব মজা?

না, ইণ্ডিয়ানটা টেনে তুলেছে বেশ্যা হারামি বেটিকে!

এদিকে একদৌড়ে বার্ন ছেড়ে বেরিয়েই একটু দূরে ক্যাথির সাদা, থলথলে নিতম্বের দুলুনি চোখে পড়ল রানার। কাঁধে প্যান্ট তুলে প্রাণপণে পালিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। পাশে গোল্ডেন সান। দৌড়ে কেউ কম যায় না!

এবার হেলিকপ্টার দেখল রানা। স্কিডে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে পাইলটকে কী যেন বলছে ক্যাল অ্যামেট। কাত হলো কপ্টার। কিন্তু ততক্ষণে ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে ক্যাথি ও গোল্ডেন সান। পেছনে ধুপ্ করে বন্ধ করে দিল দরজা। তাতে রেগে গিয়ে বারান্দার ওপর ঝাল ঝাড়ল অ্যামেট। কাঠের তক্তা খুবলে তুলল একরাশ গুলি। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচের জানালা।

বাড়ির ভেতর ক্যাথিকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে ওর ওপর চড়াও হয়েছে ইণ্ডিয়ান যুবক, উদ্দেশ্য মেয়েটাকে আড়াল করা। গুলির প্রচণ্ড আঘাতে নানাদিকে ছিটকে যাচ্ছে ভাঙা কাঁচ। ছিঁড়ে কুচি-কুচি হলো পর্দা। খটাখট দেয়ালে লাগছে বুলেট। গোল্ডেন সানের কানের কাছে পোয়াতি শেয়ালের মত বিচ্ছিরি চিৎকার জুড়েছে ক্যাথি। ওর লালচে গালে কষে চড় দেবে কি না, ভাবল যুবক। আনমনে মাথা নাড়ল, অত সহজ নয় সুন্দরীদেরকে চড়িয়ে দেয়া!

ওদিকে রানার পিছু নিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে এসেছে রেবেকা। ওদের চোখের সামনে বাড়ির উঠানের বিশ ফুট ওপরে ভাসছে হেলিকপ্টার। প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে বেরেটা পিস্তল বের করেই কপ্টারের দিকে তাক করল রানা। ওই একই সময়ে ওদের দিকে ঘুরল যান্ত্রিক ফড়িং। নিচু হয়ে ছুটে এল বার্নের দিকে। প্রায় মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে স্কিড।

রাইফেল হাতে লোকটাকে চিনে ফেলল রানা। দেরি হলো না গুলি পাঠাতে। কানের পাশ দিয়ে বুলেট যেতেই এক লাফে ভেতরে ঢুকল ক্যাল অ্যামেট। পরের কয়েকটা বুলেট গাঁথল পাতলা ধাতুর ফিউজেলাজে। হঠাৎ করেই বাঁক নিয়ে সরে গেল হেলিকপ্টার। ওটার নিচে লাগল রানার কয়েকটা বুলেট। কিন্তু নাইন এমএম অ্যামিউনিশন ঢুকল না কেবিনে। তবে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে পাইলট।

বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল রানা ও রেবেকা। বারান্দায়

উঠেই দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে। একটু দূরে মেঝেতে গোল্ডেন সানকে দেখল রানা। ঢেকে রেখেছে যুবক উলঙ্গ ক্যাথিকে।

'আহত তোমরা কেউ?' জানতে চাইল রানা।

বারকয়েক মাথা নাড়ল ইণ্ডিয়ান যুবক। এখনও হতভম্ব। উঠে দাঁড়িয়ে টেনে তুলল ক্যাথিকে। এক ছুটে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল উলঙ্গ মেয়েটা। একইসময়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাসল। উত্তেজনায় বিস্ফারিত তাঁর চোখ। হাতে পুরনো, রঙচটা এক ইথাকা শটগান।

ঘরে থিতিয়ে আসছে ধুলো। হেলিকপ্টার চলে যাওয়ার পর এখন থমথম করছে চারপাশ। শটগান হাতে কাকে যেন জোর গলায় অভিশাপ দিতে লাগলেন ক্যাসল।

আবারও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। ওর পিছু নিল রেবেকা। দুশ্চিন্তা নিয়ে দূর দিগন্তে চেয়ে আছে রানা। নিচু গলায় বলল, 'রাইফেল হাতে ওই লোকটা ক্যাল অ্যামেট। দেরি হবে না ফিরতে। তখন সঙ্গে থাকবে অনেক লোক।'

'বলতে পারো আর্মি নিয়ে ফিরবে,' বলল রেবেকা। 'বড় জোর কয়েক ঘণ্টা পাব। ওরা আসার আগেই সরে যেতে হবে অনেক দূরে।'

'স্টার্টার মোটর চালু হলে কাজে আসবে পিকআপটা,' বলল রানা। 'সরে যেতে পারবে।'

অবাক চোখে ওকে দেখল রেবেকা। 'তুমি নিজে কোথায় যাবে?'

জবাব না দিয়ে আবারও বাড়ির ভেতর ঢুকল রানা। বৃদ্ধের উদ্দেশে বলল, 'মিস্টার ক্যাসল, আপনার কাছে রাইফেল আছে?'

কয়েক সেকেণ্ড ওকে দেখলেন ক্যাসল, তারপর আগুনের ফুলকির মত চকচক করে উঠল দুই চোখ। রানার মনে হলো নতুন করে জীবন পেয়েছেন বৃদ্ধ। মাথা দোলালেন তিনি,

তারপর পিছু নিতে বললেন হাতের ইশারায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে প্যাসেজ পেরোল ওরা। সামনে পড়ল একটা দরজা। ওদিকেই কাঠের সিঁড়ি। নেমে এল ওরা বেসমেণ্টে। ক্যাসল সুইচ টিপে বাতি জ্বালতেই দেখা গেল, একদিকের দেয়ালের তাকে রাখা এক রাইফেল। খুব সরু ওয়ালনাটের স্টক। ছোটখাটো হলেও দেখতে দারুণ অস্ত্রটা। খপ্ করে রাইফেল তুলে নিলেন ক্যাসল। একটা কথাও না বলে ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

রাইফেলটা দেখল রানা।

পয়েণ্ট টু-টু ক্যালিবারের আণ্ডারলিভার মার্লিন। চমৎকার জিনিস। তবে ওটা দিয়ে শিকার করতে পারবে বড়জোর খরগোশ বা স্কুইরেল।

রানার হতাশ চেহারা দেখে মুচকি হাসলেন ক্যাসল। 'বুঝতে পারছি, বাছা, কী ভাবছ। ভারী জিনিস চাই তোমার।'

চুপ করে আছে রানা।

'তা হলে অন্য কিছু দেখাই, চলো।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেসমেণ্টের আরেক দিকে গিয়ে থামলেন ক্যাসল। জায়গাটা আবছা আঁধার। মেঝেতে পড়ে আছে ঘন ধুলো ও মাকড়সার জালে ভরা প্যাকিং বাক্স ও ভাঙা আসবাবপত্র। সেসব সরাতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। পাশে হাত লাগাল রানা। একটা বাক্স সরিয়ে ভারী এক ট্রাঙ্ক টেনে আনলেন ক্যাসল। 'কোরিয়া থেকে ফেরার পর আর কখনও খুলিনি। মনে হয়নি আবারও ওটাকে দেখব। কিন্তু ভাগ্য মানুষকে কোথায় নেবে, জানার উপায় নেই। কে জানে, একদিন এমন পরিস্থিতি হবে বলেই হয়তো হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সঙ্গে এনেছিলাম।' কেসের ওপর ফুঁ দিয়ে ধুলো সরালেন তিনি।

ট্রাঙ্ক খুলতেই দেখা গেল ভারী একটা ম্যাট। ওটা তুলে মেঝেতে ফেললেন ক্যাসল। ট্রাঙ্কের ভেতরে বড় একটা বস্তা।

ওটার গায়ে মেখে আছে গ্রিস। রানার নাকে লাগল পুরনো গান অয়েলের গন্ধ।

টান দিয়ে বস্তা সরিয়ে বললেন ক্যাসল, 'ব্যস, আর কিছু নেই। এখন হয়তো ওটা তুলতেও পারব না। তবে যৌবনে কাজে এসেছিল।'

রানাকে দেখতে দেয়ার জন্যে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

চোখ বিস্ফারিত হলো রানার। 'অবিশ্বাস্য! ভাবতে পারিনি আপনার কাছে *বার* থাকবে।'

ব্রাউনিং অটোমেটিক রাইফেল।

আগে মাত্র একবার ওই অস্ত্র ব্যবহার করেছে রানা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই জিনিস ব্যবহার করেছিল আমেরিকা। ডিকমিশন করা হয় ষাটের দশকে। এই লাইট মেশিন গান আজকাল দেখা যায় মিলিটারি মিউযিয়ামে। কিন্তু এটা একদম ঝকঝকে নতুন। ধূসর গান মেটাল। তেল দেয়া কাঠ ও স্টিলের ব্যাটল সাইট রানাকে মনে করিয়ে দিল, অপটিক রেড ডট, লেসার, রাবার আর পলিমারের যুগেও উপযুক্ত লোকের হাতে জাদু দেখাতে পারবে এই জিনিস।

ঝুঁকে কেস থেকে *বার* তুলে নিল রানা। বেশ ভারী ওটা। তেলমাখা। রাখা হয়েছে অত্যন্ত যত্নে। বোর পরিষ্কার। চকচক করছে অ্যাকশন। এমন কী ক্যানভাসের স্লিং-ও নতুন। দীর্ঘ, বাঁকা ম্যাগাযিন। কেসে সাজানো আরও পাঁচটা ম্যাগাযিন।

হাসলেন ক্যাসল। 'স্পেশাল হাই-ক্যাপাসিটি অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট্ ভার্শান। এই সুন্দরীকে দিয়ে আকাশ থেকে বিমান ফেলতাম আমরা।' বেসমেন্টের আরও গভীরে গেলেন তিনি। সরিয়ে দিলেন আরও কয়েকটা বাক্স। ঘোঁৎ করে উঠে টেনে বের করলেন ভারী এক ধাতব কেস।

ওটা অ্যামিউনিশনের। জলপাই রঙা। কিনারায় ধরেছে জং। হলদে অক্ষর অস্পষ্ট।

স্টিলের ক্যাচ খুললেন ক্যাসল। টান দিতেই ক্যাঁচ আওয়াজে খুলল ডালা। হলদে বাতির আলোয় প্রতিফলন তৈরি করল পুরনো তামার বুলেটের খোসা। থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে .৩০৮ মিলিটারি ইশ্যু কার্ট্রিজ। সংখ্যায় অন্তত এক হাজার। কোনও ক্ষতি হয়নি ওগুলোর। হালকা করে গ্রিস দেয়া। চিকচিক করছে অর্ধশতক পেরোলেও।

রানাকে বললেন ক্যাসল, 'বাছা, যুদ্ধ আরম্ভ করতে এর বেশি কিছু লাগে না।'

'লড়বও এখানেই,' বলল রানা। ম্যাগাযিনগুলোয় দ্রুত হাতে বুলেট ভরতে লাগল ও।

রানার কাজ দেখতে দেখতে আনমনে মাথা দোলালেন ক্যাসল। 'তোমাকে যোদ্ধা বলেই মনে হয়। ভুল বললাম?'

'বাংলাদেশ আর্মিতে ছিলাম। মেজর।'

'ইউনিট?'

'স্পেশাল কমাণ্ডো ইউনিট।'

'একা লড়বে কেন, আমিও পাশে থাকব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এটা আপনার লড়াই নয়, স্যর। খুশি হব আপনি দূরে থেকে দেখলে।'

থুক্ করে মেঝেতে থুতু ফেললেন ক্যাসল। 'তা পরে দেখব, বাছা। আমার বাড়িতে গুলি করেছে ওরা। তার ওপর আমার শুকনো পাছাটা বাইরে থেকে তুলে এনে কাউচে রেখেছ। কৃতজ্ঞতাবোধ বলে একটা কথা আছে না আমার?'

'এরা খুব বাজে লোক।'

'আমি নিজেও দেবতা নই, বাছা। বুড়ো হয়েছি, কিন্তু দরকার হলে কীভাবে পোঁদে লাথ্ মারতে হয় সেটা ভাল করেই জানি।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'আমার আরও কিছু জিনিস লাগবে, মিস্টার ক্যাসল।'

সাতচল্লিশ

বার্ন থেকে বেরোল রানা। এইমাত্র দুই পুরনো পিকআপের মধ্যে নতুনটায় উঠে বসেছে রেবেকা। কালিঝুলি ভরা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিল হাত। গালে সামান্য তেল। উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল, হাসল রানাকে দেখে।

'কাজ শেষ? ইঞ্জিন চালু হবে?' জানতে চাইল রানা।

'দেখব এখন। মোমেন্ট অভ ট্রুথ।'

চাবি মুচড়ে দিতেই একরাশ নীল ধোঁয়া ছেড়ে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। রেবেকার সুন্দর মুখে ফুটল বিজয়িনীর হাসি। ক্যাব থেকে নেমে এল। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল রানাকে। 'এবার চলো, ক্যাথিকে নিয়ে চলে যাই।'

চুপ করে আছে রানা।

'কী হয়েছে, রানা?'

'আমি থেকে যাচ্ছি, রেবেকা,' বলল রানা।

আতঙ্ক নিয়ে ওকে দেখল মেয়েটা। 'কেন? এটা কী বলছ! রয়ে গেলে তো ওরা খুন করবে তোমাকে!'

'তুমি রওনা হও। নয় মাইল পশ্চিমে মেলভিলের খামার। ওখানে গিয়ে ঊর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তাঁরা সরিয়ে নেবেন ক্যাথি আর তোমাকে।'

রানাকে দেখছে রেবেকা। ঘন ঘন মাথা নাড়ল। 'গেলে সবাই যাব। দেরি কোরো না, রানা। হাতে বেশিক্ষণ পাব না।'

ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'খোলা জায়গায় কোনও

সুযোগই পাব না। হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে যাবে। তা ছাড়া, গোল্ডেন সান আর মিস্টার ক্যাসলকে রেখে গেলে, ক্যাল অ্যামেট এসে খুন করবে ওদের দু'জনকে। চাই না সারাজীবন বিবেক আমাকে তাড়িয়ে বেড়াক। বদমাস লোকগুলোকে ঠেকাতে হলে এখানে আমাকে দরকার। ক্যাথিকে নিয়ে রওনা হও। এখানে থেকে মোকাবিলা করব অ্যামেটের দলকে।'

'তুমি রয়ে গেলে আমিও থাকব।'

মাথা নাড়ল রানা, গম্ভীর। 'একটুও ভেবো না। ঠিক করেছি, আপাতত মরব না।'

'ঠাট্টা করছ? তুমি জানো, কী করবে ওরা!'

'জানি, চেষ্টা করবে,' বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেবেকা। বুঝে গেছে, ওর কথা শুনবে না মানুষটা। রানার বাহুতে হাত রাখল। চোখের কোলে নামল দু'ফোঁটা অশ্রু।

হাসছে রানা। মুছে দিল রেবেকার চোখ।

ফুঁপিয়ে উঠল রেবেকা। 'তুমি একদম পাগল! ভাবিনি প্রেমে পড়ব, কিন্তু শেষে তা-ই হলো। কোনও দাবি নেই, কিন্তু মনে রেখো, অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে।'

হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করল রানা। মনে পড়েছে রেবেকা সাউলের মিষ্টি হাসিমুখ। অন্তর থেকে ওকে কাছে চেয়েছিল মেয়েটা। ও নিজেও কি চায়নি নিশ্চিন্ত জীবন? শেষে হয়নি কিছুই! চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে যে রেবেকা, ঠিক ওর মতই এখন সামনে দাঁড়িয়ে আরেক রেবেকা। সে-ও কি একই ভুল করছে না? নিষ্ঠুর প্রকৃতি বারবার মেতে উঠছে রানার মনটাকে নিয়ে খেলতে!

রেবেকার হাত ধরে পিকআপ ট্রাকের দিকে পা বাড়াল রানা। নরম সুরে বলল, 'এবার ক্যাথিকে নিয়ে চলে যাও। আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। পরে দেখা হবে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেবেকা।

ওকে নিয়ে পিকআপ ট্রাকে উঠল রানা, ইঞ্জিন চালু করে বার্নের বাঁক ঘুরে গিয়ে থামল বাড়ির সামনে। দেখে নিল যথেষ্ট তেল আছে কি না। পরখ করল ফ্যান বেল্ট। এবার রেবেকাকে রেখে বাড়িতে ঢুকল রানা। ক্যাথির ঘরে গিয়ে জানাল, রেবেকার সঙ্গে দূরের খামারে যেতে হবে তাকে।

খুশিই মনে হলো মেয়েটাকে। রানার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এসে উঠল পিকআপে।

রেবেকা চলে যাবে বলে খারাপ লাগছে রানার। মনকে সান্ত্বনা দিল, ওরা যাবে নিরাপদ জায়গায়। রওনা হওয়ার আগে ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রেবেকা। পাল্টা টা-টা দিল রানা। অসমতল রাস্তা ধরে গেটের দিকে চলল পিকআপ। পেছন থেকে চেয়ে রইল রানা। কিন্তু আরও পাঁচ গজ যাওয়ার পর ব্রেক কষে থামল গাড়িটা। লাফ দিয়ে নামল রেবেকা, দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

দু'সেকেণ্ড পর পরস্পরকে চুমু দিল ওরা।

একমিনিট পর চোখ তুলে রানার চোখে তাকাল রেবেকা। 'সতর্ক থেকো, মাসুদ রানা, এটা আমার দাবি!'

'আবার দেখা হবে,' নিচু গলায় বলল রানা।

'তখন তোমার কাছে কিছু চাইব,' লালচে হয়ে গেল রেবেকার গাল। আবার গিয়ে উঠল পিকআপ ট্রাকে। গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু। দাবিয়ে দিল অ্যাক্সেলারেটর। নুড়িপাথরে পিছলে রওনা হলো গাড়িটা। গেট পেরিয়ে দূরে হারিয়ে গেল টিলার বাঁকে।

রেবেকা ও ক্যাথি চলে গেছে। এবার জরুরি কিছু কাজ সারতে হবে রানাকে। পরের একটা ঘণ্টা ব্যস্ত কাটল ওর। ভালভাবে ঘুরে দেখল খামারবাড়ির আশপাশ। বুঝে নিল কেমন হবে শত্রুদের ওপর ওর পাল্টা আক্রমণ।

একদল লোকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একা। শত্রুর সঙ্গে থাকবে ভারী অস্ত্র। প্রত্যেকে পেশাদার। সরাসরি হামলা

করবে, চট্ করে শেষ করতে চাইবে রানাকে। তবুও টিকে থাকা সম্ভব বলেই মনে হলো ওর। পাবে বাড়তি কিছু সুবিধা, যেগুলো শত্রুরা পাবে না।

খামারবাড়ির বার্নে পেল রানা প্রয়োজনীয় প্রায় সবই। জড় করল বার্নের একপাশে। ওর রসদের কোন-কোনওটা ভারী, তাই স্যাক কার্টে তুলে সরিয়ে নিচ্ছে নানান দিকে। সাহায্য করার শারীরিক শক্তি নেই মিস্টার ক্যাসলের, দেখছেন রানার যুদ্ধ-প্রস্তুতি; তবে রানার সঙ্গে প্রাণপণ খাটছে গোল্ডেন সান।

স্যাক কার্টে করে মালপত্র তুলছে রানা, এমনসময় মুখ তুলে ওকে দেখল গোল্ডেন সান। জানতে চাইল, 'সংখ্যায় ওরা অনেক, তাই না?'

'হ্যাঁ। প্রথম সুযোগেই শেষ করতে চাইবে আমাদেরকে,' বলল রানা। 'লড়ব। তবে চাই মিস্টার ক্যাসল বা তুমি সরে থাকবে।'

'আমি ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ান, কখনও লড়াই থেকে পিছিয়ে যাই না,' নরম গলায় বলল গোল্ডেন সান। গর্ব প্রকাশ পেল কণ্ঠে, 'আমাদের বাপ-দাদার জমি কেড়ে নিয়েছে এরা। বাধ্য করেছে রিযার্ভেশনে বাস করতে। কেড়ে নিয়েছে আমাদের আজন্ম অধিকার।' আস্তে করে মাথা নাড়ল সে। 'আমি ওদের মত লোকদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই। তাতে মরতেও আপত্তি নেই। ...তা ছাড়া, দেখতে চাই সত্যিকারের বীরপুরুষ কীভাবে লড়ে।'

'যুদ্ধ ঠিকই দেখবে, গোল্ডেন সান,' বলল গম্ভীর রানা। 'বাঁচলে সারাজীবন মনে রাখবে কী হয়েছে এখানে।'

দরকারি সবকিছু স্যাক কার্ট থেকে নামিয়ে ফেলেছে রানা। এবার সিকি মাইল দূরের খোঁয়াড়ে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে রাখল ওরা। আগুনের গোলার মত রোদ ঢালছে সূর্য। দরদর করে ঘামছে রানা। টিসটিস করছে কাঁধের ব্যথা। একবার

দেখে নিল হাতঘড়ি।

বিকেল চারটে।

বোধহয় সময় হয়েছে হামলার।

মুখ তুলে নীল আকাশে চোখ বোলাল রানা। ওই যে দূরে পর্বতে বরফে ছাওয়া চূড়া। ওদিক দিয়েই আসবে ওদের আক্রমণ।

রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে ওকে।

ওরা আসছে!

সাবধান, রানা!

আটচল্লিশ

মেঘমুক্ত নীলাকাশের পটভূমিতে তিনটে কালো বিন্দু, উড়ে আসছে V আকৃতি নিয়ে। ক্রমেই বাড়ছে রোটরের ধুপ-ধুপ শব্দ। গোল্ডেন সানকে বলল রানা, 'লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেসমেন্টে থাকবেন মিস্টার ক্যাসল। তুমিও তাঁর পাশে থেকো।'

ক'মুহূর্ত দ্বিধা করে দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকল যুবক। রানা চলে এল পাথরের তৈরি দোতলা স্টোররুমে। এখানেই একটা জানালার পাশে ট্রাইপডে ফিট করেছে রানা বার রাইফেল। প্রথমতলায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজা আটকে দিয়ে ওপরে উঠে এল রানা। শুয়ে পড়ল অস্ত্রটার পেছনে। পাশেই পেটমোটা ব্যাগে লাইট মেশিন গান ও বেরেটা পিস্তলের কিছু গুলি ভরা স্পেয়ার ম্যাগাযিন।

কিছুক্ষণ পর খামারবাড়ির আকাশে ভাসতে লাগল তিন

হেলিকপ্টার। রোটর ও ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজে কাঁপছে চারপাশ। তুমুল হাওয়ার তোড়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে ঘাস। দূরের খোঁয়াড়ে ভীষণ ভয়ে ছোটাছুটি করছে একপাল ঘোড়া।

স্টোররুমে রাইফেলের সাইটে চোখ রাখল রানা। নামতে গিয়েও ফর্মেশন ভাঙল না তিন কপ্টার। সামনে একটা, পেছনে দুটো। প্রথম কপ্টারের দুই দরজা থেকে নিচে পড়ল দুই দড়ি। নামতে লাগল কালো ইউনিফর্ম পরা ছয়জন এজেন্ট। রানার মনে হলো, কালো সিল্ক বেয়ে নামছে ছয় মাকড়সা, পরনে আর্মার, গগল্স্, হেলমেট, পিঠে ঝোলানো অটোমেটিক রাইফেল।

যে কারও বুকে কাঁপ-ধরিয়ে-দেয়া দৃশ্য।

সময় হয়েছে, বুঝে গেল রানা। এদেরকে হিংস্র পশু ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না। এসেছে নিরস্ত্র, অসহায় ক'জন মানুষকে হাসতে হাসতে নিশ্চিন্তে খুন করতে। কাজেই দয়ামায়া করবে না ও। চমকে দেবে শত্রুকে। চরম ক্ষতি করবে প্রথম সুযোগে।

ছয় ট্রুপার মাটিতে নামার আগেই বার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ সরাল রানা, পরক্ষণে শুরু করল গুলি। তাক করেছে ওপরের হেলিকপ্টারের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে। পিস্তলের হালকা গুলি নয় যে ফিউজেলাজে ঢুকবে না, এগুলো মেশিন গানের বুলেট। প্রতি মিনিটে নয় শ' রাউণ্ড হাই-ভেলোসিটি .৩০৮ গুলি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ঝাঁঝরা করল কপ্টার। বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। পরের সেকেণ্ডে মস্তবড় এক কমলা আগুনের গোলা গপ করে গিলে ফেলল কপ্টারটাকে। হাজার টুকরো হয়ে আগুনে বৃষ্টির ফোঁটার মত আকাশ থেকে ঝরঝর করে ঝরল সব। অগ্নিশিখার বিশাল ফুটবলের ভেতর আটকা পড়েছে ছয় ট্রুপার। বাঁচার কোনও সুযোগই পেল না ওরা।

নির্লিপ্তভাবে খুন করছে রানা। বুকে দয়ামায়া নেই, কারণ

ওটা দেখাবে না শত্রুরাও। আগুনে গুলি ছুঁড়ছে রানা। থরথর করে কাঁপছে বার লাইট মেশিন গান। ওটা থেকে বেরিয়ে ঘরের আরেক প্রান্তে গিয়ে পড়ছে খরচ করা গুলির খোসা। বাতাসে কর্ডাইটের কড়া কটু গন্ধ। জ্বলন্ত মানুষ দেখল রানা। হাত-পা ছুঁড়ছে তারা। বুকে গুলি খেয়ে ধুপ-ধাপ পড়ল আগুনের ভেতর।

দ্বিতীয় এক বিস্ফোরণে চুরমার হলো হেলিকপ্টারের সুপারস্ট্রাকচার। আকাশে উঠল ঘন কালো ধোঁয়া ও কমলা রঙের মস্ত ছাতা। খামারবাড়ির নানান দিকে ছিটকে গেছে ভাঙা টুকরো।

একটা হেলিকপ্টার শেষ।

অন্যদুটো পিছিয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাতে ওপরে উঠছে পাইলটরা। বাঁক নিয়ে বার্নের দিকে গেল দুই কপ্টার, পরক্ষণে ঘুরেই ছুটে এল ঝড়ের বেগে। দরজার পাশ থেকে নামছে ট্যাকটিকাল গিয়ার পরা কালো পোশাকের লোক। সবার হাতে উঠে এসেছে রাইফেল।

সামনের হেলিকপ্টারের ওপর লক্ষ্যস্থির করল রানা। বার রাইফেলের তপ্ত ব্রিচ থেকে ছিটকে বেরোল অসংখ্য খোসা। বুলেট ঝাঁঝরা করছে ফিউজেলাজ। গুলি লেগেছে কারও গায়ে। উইণ্ডশিল্ডে ছলাৎ করে লাগল একরাশ রক্ত। ভারী গুলিবর্ষণে ভেঙে পড়ল প্লাস্টিক মেশানো কাঁচ।

হঠাৎ বাঁক নিয়ে নিচে নাক তাক করল হেলিকপ্টার। কাত হয়ে জোরালো হুয়াম্প-হুয়াম্প আওয়াজ তুলল রোটর। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে যান্ত্রিক ফড়িং। কয়েক সেকেণ্ড রানার মনে হলো, সোজা বাড়ির উঠানে গাঁথবে ওটা। কিন্তু গরু রাখার কাঠের পুরনো ছাউনিতে লাগল এয়ারক্রাফটের রোটর। বিকট আওয়াজে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হতেই চারদিকে ছিটকাল কাঠের তক্তা ও জং ধরা লোহার কাঠামোর অসংখ্য টুকরো।

নানান জিনিস উঠে আসছে দেখে ওপরে কপ্টার তুলছে তৃতীয় পাইলট। রানার মাথার ওপরে প্রচণ্ড ধুপ-ধুপ আওয়াজ। ওদিকে মন দিল না ও। তিন সেকেণ্ড পর গরু রাখার ছাউনির দরজা দিয়ে বেরোল কালো পোশাকের কয়েকজন। হাতে অস্ত্র। কপ্টার বিধ্বস্ত হলেও বেঁচে গেছে প্রাণে। শত্রুকে খুঁজছে, চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে।

বাম থেকে ডানে বার রাইফেলের নল ঘোরাল রানা। লোকগুলোর বুক-পেট থেকে ছিটিয়ে গেল রক্ত। অতি সহজেই শত্রু খতম করছে রানা। কিন্তু পরক্ষণে কাজটা হয়ে উঠল কঠিন।

আধুনিক মিলিটারি অস্ত্রের মাযল ফ্ল্যাশ লুকাতে সাপ্রেসর থাকে, ওই জিনিস নেই বার রাইফেলে। স্টোররুম থেকে হলদে-সাদা আগুনের হলকা দেখেছে তৃতীয় হেলিকপ্টারের পাইলট। তার তরফ থেকে এল পাল্টা হামলা।

টিনের ছাত ভেদ করে ও রানার ঘরের জানালা-পথে ঢুকল অজস্র বুলেট। ঝরঝর করে ওর গা-মাথায় নামল ভাঙা কার্ডবোর্ড। ধুপ-ধুপ আওয়াজে দূরে গিয়ে থামল কপ্টার। এবার এল অন্তত তিনটে অ্যাসল্ট রাইফেলের গুলির বৃষ্টি।

ভারী ব্রাউনিং সহ গড়িয়ে সরে গেল রানা। সঙ্গে টেনে নিয়েছে ম্যাগাযিনের ব্যাগ। আবার মাথার ওপরে হাজির হলো হেলিকপ্টার। বার রাইফেলের নল তুলে ছাত লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল রানা। তাতে ঝরঝর করে মুখে পড়ল একরাশ ধুলো।

ছাতের ওপর থেকে সরে গেল হেলিকপ্টার। চরকির মত ঘুরে গেল বাড়ির দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধে ব্যাগ তুলে হুড়মুড় করে নিচতলায় নামল রানা। দরজা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এল কড়া রোদের ভেতর।

জঞ্জাল ভরা গলির একপাশে গরুর ছাউনি, অন্যদিকে স্টোররুম। মাঝে রানা। ওর বামে তিরিশ গজ দূরে নষ্ট এক

ট্র্যাক্টর। পনেরো গজ আগে দালানের পাশে বড় দুটো স্তূপ। ঢেকে রাখা হয়েছে তারপুলিন দিয়ে। চারপাশে জড় করা হয়েছে খামারের ভাঙা মালপত্র।

ডানে বাড়ির উঠানের আকাশে ভাসছে তৃতীয় কপ্টার। ওটা থেকে দড়ি বেয়ে সরসর করে নামল ছয়জন ট্রুপার। একপাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে ওদিকে তাকাল রানা। এখনও ওকে দেখেনি তারা। ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সিগনাল দিচ্ছে পরস্পরকে।

কিন্তু রানাকে দেখেছে পাইলট। নিচু করে নিল কপ্টারের নাক। পরক্ষণে দুই দালানের মাঝ দিয়ে এল ঝড়ের বেগে। মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে স্কিড।

ঘুরেই নষ্ট ট্র্যাক্টরের দিকে দৌড় দিল রানা। পেছনে গর্জে উঠল অ্যাসল্ট রাইফেল। তারপুলিন দিয়ে ঢাকা দুই স্তূপের মাঝ দিয়ে ছুটছে রানা। আরও বাড়াল ছোটার গতি। পেছনের মাটিতে বিঁধছে গুলি। তিন সেকেণ্ড পর ঝাঁপ দিল ট্র্যাক্টরের ওদিকে। উঠেই ওপরে তুলল বার রাইফেল। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে সরাসরি ওর দিকে আসছে হেলিকপ্টার। এই মুহূর্তে আছে দুই স্তূপের ঠিক মাঝে।

কপ্টারটাকে ওখানেই চেয়েছে রানা। একমুহূর্ত দেরি না করে গুলি ছুঁড়ল ও। কপ্টার নয়, ওর লক্ষ্য বামদিকের স্তূপ। তিন সেকেণ্ড পর গুলি গেল ডানের স্তূপে। পুরো ম্যাগাযিন খালি হলো ওটার ওপর। পরক্ষণে রাইফেল ফেলে ট্র্যাক্টরের পেছনে শুয়ে পড়ল রানা। এক মুহূর্ত পর চারপাশে ছিটিয়ে গেল চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা আলো।

আজ দুপুরে বার্নে প্রোপেন গ্যাসের সিলিণ্ডার পেয়েছে রানা। কিচেনে লাগবে বলে রাখা ছিল ওখানে। পাশেই বস্তা ভরা চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের গজাল। গোল্ডেন সানের সাহায্য নিয়ে ডাক্ট টেপ দিয়ে সব আটকে নিয়েছে সিলিণ্ডারে। নোংরা তারপুলিনের নিচে ছিল ওর তৈরি প্রকাণ্ড গজালকাঁটার বোমা।

অবশ্য, সমস্যা হচ্ছে: এত কাছ থেকে ওটা ফাটাতে হবে, ভাবতেও পারেনি রানা।

দুই দালানের মাঝের অংশ সংকীর্ণ। ওই কারণেই বহু গুণ বাড়ল বোমার ধ্বংস-ক্ষমতা। 'বুম!' শব্দে ফাটল কপ্টারের নাকের ওপর।

ভারী দেয়ালে যেন প্রচণ্ড বেগে বাড়ি খেল হেলিকপ্টার। বাচ্চারা রাগ করে খেলনা ভেঙেচুরে মাটিতে ফেললে যেমন হয়, সেই অবস্থা হলো ওটার। ভেতরের দিকে বিস্ফোরিত হলো জানালা। হাজারো টুকরো হয়ে নানাদিকে ছিটকে গেল ঘুরন্ত রোটর। রানার তৈরি পেট্রল বোমার আগুনটাকে পেল ভাঙা সিলিণ্ডারের প্রোপেন গ্যাস। বিস্ফোরিত হলো দেয়ালের পাশে লুকিয়ে রাখা সব জেরি ক্যান। গ্যাসের কারণে দাউ-দাউ আগুনে দপ্ করে জ্বলে উঠল বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার। ভেতরে যারা ছিল, পুড়তে লাগল তারা। চিৎকার করছে প্রাণের ভয়ে। জ্বলন্ত শরীরে দৌড়ে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু রক্ষা নেই লেলিহান শিখা থেকে।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে রানা। কয়েক ফুট ওপর দিয়ে গেল আগুনের প্রচণ্ড হলকা। চড়চড় শব্দে পুড়ছে ঘাড়ের খাটো চুল। মনে হলো, এবার পুড়েই মরবে। অবশ্য, পরের সেকেণ্ডে জোরালো হুশ্ শব্দে দপ্ করে নিভল অগ্নিস্রোত। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা।

পুড়ে ছাই হয়েছে চারপাশের প্রায় সবই। দুই দালানে জ্বলছে গনগনে আগুন। মাটিতে কয়েকজন লোকের মৃতদেহ। বাতাসে পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ। জ্বলছে হেলিকপ্টারের কঙ্কাল।

ট্র্যাক্টরের কাছ থেকে সরল রানা। কয়েক গজ দূরে ধুলোয় পড়ে আছে বার রাইফেল। ওটা তুলে নিল রানা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, উড়ন্ত শ্র্যাপনেলের আঘাতে চুরমার হয়েছে রিসিভার। রাইফেলটা হাত থেকে ফেলে ব্যাগ হাতড়াল রানা। হালকা মেশিন গানের ম্যাগাযিন আর কাজে

আসবে না, ফেলে দিল। পিস্তল নিয়ে চারপাশে তাকাল সতর্ক চোখে।

তখনই বুঝল, তৃতীয় হেলিকপ্টার থেকে নেমেছে ক'জন ট্রুপার। সংখ্যায় ছয়জন। জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের সুপারস্ট্রাকচার আর বিধ্বস্ত দালানের মাঝে আছে তারা। উঁচু করে ধরেছে অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল। চোখের সানগ্লাসে প্রতিফলিত হচ্ছে কমলা আগুন।

শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল রানার।

পড়েছে মস্ত বিপদে।

সামনে ট্রুপাররা ছাড়াও পেছন থেকে আসছে আরেক দল। তাদের নেতার মুখে ফোকলা, চওড়া হাসি।

ক্যাল অ্যামেট!

পেছনের গাছের জটলার ওদিকে হাজির হয়েছে চতুর্থ কপ্টার। রানাকে ব্যস্ত রাখতে ব্যবহার করেছে প্রথম তিন হেলিকপ্টারকে।

অ্যামেটের সঙ্গে হাঁটছে আরও পাঁচ ট্রুপার। সবার পরনে ট্যাকটিকাল গিয়ার, হাতে এম-সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল।

শত্রুরা দলে কমপক্ষে বারোজন, সঙ্গে হাই-ভেলোসিটি রাইফেলের তিন শ' পঞ্চাশটা বুলেট।

কিছুই করার নেই রানার। আটকা পড়েছে দু'দলের মাঝে। পিছিয়ে কাভার নেবে, সে উপায়ও নেই।

'এবার পেয়েছি!' চিৎকার করল ক্যাল অ্যামেট, 'তুই একা, বায়েন—!'

উনপঞ্চাশ

পরের গুলির আওয়াজে পেশি শক্ত করল রানা। মৃত্যুর জন্যে তৈরি। এবার ওকে শেষ করবে বুলেট। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর, হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে উঠল এক ট্রুপার। মনে হলো উড়ে গেছে দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কায়। কয়েক ফুট উড়ে ধুলোয় পড়ল লোকটা। পাশেই রাইফেল। একই সময়ে খামারবাড়ি থেকে এল কারও চিৎকার, 'রানা একা নয়!'

হৈ-চৈ করে উঠল ট্রুপাররা। এল হামলা। টাশ্ করে উঠল ছোট ক্যালিবারের রাইফেল। মাথা চেপে ধুপ্ করে মাটিতে পড়ল আরেক ট্রুপার। প্রাণের ভয়ে চারপাশে কাভার নিতে ছুটল লোকগুলো। যে-যার মত লুকিয়ে পড়ছে খামারের যন্ত্রপাতি, জং ধরা ড্রাম ও নষ্ট ট্র্যাক্টরের চাকার পেছনে।

গুলি যারা করছে, বারবার সরছে কাভার নিয়ে। তারা এমন কেউ, যারা ভাল করেই চেনে খামারের কোথায় কী আছে।

'বুম্!' করে উঠল বন্দুক।

করুণ এক চিৎকার ছেড়ে উরু চেপে ধরল এক ট্রুপার। গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত।

টাশ্ করে উঠল ছোট ক্যালিবারের রাইফেল। ক্যাল অ্যামেটের পাশের লোকটা টুঁ শব্দ না করেই পড়ে গেল।

গুলি করছে দু'জন।

অস্ত্রও দুটো।

একটা পয়েণ্ট টু-টু মার্লিন, অন্যটা প্রাচীন ইথাকা

শটগান।

ডাইভ দিয়ে আবারও ট্র্যাক্টরের আড়ালে গেল রানা। ওর বামে জ্বলন্ত কপ্টারের ওদিকে লুকিয়ে পড়েছে চার ট্রুপার। আটকা পড়েছে কোথা থেকে গুলি এসেছে বোঝার আগেই। জ্বালানি কাঠের স্তূপের ওদিকে লুকিয়ে পড়েছে অ্যামেট ও তার দলের লোকেরা। নানাদিকে গুলি পাঠাচ্ছে তারা, আতঙ্কিত। বেরেটা তুলে একজনের কপাল ফুটো করল রানা। জবাবে ওর দিকে গুলি পাঠাল ক'জন। ট্র্যাক্টরের ফেণ্ডারে লেগে ছিটকে গেল বুলেট। আবারও গুলি পাঠাল রানা। খুন হলো আরেক ট্রুপার।

তখনই চমকে গেল রানা। গলির শেষে জ্বলন্ত গরুর ছাউনি আর স্টোররুম থেকে দশ গজ দূরে বেরিয়ে এসেছে গোল্ডেন সান। হাতে পয়েন্ট টু-টু মার্লিন। ওর কাছ থেকে মাত্র দশ গজ দূরে অ্যামেট এবং তার দলের লোক। থুতনি উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ান যুবক। চোখে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। তার পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরোলেন মিস্টার ক্যাসল। হাতে বন্দুক। চেহারা ভীষণ গম্ভীর। চিৎকার করে বললেন, 'আমার জমিতে পা রাখার কোনও অধিকার নেই তোদের, হারামজাদারা!'

ঝট্ করে গোল্ডেন সান ও মিস্টার ক্যাসলের দিকে রাইফেল ঘোরাল অ্যামেট। গলির আরেক প্রান্ত থেকে পর পর চারবার গুলি করল রানা। প্রাণের ভয়ে জ্বালানি কাঠের স্তূপের ওদিকে ঝাঁপ দিল অ্যামেট।

এবার চারপাশে তৈরি হলো নরকের পরিবেশ।

চারদিকে ছুটছে বুলেট।

ব্যথায় মুখ কুঁচকে মাটিতে পড়ল গোল্ডেন সান।

নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দু নড়লেন না ক্যাসল। পুরনো ইথাকা বন্দুক বারবার পাম্প করে পাঠালেন এলজি বুলেট। রানার হাতে লাফিয়ে উঠে 'টাশ্! টাশ্!' আওয়াজ

তুলছে বেরেটা পিস্তল। ক'সেকেণ্ড পর খালি হলো ওর অস্ত্র।

যেভাবে হঠাৎ শুরু হয়েছিল লড়াই, তেমনি আচমকা থামল সব। খামারে নামল থমথমে নীরবতা। গলির মধ্যে মাটিতে ছিটিয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত সব রক্তাক্ত লাশ।

এই হামলায় শেষপর্যন্ত মারা গেছে বিশজনেরও বেশি ট্রুপার। বেঁচে আছে শুধু একজন— ক্যাল অ্যামেট! কাভার থেকে সরে খালি রাইফেল ফেলে পালিয়ে গেছে। জ্বলন্ত কপ্টারের আগুন পেরোবার সময় দু'হাতে ঢেকে রেখেছিল মুখ। গেছে ছোট-বড় সব দালানের গোলকধাঁধায়।

শটগান ফেলে গোল্ডেন সানের পাশে বসলেন মিস্টার ক্যাসল। পা চেপে ধরে গোঙাচ্ছে ইণ্ডিয়ান যুবক। আঙুলের ফাঁক দিয়ে নামছে রক্ত।

মুখ তুলে রানাকে দেখে খামার মালিক বললেন, 'মনে হয়েছিল সাহায্য দরকার তোমার, বাছা।'

মাথা দোলাল রানা। 'আমি কৃতজ্ঞ। কখনও দরকার হলে একবার শুধু ডাকবেন। পৃথিবীর যেখানেই থাকি, আমি হাজির হয়ে যাব।'

ব্যথা সহ্য করেও হাসল গোল্ডেন সান। 'আমরা ভালই দেখিয়ে দিয়েছি, তাই না, মিস্টার রানা?'

ওর ক্ষতটা দেখল রানা। 'মাংস চিরে গেছে বুলেট। এবার সরে যেতে হবে এখান থেকে। এদের দলের আরও লোক আসবে এবার।'

'তুমি কোথাও চললে, বাছা?' জানতে চাইলেন ক্যাসল।

'বদমাস ক্যাল অ্যামেট,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'চুকিয়ে দেব ওর ঋণ।' খালি ম্যাগাযিন ফেলে নতুন আরেকটা ভরল পিস্তলে।

গরুর ছাউনি পুড়ছে লকলকে আগুনে।

ওদিকে যাওয়া অসম্ভব। প্রায় বিধ্বস্ত স্টোররুমে ঢুকল রানা, আগুনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে বেরোল ওপাশের উঠানে।

পলকের জন্যে দেখল, এইমাত্র বড় বার্নে ঢুকেছে অ্যামেট। ট্যাকটিকাল গিয়ারের জন্যে মন্থর লোকটা। দ্রুত পায়ে উঠান পেরিয়ে বার্নে ঢুকল রানা। বেশ কিছু দালানে আগুন ধরলেও, এটা অক্ষত।

বার্নের ভেতরে প্রায় অন্ধকার। পরিবেশ শীতল। সতর্ক চোখে চারপাশ দেখছে রানা। তখনই গাঢ় এক ছায়া থেকে বেরোল ক্যাল অ্যামেট, হাতে পিচফর্ক। রানার বুক লক্ষ্য করে গায়ের জোরে ছুঁড়ল ওটা।

ঝট্ করে সরে গেল রানা। পেছনে কাঠের গুঁড়ির দেয়ালে বিঁধল ত্রিশূলের মত জিনিস্টা।

টলমল করে নিজেকে সামলে নিল অ্যামেট, চোখে তীব্র ঘৃণা। প্যান্টের পকেটের ভেলক্রো স্ট্র্যাপ খুলে ছোঁ দিয়ে নিল ট্যাকটিকাল কমব্যাট নাইফ। কুঁজো হয়েছে আক্রমণোদ্যত হিংস্র জানোয়ারের মত।

'এভাবে আসা উচিত হয়নি তোমার,' নরম সুরে বলল রানা, 'মস্তবড় ভুল করেছ।'

কর্কশ গর্জন ছেড়ে ষাঁড়ের মত তেড়ে এল সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট, ছোরা চালাল রানার গলা লক্ষ্য করে। তবে বিদ্যুদ্বেগে এক পা সরে খপ্ করে কবজিটা ধরেই গায়ের জোরে মোচড় দিল রানা। অ্যামেটের হাত থেকে খসে পড়ল ছোরা।

কবজির ব্যথায় গুঙিয়ে উঠেছে লোকটা। শরীর মুচড়ে পিছিয়ে গেল ছায়ার ভেতর। বুঝে গেছে, বিসিআই এজেন্টের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না। ঘুরেই দৌড় দিল খড় রাখার দোতলা চাতালের দিকে। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ভীত চোখে। অস্ত্র হিসেবে কিছু পাওয়া যায় কি না, সেজন্যে পাগলের মত দু'পাশ খুঁজছে তার চোখ। বেড়া দেয়ার খুঁটি ভরা এক ভারী ড্রামে হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। বড় ওই ড্রামের ভেতর অনেকগুলো খুঁটি।

একটানে তুলে নিল একটা খুঁটি। ওটা পাইন কাঠের তৈরি। পাঁচ ফুট লম্বা। একদিক পেরেকের মত চোখা। বর্শার মত করে ওটা ছুঁড়তে চাইল অ্যামেট। তবে অনেক বেশি ভারী। একটু গিয়েই পড়ল মেঝেতে। এদিকে ওটার ওজন সামলাতে না পেরে বড় এক বৃত্তাকার করাতের হাউসিঙে পিছলে পড়ল লোকটা।

ধীর পায়ে হাঁটছে রানা। দু'জনই জানে, কোথাও পালাতে পারবে না অ্যামেট।

'এবার?' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'সঙ্গে তো অস্ত্র নেই। কাজেই খেলা খতম। তোমার উচিত ছিল না হামলা করা।'

আক্রান্ত ছুঁচোর মত কিঁচকিঁচ করে দুর্বল স্বরে কী যেন বলল অ্যামেট। সরু মই বেয়ে উঠতে লাগল খড় রাখার দোতলা চাতালে।

লোকটার পিছু নিয়ে তিরিশ ফুট ওপরের মেঝেতে উঠে এল রানা। সোনালি রোদ ছোট এক জানালায়। ধুলোভরা মাকড়সার জাল চারপাশে। সরাসরি ক্যাল অ্যামেটের মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল রানা।

খড়ের গাদায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অ্যামেট। গলা ভেঙে গেল তার, 'প্লিয, দয়া করো, মেরে ফেলো না!'

পিস্তল নামিয়ে বেল্টে গুঁজল রানা। সহজ সুরে বলল, 'না, তোমাকে খুন করব না।' ব্যাগ নামিয়ে খুঁজছে কী যেন।

ওর হাতে ছোট বোতল ও সিরিঞ্জ দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল অ্যামেট। হাত থেকে ব্যাগ ফেলে সিআইএ স্পেশাল এজেন্টের দিকে পা বাড়াল রানা। বোতল থেকে সিরিঞ্জে টেনে নিল স্বচ্ছ তরল। ঠিক জায়গায় নিল প্লাঞ্জার। এবার রক্তে বুদ্বুদ তৈরি করবে না বাতাস। ভীষণ আতঙ্কে হড়বড় করে কী যেন বলতে চাইল অ্যামেট। খপ্ করে ঘাড় চেপে ধরে মেঝেতে ফেলল রানা। ঘাড়ে গেঁথে দিল নিডল। চাপ তৈরি করল প্লাঞ্জারে।

ফুঁপিয়ে উঠল অ্যামেট। হাঁ হয়ে গেছে ভয়ে। দেখা গেল তার মুখের চৌকো কালো ফাঁক। 'ক্-কী করলে, রানা...'

পিছিয়ে এসে ছায়ায় খালি সিরিঞ্জ ফেলল রানা। চোখের সামনে দেখল, পাল্টে যাচ্ছে সিআইএ এজেন্টের চেহারা। মেঝেতে মাথা ঠুকতে শুরু করেছে সে। ছিঁড়তে লাগল মাথার চুল। মুখে আঙুল ভরে চাইছে বমি করতে। শরীর থেকে বের করবে ওই ড্রাগ। দরদর করে নেমেছে দু'চোখ থেকে অশ্রু।

'কেমন লাগছে, অ্যামেট?' বলল রানা। 'জানোই তো, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বদ্ধউন্মাদ হয়ে যাবে। ওই ভিডিয়োর লোকটার মত।'

'খুন করো... আমাকে খুন করো!' আবারও ফুঁপিয়ে উঠল অ্যামেট। মুখে লেগে আছে খড়। উঠে দাঁড়াল। 'দয়া করে আমাকে খুন করো, মিস্টার রানা!'

'সরি,' নিষ্ঠুর শোনাল বিসিআই এজেন্টের কণ্ঠ। 'এবার সব খুলে বলো।' বসল একটু দূরের খড়ের গাদায়। বুঝতে পারছে, লোকটার শিরার মাঝ দিয়ে বইছে ওই ড্রাগ। মাত্র একমিনিট পর অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেল অ্যামেট। আস্তে করে বসল খড়ের গাদায়।

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক থেকে হঠাৎ করেই হয়েছে নির্বিকার এক মানুষ। আরও দু'মিনিট পর শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। চোখ-মুখ নিস্পৃহ। অ্যানেস্থেযিয়া দেয়া মানুষের মত ঝুলে গেল গালের পেশি। বোধহয় জানেও না কী হচ্ছে। উল্টে গেল চোখের মণি। বিড়বিড় করে বলতে লাগল পেটের সব কথা।

ও নিজে এখন কী করবে, ভালভাবেই জানে রানা। সরকারী এজেন্ট এবং পুলিশ অফিসার খুনের দায়ে ওকে খুঁজছে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ। কাজেই চাই এমন প্রমাণ, যেটা নিরপরাধ হিসেবে মুক্ত করতে পারে ওকে। রানা আশা করছে, নানান তথ্য পাবে ক্যাল অ্যামেটের কাছ থেকে।

ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে অন করে ভিডিয়ো ক্যামেরা অ্যাকটিভেট করল রানা। ক্যামেরা স্ক্রিনে আনল অ্যামেটকে। জোর গলায় বলল, 'জানাও, তুমি আসলে কে।'

বারকয়েক চোখের পাতা নাড়ল অ্যামেট। তারপর দ্বিধা না করেই বলল, 'আমি ক্যাল অ্যামেট। কাজ করি সিআইএ-তে।'

মাথা দোলাল রানা। কাজ করছে ড্রাগ। এবার সামান্য মানসিক চাপ তৈরি করল ও, 'জানাও, কোর্ফিউ দ্বীপে প্রাক্তন দুই সরকারী অফিসার বয়েটার ও ক্রিস্টিনা কী করছিল। তাদের সঙ্গে ছিল সক্রিয় সিআইএর বেশ ক'জন এজেন্ট।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও নানান দিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার থেমে গেল অ্যামেট। বারবার পাকিয়ে ফেলল দুই মুঠো। যেন লড়াই চলছে মনের দুটো শক্তির মাঝে। কিন্তু জয়ী হলো ড্রাগ, কেমিকেল সিগনাল পাঠাল মগজে। 'ক্যাথি হার্বার্ট,' নিচু গলায় বলল অ্যামেট, 'ক্যাথি হার্বার্টকে কিডন্যাপ করেছিল ইউএস এজেন্টরা। মণ্ট্যানার প্রত্যন্ত এক আনঅথোরাইযড় ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে আসা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।'

'তোমার দায়িত্ব কী ছিল, এজেন্ট অ্যামেট?'

'মেয়েটার কাছ থেকে জরুরি তথ্য সংগ্রহ করা। দরকার হলে নির্যাতন করতে বলে দেয়া হয়।' মাথা নাড়ল অ্যামেট। 'কোনও বাধা এলে খুন করতে হবে শত্রুদেরকে। সেজন্যেই খুন করেছি ডাক্তার মাল্ডুন আর দুই পুলিশ অফিসারকে।' দরদর করে ঘামছে লোকটা। কপালে ফুটে উঠেছে নীল রগ। অন্তরের দুই ধরনের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠছে সে।

কাছ থেকে ক্যামেরা ধরল রানা। 'ক্যাথি হার্বার্টের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এত জরুরি কেন?'

'কারণ এসবে জড়িত জেরুযালেম।'

'খুলে বলো।'

চোখ উল্টে গেল অ্যামেটের। মুচড়ে ফেলল ঠোঁট। দেখা

দিল চৌকো গর্ত। তাকে দেখাল যোম্বির মত।

শিরশির করছে রানার শিরদাঁড়া। কী বলছে লোকটা?

'ঠেকাতে পারবে না,' চাপা স্বরে বলল অ্যামেট। 'শুরু হয়েছে, আর কিছু করতে পারবে না কেউ। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরম্ভ হবে সব।'

'কী শুরু হবে?'

'ওই মেয়ে কিছুই জানে না। আসল কথা হলো যুদ্ধ।'

'কীসের যুদ্ধ?'

চোখ আবারও উল্টে গেল অ্যামেটের। তারপর সরাসরি তাকাল রানার চোখে। অদ্ভুতভাবে হাসল। 'কেন? বাইবেলের সেই চরম শেষ যুদ্ধ?'

রানার মনে হলো কষে ওর গালে চড় দিয়েছে কেউ। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'বলতে থাকো।'

টপটপ করে নাক বেয়ে ঘাম পড়ছে অ্যামেটের। আগে কখনও কাউকে এভাবে ঘামতে দেখেনি রানা। ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল লোকটা। ছিঁড়তে চাইল গায়ের পোশাক। যেন আগুন ধরেছে তার গায়ে। নানান দিকে ঘোরাচ্ছে চোখ। কর্কশ স্বরে বলল, 'সময় ঘনিয়ে এল। মহাপ্রলয়। ওটা শুরু করবে ওরা। পটভূমি তৈরি। সব শুরু হবে জেরুযালেমে।'

'কী করবে ওরা?'

'মস্তবড় কিছু,' বলল অ্যামেট, 'তুমি বা কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। পারবে না ঠেকাতে।'

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। এক সেকেণ্ড পর বলল, 'এসব করছে বা করাচ্ছে থর্ন? কে সে?'

জমাট হাসি ফুটল অ্যামেটের মুখে। থরথর করে কাঁপছে লোকটা। বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

'পরিষ্কার করে বলো,' বলল রানা।

সরাসরি ওর চোখে তাকাল অ্যামেট। রক্তের মত লাল হয়েছে দু'চোখ। ফিসফিস করল, 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, কথা ঠিক। প্রশ্নের জবাব দাও।'

ড্রাগের কারণে বাকি জীবন পাগলাগারদে থাকবে, সেই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠছে অ্যামেট। কী যেন ভাবল। স্থির করল কিছু। তার চোখে বিপদের সঙ্কেত দেখল রানা। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল ওর।

হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল লোকটা, বাধা দেয়ার আগেই দৌড়ে পাশ কাটিয়ে গেল রানাকে। দুই সেকেণ্ডে দশ ফুট পেরিয়ে গেল অ্যামেট, পরক্ষণে ঝাঁপ দিল তিরিশ ফুট উঁচু দোতলা থেকে। কোনও রেলিং নেই যে বাধা দেবে। শূন্যে পাক খেল শরীরটা, পরের সেকেণ্ডে শুরু হলো পতন। লোকটার চোখের সাদা অংশ দেখল রানা।

কিন্তু নিচের মেঝেতে পড়ল না অ্যামেট।

কিছুক্ষণ আগে যে ড্রাম থেকে খুঁটি নিয়ে রানাকে গাঁথতে চেয়েছে ক্যাল অ্যামেট, সেসব খুঁটিই গেঁথে গেল তার পিঠে। দেহের ওজনে ঝাঁঝরা হলো বুকের পিঞ্জর। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাত হয়ে ঝুলে থাকল লোকটা। সরাসরি চেয়ে আছে ওপরে রানার চোখে। এক সেকেণ্ড পর তার মাথা ঠাস্ করে পড়ল পুরনো বৃত্তাকার করাতের ফলার ওপর। জং ধরা করাতের ফলা থেকে টপটপ করে নিচে পড়ল রক্ত ও গলে যাওয়া মগজ।

মোবাইল ফোন অফ করে পকেটে রাখল রানা। ব্যাগ তুলে নেমে এল নিচে। ঘুরপাক খাচ্ছে মনে ক্যাল অ্যামেটের বলা কথাগুলো।

ক্যাথিকে কিডন্যাপ করেছে প্রলয় ডেকে আনার জন্যে?

ব্যাপারটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না ওর।

হয়তো ড্রাগের ঘোরে যা খুশি বলেছে লোকটা।

কিন্তু...নাহ্!

লোকটার চোখে অন্য কিছু দেখেছে রানা।

সত্যি বলছিল সে!

সিআইএ এজেন্টের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবল, এসব থেকে কী বুঝব?

ক'সেকেণ্ড পর সতর্ক হয়ে উঠল রানা।

বাইরে আওয়াজ!

দৌড়ে বার্ন থেকে রোদে বেরিয়ে এল ও। গলির ভেতর এখনও দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। তাপ লাগছে মুখে। তাপ প্রবাহের মাঝ দিয়ে দেখল, খামারবাড়ির উঠানে একসঙ্গে নামছে চারটা হেলিকপ্টার। রঙ গাঢ় সবুজ। গায়ে সাদা লেখা: এফবিআই।

প্রথমটা বড় টুইন প্রপ বোয়িং। পিছলে খুলে গেল হ্যাচ। নেমে পড়ল এক লোক। পরনে ট্যাকটিকাল পোশাক নেই। ধূসর কোট। রোটরের দমকা হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো ধূসর চুল। মাথা নিচু করে ঘাস মাড়িয়ে দূরে সরল সে।

ওই লোকের পেছনেই আছে রেবেকা। চারপাশের জ্বলন্ত দালান ও কপ্টারের ধ্বংসস্তূপ দেখে বিস্ফারিত হয়েছে ওর চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল রানাকে। লক্ষ ওয়াটের দারুণ উজ্জ্বল এক হাসি ফুটল রেবেকার মুখে।

ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে হেঁটে ওর দিকে চলল রানা। বেল্ট থেকে নিয়ে ধুলোয় ফেলে দিল বেরেটা পিস্তল।

অন্য তিন হেলিকপ্টার নেমে পড়তেই ওগুলো থেকে বেরোল অন্তত বিশজন এজেন্ট। ধূসর কোট পরা লোকটা হেঁটে আসছে রানার দিকে। কোটের পকেট থেকে ব্যাজ নিয়ে ওপরে তুলে ধরল। ছুটে এসে তাকে প্রায় ঘিরে ধরল সশস্ত্র এজেন্টরা। সবার অস্ত্র তাক করা রানার বুকে।

গম্ভীর চেহারায় মাথার ওপরে হাত তুলল রানা।

'আমি সিআইএর স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন,' বলল ধূসর কোট, 'গ্রেফতার করা হচ্ছে আপনাকে, মিস্টার রানা।'

পঞ্চাশ

রানাকে ঘিরে ধরে বোয়িং কোম্পানির বড় হেলিকপ্টারে তুলল ক'জন সিআইএ এজেন্ট। জানালা দিয়ে রানা দেখল, কালো সানগ্লাস পরা ধূসর কোটের লোকটার ইশারায় আরেকটা কপ্টারে উঠল রেবেকা ও ক্যাথি। ওই যান্ত্রিক ফড়িঙে নিজেও উঠল লোকটা।

আকাশে দীর্ঘক্ষণ উড়ে চলল চার হেলিকপ্টার। সন্ধ্যার দিকে নামল ব্যক্তিগত কারও রানওয়েতে। অপেক্ষা করছিল কালো এসইউভি গাড়ি নিয়ে সশস্ত্র লোক। রানাকে তুলে দেয়া হলো চকচকে নতুন এক জেট বিমানে। গার্ডরা চোখ রাখল ওর ওপর। দূরের সিটে রেবেকা ও ক্যাথি।

টেকঅফের আধঘণ্টা পর বিমান নামল এক মিলিটারি এয়ারফিল্ডে। অপেক্ষা করছিল আরও কয়েকটা কালো গাড়ি। একটায় তোলা হলো রানাকে। দু'পাশে থাকল একজন করে এজেন্ট। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। তুমুল বেগে রওনা হলো গাড়ি। সামনে ও পেছনে কয়েকটা কালো এসইউভি। একটা কথাও বলল না কেউ।

কোথায় নেয়া হচ্ছে, বুঝে গেছে রানা।

গন্তব্য ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে সিআইএ হেডকোয়ার্টার। কিছুক্ষণ পর দূরে রানা দেখল বিশাল দালান।

উঁচু স্টিলের গেটের সামনে গাড়ির বহর ঠেকাল সশস্ত্র সিকিউরিটি পারসোনেলরা। গেটে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স

এজেন্সির ঈগল ও নক্ষত্রের সিল। হ্যামারস্টাইন তার কার্ড দেখাবার পর ছেড়ে দেয়া হলো পথ।

পেরোতে হলো কয়েকটা গেট, তারপর পৌঁছে গেল ওরা হাজারো জানালা বসানো মস্তবড় এক দালানের কাছে। সন্ধ্যার আঁধারে উজ্জ্বল আলোয় ওটা যেন ঝিকঝিক করা প্রকাণ্ড কোনও জাহাজ। ফ্লাডলাইটের আলোয় মৃদু হাওয়ায় উড়ছে আমেরিকার পতাকা। এখানে সবই মাপা। কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। প্রকাশ পাচ্ছে জাতীয় দম্ভ।

কয়েক সেকেণ্ড পর থামল গাড়ি, রানাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভবনের ভেতর। চারপাশে বহু মানুষের ব্যস্ততা। পেরোতে হলো কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী। চওড়া সব করিডোরে নানাদিকে চলেছে অসংখ্য কর্মী। রানাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত হাঁটছে স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। পেছনেই কালো কোট পরা ফেউয়ের মত ক'জন এজেন্ট। কাঁধের ওপর দিয়ে পনেরো গজ পেছনে রেবেকাকে দেখল রানা। মেয়েটাকে পাহারা দিয়ে আনছে আরেকদল এজেন্ট। রানার দিকে চেয়ে হাসল রেবেকা, তবে সেই হাসি নার্ভাস মানুষের। কোথাও দেখা গেল না ক্যাথিকে।

হ্যামারস্টাইনের পিছু নিয়ে মস্তবড় এক অপারেশন রুমে ঢুকল রানা। সারি সারি ডেস্কে কমপিউটার টার্মিনাল নিয়ে বসে আছে সিআইএ টেকনিশিয়ানরা। জায়গাটাকে স্টক এক্সচেঞ্জের মত লাগল ওর। শত শত স্ক্রিনে নানান দেশের তথ্য। দেয়ালে রঙিন পলিটিকাল ম্যাপ। বারবার বদলে যাচ্ছে দৃশ্য। সবার চোখ কমপিউটার স্ক্রিনে। গম্ভীর চেহারা। হয়তো ভাবছে পলক ফেললেই সর্বনাশ হয়ে যাবে আমেরিকার।

বিশাল অপারেশন রুম পেরিয়ে কাঁচের কয়েকটা স্লাইডিং ডোর পেরোল রানা। সামনেই ভার্টিকাল পর্দা দিয়ে ঘেরা ঘর। ওদেরকে দেখে ডেস্কের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল এক সিকিউরিটি গার্ড।

তার হাতে একটা কার্ড দিল হ্যামারস্টাইন। হুইশ্ আওয়াজে খুলে গেল পরের ঘরের দরজা। এজেন্টের পিছু নিয়ে লম্বাটে এক কনফারেন্স রুমে ঢুকল রানা।

মাঝে চকচকে কালো টেবিল। চারপাশে চামড়ামোড়া আরামদায়ক চেয়ার। তিনদিকের দেয়ালে কাঠের প্যানেল, চতুর্থ দিকে মস্ত মিরর উইণ্ডো। পাশে উড়ছে দুটো পতাকা। প্রথমটা ইউএসএর নক্ষত্র খচিত, দ্বিতীয়টা এমব্রয়ডারি করা সিআইএর সাদা-সোনালি পতাকা। বেশ নিচু ঘরের ছাত। ছাতে বেশ কয়েকটা স্পটলাইট।

রেবেকাকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল নীরব এজেন্টরা। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। রানার দিকে তাকাল রেবেকা। চোখ বলছে অনেক কথা, কিন্তু আপাতত মুখ খোলার উপায় নেই। দু'সেকেণ্ড ওর চোখে চেয়ে অভয় দিল রানার চোখ।

কনফারেন্স টেবিলের একমাথায় আছেন চওড়া কাঁধের এক কৃষ্ণ বর্ণের ভদ্রলোক। বয়স ষাটের কাছাকাছি। পরনে ধূসর কোট, গলায় নেভি টাই। বিচারকের মতই অত্যন্ত গম্ভীর তিনি। টেবিল ঘুরে গিয়ে তাঁর ডানদিকের চেয়ারে বসল হ্যামারস্টাইন। ঠিক করে নিল টাই। অপেক্ষা করছে কথা শুরু করবেন বস।

রানা বুঝল, সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে।

'আমার নাম জেরাল্ড ডালটন,' বললেন ভদ্রলোক। কণ্ঠ গম্ভীর, তবে মোলায়েম। চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। সিআইএর এই নতুন চিফ সম্বন্ধে কোনও বদনাম শোনেনি রানা।

অলসভঙ্গিতে হাত তুলে বামদিকের চেয়ার দেখালেন জেরাল্ড ডালটন। 'প্লিয, বসুন।'

বসল রানা। তিন ফুট দূরের চেয়ারে রেবেকা। নার্ভাস হয়ে খুক-খুক করে কাশল।

বন্দিকে ধরে এনে প্রথমেই ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে এই ঘর

রেখেছে সিআইএ, ভাবল রানা। সহজ সুরে জানতে চাইল ও, 'ক্যাথি কোথায়?'

'ভাল আছে,' শান্ত স্বরে বললেন ডালটন, 'এজেন্ট হ্যামারস্টাইনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার নিরাপত্তার।'

'সিআইএর হেফাজতে রাখা হয়েছে ওকে?'

'নিরাপদে আছে,' বললেন ডালটন, 'এর বেশি আপাতত আপনার জানার দরকার নেই।' ঠোঁট মুচড়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন তিনি। ক'মুহূর্ত পর একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন সরাসরি রানার চোখে। 'মস্ত বিপদে পড়েছি আমরা, মিস্টার রানা।' তাঁর চোখ পড়ল রেবেকার ওপর। 'এজেন্ট ট্রিপলার, তুমি বোধহয় বুঝতে পেরেছ, কত বড় ঝামেলায় আছ? মিটিং শুরুর আগে জরুরি কিছু বলার আছে তোমার?'

রেবেকাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মনে হলো রানার। আগেই সব জানানো হয়েছে জেরাল্ড ডালটনকে। এখন ঘরের মিরর উইণ্ডোর ওদিক থেকে দেখছে একদল লোক। শুনবে সব। রেকর্ড করবে কথা। ভিডিয়ো করা হবে প্রতিটি দৃশ্য।

'আসার পথে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছি, তার বাইরে আর কিছু বলার নেই আমার, স্যর,' শান্ত গলায় বলল রেবেকা।

'রেকর্ড করার জন্যে সব শুনব আবার প্রথম থেকে,' বললেন ডালটন।

শীতল হাসল স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন।

মেপে মেপে কথা বলতে শুরু করল সতর্ক রেবেকা। 'আমি ছিলাম ক্যাল অ্যামেটের দলে। আমাকে ধারণা দেয়া হয়: অনুমোদিত মিশনে কাজ করছি। কিন্তু পরে দেখলাম কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা, আর তাই মনে জেগে উঠল সন্দেহ। আমি সাক্ষ্য দেব, নিজ হাতে জর্জিয়ার দুই পুলিশ অফিসারকে খুন করেছে ক্যাল অ্যামেট। এ ছাড়া, চিনুকের কাছে একটা ফ্যাসিলিটিতে তার হাতে খুন হয়েছেন ডক্টর মাল্ডুন। প্রতিটি

ঘটনা ঘটেছে আমার চোখের সামনে। নিজ চোখে দেখেছি, মণ্ট্যানার ফ্যাসিলিটিতে অ্যামেট এবং তার দলের লোকরা আটকে রেখেছিল ক্যাথি হার্বার্টকে। আমরা বাধা না দিলে নির্যাতন করে মেয়েটাকে খুন করত তারা।'

টেবিলের ওদিক থেকে আক্রমণাত্মক সুরে বলল হ্যামারস্টাইন, 'অথচ সব জেনেও ঊর্ধ্বতন অফিসারকে জানাওনি।'

'স্যর, এজেন্ট অ্যামেট ছিল আমার ইমিডিয়েট সুপিরিয়র। নিজ নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হয়েছে আমাকে। রিপোর্টে লিখেছি, সে সময়ে কিছুই করার উপায় ছিল না বলে আমি লজ্জিত।'

চুপ করে আছেন জেরাল্ড ডালটন। কয়েক মুহূর্ত পর গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলালেন। 'পরে এই বিষয়ে আলাপ করব আমরা।' রানার দিকে তাকালেন। 'এবার আসা যাক আপনার বিষয়ে, মিস্টার রানা। আমরা ভাল করেই জানি আপনি কে। কাজেই নতুন করে পুরনো কথা তুলব না।'

ভদ্রলোকের স্থির দৃষ্টির বদলে তাঁকে একইরকম ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফেরত দিল রানা। 'আমি কিছুই গোপন করছি না।'

'মিস হার্বার্টের বাবা-মার কথায় মেয়েটাকে খুঁজে দেয়ার কাজ নেন আপনি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কাজটা নেয় আমার এক বন্ধু। আমি সরাসরি জড়িত ছিলাম না।'

'ঘটনা যা-ই হোক, পড়তে লাগল লাশের পর লাশ। প্রথমে গ্রিসে, তারপর জর্জিয়ায়। এরপর মণ্ট্যানায়। আমাদের তদন্ত দল এখনও ওই হোটেল থেকে এজেন্টদের লাশ বের করছে। কেউ সক্রিয় সরকারী এজেন্ট, আবার কেউ প্রাক্তন। যে খামারে আপনাকে পাওয়া গেছে, ওই জায়গা ছিল রণক্ষেত্রের মত। আপনি যেখানেই গেছেন, ধ্বংস হয়েছে ওই এলাকা। বিসিআই এজেন্ট হিসেবে আপনি এর কী ব্যাখ্যা

দেবেন?'

'আমাকে খুন করতে এসে কেউ মারা পড়লে সেটাকে আমি খুন বলে মনে করি না,' বলল রানা।

ডালটনের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। 'ও। বুঝলাম। তবুও ক্যাথি হার্বার্ট কিডন্যাপ হওয়ার পর আপনি জড়িয়ে যাওয়ায় কী হলো, তা একটু খুলে বলুন।'

'ক্যাথি হার্বার্টের জড়িয়ে যাওয়া কাকতালীয় ঘটনা,' বলল রানা। 'আসলে আরও অনেক বড় কিছু ঘটছে।'

'যেমন?'

'যেমন, যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হবে পৃথিবী জুড়ে,' বলল রানা।

'পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডালটন। 'আপনি জানিয়েছেন, গোপনে কোনও মিশনে জড়িয়ে গিয়েছিল এজেন্ট ক্যাল অ্যামেট। তার সঙ্গে ছিল সিআইএর একদল এজেন্ট।'

'আপনার নাকের ডগায় বসে যা খুশি করেছে,' বলল রানা, 'নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যবহার করছিল আপনাদের ফ্যাসিলিটি ও টাকা।'

'কী তাদের উদ্দেশ্য?'

'সেটা জানতে সময় লেগেছে আমার,' বলল রানা, 'আমার কাছ থেকে সবই জেনে নিয়েছে আপনার এজেন্টরা। তাদের কাছ থেকেই শুনতে পাবেন।'

'তবুও আপনিই বলুন।'

'সব শুরু হয়েছে বুক অভ রেভেলেশনের কল্যাণে,' বলল রানা।

বাঁকা হাসল হ্যামারস্টাইন। 'আপনি পাগল হয়ে যাননি তো? আমরা অভিশাপ আর জন্তুর গল্প শুনতে বসিনি।'

'আপনার অধীনস্থ অফিসারকে বলুন সব খুলে বলতে,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা।

‘আপনি চুপ করুন, হ্যামারস্টাইন,’ রানার ওপর থেকে চোখ সরালেন না ডালটন। ‘মিস্টার রানা, প্রথম থেকে বলুন। সব পরিষ্কারভাবে বুঝতে চাই।’

‘ক্যাল অ্যামেট যে খ্রিস্টান সংস্থার হয়ে কাজ করত, সেটার সদস্যরা চাইছে মহাপ্রলয় হোক পৃথিবীর বুকে। এবং যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার জন্যে জেরুযালেমে সন্ত্রাসী হামলা করবে তারা।’

হো-হো করে হেসে ফেলল সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন।

বিরক্ত চোখে তাকে দেখলেন ডালটন। চেহারা গম্ভীর।

‘আমার কথা অবিশ্বাস করতে পারেন, তবে আপনাদের নিজেদের লোকের মুখে শুনলে বিশ্বাস আসবে,’ বলল রানা। ‘ওই ফার্মে আমার ফোনটা নিয়েছেন এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। ওটা ফেরত দিন।’

‘কাকে কল দেবেন?’ হাসল হ্যামারস্টাইন। ‘উকিল?’

‘দেখবেন ক্যাল অ্যামেটের ভিডিয়ো।’

‘ওঁকে ফোনটা দিন,’ বললেন ডালটন।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল এজেন্ট, তারপর ব্রিফকেস খুলে বের করল স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ। ওটা থেকে নিল ফোন। বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ওটা নিয়ে অন করল রানা। মেনু থেকে অ্যামেটের ভিডিয়ো বের করল। সিআইএ চিফ ডালটন ও এজেন্ট হ্যামারস্টাইনের দিকে রাখল ফোনের স্ক্রিন, তারপর চালু করল ভিডিয়ো।

ছোট স্ক্রিনে মনোযোগ দিলেন ডালটন ও হ্যামারস্টাইন।

খড়ের গাদায় বসে কথা বলছে ক্যাল অ্যামেট।

একটু পর টাই ঠিক করে নড়েচড়ে বসল হ্যামারস্টাইন। আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন ডালটন। কয়েক সেকেণ্ড পর স্ক্রিন থেকে সরল অ্যামেট। শোনা গেল কেমন খচ-খচ আওয়াজ। ওপর থেকে পড়ে খুঁটিতে গেঁথে গেছে লোকটা। ভিডিয়ো

প্রোগ্রাম বন্ধ করল রানা।

'আশা করি আপনার জানা আছে, বেআইনীভাবে ওই স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে?' সতর্ক কণ্ঠে বললেন ডালটন। 'এই ভিডিয়ো কোনও ধরনের প্রমাণ নয়।'

'ওই লোকও আইনী কোনও কাজে ছিল না,' বলল রানা। 'ক্যাল অ্যামেট যে ট্রুথ সিরাম ক্যাথি হার্বার্টকে দিতে চেয়েছিল, ওই একই জিনিস ব্যবহার করেছি তার ওপর। ওই জিনিস কিন্তু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে পাবেন না।'

কড়া চোখে ওকে দেখলেন ডালটন। 'বলতে থাকুন।'

সংক্ষেপে সবই খুলে বলল রানা। বাদ পড়ল না কিছুই। ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখল, ভুরু কুঁচকে গেছে সিআইএ চিফের।

সন্দেহের চোখে রানাকে দেখল হ্যামারস্টাইন।

'যে থর্নের কথা বললেন, ওই লোক তো নির্দেশ দিত অ্যামেটকে, কিন্তু একবারও তার কথা নেই ভিডিয়োয় অ্যামেটের স্বীকারোক্তির ভেতর।'

'মিথ্যা বলছে না রানা,' নার্ভাস সুরে বলল রেবেকা।

'নিজে তুমি ওই লোককে কখনও দেখেছ?' কড়া সুরে রেবেকার কাছে জানতে চাইল হ্যামারস্টাইন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল রেবেকা, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, স্যর।'

হাসল স্পেশাল এজেন্ট। আঙুল তাক করল রানার দিকে। 'তার মানে, মাসুদ রানা একমাত্র মানুষ, যে কিনা বলছে থর্ন নামের এক লোক এসবের পেছনে আছে। প্রমাণ হিসেবে ধরার মত কিছুই নেই।'

'শুধু থর্ন?' বললেন ডালটন। 'নামের শুরু কী?'

'থর্ন নামটা নকলও হতে পারে,' বলল রানা।

'তার মানে আপনি মোটেও জানেন না সে কে,' বলল হ্যামারস্টাইন।

‘চেহারার বর্ণনা দিতে পারব,’ বলল রানা, ‘বয়স চল্লিশ। আমেরিকান। শ্বেতাঙ্গ। লালচে চুল। হালকা-পাতলা শরীর। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। পেশাদার। যদিও জানি না পেশা কী। লোভী চোখ। টাকা-পয়সার অভাব নেই। হাতে সোনার দামি হাতঘড়ি, তাতে ডায়মণ্ড বসানো।’

‘এমন লাখে লাখে লোক আছে আমেরিকায়,’ মাথা নাড়ল হ্যামারস্টাইন।

‘থর্নের ব্যাপারে আরও তথ্য চাই,’ কড়া সুরে বললেন ডালটন। ‘ওই লোক থেকে থাকলে, সে আছে আমাদের ডেটা বেস-এ।’ রানার দিকে তাকালেন। ‘বলুন তো, মিস্টার রানা, খ্রিস্টান একটা দল হঠাৎ কেন চাইছে যুদ্ধ বাধাতে? আপনার কোনও কারণ জানা আছে?’

‘আমার ধারণা, তারা চাইছে বাস্তব হয়ে উঠুক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী। হয়তো বিরক্ত ঈশ্বরের ওপর, তাই নিজেরাই নেমে পড়েছে যুদ্ধ বাধাতে। অথবা, এটা কোনও কৌশল, যেন সাধারণ মানুষ মনে করে সত্য হচ্ছে বাইবেলের বাণী। কোটি কোটি আমেরিকান সেক্ষেত্রে ধরে নেবে ফুরিয়ে এসেছে সময়। সামনেই মহাপ্রলয়। ঘটনা যাই হোক, আমার মনে হয়েছে, এসব করা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যে।’

‘জড়িত কারা?’ শান্ত কণ্ঠে বললেন ডালটন। ‘কোন্ স্তরের লোক তারা?’

‘তা আমার জানা নেই,’ বলল রানা। ‘তবে ধরে নিতে পারেন, চাল দেয়া হচ্ছে ওপর পর্যায় থেকে। দেশে দেশে বাধিয়ে দেয়া হবে যুদ্ধ। ভীষণ আতঙ্কে পড়বে সাধারণ মানুষ। আমেরিকার অন্তত পাঁচ কোটি ভোটারের কাছ থেকে ভোট চাইবে কেউ।’

‘এটা উন্মাদের মত কথা হলো,’ আপত্তির সুরে বলল হ্যামারস্টাইন। ‘আপনি স্রেফ আন্দাজ করছেন। শক্ত কোনও প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই।’

তাকে পাত্তা না দিয়ে রানাকে দেখছেন ডালটন। চেহারা বলে দিচ্ছে, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত। 'এসব থেকে আপনি কী ভাবছেন, মিস্টার রানা?'

'হাজার বছর ধরেই স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ জেরুযালেম,' বলল রানা। 'একই শহরে পাশাপাশি আছে ইহুদি ও মুসলিমদের পবিত্র স্থাপনা। রাগ ও হতাশার এলাকা। বলতে পারেন ধর্মীয় গান-পাউডারের বস্তা। সর্বনাশ করতে পারে আগুনের মাত্র একটা ফুলকি। গ্রাউণ্ড যিরো। যারা মনে করে সময় হয়েছে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার, তাদের চোখ পড়ে আছে জেরুযালেমের ওপর। সংখ্যায় এরা কোটি কোটি। বিশ্লেষণ করছে প্রতিটি ঘটনা। ওই এলাকার জন্যে পাল্টে যাচ্ছে রাজনৈতিক পরিবেশ।' এটুকু বলে চুপ হয়ে গেল রানা।

মাথা দোলালেন ডালটন। 'ঠিক আছে, আমি শুনছি। আপনি বলে যান।'

'ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, হামলা হবে ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় ইযরায়েলের ইহুদি জাতির ওপর,' বলল রানা। 'কিন্তু সেরকম কিছু ঘটাতে চাইলে কী করা উচিত?'

চুপ করে কী যেন ভাবছেন ডালটন। একটু পর বললেন, 'কাজে লাগাতে হবে জেরুযালেমের ধর্মীয় উত্তেজনাকে। উস্কে দিতে হবে মুসলিম নেতাদেরকে, যাতে তারা হামলা করে ইহুদিদের ওপর। তাতে ছড়িয়ে পড়বে আরব ভূখণ্ডে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।'

মাথা দোলাল রানা। 'সেক্ষেত্রে আগে হামলা করতে হবে মুসলিম নেতাদের ওপর। তাতে মুসলিম দেশগুলো চাইবে শত্রু রাষ্ট্রের ওপর হামলা করতে।'

'তার মানে, ধরে নিতে পারি, আগে আক্রমণ করা হবে মুসলিম নেতাদের ওপর।' আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন সিআইএ চিফ।

‘এমন কিছু করতে হবে, যেন খেপে ওঠে মুসলিম জগৎ,’ বলল রানা। ‘তা হবে এমন কিছু, যেমন আগে কখনও করা হয়নি। চরম প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবে মুসলিমরা।’

‘যেমন?’ ভুরু উঁচু করে রানার দিকে তাকালেন ডালটন।

‘আন্দাজ করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি,’ বলল রানা। ‘তবে সন্ত্রাসী কোনও হামলার কথাই ভাবছি। খুন হবেন রাজনৈতিক কোনও ইসলামী নেতা। অপমানিত হবে গোটা মুসলিম বিশ্ব।’

‘যে-কোনও কিছু হতে পারে,’ বললেন ডালটন। ‘কারা প্রতিপক্ষ, কী করবে, এসব একদম অজানা। কোথা থেকে শুরু করা উচিত, সেটাও আমাদের জানা নেই।’

‘আপনাদের শুধু জানা আছে দুটো তথ্য,’ বলল রানা। ‘জেরুযালেমে খারাপ কিছু হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। আর সব দোষ চাপিয়ে দেয়া হবে ইযরায়েলিদের ঘাড়ে।’

তিক্ত চেহারায় টেবিলে চাপড় মারল হ্যামারস্টাইন। ‘পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে।’

তার দিকে তাকালেন না সিআইএ চিফ ডালটন। হাতের ইশারা করলেন মিরর উইণ্ডোর দিকে।

রানা বুঝল, ওর ধারণাই ঠিক, ভিডিয়ো করা হচ্ছিল সব। মানা করে দেয়া হলো এখন।

‘স্টপ ট্র্যান্সক্রিপশন।’ রানা ও রেবেকার দিকে ফিরলেন ডালটন। কুঁচকে গেছে ভুরু। ‘এখন যা বলব, সেটা কখনও প্রকাশ করবেন না। তিন মাস আগে হারিয়ে গেছে ইযরায়েলি মোসাদ এজেন্ট জাত খুনি সলোমন রুশদি। তারপর থেকে সিআইএ তার কোনও খোঁজ বের করতে পারেনি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম খুন হয়ে গেছে। কিন্তু ওই খুনের জন্যে দায় নেয়নি কেউ। এরপর মাত্র একবারের জন্যে তাকে দেখা গেছে কোর্ফিউ দ্বীপে। আজ মিস্টার রানা যা বললেন, তাতে এখন মনে হচ্ছে, বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে রুশদিকে কিনে

নিয়েছে কেউ। বোমা ফাটিয়ে হাওয়া হয়েছে আগেও। প্রমাণ করা যায়নি যে সে দোষী।'

'খুনির অস্ত্র পেলে হয়তো হাতের ছাপ থেকে বুঝব, খুন করেছে সলোমন রুশদিই,' বলল রেবেকা।

'সঙ্গে পাবেন তার ক্রেডিট কার্ড ভরা মানি ব্যাগ,' বলল রানা। 'যেমন ৯/১১-এ পাওয়া গিয়েছিল সন্ত্রাসীদের আধ পোড়া আইডি।'

চোখ সরু করে ফেললেন ডালটন। চুপ করে আছেন।

'নোংরা লড়াইয়ে বড়ে ছাড়া খেলা যায় না,' যোগ করল রানা। 'সলোমন বড়ে। তার মাথার ওপরে আছে আপনাদের দেশের হাতি-ঘোড়া-নৌকা-মন্ত্রী; একদল ক্ষমতাশালী লোক।'

কড়া চোখে ওকে দেখে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল হ্যামারস্টাইন। 'স্যর, আশা করি এই লোকের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না? আন্দাজে যেদিক খুশি বন্দুক মারছে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডালটন, 'অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনছি মিস্টার রানার কথা। ...হ্যামারস্টাইন, আপনার যৌক্তিক কোনও কথা না থাকলে, দয়া করে চুপ করে থাকুন।'

মুখ লালচে করে নীরব হয়ে গেল হ্যামারস্টাইন।

টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে এলেন ডালটন। 'মিস্টার রানা, আপনি আছেন মস্ত বিপদে। খুনের দায়ে হয়তো জেল হবে পঞ্চাশ বছর। কারও সাধ্য নেই আপনাকে বের করে আনবে।'

'তা হলে ভরে দিন জেলেই,' নির্বিকার সুরে বলর রানা।

হাসলেন ডালটন। 'আমরা তা চাইছি না।'

'স্যর, আমি কিন্তু ওসব খুনের সাক্ষী,' প্রতিবাদের সুরে বলল রেবেকা। 'খুন করেছে ক্যাল অ্যামেট, রানা নন।'

কড়া চোখে ওকে দেখলেন ডালটন। 'মুখটা বন্ধ রাখো,

রেবেকা। নিজেও আছ বিপদে। তোমার রিপোর্টে উল্লেখ আছে, খুন করেছ সিআইএর এক এজেন্টকে।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'মিস্টার রানা, আপনি হয় আমাদের পক্ষে কাজ করবেন, অথবা দুই পুলিশ অফিসার আর এজেন্টদের খুনের দায়ে ফেঁসে যাবেন। অন্তত বিশ বছরের জেল হবে রেবেকা ট্রিপলারেরও।'

'আপনার মনে হয়েছে আমি উপযুক্ত লোক, আপনাদের হয়ে কাজ করব— এটা ভাবার কারণটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'নইলে বাকি জীবনেও আর বেরোতে পারবেন না জেল থেকে। ...স্নাইপার কাউন্টার স্নাইপারের লড়াই হলে, আপনার চেয়ে দক্ষ আর কাউকে পাব না। সেজন্যেই আপনাকে চাই।' শার্টের পকেট থেকে ম্যাচের বাক্স বের করলেন ডালটন। বাড়িয়ে দিলেন। 'ভেতরে পাবেন খরচ করা একটা কাঠি। ওটা দেখলে মনে পড়বে জর্জিয়ার এক রাইফেল শুটিঙের কথা।'

চুপ করে আছে রানা।

কয়েক মুহূর্ত পর বললেন ডালটন, 'আমার সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা বলব। তবে মনে হচ্ছে, সব শোনার পর উনি বলবেন, আপনি নিজে যেন যান ইযরায়েলে।'

'আমি তো আপনার সুপিরিয়র অফিসার, অর্থাৎ আমেরিকান প্রেসিডেন্টের চাকরি করি না,' বলল রানা।

'তা ঠিক,' মাথা দোলালেন ডালটন, 'বিমানে করে আসার সময় রিপোর্ট দিয়েছেন হ্যামারস্টাইন। বিস্তারিতভাবে সব শোনার সময় যখন জানলাম, আপনি জড়িয়ে গেছেন এসবে, তখনই বুঝেছি সাহায্য চাইলে এ কথাই বলবেন।'

'তো?'

'কাজেই ফোন দিয়েছি বিসিআই চিফের কাছে। খুলে বলেছি কী ধরনের সমস্যা।'

'কী বললেন তিনি?'

'জানালেন, আপনি চাইলে সিআইএর এই মিশনে যোগ দিতে পারেন, তাঁর কোনও আপত্তি নেই।'

'ফোন দিতে পারি তাঁর কাছে?' জানতে চাইল রানা।

'পারেন।' রানার মোবাইল ফোন দেখালেন ডালটন।

বিসিআই চিফের ব্যক্তিগত ফোনে কল দিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে রিসিভ করলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। 'হ্যালো, রানা।'

'স্যর, আমি...'

'তুমি আছ সিআইএ হেডকোয়ার্টারে,' মুখের কথা কেড়ে নিলেন রাহাত খান, চাপা কণ্ঠে উদ্বেগ। 'কথা হয়েছে চিফ ডালটনের সঙ্গে।'

'উনি চাইছেন আমি যেন ইযরায়েলে যাই।'

'যাবে কি না, তা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে, রানা। এ বিষয়ে আমার কোনও নির্দেশ বা বাধা নেই। তবে, ঘুরে আসাই বোধহয় ভাল। যদি ঠেকিয়ে দেয়া যায় ম্যাস মার্ডার, তা ইহুদি-খ্রিস্টান-মুসলিম সবার জন্যেই মঙ্গলকর। আমরা কেউ চাই না ধর্মের নামে যুদ্ধ বাধিয়ে খুন করা হোক নিরীহ মানুষ।'

চুপ করে আছে রানা।

'আর কিছু বলবে?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'না, স্যর,' বলল রানা, 'তা হলে পরে রিপোর্ট দেব আপনাকে।'

'গুড।' লাইন কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

চুপ করে আছেন সিআইএ চিফ জেরাল্ড ডালটন। বাংলায় বলা একটা কথাও বুঝতে পারেননি। তবে রানার চেহারা দেখে আঁচ করেছেন কিছু। 'জেরুযালেমে আপনাকে দরকারি প্রতিটি বিষয়ে সাহায্য করবেন হ্যামারস্টাইন,' বললেন তিনি। 'ওই শহরের সিআইএ এজেন্টদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া

হবে।'

'আমার কিছু শর্ত আছে,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন ডালটন। 'শুনতে আপত্তি নেই। বলুন।'

'পৌঁছে দিতে হবে ক্যাথি হার্বার্টকে ওর বাবা-মার কাছে।'

'অসম্ভব,' মাঝ থেকে বাগড়া দিল স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। 'সে আমাদের সাক্ষী।'

'অন্যায়কারী সিআইএ এজেন্টদের অসহায় শিকার ক্যাথি,' বলল রানা। 'জোর করে ওর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চেয়েছে তথ্য। কাজেই চাইব সেরা পুলিশ প্রহরা দিয়ে ওকে পাঠানো হবে ব্রিটেনে। ওখানেও নজর রাখতে হবে ওর ওপর। নইলে যে-কোনও সময়ে খুন হবে।'

কী যেন ভাবছেন ডালটন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'ঠিক আছে। আমি রাজি। কিন্তু পরে প্রয়োজন পড়লে সাক্ষ্য দেবে সে-কথা দিতে হবে তাকে।'

'আরও কিছু কথা আছে,' বলল রানা। 'ভবিষ্যতে অতীত তুলে অভিযোগ আনা যাবে না রেবেকার বিরুদ্ধে।'

মাথা দোলালেন সিআইএ চিফ। 'আর কিছু?'

'গ্রিসে কোর্ফিউ দ্বীপে রেখে এসেছি পুলিশ ক্যাপ্টেন আবদাল্লা অ্যানেস্তাসিয়োকে। চাই না ইউরোপে ফিরলে আমার পেছনে লেলিয়ে দিক ইণ্টারপোল অফিসকে।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ডালটন। 'বলে দেয়া হবে, জীবনেও আপনার নাম শোনেনি সে। আর কিছু?'

'না, আর কিছু না।'

'তো চুক্তি হয়ে গেল,' বললেন সিআইএ চিফ, 'প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব জেরুযালেমে।'

একান্ন

রাত দশটার পর কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরোল রানা ও রেবেকা। আগের মতই ব্যস্ত অপারেশন্স অফিস। ওদেরকে পথ দেখিয়ে দু'দফা কাঁচের দরজা পেরোলেন চিফ ডালটন। এসে ঢুকলেন কমপিউটার ল্যাবোরেটরিতে। ভেতরে গিজগিজ করছে নানান ইকুইপমেন্ট। গম্ভীর চেহারায় কাজ করছে ছয়জন স্টাফ।

টেকনিশিয়ানদের ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে একটা টার্মিনালে চোখ রেখেছে স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। চিফ ঘরে ঢুকতেই তাঁর দিকে এগিয়ে এল সে। 'সব মিলে ইউএসএতে আছে প্রায় ছয় হাজার থর্ন। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।'

কমপিউটার ডেস্কের দিকে তাকালেন ডালটন। 'চুলের রঙ, উচ্চতা, শরীরের গঠন, পেশা এসব থেকে পরিসর ছোট করে আনতে পারবেন না?'

'সময় লাগবে,' তিক্ত কণ্ঠে জানাল স্পেশাল এজেন্ট।

'বেশি সময় নেবেন না। সময় সংক্ষিপ্ত।'

কয়েক মিনিটের জন্যে লবিতে রানা ও রেবেকাকে রেখে ফোন করতে গেলেন জেরাল্ড ডালটন।

'উপকার করলে বলে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রেবেকা, 'নইলে চাকরি তো যেতই, জেলের রুটিও খেতাম।'

'তুমিও আমার জন্যে কম করোনি,' নরম সুরে বলল রানা। জানতে চাইল, 'দুটো বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করবে?'

মাথা দোলাল রেবেকা। 'বলো।'

‘প্রথম কথা, নজর রাখবে, যেন ইংল্যাণ্ডে বাবা-মার কাছে ফিরতে পারে ক্যাথি।’

‘অবশ্যই। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা কীসের?’

‘নিজের যত্ন নেবে। অপেক্ষা করবে। দেখবে তোমার জীবনে আসবে উপযুক্ত কেউ।’

রানার চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে ফেলল রেবেকা। ঠোঁটে ফুটে উঠল অনিশ্চিত হাসি। ‘তুমি কি আমাকে টা-টা দিচ্ছ?’

‘ঠিক তা নয়। তবে ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।’

কাতর চোখে ওর দিকে তাকাল রেবেকা। ‘ফোন করতে অনুমতি দেবে? মাঝে মাঝে?’

‘খুশি হব যোগাযোগ থাকলে।’ নিজের মোবাইল ফোন ও রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্কের ফোন নম্বর জানাল রানা। মাত্র দ্বিতীয়বারে সব মুখস্থ হয়ে গেল রেবেকার।

লবিতে খুলে গেল একটা দরজা, আবার উপস্থিত হলেন ডালটন। ‘কাজ শেষ। মাঝরাতে ইযরায়েলের উদ্দেশে রওনা হবে আপনার বিমান, মিস্টার এমআরনাইন।’

‘তারপর ওখানে নেমে?’ জানতে চাইল রানা।

ভুরু কুঁচকে ফেললেন সিআইএ চিফ। ‘জাল ছড়াতে শুরু করেছি আমরা। ধরে নিন, আপনি ওখানে পৌঁছুবার আগেই পাব নতুন তথ্য। জেরুযালেমে আমাদের এজেন্টরা খুঁজে বের করবে আসল টার্গেট। সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।’ হাতঘড়ি দেখে চোখ কুঁচকে ফেললেন তিনি। ‘আপনার পাশে কাজ করবেন স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন।’ রেবেকার দিকে তাকালেন তিনি। ‘মিস্টার রানার কথায় তোমার ওপর দায়িত্ব দিচ্ছি, এখন থেকে দেখভাল করবে ক্যাথি হার্বার্টের। চেনে, তাই নিজেকে নিরাপদ ভাববে তোমার সান্নিধ্যে। খুব উত্তেজিত। হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে পারবে ওকে।’

‘আমার সাধ্যমত করব,’ কথা দিল রেবেকা। ‘আজকের মত উঠুক আমার বাড়িতে।’

সন্তুষ্ট হাসলেন সিআইএ চিফ জেরাল্ড ডালটন। তাঁর চোখে রেবেকার জন্যে প্রশংসা দেখল রানা। ‘থ্যাঙ্ক ইউ, রেবেকা। তোমার বাড়ির বাইরে থাকবে তিনজন এজেন্ট। যদিও মনে করি না বিপদ হবে ওই মেয়ের।’ একটা দরজা দেখালেন তিনি। ‘ওই ঘরে আছে।’

দ্বিধা নিয়ে রানার দিকে তাকাল রেবেকা।

‘তা হলে আপাতত বিদায়,’ বলল রানা।

‘পরে দেখা হবে,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেবেকা।

‘আমেরিকায় ফিরলে যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে,’ বলল রানা।

ওর বাহু স্পর্শ করল রেবেকা। পরক্ষণে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা। রানার ঠোঁট নামল রেবেকার নরম ঠোঁটে। উদাস হয়ে অন্যদিকে তাকালেন সিআইএ চিফ।

‘সাবধান,’ ফিসফিস করে রানাকে বলল রেবেকা।

‘তুমিও,’ সরে এক পা পিছিয়ে গেল রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বামের ঘরে গিয়ে ঢুকল রেবেকা।

‘এবার চলুন, দেখা যাক হ্যামারস্টাইন খুঁজে বের করতে পেরেছেন কি না আপনার সেই লোককে,’ বললেন ডালটন।

পরের সত্তর মিনিট প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইনের সঙ্গে সময় ব্যয় করল রানা। কমপিউটারের স্ক্রিনে দেখল শত শত ফোটো। হাজার হাজার লোকের ভেতর থেকে খুঁজে পাওয়া গেল না থর্নকে। বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল রানা। ‘এদের মধ্যে নেই সে।’

চোখ সরু করে ওকে দেখল হ্যামারস্টাইন। ‘ভুল হচ্ছে না তো? সিআইএর সেরা সুপার কমপিউটারের ডেটা পাচ্ছেন আপনি।’

‘আমার কোনও ভুল হচ্ছে না,’ বলল রানা, ‘কখনও কারও চেহারা ভুলি না।’

‘তা হলে হয়তো নকল নাম ব্যবহার করেছে ওই লোক,’ বলল হ্যামারস্টাইন। ‘এমনই কিছু হবে, জানতাম। অবাক লাগছে এটা বুঝতে পারেননি ডালটন। এত খেটেও ফলাফল শূন্য। সময় নষ্ট কাকে বলে!’

চুপ করে থাকল রানা।

ডান আস্তিন গুটিয়ে হাতঘড়ি দেখল হ্যামারস্টাইন। ‘চলুন, যেতে হবে এয়ারফিল্ডে। হাতে বেশি সময় নেই।’

বায়ান্ন

ভার্জিনিয়া।

ল্যাংলিতে সিআইএর হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির ঘুমন্ত শেডি ওক পল্লী।

রাত সাড়ে এগারোটা।

নির্জন রাস্তার পাশেই রেবেকার কাঠের ছোট সাদা বাড়ি। ওটার সামনে থামল সিআইএর স্টাফ ভেহিকেল। পেছনের দরজা খুলে নেমে পড়ল রেবেকা ও ক্যাথি। ছোট্ট বাগান পেরিয়ে পৌঁছে গেল সদর দরজার সামনে। পুরো বাড়ি সার্চ করেও কোনও ছারপোকা পায়নি সিআইএ এজেন্টরা। দরজা খুলে ভেতরে রেবেকা ও ক্যাথিকে ঢুকতে দেখে আবারও গাড়ির কাছে ফিরল তিন এজেন্ট। কয়েক ঘণ্টা পর তাদের বদলে নতুন আরেক দল আসবে পাহারা দিতে।

খোলামেলা লিভিংরুমে বাতি জ্বেলে সহজ সুরে বলল

রেবেকা, 'মনে করো এটা তোমার নিজের বাড়ি।' পরিবেশ বেশ শীতল। ইমিটেশন ফায়ারপ্লেসে জ্বালল গ্যাসের নীল আগুন। পরখ করে দেখল, নতুন মেসেজ এসেছে কি না অ্যান্সার-ফোনে। না, কল করেনি কেউ।

চামড়ার সাদা সোফায় বসে চোখ ডলছে ক্যাথি।

'ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল রেবেকা। 'কোনও ড্রিঙ্ক নেবে?' কিচেনের র‍্যাক থেকে লাল ওয়াইনের বোতল এনে টেবিলে রাখল ও। দু'জনের জন্যে ঢেলে নিল বড় দুই গ্লাসে ওয়াইন। খুশি হয়ে গ্লাসটা নিল ক্যাথি।

'আপাতত এই বাড়িতেই থাকছি,' বলল রেবেকা।

'আগামীকাল হয়তো তুলে দেবে বিমানে,' মৃদু হেসে জানাল ক্যাথি।

'সময়টা খুব খারাপ কেটেছে, তাই না?' বলল রেবেকা।

মাথা দোলাল ক্যাথি। 'মনে আনতে চাই না ওসব। ভাবলে ভয় লাগে। বাড়ি ফিরলে একমাসেও বেরোব না।'

'তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন তোমার বাবা-মা।'

'ল্যাংলি থেকে ফোন করেছিলাম।'

'কী বললেন তাঁরা?'

'খুব কাঁদলেন।'

'বাড়ি ফিরলে নতুন করে আবারও কাঁদবেন, তবে সেটা আনন্দের কান্না।'

'হয়তো।'

'ডিনারে পিৎযা পছন্দ করো?'

'একটা কিছু হলেই হয়।'

'বলেছিলে তুমি ভেজিটারিয়ান। পিৎযায় পেপেরোনি আর অ্যানকোভি আছে, তোমারটা থেকে চেঁছে দেব?'

'থাকুক,' বলল ক্যাথি, 'যা খিদে লেগেছে, কাঁটাওয়ালা গাধাও আস্ত খেয়ে ফেলব।'

বেজে উঠল ল্যাণ্ড ফোন। স্পিকার অন করে কল রিসিভ

করল রেবেকা।

'সব ঠিক করা হয়েছে,' ভারী গলায় বললেন জেরাল্ড ডালটন। 'সকালে আর্লিংটন এয়ারপোর্ট থেকে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে লণ্ডনে যাচ্ছে মিস হার্বার্ট। সকাল দশটার পর তোমার বাড়িতে যাবেন হ্যামারস্টাইন, এস্কোর্ট করে মেয়েটাকে নিয়ে তুলে দেবেন বিমানে।'

'জী,' বলল রেবেকা।

'গত বেশ কিছু দিন মানসিক কষ্টে ছিলে, তোমাকে এক মাসের ছুটি দিয়েছি,' বললেন ডালটন।

ধন্যবাদ দিল রেবেকা।

ফোন রেখে দিলেন সিআইএ চিফ।

ফায়ারপ্লেসের আগুনের তাপে স্বাভাবিক হয়েছে ক্যাথি। খুলে ফেলল জাম্পার। পাশে ওটা রেখে বলল, 'ছুটি পেয়ে গেলে?'

মাথা দোলাল রেবেকা। চলে গেল কিচেনে। বের করল ফ্রিয থেকে পিৎযা। দু'মিনিট গরম করল মাইক্রোওয়েভ আভেনে, তারপর ডাইনিং টেবিলে ডাকল ক্যাথিকে। পিৎযা ও ওয়াইন নিয়ে মুখোমুখি বসল ওরা।

'ছোট হলেও সুন্দর বাড়ি,' মুখ ভরা খাবার নিয়ে মন্তব্য করল ক্যাথি।

'চলে। বেশিরভাগ সময় ফিরতে পারি না।'

'তা হলে এখানে একাই থাকো?'

'হ্যাঁ।'

'বয়ফ্রেণ্ড নেই?'

'নাহ্।'

ওয়াইন শেষ করে টেবিলে গ্লাস রাখল ক্যাথি। ঠোঁটে ফুটে উঠল দুষ্টুমির হাসি। 'তুমি মাসুদ রানাকে পছন্দ করো।'

ওয়াইনের বোতল নিতে গিয়েও থেমে গেল রেবেকা। 'এত সহজেই বোঝা যায়?'

‘তা যায়।’

ভুরু ওপরে তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেবেকা। ‘তা হলে অন্যদের কাছ থেকেও লুকাতে পারব না।’ ক্যাথির গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে দিল ও।

‘তোমাকেও খুব পছন্দ করে রানা।’

চুপ করে থাকল রেবেকা।

‘তবে আমাকে একেবারেই অপছন্দ করে,’ ভুরু কুঁচকে গ্লাসে চুমুক দিল ক্যাথি।

‘কখনও তেমন কিছু বলেনি আমাকে,’ মিথ্যা বলল রেবেকা।

‘দোষ দেব না ওকে। অন্যায় করেছি ওর ওপর। আসলে, অনেক মানুষের ক্ষতি করে ফেলেছি।’

‘নিজেও তুমি অনেক চাপে ছিলে।’

মাথা নাড়ল ক্যাথি। ‘মাফ পাব এমন মুখ আমার নেই। তবে বলব, রেবেকা, যত খারাপ কাজ করেছি, সেজন্যে আমি সত্যিই অন্তর থেকে দুঃখিত এবং লজ্জিত।’

ক্যাথির বাহুতে হালকা চাপড় দিল রেবেকা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। ‘অতীত নিয়ে আলাপ আমরা না-ই বা করলাম?’ মনে মনে বলল, সামনে কঠিন সময়। যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মস্তবড় বিপদে আছে রানা। অথচ, ওকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারবে না ও।

‘নিশ্চয়ই আবার রানার সঙ্গে দেখা হবে তোমার?’ জানতে চাইল ক্যাথি।

‘জানি না। তবে আশা করি। দেখা যাক।’

‘ওর সঙ্গে দেখা হলে আমার হয়ে একটা কথা বলবে?’

‘বলব। কী বলতে হবে?’

‘ওকে বলবে, আমি জানতাম না আমার জন্যে খুন হবে ওর বন্ধু। কারও ক্ষতি করতে চাইনি। ভেবেছিলাম, মিথ্যা বলে পাব অনেক টাকা। বুঝিনি, সেজন্যে এত ক্ষতি হবে

অনেকের। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'বলব ওকে, ভেবো না,' বলল রেবেকা।

নীল আগুনের দিকে চেয়ে রইল ক্যাথি। চোখ চলে গেছে বহু দূরে। ফিসফিস করে বলল, 'থ্যানাটসের জন্যে মনটা খুব পুড়ছে। মারা গেছে।' এক ফোঁটা অশ্রু নামল গালে। 'পিছলা সিম্পসনের জন্যেও খারাপ লাগছে। পা ভেঙে দিয়েছে বেচারার। কোথাও যাওয়ার নেই। ওর এত বড় ক্ষতি হবে, ভাবতেও পারিনি।'

'যা হওয়ার হয়েছে, অতীত ভুলে গুছিয়ে নিয়ো জীবনটা,' বলল রেবেকা।

'দেখো, একদম বদলে যাব,' বলল ক্যাথি। 'অনেক আগেই ছেলেমি বাদ দিয়ে বড় হয়ে ওঠা উচিত ছিল আমার।'

সান্ত্বনা দেয়ার কিছু নেই। জানতে চাইল রেবেকা, 'খুলব ওয়াইনের আরেকটা বোতল?'

মাথা দোলাল ক্যাথি।

তেপ্পান্ন

জেরুযালেম শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে বেন গুরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

ইযরায়েলি সময় বিকেল পৌনে চারটা।

সাদা আগুনের মত দাউদাউ করে জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্যের সূর্য। বিমান থেকে নেমেই নাকে-মুখে গরমের ঝাপটা খেল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই নিল ট্যাক্সি। প্লাস্টিকের সিটের গনগনে তাপে ওর মনে হলো ছারখার হয়ে

গেল নিতম্ব। তুমুল বেগে গন্তব্যের দিকে চলেছে তুবড়ে যাওয়া মার্সিডিয।

তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈশ্বর জেরুযালেম শহরকে দিয়েছেন দুনিয়ার নয়টি দিকের সব সৌন্দর্য। ওখানে লেখা নেই, দুনিয়ার এক শ' নয়টা সমস্যার মূল কারণ ওই শহর।

মেঘহীন নীলাকাশের সাদা দিগন্ত পর্যন্ত জ্বলছে সূর্যের আগুন। তাপ এতই বেশি, মন চায় ছুটে পালিয়ে যেতে। এই একই অবস্থা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার সব শহরে। চারপাশে কালচে ধোঁয়া আর বিকট সব আওয়াজ। অনেকটা হাজার কোটি পিঁপড়ের ঢিবির মত। ভ্যাঁ-পোঁ হর্ন বাজিয়ে অন্যসব গাড়ি পেছনে ফেলার প্রতিযোগিতায় নেমেছে সবাই। মাত্র কয়েক মাইল এলাকায় গিজগিজ করছে লাখ লাখ স্থানীয় লোকজন ও হাজারো টুরিস্ট। নানাদিকে ছুটছে যে-যার কাজে। দু'হাজার বছরেরও বেশি পুরনো বাড়ির পাশেই হয়তো আকাশচুম্বী সব আধুনিক দালান। একটু দূরেই ধর্মীয় প্রাচীন স্থাপনা। একেকটা এলাকার নাম অদ্ভুতঃ অ্যামিউনিশন হিল বা প্যারাট্রুপার্স রোড। মনে করিয়ে দেয় শহরের রক্তাক্ত সব ইতিহাস।

পৃথিবীর অন্য কোনও শহর জেরুযালেমের মত এভাবে এতবার হাত বদল হয়নি। কখনও দখল করেছে খ্রিস্টানরা, ইহুদিরা আবার কখনও মুসলিমরা। তিন ধর্মের আর্কিটেক্টদের চিন্তাভাবনার ছাপ আছে এসব দালানে। জেরুযালেমের দিকে যেতে যেতে ভাবছে রানা, ক্যাল অ্যামেটের কথা মিথ্যা না হলে, এ শহরের রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণেই যখন তখন আগুনের ফুলকি পড়বে ডিনামাইটের স্তূপে।

বিকেল সাড়ে চারটেয় ওর জন্যে নির্ধারিত হোটেলে উঠল রানা। শহরের প্রান্তে প্রায় ঘুমন্ত হোটেল। একটু দূর থেকে এল প্রচণ্ড আওয়াজে আযান। ওকে দেয়া হয়েছে খুব সাধারণ ঘর। তাতে কিছু যায় আসে না ওর। লাখখানেক তেলাপোকা

থাকলেও আপত্তি তুলত না।

বিরক্ত বোধ করছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, কীরে, ব্যাটা, তুই এখানে কী করছিস? সিআইএ সাহায্য চেয়েছে, কিন্তু তোর কী করতে হবে সেটাই তো তুই জানিস না!

তিলতিল করে ঘুরছে ঘড়ির কাঁটা। কিছুই করার নেই রানার। কিছুক্ষণ পর শাওয়ার সেরে পরে নিল নতুন পোশাক। আরেকবার দেখল জেরুযালেম শহরের ম্যাপ। কিছুক্ষণ পায়চারি করল ঘরের ভেতর। অপেক্ষা করছে ফোনে জরুরি কোনও তথ্য দেবেন সিআইএ চিফ ডালটন।

আরও কিছুক্ষণ পর মহাবিরক্ত হয়ে হোটেলের বার-এ এল রানা। ফাঁকা ঘর। মানুষ বলতে ও ছাড়া বুড়ো এক বারম্যান। স্টুলে বসে সিগারেট ধরাল ও। অর্ডার দিল। বৃদ্ধ বারম্যান ওর সামনে রাখল বরফের মত ঠাণ্ডা এক গ্লাস বিয়ার। সোনালি তরলে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে ছাতের দিকে উঠে যাওয়া সিগারেটের ধোঁয়া দেখছে রানা। আধঘণ্টা পর নিল আরেকটা বিয়ার। চুপ করে বসে থেকে হয়ে উঠছে অধৈর্য।

বিকেল পাঁচটা তিন মিনিটে বেজে উঠল ওর মোবাইল ফোন। কল রিসিভ করল রানা।

'মিস্টার রানা, হ্যামারস্টাইন বলছি। লিখে নিন ঠিকানা।'

পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুক ও কলম নিল রানা। 'বলুন।'

ঠিকানা জানানোর পর বলল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন, 'জেরুযালেমের পুরনো অংশে ওটা। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহুদি কোয়ার্টারে। সাড়ে ছয়টায় ওখানে উপস্থিত হবেন।'

'কে ওই লোক?'

'কিছু তথ্য দেবে। পেয়ে যাবেন দরকারি সব কিছু।'

'আপনাদের লোক?'

'ওটা আমাদের অপারেশনাল হাউস।'

'স্লিপার এজেন্ট?'

'ওকে একটা রত্নও বলতে পারেন।'

'কী দেবে সে?'

'আপনার কথাই ঠিক, ঘনিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর বিপদ,' বলল হ্যামারস্টাইন, 'আমার ধারণা, ওটাই মোসাদ এজেন্টের টার্গেট। আমাদের ওই লোকের কাছে পাবেন জরুরি তথ্য। সব ভালভাবে শুনে নেবেন তার কাছ থেকে।'

'নাম কী তার?' জানতে চাইল রানা।

'নাম জানা দরকারি নয়,' বলল অধৈর্য হ্যামারস্টাইন, 'আমরা কৃতজ্ঞ, ঠিক ইনফর্মেশনই দিয়েছিলেন আপনি। বাধ্য হয়েই নিয়ম ভেঙে ফোন করতে হলো। সময় খুব সংক্ষিপ্ত। ওখানে পৌঁছে যেতে দেরি করবেন না। আপনার ওপর নির্ভর করছি আমরা।'

'থর্ন সম্পর্কে কিছু জানলেন?'

'এখনও না। ঠিকই খুঁজে পাব। আপনি চিন্তা করবেন না। জরুরি কাজটা শেষ করুন, ঠিক আছে?'

'আর ক্যাথি?'

'চুক্তির শর্ত অনুযায়ী একটু পর মেয়েটাকে পৌঁছে দেব এয়ারপোর্টে। ইংল্যাণ্ডে ফিরছে সে।'

'বাড়ি ফিরল কি না, সেটা দেখব,' বলল রানা।

'তাই করবেন। আরেকটা কথা, মিস্টার রানা...' চুপ হয়ে গেল হ্যামারস্টাইন।

'কী?'

'গুড লাক,' ফোন রেখে দিল সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট।

মোবাইল ফোন রেখে কয়েক ঢোকে বিয়ার শেষ করল রানা, চিন্তিত। এবার ঘটবে নতুন কিছু। হ্যামারস্টাইনের লোক জানাবে কী করতে হবে। তার তথ্য ভুয়া না সঠিক, সেটা বুঝতে হলেও ওকে যেতে হবে ওই ঠিকানা অনুযায়ী।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আগুনের মত গরম রোদে পড়ল রানা। প্রথম সুযোগে ট্যাক্সি-ক্যাব ডেকে চেপে বসল। পুরনো জেরুযালেমের উদ্দেশে ঝড়ের বেগে চলেছে গাড়ি। রানা ভাবছে, লোকটা জরুরি তথ্য দিলে তখন কী করতে হবে ওকে?

দামাস্কাস গেট দিয়ে পুরনো শহরে ঢুকল ট্যাক্সি।

চারপাশে ভিড়। নানান দোকান থেকে হাজারো জিনিস কিনছে অজস্র লোক। তাদের মাঝে আছে টুরিস্ট, রাস্তার হকার, মানি চেঞ্জার, ঠেলাগাড়িসহ ছেলেরা আর ভিক্ষুকের দল। ট্যাক্সি যানজটে এগোবে না বুঝে নেমে পড়ল রানা। চলেছে ফুটপাথের দোকান এঁড়িয়ে। খাবার, খবরের কাগজ, নকল লিভাইস জিন্স, ইলেকট্রিকাল সামগ্রী থেকে শুরু করে ইযরায়েলি কোলা সবই পাওয়া যায় এসব দোকানে। ভিড়ের মাঝে হাঁটছে একদল ইযরায়েলি সৈনিক। গলার কাছে খোলা খাকি ইউনিফর্ম। চোখে কালো সানগ্লাস। হাতে গ্রেনেড লঞ্চারসহ গ্যালিল অ্যাসল্ট রাইফেল। প্রতিটি অস্ত্র কক করা। প্রয়োজনে গুলি চালাতে দেরি করবে না সৈনিকরা।

দ্রুত হাঁটছে রানা। পুরনো শহরে পৌঁছে গেছে প্রায়। জায়গাটা গোলকধাঁধার মত। ছায়াময় সব পেঁচানো রাস্তা। হাজারো বছরের আলোড়ন-সৃষ্টি করা ইতিহাস রয়েছে এদের একেকটার।

একটু পর রানা পৌঁছে গেল ডোলোরোসায়। এখানে প্রতি বছর আসে দশ লাখ খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী। এ পথেই একসময়ে ক্রুশ বহন করে মৃত্যুর দিকে হেঁটে গিয়েছিলেন যিশু। কয়েক মিনিট পর পুরনো শহরের খ্রিস্টান কোয়ার্টারে হাজির হলো রানা। ওখানে থেমে কপালে হাত রেখে কড়া রোদ এড়িয়ে দেখল বিশাল দালান।

আগেও এ ভবন দেখেছে রানা।

দ্য চার্চ অভ দ্য হোলি সেপুলকার। খ্রিস্টানদের জন্যে

অত্যন্ত পবিত্র। এখানেই কবর দেয়া হয়েছিল যিশুকে। পরে পুনরুত্থান হয় তাঁর। শত শত বছর ধরে ধার্মিকরা পাথরে খোদাই করেছেন যিশুর সেসব দৃশ্য। দুনিয়ার দূরপ্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে প্রার্থনার জন্যে। ধরে নেয়া হয়, তাতেই পাবে স্বর্গে যাওয়ার টিকেট।

আজও বহু মানুষের ভিড় ওই চার্চে। আর্চ করা ফটক দিয়ে ঢুকছে-বেরোচ্ছে পশ্চিমা টুরিস্ট ও তীর্থযাত্রী। অসংখ্য মানুষের পরনে টি-শার্ট ও শর্টস্। প্রায় সবার হাতে গাইডবুক, ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন। অবাক হয়ে দেখছে দু'হাজার বছর আগের আর্কিটেকচার। চারপাশে প্রচুর মানুষের চিৎকার ও জোর গুঞ্জন।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবল রানা, এরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু এদেরই ভেতর আছে নিষ্ঠুর এক আততায়ী। তাকে ব্যবহার করে ক্ষমতা চাইছে কেউ। যে-কোনও সময়ে হবে হামলা। সাধারণ মানুষ চাইবে না পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ হোক। অথচ বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা চাইছে স্টিভ বার্কলের মত আর একজন লোভী লোক।

অবশ্য, সভ্যতার প্রথম আলো থেকেই প্রতিটি ধর্মের সাধারণ ধার্মিক মানুষের মাথায় কাঁচা কাঁঠাল ভেঙেই ক্ষমতায় গেছে অতিবুদ্ধিমান লোকেরা। প্রয়োজনে নিজেই ভূমিকা নিয়েছে ঈশ্বরের। স্থির করে দিয়েছে, কে বাঁচবে, আর কাকে মরতে হবে।

হাতঘড়ি দেখল রানা।

ছয়টা চোদ্দ।

পকেট থেকে বের করে দেখল ঠিকানা লেখা কাগজ। কাছের রাস্তায় পৌঁছে অন্য কেউ দখল করার আগেই নিল তুবড়ে যাওয়া আরেকটা সাদা মার্সিডিয ট্যাক্সি। ঠিকানা জানাতেই মাথা দোলাল নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়িওয়ালা ড্রাইভার। কোথায় যেতে হবে জানে সে।

সিটের পিঠে হেলান দিয়ে বসল রানা। একটু পর জানবে কী হতে চলেছে জেরুযালেমে। ওর কাজ হবে ওই দুর্ঘটনা ঠেকিয়ে দেয়া।

চুয়ান্ন

ভার্জিনিয়ার শেডি ওক কাউণ্টি।

ইউএস সময় অনুযায়ী এখন বাজে সকাল দশটা পাঁচ।

কলিং বেল বাজতেই দরজা খুলল রেবেকা।

কাঁচা সোনার মত রোদে দাঁড়িয়ে আছে স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। পেছনে আরও দুই এজেন্ট। রেবেকা দরজা ছেড়ে দাঁড়াতেই ভেতরে ঢুকল তারা। 'মেয়েটা তৈরি?' জানতে চাইল হ্যামারস্টাইন।

নিচে আওয়াজ শুনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ক্যাথি। 'আমি রেডি।'

'দরকারি সব নিয়েছ?' জানতে চাইল রেবেকা।

'তেমন কিছু আনিইনি,' হাসল ক্যাথি, 'ঠিক আছে, রেবেকা, আশা করি আবারও দেখা হবে। কখনও ইংল্যাণ্ডে এলে তোমার জন্যে সবসময় খোলা থাকবে আমার দরজা।'

ভদ্রতা করে মাথা দোলাল রেবেকা। 'সুযোগ পেলে চলে এসো তুমিও।'

'আমার জন্যে যা করেছ, কোনদিন ভুলব না,' বলল ক্যাথি। শক্ত হাতে রেবেকার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ও।

তিন এজেন্টের পিছু নিয়ে কালো জিএমসি জিপে উঠল ক্যাথি। দু'পাশে বসল দুই এজেন্ট। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে

চাপল হ্যামারস্টাইন।

ক্যাথির উদ্দেশে হাত নাড়ল রেবেকা, তারপর দরজা বন্ধ করে ফিরল লিভিংরুমে। এবার কী করবে ভাবতে গিয়ে বসল সোফায়। ওর চোখের কোণে ঝিকিয়ে উঠল কী যেন। কফি টেবিলের পাশে কাঠের মেঝেতে ক্যাথির পুরনো আমলের সেই ব্রেসলেট্। জাম্পার খোলার সময় পড়ে গিয়েছিল।

'যাহ্,' বিড়বিড় করল রেবেকা। জিনিসটা বোধহয় ক্যাথির খুব প্রিয়, নইলে সবসময় পরত না। দু'সেকেণ্ড পর রেবেকা বুঝল, কী করতে হবে ওকে। তাকাল জানালা দিয়ে। এরই ভেতর অনেকটা দূরে চলে গেছে কালো জিএমসি জিপ। জ্বলে উঠল লাল ব্রেক লাইট, তারপর বামে বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল ওটা।

কী করবে ঠিক করে ফেলল রেবেকা। মাত্র কয়েক মাইল দূরেই এয়ারপোর্ট। এখনও সময় আছে মেয়েটাকে ব্রেসলেট ফেরত দেয়ার। বাড়ির পাশেই আছে ওর ভিডাব্লিউ বিটল। দরজার হুক থেকে ওটার চাবি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রেবেকা।

আধমিনিট পর রওনা হলো গাড়ি নিয়ে। কয়েক শ' গজ যেতেই মনে পড়ল, ফোন করে গাড়ি থামাতে বলতে পারে হ্যামারস্টাইনকে। চট্ করে ফেরত দিতে পারবে ক্যাথির ব্রেসলেট। তখনই মনে পড়ল, ফোন রেখে এসেছে বাড়িতে। এখন আবার ফিরলে সময় নষ্ট হবে। অ্যাক্সেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল রেবেকা।

দু'পাশে শহরতলীর নীরব ছোট-বড় বাড়ি। বামে বাঁক নিয়ে হাইওয়েতে পড়ল রেবেকা। চলেছে সারি সারি গাড়ি। দূরে কালো জিএমসি জিপ। ওটার ওপর চোখ রেখে চেনা পথে ষাট মাইল বেগে চলেছে রেবেকা। সিডিতে ছাড়ল ওর প্রিয় মোযার্টের সিম্ফনি।

কয়েক মিনিট পর জিপ পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে যাওয়ার

টার্নঅফ-এ। রেবেকাও চট্ করে দেখে নিল রিয়ার ভিউ মিরর। এবার ইণ্ডিকেটর দেখিয়ে সরে যাবে অন্য লেন-এ।

কিন্তু লেন বদল করল না জিএমসি, সোজা চলেছে হাইওয়ে ধরে।

ভুরু কুঁচকে গেল রেবেকার। সাঁই করে পেছনে পড়ল এয়ারপোর্টের সাইনবোর্ড। বিস্মিত হয়েছে ও। চিফ ডালটন বলেছিলেন, সোজা ক্যাথিকে তুলে দেয়া হবে বিমানে। তা হলে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে?

গতি না বাড়িয়ে একই বেগে এগিয়ে চলল রেবেকা। বোধ করছে কেমন এক অস্বস্তি। পেরিয়ে গেল অনেকটা সময়। ফুরিয়ে গেল সিম্ফনি। ওটার দিকে খেয়াল নেই ওর। মাথার ওপর জমেছে ভারী কালো মেঘ। একটু পর নামল বৃষ্টি। টাশ্-টাশ্ আওয়াজে পড়ছে গাড়ির ছাতে।

হাইওয়ে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সরু এক রাস্তায় চলেছে জিএমসি। এখন আর আশপাশে গাড়ি নেই। শুরু হয়েছে দু'পাশে ঘন জঙ্গল। ল্যাংলি ও ওয়াশিংটন ডি.সি. পেছনে পড়েছে অনেক আগে। রেবেকা ভাবল, ঈশ্বর জানেন কোথায় যাচ্ছে এরা! গতি কমিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল। অনুসরণ করছে দূর থেকে।

জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকছে জিপ। রেবেকার গাড়ির উইণ্ডশিল্ড বেয়ে ঝরঝর করে নামছে বৃষ্টির ধারা। দ্বিগুণ জোরে কাজ করছে ওয়াইপার। সামনের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলা কালো সাপের মত। দূরে থেকে জিপের ওপর চোখ রাখল রেবেকা।

দুশ্চিন্তা কুরে খাচ্ছে ওকে।

কী করছেন হ্যামারস্টাইন?

এখন খুব ভাল হতো সিআইএ চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে। মস্ত ভুল করেছে ফোন না এনে।

ফোক্সভাগেনের ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি দেখাচ্ছে সকাল প্রায়

এগারোটা। নেমে এসে লাল দাগের কাছে পৌঁছে গেছে ফিউয়েল গজের কাঁটা। একটু পর তেল ফুরিয়ে গেলে নির্জন এলাকায় আটকা পড়বে ও। তবে আরও পাঁচ মিনিট পর সরু রাস্তা থেকে নেমে গেল জিএমসি জিপ। ষাট গজ পেছনে চলেছে রেবেকা। পরিষ্কার দেখল, জ্বলে উঠল ব্রেক লাইট। নেমে পড়েছে গাড়িটা জঙ্গুলে এক পথে। ছলাৎ-ছলাৎ করে ছিটিয়ে দিচ্ছে অগভীর ডোবার পানি। সাবধানে পিছু নিল রেবেকা।

এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে চলেছে জিএমসি জিপ। একটু পর থামল ফার্নে প্রায় অর্ধেক ঢাকা এক উঁচু গেটের সামনে। এখন তুমুল বেগে নেমেছে বৃষ্টি।

আরও কয়েক গজ যাওয়ার পর ফোক্সভাগেনের ইঞ্জিন বন্ধ করল রেবেকা। গাড়ি রাখল কয়েকটা ঝোপের আড়ালে। নেমে পড়ল বৃষ্টির ভেতর। ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে চোখ রাখল সামনে। জিপ থেকে নেমে পড়েছে এক এজেন্ট। খুলে ফেলল গেটের তালা। ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজে সরে গেল দুই কবাট। গাড়ি ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কয়েক মুহূর্ত পর ক্যাথির আর্তচিৎকার শুনল রেবেকা।

ওর কাছে ফোন বা অস্ত্র নেই। মনে হলো কষে চড়িয়ে দেয়া উচিত নিজেকে। আগে কখনও এত অসহায় বোধ করেনি। সামান্য দ্বিধা নিয়ে এগোল ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে। সতর্ক, যেন পায়ের নিচে মট্ করে না ভাঙে কোনও ডাল। কিছুক্ষণের ভেতর ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল। গেটের কাছে পৌঁছে চোখ রাখল ওদিকে। একটু দূরেই বিশাল এক বাড়ি। বড়লোকের নির্জন কোনও বিলাসবহুল হান্টিং লজ। অবশ্য, আগাছায় ভরে গেছে বাগান। হয়তো বছরে দু'বছরে আসে মালিক।

হ্যামারস্টাইনের দুই লোক জিএমসি জিপ থেকে টেনে নামিয়েছে ক্যাথিকে। ঠেলে নিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। সবার

আগে হ্যামারস্টাইন। খুলে ফেলল বাড়ির সদর দরজা। ঠেলে ভেতরে নেয়া হলো ক্যাথিকে। পাগলের মত লাথি ছুঁড়ছে মেয়েটা। সেই সঙ্গে করুণ আর্তচিৎকার। ধুপ করে বন্ধ হলো দরজা।

বুকের ভেতর লাফাচ্ছে রেবেকার হৃৎপিণ্ড। চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। সকাল এগারোটা বারো। আন্দাজ করতে চাইল, আসলে কোথায় আছে ওরা।

চোরের মত খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল রেবেকা। সরে গেল বাগানের ঝোপঝাড়ের আড়ালে। মনে হলো না নজর রেখেছে কেউ। বাড়ির জানালার সব কবাট বন্ধ। খুব সাবধানে বাড়িটার দিকে এগোল রেবেকা। গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড। থেমে গিয়ে কান পাতল। কিন্তু ভেতরে কোনও আওয়াজ নেই।

কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর পিস্তলের হ্যামার কক করার ধাতব ক্লিক শব্দ পেল রেবেকা। ওর মাথার পেছনে ঠেসে ধরা হয়েছে শক্ত একটা মাযল।

'তোমার মত বোকা মেয়ে দেখিনি,' অচেনা এক লোকের কণ্ঠ শুনল রেবেকা। 'ওদের পিছু নিয়েছিলে। আর আমি যে তোমার পেছনে সেদিকে কোনও খেয়াল নেই।'

ঝুঁকি নিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রেবেকা।

পেছনের লোকটা হালকা-পাতলা। পরনের দামি কোটের ওপরে লম্বা রেইন কোট। চুল লালচে। চোখে কৌতুক। একহাতে পিস্তল, অন্য হাতে ছাতা থেকে ছিটকে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা।

'তুমিই থর্ন,' শুকনো গলায় বলল রেবেকা।

'আর তুমি এজেন্ট ট্রিপলার। সুন্দরী, বিদূষী। অনেক নাম শুনেছি তোমার।'

চমকে গেছে রেবেকা। ভাবতেও পারেনি, একই দলের লোক হ্যামারস্টাইন ও থর্ন!

পিস্তলের নল দিয়ে বাড়ির দিকে ইশারা করল লোকটা। ‘সামনে বাড়ো। মাথার ওপর রাখবে হাত। খুন হবে ও-দুটো নামালেই।’

হাঁটতে লাগল রেবেকা। পেছনে থর্ন। ঢুকে পড়ল ওরা বাড়িতে। প্রথম ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র অভিজাত। প্রায়ান্ধকারে চকচক করছে কালচে কাঠের প্যানেল। একটু দূরে পাথরের ফায়ারপ্লেস। ওখানে পড়ে আছে পুরনো ধূসর ছাই ও পোড়া, কালো চ্যালা কাঠ। দেয়াল থেকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বড় সব শিকারের ট্রফি। হরিণের মস্ত শিং তৈরি করেছে বিদঘুটে ছায়া। শীতে কাঁপছে রেবেকা। ওর শরীরের পানি টপটপ করে পড়ছে ফ্ল্যাগস্টোনে।

পায়ের প্রতিধ্বনি উঠল হলওয়েতে। দড়াম করে খুলল একটা দরজা। ভেতরে ঢুকল হ্যামারস্টাইন। রাগে বিকৃত চেহারা। পেছনে আরও তিন এজেন্ট। সবার হাতে পিস্তল।

‘আমাদের নতুন অতিথি,’ রেবেকাকে দেখাল থর্ন।

কড়া চোখে ওকে দেখল হ্যামারস্টাইন। ‘নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না, রেবেকা ট্রিপলার? চালাকি করতে গিয়ে করেছ বোকামি।’ দলের অন্যদের দিকে ইশারা করল সে। ‘সার্চ করো ওকে।’

মুখ থেকে ভেজা চুল সরিয়ে জানতে চাইল রেবেকা, ‘ক্যাথি কোথায়? কী করেছ ওর?’

হাসল হ্যামারস্টাইন। ‘দেখা করবে? এসো!’

সার্চ করার পর পিস্তলের মুখে নিরস্ত্র রেবেকাকে নেয়া হলো বেসমেন্টের আঁকাবাঁকা ছায়াময় এক করিডোরে। আগে চলেছে হ্যামারস্টাইন ও থর্ন। প্যাসেজের শেষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামল তারা। থামল লোহার পেরেক দিয়ে পোক্ত করা এক পুরু কাঠের দরজার সামনে। লোহার বড় চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলল হ্যামারস্টাইন। ধাক্কা দিয়ে খুলল কবাট। পিঠে ঠেলা খেয়ে সামনে বাড়ল রেবেকা। নিচে

নেমেছে পাথরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে নিচের কংক্রিট সেলারে পড়ল বেচারি। ঠোঁটের রক্তের লবণ টের পেল জিভে। উঠে দাঁড়াল টলমল করে।

সাবধানে তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে থামল রনসন থর্ন। খুশিতে চকচক করছে চোখ। রেলিঙে হাত রেখে নরম সুরে বলল, 'কী লজ্জা!' লোভী চোখে দেখছে রেবেকার ভেজা দেহ। সেঁটে থাকা পোশাক ফুটিয়ে তুলেছে কমনীয় অঙ্গ। 'শরীরটা কিন্তু সত্যিই দারুণ!'

পেছনে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনল রেবেকা। ঘুরে দাঁড়াল। পেছনের দেয়ালের ছায়ায় আছে ক্যাথি। গাল ভিজে গেছে অশ্রুর ধারায়। চোখের একটু ওপরে কাটাচিহ্ন।

মেয়েটার কাছে গিয়ে ওর হাত ধরল রেবেকা। চাপা স্বরে বলল, 'একেকটা জানোয়ার তোমরা!'

থর্নের পাশে থামল হ্যামারস্টাইন। কোটের ল্যাপেল সরিয়ে বের করল গ্লক নাইন এমএম পিস্তল। 'ঠিক আছে, এখানেই চিরবিদায়।' সরাসরি ক্যাথির মাথার দিকে পিস্তল তাক করল সে, পরক্ষণে রেবেকার মাথায়।

নিষ্পলক চোখে তাকে দেখছে রেবেকা। মরতে রাজি, কিন্তু প্রকাশ করবে না ভয়।

রেবেকার হাত খামচে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ক্যাথি।

'নরকের কীট তোমরা, ওখানেই যাবে,' বলল রেবেকা।

'দারুণ!' আবারও বলে উঠল থর্ন। 'এই মেয়েকে ভাল না বেসে পারছি না। লোভনীয় শরীর। তেমনি তেজ। কিন্তু আপাতত উপায় নেই ওকে ঠাণ্ডা করব।'

'ওর মত শয়তান মেয়ে হয় না,' বলল হ্যামারস্টাইন। 'মেরে ফেলাই ভাল।' ভুরু কুঁচকে সাইটের মাঝ দিয়ে রেবেকাকে দেখল সে। যে-কোনও সময়ে গুলি করবে।

'একমিনিট,' বলে উঠল থর্ন।

অধৈর্য হয়ে পিস্তল নামাল হ্যামারস্টাইন। 'কী?'

'খুন করার দরকার নেই।'

'তো কী করব?'

'আরও ভাল বুদ্ধি আছে,' মুচকি হাসল রনসন থর্ন। 'কত দিন পর পর আসো এই বাড়িতে?'

'সময় পাই না বলে দেরি হয়,' বলল হ্যামারস্টাইন, 'কেন?'

'তা হলে চার বা পাঁচ মাস পর পর?'

'কাজ কম থাকলে।'

'এ বছর কাজ বেশি না কম?'

'কাজের চোটে মরার দশা!'

'তা হলে, আটকে রেখে যাব আমরা। আবার ফিরব ছয় মাস পর। দেখা যাক কী অবস্থা হয় ওদের?'

আপত্তি নিয়ে থর্নকে দেখল হ্যামারস্টাইন। 'তাতে এ ঘরে হবে ভয়ানক বাজে দুর্গন্ধ।'

মাথা নাড়ল থর্ন। 'কখনও বলেছি আমার কুকুরের কাহিনী? ছোটবেলায় ছিল। রিট্রিভার। ভালই ছিল, কিন্তু এক সময়ে খুব বিরক্ত হলাম ওটার ওপর। তাই কী হয় দেখতে আটকে রাখলাম বেসমেন্টে। মরতে অনেক সময় নিল ওটা। কিছু দিনের মধ্যেই ওটার মাংস খেয়ে ফেলল ইঁদুরের পাল। মিলিয়ে গেল দুর্গন্ধ। কাজে এসেছিল পোকামাকড়ও। পড়ে থাকল শুকিয়ে যাওয়া একটা কংকাল।'

'তোমার মত নোংরা ঘেয়ো কুকুর আর দেখিনি,' বলল রেবেকা।

'ভাবতে ভাল লাগছে রেবেকা পাবে অমন সাদা হাড়,' বলল হ্যামারস্টাইন, 'পরে ফিরে দেখব কেমন হয়েছে দেখতে। মরার আগে চাইবে মাটি খুঁড়ে বেরোতে। কিন্তু, খুব গভীর এই বাড়ির ভিত্তি। নিরেট পাথরের ওপর তৈরি।'

'মরতে রেখে যাওয়ার আগে দিই একটা তথ্য,' বলল

থর্ন। 'পৃথিবীর সেরা মঞ্চের পর্দা তুলছি আমরা। অবশ্য সে নাটক দেখতে পাবে না তোমরা। শুধু শুনে রাখো, এবার যা হবে, কোর্ফিউয়ের বোমাকে মনে হবে বড়জোর বাজিপটকা।'

রেবেকা বিড়বিড় করল, 'তোমরা বদ্ধ উন্মাদ!'

'বাইবেল সত্য করতে কাজে নেমেছি, এজেন্ট ট্রিপলার,' বলল হ্যামারস্টাইন। 'আমাদের কিছু করার নেই। এসব ঈশ্বরের ইচ্ছে। সত্যি যুদ্ধ বাধবে তো তাঁরই খায়েসে। দোষ দিলে তাঁকেই দিয়ো।'

'ঈশ্বরের গালগপ্পে বিশ্বাস করি না,' বলল থর্ন। 'তবে আমাদের হ্যামারস্টাইন আবার খুব ধার্মিক।'

কড়া চোখে তাকে দেখল স্পেশাল এজেন্ট।

'যা খুশি করে পার পাবে না,' জোর দিয়ে বলল রেবেকা। 'ওরা ইংল্যাণ্ডে অপেক্ষা করছে ক্যাথির জন্যে। ওখানে না গেলেই সতর্ক হবে সবাই।'

মাথা নেড়ে হাসল হ্যামারস্টাইন। 'ভুল। ওর জন্যে আর অপেক্ষা করছে না তারা।'

'গাড়িতে করে আসার সময় আমাকে বাধ্য করেছে বাবা-মাকে ফোন দিতে,' সড়াৎ শব্দে নাক টানল ক্যাথি। 'বলতে হয়েছে এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছি। আপাতত দেশে ফিরব না।'

'ওরা এসবে অভ্যস্ত, তাই না?' হাসল হ্যামারস্টাইন।

'সিআইএ চিফ খেয়াল করবেন হারিয়ে গেছি,' বলল রেবেকা। 'খোঁজ নিলেই ধরা পড়বে তুমি।'

'না,' বলল থর্ন, 'কেউ বোঝার আগেই এ দুনিয়া হবে অন্যরকম। তখন তোমাদের খোঁজার চেয়ে বহু গুণ বেশি জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সিআইএ।'

'তোমরা হয়তো আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারবে, কিন্তু রক্ষা পাবে না রানার হাত থেকে,' বলল রেবেকা।

হাসিমুখে পরস্পরকে দেখল থর্ন ও হ্যামারস্টাইন।

'ভাল কথা, ট্রিপলার,' হাতঘড়ি দেখল হ্যামারস্টাইন।

'এখন এগারোটা পঁচিশ। জেরুযালেমে সন্ধ্যা ছয়টা পঁচিশ। ফাঁদে পা দিতে চলেছে তোমার মাসুদ রানা। খুন হবে ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

চওড়া হাসল থর্ন। 'চমৎকার সময় কাটল তোমাদের সঙ্গে। এবার বিদায় নিতে হয়।'

সেলারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল হ্যামারস্টাইন ও থর্ন। পেছনে ধুম শব্দে বন্ধ হলো পুরু কাঠের দরজা। নীরবতা ভেঙে ক্লিক শব্দে আটকে গেল তালা।

ঘুটঘুটে আঁধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রেবেকা ও ক্যাথি।

পঞ্চান্ন

জেরুযালেম শহরের পুরনো এলাকা।

ইহুদি কোয়ার্টার।

সন্ধ্যা ছয়টা আটাশ মিনিট।

কোবল পাথরের সরু গলি পেরিয়ে প্রায় ধসে পড়া, পুরনো অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছে গেছে রানা। রাস্তা নির্জন। ওকে দেখে চট্ করে একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ইযরায়েলের ঐতিহ্যবাহী হেডড্রেস পরা এক মহিলা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। এসেছে একদম ঠিক সময়ে। আবারও দেখল নোটবুক, তারপর চলে গেল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ছায়ায়। পাথুরে মেঝেতে উঠছে ওর পায়ের খট-খট আওয়াজ। পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি।

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল রানা। একের পর এক দরজার বুকে নেমপ্লেট ও সংখ্যা।

পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সিআইএর স্লিপার। মিশে আছে সাধারণ মানুষের মাঝে। কারও সাধ্য নেই সন্দেহ করবে। এরা কখনও কখনও আঁধারে রাখে স্ত্রী বা স্বামীকেও। দৃষ্টি আকর্ষণ করে না পুলিশ বা কর্তৃপক্ষের। নতুন তথ্য পেলে পাঠিয়ে দেয়। নিজ এলাকায় কাজ করে সিনিয়র কোনও এজেন্টের বার্তাবাহক হিসেবে। রানার মনে পড়ল, কিছু দিন আগে ঢাকায় পর পর দু'দিনে গ্রেফতার হয়েছিল এক পাকিস্তানি ও এক ভারতীয় স্লিপার। বিপদ বুঝে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে পালাতে গিয়ে গুলিতে খুন হয়েছিল ওই দুই দেশের সিনিয়র দুই এজেন্ট।

নম্বর দেখে দরজায় টোকা দিল রানা।

থমথম করছে চারপাশ।

ভেতর থেকে এল না কোনও আওয়াজ।

ঘড়ি দেখল ও।

ঠিক সময়েই এসেছে।

নক করল আবারও।

কয়েক সেকেণ্ড পর খুলল দরজা।

রানা দেখল, বাজপাখির চঞ্চুর মত বাঁকা নাকের এক হালকা লোক। ছোট করে ছাঁটা কালো চুল। গালে ঘন দাড়ি। পরনে জিন্স প্যান্ট ও সাদা শার্ট। জ্বলজ্বলে চোখদুটো কালো। 'মিস্টার রানা?'

মাথা দোলাল রানা।

'আসুন,' সরে গেল লোকটা। তার পিছু নিয়ে এক লিভিংরুমে পা রাখল রানা। এই অ্যাপার্টমেন্ট বেশ ছোট। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। সাদা দেয়ালে মাত্র দু'একটা ছবি বা তৈলচিত্র। এরা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। টেবিলে সরু কার্ড ফাইল। ভেতরে কিছু কাগজ। ফাইলের পাশেই হেকলার অ্যাণ্ড কচ নাইন এমএম পিস্তল ও ম্যাগাযিন। একটু দূরে কাউচে যন্ত্র খোলা এক স্নাইপার রাইফেল, সাইলেন্সার ও

স্কোপ।

রানার মনে পড়ল ডালটনের কথা: ‘স্নাইপার কাউন্টার স্নাইপারের লড়াই হলে, আপনার চেয়ে দক্ষ কাউকে দুনিয়ায় পাব না।’

‘হ্যামারস্টাইন বলেছে একটা জিনিস দেবেন,’ বলল রানা।

‘কথা ঠিক,’ রহস্যপূর্ণ হাসি হাসল লোকটা। ‘ওটা খুব জরুরি। তবে আসুন, আগে একটু কফি খেয়ে নিই?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘কফি খাওয়ার সময় নেই। আমার তাড়া আছে।’

আবারও হাসল লোকটা। ‘কথা ঠিক, আপনার হাতে সময় নেই।’

এক সেকেণ্ড পর রানা টের পেল, দমকা হাওয়ার মত পেছনে হাজির হয়েছে কেউ!

সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেল না ও। চোখের সামনে দেখল সাদা ঝিলিক। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করছে বলে নিজেকে রক্ষা করতে হাতদুটো ওপরে তুলল রানা। ওর আঙুলে চেপে বসল তারের ফাঁস। ঝটকা দিয়ে ওটা সরাতে চাইল রানা। কিন্তু গায়ে প্রচণ্ড শক্তি পেছনের লোকটার। পেছনে টেনে নিল ওকে। আরেকটু হলে মেঝে ছাড়ত পা-দুটো। আঙুলে টানটান হয়ে চেপে বসেছে তারের ফাঁস। পেছনে লাথি মেরে নিজেকে ছোটাতে চাইল রানা। টলমল করছে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে।

মুচকি হাসছে দাড়িওয়ালা। খুব ধীর ভঙ্গিতে হাত বাড়াল টেবিলে রাখা পিস্তলের দিকে।

প্রাণ বাঁচাতে লড়ছে রানা। এদিক-ওদিক মুচড়ে ওর গলায় ফাঁস বসাতে চাইছে পেছনের লোকটা। চোখের কোণে রানা দেখল, খুলে গেল একটা দরজা। ঘরে ঢুকল তৃতীয় একজন। তার হাতে বাঁকা করাতের মত দীর্ঘ এক ছোরা।

খুন করবে বলে ফাঁদ পেতেছে সিআইএ স্পেশাল এজেন্ট হ্যামারস্টাইন। মরতেই যদি হয়, না লড়ে হারবে না, মেঝেতে ঝাঁপ দিল রানা। ওর সঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ল পেছনের লোকটা। আরও জোরে টান দিল তারের ফাঁসে। দম আটকে গেছে রানার। ঝটকা দিয়ে কাত হয়েই প্রাণপণে লাথি মারল ও। বুটের ডগা লাগল লোকটার থুতনির ওপর। হঠাৎ করেই ঢিল হলো ফাঁস।

এদিকে কাছে চলে এসেছে ছোরাওয়ালা।

শরীর গড়িয়ে একপাশ থেকে তার হাঁটুতে লাথি ঝাড়ল রানা। কড়াৎ শব্দে ভাঙল হাঁটুর বাটি। 'আউ-উ-উ' করে করুণ আর্তনাদ ছাড়ল লোকটা আহত কুকুরের মত। হাত থেকে মেঝেতে পড়েছে ছোরা।

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ফাঁসওয়ালার নাকমুখ সই করে পেনাল্টি কিক ঝেড়ে দিল রানা। পরের সেকেণ্ডে ঘুরেই কারাতে চপ মারল ছোরাওয়ালার গলায়। 'কচ্' শব্দে ভাঙল শ্বাসনালী। ওদিকে ভীষণ ব্যথায় জবাই করা মোরগের মত ছটফট করছে ফাঁসওয়ালা। বদমাসটার মুখ থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত, সঙ্গে দাঁতও পড়ল কয়েকটা।

তাড়াহুড়ো করে পিস্তল নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে দাড়িওয়ালা। অন্য হাতে কটাৎ শব্দে আটকে নিল ম্যাগাযিন। স্লাইড টেনে নেয়ায় ঝটাং আওয়াজে চেম্বারে গেল প্রথম বুলেট। দেরি হলো না গুলি ছুঁড়তে। ছোট্ট ঘরে বিকট আওয়াজ। রানা টের পেল মাথার পাশে শকওয়েভ। ছয় ইঞ্চি দূরের দেয়াল থেকে ওর গালে ছিটকে লাগল প্লাস্টারের ধারালো টুকরো। পাশের দেয়াল থেকে একটা ছবির ফ্রেম খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল রানা ফ্রিসবির মত। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে লোকটার কবজিতে লাগল ফ্রেম। টাশ্ শব্দে ভাঙল কাঁচ। কবজির মাংস কেটে যেতেই চমকে গেছে লোকটা। হাত থেকে মেঝেতে পড়েছে পিস্তল। তিন লাফে

দাড়িওয়ালার সামনে পৌঁছেই মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি ছুঁড়ল রানা। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ওই লোক। খপ্ করে কবজি ধরে টেনে নিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে রানাকে থ্রো করল সে। উড়ে গিয়ে কফি টেবিলের কাঁচে আছড়ে নামল রানা। হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়ল মেঝেতে। এদিকে পাশে পৌঁছে গেছে ক্ষিপ্র দাড়িওয়ালা। বসার সময় ধুপ্ করে হাঁটুর গুঁতো দিল রানার বুকে। পটাপট কয়েকটা ঘুষি বসাল মুখে। এক সেকেণ্ড পর পা টেনে লোকটার সোলার প্লেক্সাসে লাথি মারল রানা। ছিটকে পড়তে গিয়েও শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে আবারও দাঁড়িয়ে গেল দাড়িওয়ালা। দৌড়ে এল রানাকে শেষ করতে।

একই সময়ে উঠে দাঁড়াল রানাও।

এবারের মুখোমুখি লড়াই হলো প্রচণ্ড এবং তীব্র।

সুযোগ পেলেই পরস্পরকে আক্রমণ করছে দু'জন।

একই ধরনের ট্রেনিং পেয়েছে ওরা।

ঠেকিয়ে দিচ্ছে হামলা।

ঝড়ের বেগে চলছে দু'জনের দুই হাত।

সুযোগ করে নিয়ে গায়ের জোরে দাড়িওয়ালার গালে ঘুষি বসাল রানা। টলমল করে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। কিন্তু লোহার আঁকশির মত শক্ত হাতে ধরে রেখেছে রানার বাহু। টান দিয়ে চরকির মত ঘুরিয়ে ওকে ফেলল ঘরের কোণে বুকশেলফের ওপর। কাত হয়ে হুড়মুড় করে ওর ওপর নামল আলমিরা। চারপাশে ছড়িয়ে গেল বই ও ভাঙা কাঁচ।

মোটা এক শক্ত মলাটের বই হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে আসছে দাড়িওয়ালা, এখন আর থামতে পারবে না। বইটা তুলে গায়ের জোরে ওটার চোখা দিক লোকটার মুখে নামাল রানা। ফাটা ঠোঁট থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। একমুহূর্ত পর রানার কনুই লাগল দাড়িওয়ালার নাকে-মুখে। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ। ধুপ করে মেঝেতে পড়ল সে। পরক্ষণে তার

বুকে চেপে বসল রানা। দুইহাতে খামচে ধরল চুল, পরক্ষণে মেঝেতে ঠুকল মাথাটা। পরের সেকেণ্ডে আবারও। তারপর আবারও।

তখনই টের পেল রানা, প্যান্টের পকেটে কাঁপছে ফোন। কল করেছে কেউ। মাত্র আধ সেকেণ্ডের জন্যে সরিয়ে নিয়েছে মনোযোগ, সেই সুযোগে শরীর মুচড়ে সরল দাড়িওয়ালা। পরমুহূর্তে হিংস্র জানোয়ারের মত ঝাঁপ দিল রানার ওপর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে গড়াচ্ছে ওরা। কিন্তু তখনই দাড়িওয়ালার হাত পড়ল মেঝেতে পিস্তলের বাঁটের ওপর। কাত হয়ে উঠে এল কালো চোখের মত মাযল, সরাসরি তাকাল রানার চোখে। শীতল নল খামচে ধরল বেপরোয়া রানা। তাতে কাত হয়ে সরল মাযল। শুরু হলো দু'জনের গায়ের জোরের প্রতিযোগিতা। পিস্তলের দখল চাইছে দু'জনই।

দুই সেকেণ্ড পর ছোট্ট, এলোমেলো ঘরে বিকট 'বুম!' শব্দে গর্জে উঠল পিস্তল!

ছাপ্পান্ন

বেরোবার পথ খুঁজতে গিয়ে পুরো সেলার ঘুরে দেখেছে রেবেকা। দরজা পাথরের দেয়ালের মতই নিরেট। মাকড়সার জালে ভরা একটা তাকে ছোট টর্চ পেয়েছে ও। সেই হলদে দুর্বল আলোয় দেখছে ঘরের প্রতিটি কোনা। ভেবেছিল কোনও ট্র্যাপ ডোর বা কয়লা রাখার ঢালু কোনও সরু পথ পাবে।

কিচ্ছু নেই!

বেরোবার কোনও উপায় নেই ওদের!

পাথরের সিঁড়ির ধাপে বসল রেবেকা। মাথার পেছনে রেখেছে দু'হাত। ভাবছে রানার কথা।

হ্যামারস্টাইন মৃত্যু-ফাঁদে ফেলেছে বিসিআই এজেন্টকে! যদি সাধ্য থাকত, উড়ে গিয়ে শত্রুর সামনে বুক পেতে দিত রেবেকা। মারা পড়বে রানা, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না ও। রানার যে রেকর্ড, ঝুঁকি নেবে না সিআইএর আততায়ী। রেবেকার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে নামল অশ্রু।

ফিসফিস করে ছায়া থেকে বলল ক্যাথি, 'রেবেকা? এতক্ষণে চলে গেছে না লোকগুলো? এবার চলো বেরিয়ে যাই।'

'ঠাট্টা করছ?'

'না। বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'কী করে, ক্যাথি? আটকা পড়েছি মাটির নিচে পাথরের ঘরে। চাইলেও বেরোতে পারব না।' ছায়ায় ক্যাথিকে দেখল রেবেকা।

মেয়েটার হাতে জ্বলে উঠল অপার্থিব এক আলো!

একটা হৃৎস্পন্দন মিস করল রেবেকা।

ক্যাথির হাতে মোবাইল ফোন!

টর্চের আলো ওদিকে ফেলল রেবেকা। 'কোত্থেকে পেলে মোবাইল ফোন?'

'গাড়িতে আমার পাশে যে নিয়ানডারথালটা ছিল, তার পকেট থেকে নিয়েছি। টের পায়নি।'

হেসে ফেলল রেবেকা। 'কাজের কাজ করেছ!'

'পনেরো বছর বয়সে মাঝে মাঝেই সুযোগ বুঝে মানুষের পকেট মারতাম,' বলল ক্যাথি। 'এ-বিদ্যা কখনও ভোলা যায় না। তা ছাড়া, গাড়িতে করে আসার সময় যত কথা বলেছে হারামজাদারা, সব রেকর্ড করেছি। মনে হয়েছিল পরে কাজে

আসবে।'

'ফোনটা দাও তো,' বলল রেবেকা।

উঠে দাঁড়াল ক্যাথি। 'রিসেপশন দুর্বল। একমিনিট। একটা ফোঁটা আছে। এদেশের পুলিশকে ডাকতে হলে যেন কত লিখতে হয়? নাইন-ওয়ান-ওয়ান?'

'পুলিশে ফোন কোরো না, ফোনটা আমাকে দাও,' সিঁড়ি থেকে নেমে ক্যাথির হাত থেকে ওটা নিল রেবেকা। সত্যিই খুব দুর্বল সিগনাল। কখনও থাকছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত হাতে বাটন টিপে রেকর্ডিং শুনতে লাগল রেবেকা। হতবাক হয়ে গেল চার এজেন্টের কথা শুনে। চুপচাপ কী যেন ভাবল, মনে করতে চাইল রানার ফোন নম্বর। সংখ্যাগুলো মনে পড়ল দু'সেকেণ্ড পর। ব্যস্ত হাতে বাটন টিপতে লাগল রেবেকা। কয়েক সেকেণ্ড পর এল ডায়াল টোন। কান পেতে থাকল ও। রিং হচ্ছে আর হচ্ছে! বিড়বিড় করল রেবেকা, 'হায়, ঈশ্বর, বোধহয় সর্বনাশ হয়েই গেল!'

হাজার হাজার মাইল দূরে মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পায়ের কাছে পড়ে আছে দাড়িওয়ালার লাশ। উড়ে গেছে অর্ধেক মুখ। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের গুলি মেঝেতে ছিটিয়ে দিয়েছে রক্ত, সেই সঙ্গে মাংস, খুলি ও চোয়ালের অংশ।

হাপরের মত হাঁফিয়ে চলেছে রানা। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে থরথর করে কাঁপছে শরীর। নিজের রক্ত আর অন্য তিনজনের রক্তে লাল ওর মুখ। তচনচ হয়েছে অ্যাপার্টমেন্টের এ ঘর।

এখনও প্যান্টের পকেটে কাঁপছে মোবাইল ফোন।

কল রিসিভ করবে কি না ভাবল রানা। এক সেকেণ্ড পর রক্তলাল আঙুলে যন্ত্রটা বের করে স্ক্রিন দেখল। দেরি হলো না রিপ্লাই বাটন টিপে কানে ঠেকাতে।

'রানা? তুমি ঠিক আছ?'

'রেবেকা?' চেনা কণ্ঠ শুনে অবাক হয়েছে রানা। গলার আওয়াজে ওর মনে হলো খারাপ কিছু হয়েছে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ঠিক আছ।'

'আমার মনে হয় না তোমার ঈশ্বর খুব সাহায্য করেছে।'

'শয়তানদের দলের একজন হ্যামারস্টাইন,' বলল রেবেকা।

'তা জানতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'তুমি এখন কোথায়?'

'আমার সঙ্গেই আছে ক্যাথি। আছি হ্যামারস্টাইনের হান্টিং লজের বেসমেন্টে।' সংক্ষেপে সব খুলে জানাল রেবেকা। অনুসরণ করেছিল সিআইএ স্পেশাল এজেন্টের গাড়ি। পরে বাড়ির কাছে বন্দি হলো থর্নের হাতে। ক্ষমতাশালী সিনেটর হেনরি শোফেল্ডের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আর তাঁর কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ওই লোক। 'তবে আমার মনে হয়নি সিনেটর কিছু জানেন। তাঁকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে এরা।'

ক'সেকেণ্ড ভেবে বলল রানা, 'ভুলেও পুলিশ ডাকবে না, রেবেকা। আশপাশের স্টেট-এ আছে তোমার কোনও আপন ভাই?'

'আছে।'

'তাকে ডেকে নাও। বুঝিয়ে দিতে পারবে না কোথায় আছ?'

'পারব।'

'তুমি, ক্যাথি বা তোমার ভাই বন্ধ রেখো মুখ। আপাতত লুকিয়ে থাকতে হবে। পরে যোগাযোগ করব।'

'আরও কিছু কথা আছে,' বলল রেবেকা, 'থর্ন সম্পর্কে আলাপ করছিল হ্যামারস্টাইন ও তিন এজেন্ট। ওদেরই একজনের মোবাইল ফোন চুরি করে সব রেকর্ড করেছে ক্যাথি। জেরুযালেমের নামকরা এক মসজিদে নামাজের সময়

গুরুত্বপূর্ণ ক'জন মুসলিম নেতাকে খুন করবে। তাদের ভেতর আছেন প্যালেস্তাইনি প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিলের চার সদস্য। ওঁদের উড়িয়ে দেয়া হবে বোমা মেরে।'

ধক্ করে উঠল রানার বুক। 'কোন্ মসজিদ?'

'ওটা টেম্পল মাউন্ট-এর কাছে,' বলল রেবেকা।

'কখন ফাটাবে বোমা?'

'ইযরায়েলি সময় আজ সন্ধ্যা সাতটায়।'

ঘড়ি দেখল রানা। 'কিন্তু সাতটা বাজতে তো আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি!'

'জানি, রানা। যেভাবে পারো ঠেকাও!'

সেলারে দুর্বল সিগনাল বলেই হয়তো কেটে গেল কল। মোবাইলের দিকে চেয়ে আছে রানা। শুকিয়ে গেছে গলা। হাজার খানেক চিন্তা ভিড় করল ওর মনে।

নিজেকে বোকা বলে মনে হচ্ছে। উচিত ছিল আগেই বোঝা। শক্তিশালী বোমার হামলা হবে বিশাল ওই মসজিদে। ফলাফল ভয়ঙ্কর।

পুরনো শহরের টেম্পল মাউন্ট এলাকায় ওটা বিতর্ক সৃষ্টি করা মসজিদ। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাস জটিল। খ্রিস্টানরা মনে করে প্রথমে ওখান থেকেই পৃথিবী তৈরি করেন ঈশ্বর। শেষ বিচারে ওই জায়গায় জড় হবে সবাই। আবার মুসলিমরা বিশ্বাস করে, স্বর্গ থেকে ফেরার সময় ওই মসজিদে প্রথমে নামেন শেষ নবী (সাঃ)। একসময়ে ওটাই ছিল ইহুদিদের সবচেয়ে পবিত্র মন্দির। তাদের শায়েস্তা করতে যিশুর প্রস্থানের সত্তর বছর পর মসজিদ ধ্বংস করে রোমানরা।

মক্কা ও মদিনার পর মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে প্রখ্যাত মসজিদ ওটা। কুব্বত আল-সখরা। অষ্টকোণী মসজিদের ওপরে রয়েছে পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড, সোনালি গম্বুজ। শহরের বহু দূর থেকে দেখা যায় ওটাকে। ওখানে জড়িয়ে আছে দুই

হাজার বছরের ইহুদি ধর্মের ইতিহাস। বেশ কয়েকটা দেশ হামলা করেছে ওই মসজিদ দখলে নেয়ার জন্যে। অবশ্য, উনিশ শ' সাতষট্টি সালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহুদিরা ওটা তুলে দেয় মুসলিমদের হাতে। দুই জাতির মাঝের টানাপড়েনের প্রতীক ওই মসজিদ।

কুব্বত আল-সখরার মত পবিত্র মসজিদ ধ্বংস হলে সব দোষ পড়বে ইহুদিদের ওপর। তাতে আরেকটা কাজ হবে, দ্রুত জ্বলে উঠবে বোমার বিপজ্জনক সলতে। প্রমাণ হবে ঠিকই লেখা হয়েছে বাইবেলে: মানবজাতি পৌঁছে গেছে ধ্বংসের প্রান্তে। যুদ্ধ শুরু হবে ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে। ইহুদিদের পক্ষ নেবে আমেরিকা। একই সময়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেবে মুসলিম প্রতিটি দেশ। অন্ধবিশ্বাসী মুসলিমরা ধরে নেবে সত্যিই পৃথিবীর বুকে এটাই সবচেয়ে বড় জিহাদ। যুদ্ধের আগুন জ্বলবে পুরো পৃথিবী জুড়ে। দেরি হবে না পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করতে। এ সুযোগে আমেরিকান কোটি কোটি খ্রিস্টানের ভোট চাইবে স্টিভ বার্কলের মত ভণ্ড নেতারা।

এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। একটু পর সত্যিই ধ্বংসের পথে যাত্রা করবে পৃথিবী। যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে সেটা। অন্তত চেষ্টা তো করতেই হবে।

সাতান্ন

একেকবারে কয়েক ধাপ ভেঙে সিঁড়ি বেয়ে নামল রানা। ছিটকে বেরোল সূর্যের সোনালি আলোয়। সরু গলিতে উঠছে

ওর বুটের ভারী শব্দ। না থেমেই চট্ করে দেখল হাতঘড়ি।

বাজে ছয়টা বেয়াল্লিশ।

হাতে আর মাত্র আঠারো মিনিট!

উত্তরদিকের গলিতে রক্তমাখা রানাকে ছুটতে দেখে উন্মাদ ভেবে চমকে উঠছে মানুষজন। সামনে কেউ পড়লে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ও। বাঁক ঘুরেই দেখল, সামনে গিজগিজ করছে দোকান। জমজমাট বাজারে দরদামে ব্যস্ত স্থানীয় খদ্দের ও টুরিস্টরা। তাদেরকে সরাতে ভেঁপু দিচ্ছে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সি। গিজগিজ করা টুরিস্টদের ওপর রেগে গিয়ে এক বিএমডাব্লিউ ট্রেইল বাইকের ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ তুলছে এক মোটর সাইক্লিস্ট।

দৌড়ে যুবকের পেছনে হাজির হলো রানা। রাইডারের পিঠে স্ট্যাপ দিয়ে বাঁধা ব্যাকপ্যাক। একদিকের স্ট্র্যাপ ধরে তাকে সিট থেকে তুলে ফেলল রানা, এক ধাক্কায় ফেলল একটু দূরের রাস্তায়। বিএমডাব্লিউ কাত হওয়ার আগেই ওটার সিটে চেপে বসল রানা। হ্যাণ্ডেল ধরে মুচড়ে দিল থ্রটল। ভয়ানক এক গর্জন ছেড়ে লাফিয়ে এগোল মোটরসাইকেল। প্রাণের ভয়ে ছিটকে সরে গেল আশপাশের সবাই। দোকানগুলোর মাঝ দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে তুমুল বেগী বিএমডাব্লিউ মোটরসাইকেল। কখনও চলে যাচ্ছে এদিকের দোকানের খুব কাছে, আবার ওদিকের দোকানের দিকে। আত্মা খাঁচাছাড়া করে দিয়েছে সবার।

প্রতি সেকেণ্ড গুনছে রানা।

আর কতটা দূরে গন্তব্য?

মস্তবড় জেরুযালেম শহরের ছোট্ট অংশ প্রাচীন নগর। সবচেয়ে চওড়া অংশ বড়জোর দৈর্ঘ্যে দু' কিলোমিটার। আগে যে দ্য চার্চ অভ দ্য হোলি সেপুলকার পেরিয়ে এসেছে রানা, সেটা থেকে মাত্র পাঁচ শ' গজ দূরে কুব্বত আল-সখরা মসজিদ।

মার্কেট ও গাড়ির মাঝ দিয়ে ছুটছে মোটরসাইকেল। হঠাৎ পেছনে কেঁদে উঠল পুলিশের ওঁয়া-ওঁয়া সাইরেন। আয়নায় গাড়িটার জ্বলজ্বলে আলো দেখল রানা। ডানে উঁচু দেয়াল। দু'পাশে প্রাচীন আমলের বাড়ি। মাঝে একটা ফাঁক। ওই পথে নেমেছে পাথরের সিঁড়ি। ছুটতে ছুটতে স্কিড করে ঘুরল রানা, থ্রটল মুচড়ে উঠে যেতে চাইল সিঁড়ি বেয়ে। সামনের চাকা প্রথম ধাপে লাগতেই আরেকটু হলে ছিটকে পড়ত ও, সামলে নিল কোনওমতে। কর্কশ আওয়াজে আপত্তি তুলছে ইঞ্জিন, ধুপ-ধুপ আওয়াজে উঠতে লাগল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে।

আয়নায় আর পুলিশের গাড়িটা দেখল না রানা। দূরে চলে যাচ্ছে সাইরেন। তবে এখন পিছু নিয়েছে অন্তত তিনটে স্কোয়াড কার। ঘুরে এসে ধরতে চাইবে ওকে।

ঝড়ের বেগে সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরের রাস্তায় উঠল রানা। সামনেই দেখল বাতেই মাহাসে স্ট্রিটের সাইনবোর্ড। ঠিক পথেই যাচ্ছে। দুটো পুলিশের গাড়ির ঝলমলে আলো দেখল পেছনে। অনেক কাছে চলে এসেছে তারা।

হঠাৎ করেই সামনের একটা বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল একদল বাচ্চা।

স্কুল ছুটি!

তাদেরকে বাঁচাতে কাত হয়ে সরে গেল রানা। সরসর করে পিছলে গেল মোটরসাইকেলের পেছনের চাকা। ধুম করে গিয়ে লাগল একটা দোকানের দরজার পাশে। দুই সেকেণ্ড পর হুঁশ ফিরতেই রানা দেখল, চিৎপাত হয়ে দেখছে নীলাকাশ। একটু দূরে এসে থামল পুলিশের গাড়ি। লাফিয়ে নেমে এল দুই পুলিশ। দৌড়ে এল রানার দিকে। টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াল রানা, পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল কাছের পুলিশের চোয়ালে। প্রায় উড়ে গিয়ে কাত হয়ে রাস্তায় পড়ল লোকটা। দ্বিতীয় পুলিশ খামচে ধরেছে

রানার বাহু। পেটে হাঁটুর জোর এক গুঁতো খেয়ে হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ল সে। তার আর্তচিৎকার শুরু হওয়ার আগেই ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে রানা।

বাজে ছয়টা ঊনপঞ্চাশ।

সময় মাত্র এগারো মিনিট!

অবশ্য, গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে রানা। একটু দূরে ইহুদি কোয়ার্টারের কাছে উঁচু দেয়াল। ওদিকে জ্বলজ্বল করছে কুব্বত আল-সখরা মসজিদের সোনালি গম্বুজ।

পেছনে চিৎকার শুনছে ও। হাহাকার করছে সাইরেন। ছুটতে ছুটতে একবার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল রানা। পিছু নিয়েছে একদল পুলিশ। ইহুদিদের দেয়ালের কাছে পৌঁছে ওটার পাশ দিয়ে উড়ে চলল ও। আলখেল্লা পরা লোকজন ঠেলে সরিয়ে দৌড়ে চলেছে।

সামনেই মুর গেট। একমাত্র ওই পথেই মসজিদে ঢুকতে পারবে অন্য ধর্মের লোক। দু'পাশে ছোট ছোট দোকান। ভিড় করে নানাকিছু কিনছে টুরিস্টরা। তাদের ভেতর দিয়ে তীরের বেগে ছুটছে রানা। ধমকে উঠছে কেউ কেউ, তারপর রক্তাক্ত লোকটাকে দেখে চুপ হয়ে যাচ্ছে। টেম্পল মাউন্টের বিস্তৃত এসপ্লেনেড মাড়িয়ে কুব্বত আল-সখরা মসজিদ লক্ষ্য করে ছুটছে রানা। দাউদাউ আগুনের মত জ্বলছে ফুসফুস। আর চলতে চাইছে না পা। মানসিক জোরে ছুটছে রানা।

সামনেই নীল মার্বেল পাথর দিয়ে নকশা করা অষ্টকোণী দেয়াল, দারুণ কারুকাজ করে লেখা আল-কোরআনের সব আয়াত। দেয়ালের ওদিকেই প্রকাণ্ড দালান। মসজিদের বাইরে জড় হয়েছে শত শত মুসলিম। বাতাসে গুঞ্জন।

পেছনে চিৎকার শুনল রানা। ভিড়ের ভেতর দিয়ে তেড়ে আসছে পুলিশ। ধার্মিকদের মাঝে হারিয়ে যেতে চাইল ও। আর চলছে না শরীর। দৌড়ে ঢুকল মসজিদে। সামনেই থাকবেন প্যালেস্তাইনি প্রেসিডেন্ট ও মুসলিম কাউন্সেলাররা।

হাতে আছে মাত্র চার মিনিট!

থমকে গিয়ে পাগলের মত এদিক-ওদিক দেখল রানা। যে কোথাও থাকতে পারে বোমা। হয়তো আছে আত্মঘাতী কারও শরীরে, বোঝার উপায় নেই। হাজার হাজার মানুষের ভেতর তাকে খুঁজবে কী করে রানা!

হয়তো বোমা রেখেছে কয়েক সপ্তাহ আগে।

দূর থেকে রিমোট দিয়ে ফাটিয়ে দেয়া হবে।

হঠাৎ করেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চুরমার হবে অপূর্ব সুন্দর মসজিদ।

আগুনের হলকার মাঝে ধসে পড়বে সোনালি গম্বুজ।

জেরুযালেমের আকাশে উঠবে কমলা আগুন ও ধোঁয়ার বিশাল স্তম্ভ। ওটার মাধ্যমেই শুরু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড়।

সাতটা বাজতে তিন মিনিট!

এখন আর কিছুই করতে পারবে না রানা।

হঠাৎই চোখের কোণে দেখল অস্বাভাবিক দ্রুত নড়াচড়া। ঝট করে তাকাল রানা। পিলারের ওদিকে গেল কে যেন! চেহারাটা চেনা চেনা। পরনে ছিল হালকা জ্যাকেট ও নীল প্যান্ট। কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা চামড়ার ব্যাগ। লাখ লাখ টুরিস্টের একজন হতে পারে সে।

কিন্তু একবার কারও চেহারা দেখলে কখনও ভোলে না রানা। ওই লোক কোর্ফিউ দ্বীপের সেই বোমাবাজ আততায়ী না?

চোখা চেহারা।

অলস চোখে বিষ।

মউরোসের খুনি!

ওদিকের পিলারের দিকে দৌড় দিল রানা। বিশ গজ পেছনে ছুটে আসছে পুলিশের লোক। দৌড়ের গতি আরও বাড়াল রানা। ওর রক্তাক্ত চেহারা দেখে প্রাণভয়ে আর্তনাদ

ছাড়লেন এক মহিলা।

রানাকে দেখেছে বোমাবাজ। সরু হলো দু'চোখ। কী যেন ভাবছে সে। পরক্ষণে ঘুরেই দৌড় দিল ভিড়ের ভেতর।

সাতটা বাজতে মাত্র দুই মিনিট!

আগে কখনও এত জোরে দৌড়ায়নি রানা। ছুটছে চিতার বেগে। বোমাবাজের পিছু নিয়ে পেরোল ছোট গম্বুজওয়ালা এক প্রাচীন দালান। প্রায় লাফিয়ে নামতে লাগল অসমতল পাথরের সরু সিঁড়ি বেয়ে। চারপাশে বিশাল পিলার ও উঁচু খিলান। নানা উঁচু-নিচু ফটকের মাঝ দিয়ে ছুটে একটা গলিতে নামল বোমাবাজ। বাঁক নিল বামে। সামনের লোকদের ধাক্কা দিয়ে পথ করে ছুটছে।

খুব ধীর হলেও দূরত্ব কমিয়ে আনছে রানা। প্রাচীন পাথরের বুকে উঠছে ওদের দু'জনের ছুটন্ত পদশব্দ।

সাতটা বাজতে মাত্র এক মিনিট বাকি!

ছুটতে ছুটতে পিঠের চামড়ার ব্যাগে হাত ভরল লোকটা। হাতে তুলে নিল কী যেন। কালো রঙের— দেখতে ছোট মোবাইল ফোনের মত। দৌড় না থামিয়ে কী সব বাটন টিপছে সলোমন রুশদি।

তারই সেট করা কোড!

ভয়ে বরফের মত জমাট বাঁধতে চাইছে রানার হৃৎপিণ্ড। রক্তাক্ত শার্টের কোমর থেকে নিল দাড়িওয়ালার পিস্তল। দেরি হলো না গুলি করতে। মাথা নিচু করে নিল সলোমন রুশদি। পেছনের দেয়ালে বিঁধল রানার বুলেট। বিকট আওয়াজ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে সরে যেতে লাগল লোকজন।

আবার বাঁক নিয়ে খিলান করা আরেক চওড়া দরজা দিয়ে পরের গলিতে ঢুকল বোমাবাজ। পেছনে ছুটছে রানা। লোকটা পালিয়ে গেলে চলবে না ওর। প্রথম সুযোগে শেষ করতে হবে তাকে। কোড পূরণ হলে খেলা শেষ। এরপর স্রেফ টিপে দেবে সেণ্ড কি।

বোমার বিস্ফোরণে মরবে শত শত মুসলিম।
আর তারপর শুরু হবে সত্যিকারের কেয়ামত।
ছুটতে ছুটতে হাতঘড়ি দেখল রানা।
সময় এখন সন্ধ্যা সাতটা!

হাজার হাজার মাইল দূরে দ্রুতগামী কালো লিমোর পেছন সিটে বসে আছে রনসন থর্ন। সোনার ঘড়িতে দেখছে শেষ ক'সেকেণ্ড। একটু পরেই সূচনা হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের!

মৃদু মৃদু হাসছে থর্ন। আরাম করে হেলান দিল চামড়ার সিটের পিঠে। বিড়বিড় করে বলল, 'সময় এখন ফুর্তির!'

আটান্ন

ভাঙা খিলানের ভেতর দিয়ে ওদিকে বেরিয়ে গেল সলোমন রুশদি। লোকটার হাতে কালো ওই রিমোট।

আবারও গুলি করতে পিস্তল তুলেছে রানা, এমনসময় হঠাৎ করেই আকাশে উঠল লোকটা। ধুম করে গিয়ে পড়ল একটু দূরের পাথরের স্ল্যাবে। বাঁক নিয়েই তার ওপর চড়াও হয়েছে পুরনো একটা মোপেট। আপাতত ভূমিশয্যা নিয়েছেন ভীষণ মোটা আরোহিনী। মহিলার ভারী পেট সলোমনের পিঠের ওপর। তলা থেকে বেরোতে চাইছে লোকটা।

ব্রেক কষে থামল রানা। সলোমনের হাত থেকে দু'ফুট দূরে পড়েছে রিমোট। আছাড় খেয়ে গাল-কপাল কেটে গেছে তার। দাঁত খিঁচিয়ে কী যেন বলল মহিলাকে। পিঠে ভারী ওজন নিয়েও তিলতিল করে এগোল রিমোটের দিকে।

দশ গজ দূরে রানা। নতুন করে শুরু করল দৌড়। চোখে আতঙ্ক নিয়ে দেখল, মহিলা সলোমনের পিঠ থেকে গড়িয়ে নেমে পড়তেই খপ্ করে রিমোট ধরল লোকটা।

রানা শেষ দুই গজ পেরোবার আগেই বাটন টিপবে সে!

ডাইভ দিয়ে তার পাশে পড়েই ঘুরল রানা। গায়ের জোরে ঘুষি মারল হালকা-পাতলা লোকটার মাথায়। পরক্ষণে ওর বামহাতি ঘুষি পড়ল বোমাবাজের চোয়ালে। লোকটার মুখ থেকে ছিটকে বেরোল ভাঙা দাঁত ও রক্ত। হাত থেকে রিমোট কেড়ে নিতে চাইল রানা।

তখনই পেছনে শুনল কর্কশ ধমক। ঘুরে তাকাল রানা। তিন গজ দূরে তরুণ পুলিশ অফিসার, হাঁফিয়ে চলেছে হাপরের মত। হাতে পিস্তল। তাক করেছে রানার বুকে। তরুণের চোখে ভয়, তবে গুলি করবে প্রয়োজনে। হিব্রু ভাষায় আবারও নির্দেশ দিল সে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে।

ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলল রানা। উঠে দাঁড়াল।

বোমাবাজের দিকে পিস্তল তাক করল পুলিশ অফিসার।

ভাঙা দাঁতের হাসি হাসল সলোমন রুশদি। উঠে বসল ধুলোর ভেতর। বুড়ো আঙুল রাখল সেণ্ড বাটনে।

কমপ্লিট হয়েছে সিকোয়েন্স। এবার চাপ দিলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ঠেকাতে পারবে না কেউ!

আগে কখনও এত দ্রুত নড়েনি রানা। ওর কনুই নামল তরুণ পুলিশ অফিসারের মুখের ওপর, একইসময়ে কেড়ে নিল পিস্তল। তাকও করল না, ঘুরেই গুলি করল সলোমন রুশদির হাতে। লাল কুয়াশা তৈরি করে উধাও হলো লোকটার বুড়ো আঙুলের অর্ধেক অংশ। খটাৎ শব্দে পাথুরে স্ল্যাবে পড়ল প্লাস্টিকের রিমোট।

হাঁটু গেড়ে বসে আহত আঙুল চেপে ধরেছে সলোমন। অবাক চোখে দেখছে রানাকে। ভাঙা গলায় জানতে চাইল,

‘তুমি আসলে কে?’

‘কেউ না,’ শান্ত স্বরে বলল রানা। পরক্ষণে গুলি করল লোকটার মাথায়।

‘যার শেষ ভাল, তার সবই ভাল,’ বললেন সিআইএ চিফ জেরাল্ড ডালটন। ‘আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, মিস্টার রানা।’ একটু আগে পৌঁছেছেন এ শহরে।

জেরুযালেমে নিজের হোটেল কক্ষে বসে আছে রানা। নড়বড়ে খাটের কিনারায় ডালটন। সারাশরীরের প্রতিটি হাড় চুর-চুর হয়ে ভেঙে গেছে, মনে হচ্ছে রানার।

‘আপনার বিরুদ্ধে আমাদের আর কোনও অভিযোগ নেই,’ বললেন ডালটন। ‘আপনি আসলে আসেনইনি এখানে। জীবনেও কখনও দেখা হয়নি আমাদের। এবার সিআইএর বিমানে চেপে সোজা চলে যেতে পারেন যেখানে খুশি।’ হাসলেন তিনি, ‘জেনে সুখী হবেন, মসজিদে পাওয়া গেছে শক্তিশালী বোমাটা, ফাটলে সর্বনাশ হয়ে যেত। আবারও ধন্যবাদ।’

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন জেরাল্ড ডালটন।

একটু পর রেবেকার কাছে কল দিল রানা। ভাবছে, এই নম্বরে কি পাব ওকে?

পাঁচ সেকেণ্ড পর কল রিসিভ করল কেউ। ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

‘আমি ফিরছি,’ বলল রানা। ‘আগামীকাল দুপুর একটায় দেখা কোরো ওয়াশিংটন ডি.সি.-র লিঙ্কন মেমোরিয়ালে।’

ফোন রেখে অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ার নিল রানা। ধুয়ে গেল সব রক্ত, কিন্তু মিলিয়ে গেল না অন্তরের তিক্ত স্মৃতি। চল্লিশ মিনিট পর পৌঁছে গেল রানা এয়ারপোর্টে। এখনও রয়ে গেছে অনেক কাজ।

উনষাট

লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সামনে পাথুরে সিঁড়ির ধাপে বসে আছে রেবেকা। পিছনে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল আর ক্যাপিটোল ডোম। ওখানেই বসে ইউএস সিনেট। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে রানাকে হেঁটে আসতে দেখল ও। দশ লক্ষ ওয়াটের বাতির মত ঝলমল করে উঠেছে ওর মুখ।

'যাক্, সত্যিই এলে,' রানা এসে থামতেই উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল রেবেকা। 'ভেবেছিলাম আসবেই না।'

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে জানতে চাইল রানা, 'তোমার ভাই বের করেছিল সেলার থেকে?'

মাথা দোলাল রেবেকা। 'আমরা আছি ওর বাড়িতেই। এখনও ওখানেই আছে ক্যাথি।'

'গুড,' বলল রানা। 'আপাতত লুকিয়ে থাকাই ভাল। থর্ন আর হ্যামারস্টাইনের সঙ্গে বোঝাপড়া সব শেষ হয়নি। এখনও বিপদে আছে মেয়েটা। একই কথা খাটে তোমার বেলাতেও। থর্ন আর হ্যামারস্টাইন চাইবে না তোমরা মুখ খোলো।'

উদ্বেগের ছাপ পড়ল রেবেকার মুখে। 'তা হলে কী করা উচিত?'

'সিনেটর শোফেল্ডের সঙ্গে দেখা করব,' বলল রানা। 'তারপর দেখা যাক, কী বলেন তিনি।'

'আমিও যাব?'

'একা লাগবে না তুমি সঙ্গে গেলে।'

'মণ্ট্যানা তা হলে?'
'হ্যাঁ, ওখানে।'
পার্কিং লটের দিকে চলল ওরা।

পরদিন।
মণ্ট্যানা।
সকাল দশটা।
পাহাড়ি সড়কে ছুটে চলেছে পোর্শে নাইন ফাইভ নাইন। চওড়া চাকা আঁকড়ে রেখেছে অ্যাসফল্ট। গতি প্রায় না কমিয়েই বাঁক নিলেন সিনেটর হেনরি শোফেল্ড।
সামনের দৃশ্য দেখে চেপে ধরলেন ব্রেক প্যাডেল। তিরিশ গজ দূরে আড়াআড়িভাবে রাখা পুরনো এক ফোর্ড পিকআপ। খোলা ওটার হুড। ঝুঁকে কী যেন দেখছে সুন্দরী এক মেয়ে।
পোর্শে থেকে নেমে এলেন সিনেটর। হুডের সামনে পৌঁছে হাসলেন সুন্দরীর দিকে চেয়ে। মেয়েটার হাতে চটচট করছে কাদার মত তেল। অসহায় দৃষ্টিতে দেখল হেনরির চোখে।
সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সিনেটর। 'আমি কি কোনও সাহায্যে আসতে পারি, ম্যাম?'
রাস্তার পাশের এক বোল্ডারের পেছন থেকে বেরিয়ে সিনেটরের চার ফুট দূরে থামল রানা। 'হ্যাঁ, সাহায্য করতে পারেন, স্যর।' ওর হাতের পিস্তলের নল সোজা ভদ্রলোকের মাথার দিকে তাক করা।
ধুম্ করে বনেট বন্ধ করল রেবেকা।
'কী চাই তোমাদের?' আড়ষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইলেন শোফেল্ড।
'আলাপ করতে চাই রনসন থর্নের বিষয়ে,' বলল রানা। 'চলুন, একটু ঘুরে আসি।'

পিকআপের পেছনে বসে আছেন হেনরি শোফেল্ড। ফ্যাকাসে হয়েছে মুখ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর থর্নের বিষয়ে সব কথা শেষ করল রানা। ও থেমে যাওয়ার পর ক্যাথি আর ওকে কীভাবে মেরে ফেলতে চেয়েছে থর্ন, খুলে বলল রেবেকা।

সব শোনার পর দুর্বল সুরে বললেন শোফেল্ড, 'যা বললেন, সব শুনেও মনে হচ্ছে ভুল শুনেছি।'

'আপনি থর্নের প্ল্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ,' বলল রানা। 'প্রথম থেকেই আপনাকে ব্যবহার করছে সে।'

'মাঝে মাঝে অদ্ভুত লাগত ওর আচরণ,' বললেন শোফেল্ড, 'কেবল কার-এ উঠে গোপনে মিটিং করত। বুঝতাম না কীসের অত ফুসুর-ফাসুর।'

'এখন সবই জানেন,' বলল রানা।

দু'মুঠো পাকিয়ে ফেললেন শোফেল্ড। 'জানতাম খুব চতুর লোক থর্ন। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত পেছনে। তবে ভাবতেও পারিনি এত বড় নরপশু।' রাগে থরথর করে কেঁপে গেল তাঁর কণ্ঠ: 'ঈশ্বর মাফ করবেন না আমাকে, এত বড় খুনিকে পুষে রেখেছি! শয়তানও বোধহয় এত খারাপ হয় না।' মুখ তুলে রানাকে দেখলেন তিনি। 'বলতে পারেন, আমি হতভম্ব। কী করব বুঝতে পারছি না। বিচার হওয়া উচিত লোকটার।' রেবেকাকে দেখলেন শোফেল্ড। 'আপনি জানাননি আপনার সুপিরিয়র অফিসারকে?'

'আমরা দু'জন ছাড়া কেউ জানে না,' বলল রেবেকা।

ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন শোফেল্ড। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'হ্যামারস্টাইন আর থর্নের বিচার করতে হবে। দেরি না করে এবার ফোন দেব সঠিক জায়গায়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সেটা চাই না।'

দ্বিধান্বিত হয়ে ভুরু কুঁচকে ওকে দেখলেন শোফেল্ড। 'তা হলে কী করতে চান?

'বলুন আপনার কেবল কারের কথা,' বলল রানা।

ষাট

দ্য বেলাজিয়ো হোটেল।

লাস ভেগাস।

কুব্বত আল-সখরা মসজিদ এখনও অক্ষত শুনেই ছুটি নিয়েছে রনসন থর্ন। এখন বসে আছে নিজের সুইটে। দমে গেছে মন। একটু পর পর গিলছে ব্র্যাণ্ডি। কয়েকটা চকোলেট খাওয়ার পর ঠিক করল ফোন দেবে তার ব্রোকারের কাছে। নামকরা কিছু কোম্পানির শেয়ার কিনেছিল, এখন মুনাফা তো হবেই না, গচ্চা দিতে হবে কয়েক লাখ ডলার। শুধু তা-ই নয়, যখন-তখন চিরকালের জন্যে ছেড়ে যেতে হবে এ দেশ।

অবশ্য এখন মনে হচ্ছে, লুকিয়ে পড়তে হবে না অন্য দেশে। খবরের কাগজ বা টিভি কিছুই বলেনি ওর সম্পর্কে। প্রকাশ পায়নি কিছু। মণ্ট্যানার ওই হোটেলে কেউ বেঁচে নেই যে, সাক্ষ্য দেবে ওর বিরুদ্ধে। ভালভাবেই নিজের পদচিহ্ন লুকিয়ে ফেলেছে হ্যামারস্টাইন।

জেরুযালেম থেকে ফিরে সিআইএ চিফকে হয়তো জানাবে মাসুদ রানা, ফাঁদে ফেলা হয়েছিল তাকে। কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না কিছুই। প্রমাণ শুধু দিতে পারত হ্যামারস্টাইনের বেসমেণ্টের দুই কুত্তী। কিন্তু মুখ খোলার উপায় নেই তাদের।

কাজেই চিন্তার কী আছে?

দুপুরের আগে ফোন করলেন সিনেটর শোফেল্ড। খুশি-খুশি কণ্ঠে জানালেন, মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ

করতে ডাক এসেছে হোয়াইট হাউস থেকে। তাতে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছেন তিনি। বক্তৃতা তৈরি করে দিতে হবে। সে কারণে বাধ্য হয়েই থর্নের ছুটি বাতিল করছেন তিনি।

'চলে এসো,' বললেন শোফেল্ড। 'দেখা করবে আটটায় স্কি শ্যালেতে।'

ঘড়ি দেখল থর্ন। কুঁচকে গেল ভুরু। 'এখন রওনা হলে হয়তো ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারব। তবে স্কি শ্যালেতে কেন?'

'বাড়িতে ছারপোকা আছে,' বললেন সিনেটর। 'আমার অফিসও বাদ পড়েনি। সার্চ করা হচ্ছে পুরো বাড়ি। আমরা আলাপ সারব স্কি শ্যালেতে।'

এই তথ্য শুনে অবাক হয়েছে থর্ন। সিনেটর ফোন রাখার পর আরেক ঢোক ব্র্যাণ্ডি নিল সে। ভাবছে, কারা রেখেছে ওই লিসেনিং ডিভাইস?

যাক গে!

ব্যাগেজ গুছিয়ে রওনা হতে হবে তাকে।

বিমান থেকে নেমে লিমোতে চেপেছে রনসন থর্ন। তিক্ত মনে ফিরল সিনেটরের প্রাসাদে। দরদর করে ঘামছে গরমে। শাওয়ার নেয়া জরুরি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে এখন টেইল-বোন ব্যথা করছে তার।

সিনেটরের বাড়ির উল্টো দিকে উপত্যকার শেষমাথায় পাহাড়ি শ্যালে। ওখানে পৌঁছুতে হলে ব্যবহার করতে হবে কেবল কার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাড়ির পাশের কাঠের কণ্ট্রোল রুমে ঢুকল থর্ন। চেপে বসল কেবল কার-এ। কণ্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাক করল রিমোট। যন্ত্র অ্যাকটিভেট করবে, এমনসময় শুনল পরিচিত কণ্ঠ: 'একমিনিট!'

ক্লান্ত পায়ে কেবল কারে এসে উঠল হ্যামারস্টাইন।

অবাক চোখে ওকে দেখল থর্ন। 'তুমি এখানে কী করছ?'

'মিটিঙে ডেকেছে শোফেল্ড। কী যেন বলবে হোয়াইট হাউসের বিষয়ে।'

'তোমার সঙ্গে শোফেল্ডের কী?'

'জানি না। জানাল খুব জরুরি। লোকটা কোথায়?'

'উপত্যকার আরেক প্রান্তে কেবল কার শ্যালেতে,' বলল থর্ন। 'ওটা ওদিকে।' হাত তুলে উপত্যকা দেখাল সে।

ফ্যাকাসে হলো হ্যামারস্টাইনের মুখ। 'বাড়িতে মিটিং করলে ভাল হতো না?'

'বাড়িতে ছারপোকা পাওয়া গেছে।'

'অবাক কাণ্ড,' বলল হ্যামারস্টাইন, 'ঠিক আছে, চলো। কথা বলে দেখি লোকটার সঙ্গে।'

রিমোট তুলে বাটন টিপল থর্ন। তাতে কিছুই হলো না। আবার রিমোটের বাটন টিপে দিল সে। এবার ক্লং-ক্ল্যাং আওয়াজে নড়ে উঠল কেবল কার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলেছে মসৃণভাবে। বহু নিচে উপত্যকার মেঝে।

মাঝামাঝি যাওয়ার পর হঠাৎ থামল কেবল কার। আর এগোচ্ছে না।

'আরে, কী ব্যাপার!' রিমোট তুলে নির্দিষ্ট বাটন টিপল থর্ন। নড়ল না কেবল কার। বিড়বিড় করে বলল সে, 'বোধহয় ব্যাটারি শেষ।'

কিন্তু ঠিকই জ্বলছে সবুজ লেড বাতি।

বুকটা ধক্ করে উঠল থর্নের।

'তোমার রিমোট কাজ না করলে ফিরব কী করে?' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল হ্যামারস্টাইন।

থর্ন কিছু বলার আগেই তার পকেটে বাজল মোবাইল ফোন।

পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। দেখছে তিন শ' গজ

দূরে, শূন্যে ভাসছে কেবল কারটা। একহাজার ফুট নিচে গভীর জঙ্গল। পকেটে রেখে দিল আসল রিমোটটা। থর্নের কাছে আছে নকল একটা। ওটা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না সে।

কল রিসিভ করল থর্ন। উত্তেজনা আর ভয় নিয়ে জানতে চাইল, 'সিনেটর, ফোন কি আপনি করেছেন?'

'ভুল বললে, থর্ন,' ব্লুটুথ হেডসেট-এ জবাব দিল রানা।

চুপ হয়ে গেল থর্ন। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কে? কে আপনি?'

'তোমার বামে তাকাও,' বলল রানা। 'চোখ ভাল থাকলে দেখবে আমি পাহাড়ের ওপর।'

'রানা?'

'হয়তো ভাবছ, হঠাৎ এখানে কেন,' বলল রানা। 'কিন্তু এর কোনও ব্যাখ্যা দেব না। জেনেই বা কী করবে? মৃত লোকের কোনও তথ্য দরকার হয় না।'

'শোনো... রানা...' তোতলামি পেয়ে বসল থর্নকে, 'রানা... আমার... অনেক টাকা। বড়লোক করে দেব তোমাকে। বুঝলে...'

'ভালই প্ল্যান করেছিলে,' বলল রানা। 'চালাক লোক। হ্যামারস্টাইনও কম নয়। সহজেই সিআইএ ডেটা বেস থেকে সরিয়ে দিয়েছে তোমার সব ডেটা।' কথা বলতে বলতে প্যাড দেয়া রাইফেল কেসের স্ট্র্যাপ খুলছে রানা। বের করল রেমিংটন রাইফেল। দারুণ জিনিস। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের এক বন্ধু যত্নের সঙ্গে জিরো করেছেন এটাকে। আনযিপ করে অ্যামিউনিশন কম্পার্টমেন্ট থেকে পাঁচটা লম্বা পয়েন্ট থ্রিযিরোএইট বুলেট নিল রানা। এক এক করে ভরল ম্যাগাযিনে। ধীরেসুস্থে শুয়ে পড়ল পাহাড়ের কিনারায়। স্কোপের মাঝ দিয়ে পরিষ্কার দেখল, কেবল কার-এর ছাতে পুলি ও পুরু তার।

ফোনে ধাতব আওয়াজ শুনেছে থর্ন। ভীতকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমি কাজ করি ইউএস সিনেটরের হয়ে। বুঝতে চেষ্টা করো, রানা, আমাকে খুন করলে রক্ষা পাবে না।'

'তা হলে শোনো, তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে,' বলল রানা।

'কীসের মেসেজ? কী বলতে চাও...'

'চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তোমাকে।' সেফটি অফ করল রানা। 'হ্যামারস্টাইনকেও জানাতে পার, ওকেও বের করে দেয়া হয়েছে সিআইএ থেকে।' হেডসেটে শুনল রানা, তীব্র আতঙ্কে কী যেন বলছে থর্ন। পাত্তা দিল না ও। আঙুল আস্তে করে ডেবে গেছে ট্রিগারে। ওর কাঁধে ধাক্কা দিল রেমিংটন।

তিন শ' গজ দূরে ছিঁড়ল একটা কেবল। সড়াৎ করে পুলি থেকে বেরোতে লাগল ওটা। বনবন করে ঘুরছে পুলি। হোঁচট খেল কেবল কার। সাঁই করে নামল দশ ফুট নিচে। কেবল আটকে গেছে বলে থামল পতন।

ভীষণ করুণ চিৎকার জুড়েছে রনসন থর্ন ও হ্যামারস্টাইন। পাগল হয়ে গেছে তারা। কাত হয়ে যাওয়া মেঝেতে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে থাবা মারছে জানালার কাঁচে।

শান্ত হাতে রাইফেলের বোল্ট টানল রানা। আবারও তাক করল রেমিংটন। টিপল ট্রিগার। পাহাড়ি উপত্যকায় ছড়িয়ে গেল বুলেটের প্রচণ্ড আওয়াজ।

রানার মনে হলো চিরকাল শূন্যে ঝুলে আছে কেবল কার, তারপর হঠাৎ করে সাঁই করে রওনা হলো একহাজার ফুট নিচে পাথুরে জমি লক্ষ্য করে। থর্ন ও হ্যামারস্টাইনের বেসুরো চিৎকার শুনল রানা। নেমে চলেছে তারা তীব্র বেগে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর পাহাড়ের পায়ের কাছে ড্রপ খেল কেবল কার। লাফ দিয়ে উঠে বিস্ফোরিত হলো তরমুজের

মত। ভাঙা সব টুকরো ডিগবাজি খেতে খেতে গিয়ে থামল নিচের জঙ্গলে।

ততক্ষণে কেসের ভেতর রাইফেল রেখে দিয়েছে রানা। সব গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাইফেল কেস হাতে পাহাড় থেকে নামতে লাগল রানা। নিচে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে রেবেকা। এবার সোজা ফিরবে ওরা ভার্জিনিয়ায়।

একষট্টি

ভার্জিনিয়া।

রেবেকার বাড়ি।

সোনালি রোদ চোখে পড়তেই ঘুম ভাঙল রানার। এখনও ঘুমিয়ে আছে রেবেকা। পরীর মত লাগছে মেয়েটাকে। শুভ্র বুক থেকে চাদর সরে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড ওকে দেখল রানা, তারপর বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল নিঃশব্দে। দুটো ফোন কল করতে হবে। জরুরি।

ড্রইংরুমে চলে এল রানা। প্রথমে কল দিল মিস মেরিয়ান ট্রুলির ফোনে।

রিসিভার তুলল একটা মেয়ে। রানা মিস ট্রুলিকে চাইছে শুনে জানাল, ডেকে দিচ্ছি তাঁকে।

দু'মিনিট পর লাইনে এলেন বৃদ্ধা মহিলা।

রানা জানে, তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন। নরম সুরে বলল ও, 'সরি। বাধ্য হয়ে জরুরি কাজে যেতে হয়েছিল।'

'এখনও যোগাযোগ করছে সাংবাদিকরা,' বললেন মিস ট্রুলি। 'সবার কৌতূহল, কোথায় গেল রহস্যময় ওই শুটার।

আর পুরস্কারই বা নিল না কেন?'

'আপনার আতিথেয়তার কথা সবসময় মনে থাকবে,' বলল রানা।

'ওটা কিছু না, রানা। স্যাভানায় এলে অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার বাড়ির দরজা সবসময় তোমার জন্যে খোলা। ...এবার আরেকটা কথা, কোথায় পাঠাব আমরা তোমার পুরস্কারের ছয় লাখ ডলার?'

'ওটা আমাকে দিতে হবে না, ম্যাডাম,' বলল রানা, 'আপনার ট্রাস্টের ফাণ্ডে জমা করে নিলে খুব খুশি হব।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন মিস ট্রুলি, তারপর বললেন, 'সত্যি? এত টাকা দিয়ে দেবে তুমি?'

এ বিষয়ে টুঁ শব্দ করল না রানা, সরে গেল অন্য প্রসঙ্গে: 'তবে একটা সাহায্য চাই। আপনার কাছে কি রেভারেণ্ড স্টিভ বার্কলের ফোন নম্বর আছে? তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু বই কিনব। দারুণ লিখেছেন ভদ্রলোক।'

'খুব খুশি হবে,' বললেন মিস ট্রুলি। মুখস্থ করে ফেলেছেন বাটপার যাজকের ফোন নম্বর। সংখ্যাগুলো বলে গেলেন তিনি।

বিদায় নিয়ে কল কেটে দিল রানা। এবার কল করল বার্কলের ফোনে। 'হ্যালো, কেমন আছেন, বার্কলে?'

রানার কণ্ঠ শুনে চুপ থাকল লোকটা। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আছি।'

'তা হলে পেয়ে গেছেন এক শ' মিলিয়ন ডলার?'

'দু'দিন আগে,' বিস্মিত সুরে বলল বার্কলে। 'আপনি জানলেন কী করে?'

'আন্দাজ,' বলল রানা, 'ফোন করেছি জরুরি এক চুক্তি করতে।'

বড় একটা ঢোক গিলল বার্কলে। 'চুক্তি? কীসের চুক্তি?'

'ভয় পাবেন না। আপনার টাকা কেড়ে নেব না। অন্তত

সব নয়।'

'আপনার অনেক দয়া,' শুকনো গলায় বলল যাজক।

'তা ঠিক,' হাসল রানা। 'এবার শুনুন আপনার ভাঁওতাবাজি গোপন রাখার ব্যাপারে আমার শর্ত। কোনও এদিক-ওদিক চলবে না। আপনি শুনতে তৈরি তো?'

'শুনছি।'

'প্রথম কথা, দেরি না করে মিস ট্রুলির ট্রাস্টে জমা দেবেন ওই এক শ' মিলিয়নের পঁচিশ পার্সেন্ট। ওটা দিচ্ছেন শিশুদের চিকিৎসার জন্যে।'

কান্না কান্না হয়ে গেল বার্কলের কণ্ঠ, 'ঠিক আছে। আমিও ভাবছিলাম... কিন্তু একেবারে পঁচিশ ভাগ?'

'চুক্তির প্রথম অংশ,' বলল রানা। 'এবার পরের অংশ। যাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছেন, সব শোধ করার পর আপনার মনে হবে বাড়িটা নতুন করে সাজিয়ে নেয়া উচিত। এখনও তো আপনার বাড়ির দেয়াল একদম ফাঁকা, ঠিক?'

'ই... ইয়ে,' তুতলে উঠল বার্কলে। 'কিন্তু...'

'অক্সফোর্ডে প্রতিভাময়ী এক পেইণ্টার আছে, নাম লিলি রিভার্স। আমি চাই আপনি তার ওয়েব সাইট দেখবেন।'

'ওটা দেখে কী হবে?'

'আজ থেকে শিল্পী-বান্ধব হয়ে উঠছেন, বার্কলে। ওর সব ছবি উপযুক্ত দামে কিনে নেবেন। দামটা উপযুক্ত কি না, সেটা আমি পরে খোঁজ নেব। ঠকাতে যাবেন না ভুলেও।'

'এটা তো অত্যাচার,' প্রতিবাদ করল বার্কলে। 'আমি আধুনিক আর্ট পছন্দ করি না।'

'অভ্যেস তৈরি করুন,' বলল রানা। 'এবার চুক্তির তৃতীয় অংশ। মণ্ট্যানার এক খামারের বয়স্ক মালিকের দরকার কিছু টাকা। কে বা কারা যেন গোলাগুলি করে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওই খামারের। নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে সব। দরকার একটা-দুটো নতুন পিকআপ ট্রাক। সঠিক সময়ে

পেয়ে যাবেন তার ঠিকানা আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর। দেরি করবেন না টাকা পাঠিয়ে দিতে।'

'কত দিতে হবে?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল বার্কলে।

'রাউণ্ড ফিগার দেয়াই ভাল,' বলল রানা। 'ধরুন, এক মিলিয়ন ডলার।'

ওদিক থেকে এল দীর্ঘশ্বাসের ফোঁস আওয়াজ। 'আপনি খুন করে ফেলছেন আমাকে, রানা!'

'আপনাকে খুন করব বলেই ভাবছিলাম,' বলল রানা। 'পরে ভাবলাম, শেষ করে না দেয়াই ভাল। ...এবার শুনবেন চুক্তির পরের অংশ?'

হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো বার্কলের কণ্ঠ, 'বলুন।'

'ঠিক আছে, তা হলে শুনুন, জর্জিয়ায় আছে এক উকিল। তার পা-দুটো অপারেশন করে ঠিক করতে হবে।'

'পিছলা সিম্পসন?' কাতরে উঠল বার্কলে। 'আপনি চান ওই হারামজাদাকে টাকা দেব আমি?'

'ধরেছেন ঠিক,' বলল রানা। 'এ ছাড়া, তাকে বাড়তি কিছু টাকা দেয়াও খারাপ হবে বলে মনে হচ্ছে না। নতুন করে শুরু করতে পারবে প্র্যাকটিস। ধরুন, তিন লাখ ডলার দিলেই চলবে। ...না, না, পাঁচ লাখ দেয়াই ভাল।'

পাথর হয়ে গেছে স্টিভ বার্কলে।

'আরেকটা কথা, মন দিয়ে শুনবেন,' বলল রানা। চুপ হয়ে গেল। এবার যে বিষয়ে বলবে, ওটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওর কাছে। 'তৈরি করবেন একটা ট্রাস্ট। সব মিলে দশ লাখ ডলার।'

'কার জন্যে?' নাক টানল বার্কলে। 'আপনার?'

'অনাগত এক শিশুর জন্যে,' বলল রানা। 'ওকে অন্তর থেকে ভালবাসি। আঠারো বছর হওয়ার পর ও ওই টাকা পাবে। ততদিনে বাড়বে টাকা। ক'দিনের ভেতর লণ্ডনের এক উকিল যোগাযোগ করবে আপনার সঙ্গে। তার কাছে থাকবে

দরকারি সব কাগজ। সই করে দেবেন।'

রানা ভেবে দেখেছে, যা ঘটে গেছে, এরপর কখনও ওকে মাফ করবে না মউরোসের স্ত্রী জোয়ি। মুখে বলে বোঝাতে পারবে না ও, দোষ ছিল না ওর। তবে যদি টাকার ব্যবস্থা করে, তা পরে কাজে আসবে মউরোসের সন্তানের।

'আমি কি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি, আপনাকে কী কী করতে হবে?' জানতে চাইল রানা।

'বুঝেছি,' বিড়বিড় করল স্টিভ বার্কলে। 'কিন্তু চুক্তির এসব ভাল দিক যদি মেনে নিতে না চাই?'

'আমার চোখ থাকবে আপনার ওপর, বার্কলে। তেড়িবেড়ি করলে বুঝবেন, ধার দেয়া লোকদের মত অতটা নরম মনের মানুষ আমি নই। আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে মিস ট্রুলির, সব শেষ হয়ে যাবে তাঁর। জানিয়ে দেব আপনার মত ঠগ লোক কমই হয়। শুধু তা-ই নয়, প্রথম ফ্লাইটে চেপে হাজির হব জর্জিয়ায়। পরে লোকে বলবে, কী ভয়ঙ্কর করুণ ভাবেই না মরল স্টিভ বার্কলে! জানেন তো, আমি আবার এককথার মানুষ।'

'আপনি তো এরপর বলবেন, আরও দশ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে ওই বেশ্যা বেটি ক্যাথি হার্বার্টকে,' গুঙিয়ে উঠল ভণ্ড যাজক।

'না, ওই টাকা রেখে দিন নিজের কাছে। আপনার কাছ থেকে আর একটা ফুটো পয়সাও প্রাপ্য নেই ওই মেয়ের।'

চুপ হয়ে গেল দু'জন। হিসাব কষছে বার্কলে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তার মানে, আমার আর কোনও উপায় নেই?'

'আসলেই নেই,' বলল রানা।

গভীর আরেক গোঙানি ছাড়ল যাজক। 'ঠিক আছে। আপনি জিতে গেলেন, রানা। রাজি আছি এই চুক্তিতে।'

রানা ফোন রেখে দেখল, কখন যেন দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। রানা কিছু বলার আগেই হাসল

মেয়েটা। 'চুক্তি তো শেষ, নাস্তা রেডি। এসো।'

ডাইনিং রুমে পা রেখে রানা বুঝল, আজ টেবিলে অন্তত আট-দশটা সুস্বাদু খাবার। খুশি হয়ে উঠল রানার অন্তরটা। ভাল খাবার কার না পছন্দ? যদি সে খাবার এমন মমতার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়?

টুক করে একটা চুমু দিল ও রেবেকার গালে।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

দুরাত্মা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: ইসমাইল আরমান

এক নামে সবাই চেনে তাকে।
লিম ওয়ান-জু, ওরফে অ্যাণ্ডি লিম–
মহাপরাক্রমশালী এক কোরিয়ান ধনকুবের।
সেধে তার সঙ্গে টক্কর দিতে গেছে রানা,
তার ফলও পেতে চলেছে হাতে-নাতে।
ওর সামনে এখন মেলে ধরা হয়েছে তাসের ডেক,
একেকটা তাসে একেক ধরনের মৃত্যুর পন্থা লেখা।
সেখান থেকে বেছে নিতে হবে একটা।
অস্ত্রের মুখে তাস টানতে বাধ্য হলো রানা।
ফলাফল? জ্যান্ত কবর দেয়া হবে ওকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ শাওন হোসেন রাজু
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩।

পাজির পা ঝাড়া রিচার্ড বজ্রপাতে জ্বলেপুড়ে কাবাব হয়ে গেছে জেনে সত্যি বলতে কী, খানিক দুঃখ পেয়েছি। ব্যাটার আরও কষ্ট পেয়ে মরা উচিত ছিল।

অপরের জন্য গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তেই পড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে ডক্টর ভেলর, ব্যাপারটা চরম আনন্দের ছিল। ভেবেছিলাম রানার সাথে ওর একটু রোমান্স হবে। নিরাশ হতে হলো–তবে মৃত্যুটা চমৎকার।

মাকড়সার জালে বন্দি একটা মৌমাছির কেমন লাগে? অবশেষে যদি দেখা যায়, সেই মৌমাছিটাই জালটির মালিক মাকড়সাকে খেয়ে হজম করে ফেলেছে, তখনকার অনুভূতি? মাসুদ রানা সিরিজের ৪৪৯ নম্বর বই 'ইসাটাবুর অভিশাপ' পড়ে উপরোক্ত ঘটনাটির মতই উত্তেজিত হয়েছি। রানাকে ফাঁদে ফেলে খেলা চলছে, উপভোগ করার মতই কাহিনী বটে। চমৎকার বইটি উপহার দেবার জন্য আপনাকে ও সায়েম দাদাকে অনেক ভালবাসা।

❋ আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমরা দুজনেই খুশি। চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

গহন আহমেদ
মিরপুর ১০, ঢাকা ১২১৬।

এই সিরিজের প্রত্যেকটি বই-ই উত্তেজনাকর; রোমাঞ্চকর সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সঙ্গে বিপুল পরিমাণ তথ্যে ঠাসা। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় প্রতিটি কাহিনীর আড়ালে বাস্তব দুনিয়ার সত্যিকারের

কিছু ন্যায়-অন্যায়ের গল্প। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার এই বাংলাদেশকে নতুন করে ভালবাসতে শিখেছি রানার কাছ থেকে। কীভাবে জীবনের বিপদসঙ্কুল প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাসী হতে হয়; কীভাবে আর কেন বেছে নেয়া উচিত ন্যায়ের পথ–সব কিছুই শিখেছি আমি রানার কাছে। এজন্য আমি রানা ও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। রানা আমার কাছে নিছক কোনও গল্পের নায়ক নয়। বাস্তব জীবনের এক অমূল্য বন্ধুই মনে করি আমি তাকে–এক অতুলনীয় বন্ধু। ধন্যবাদ, কাজীদা।

ওহ্, একটা প্রশ্ন ছিল! *boighar.com*

রানার প্রতিটি বই-ই টুকিটাকি অনেক তথ্যে ভরা। যেমন: 'ট্রেজার হান্টার ১'-এ জানতে পেরেছি এসআর ৯০ অর্থাৎ স্ট্রনটিয়াম ৯০ সম্পর্কে। আবার অন্য একটি বইয়ে (নামটা মনে নেই) পেয়েছিলাম এই তথ্যটি: 'মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ঠাণ্ডা আর ৪০ নট বাতাসের সমন্বয়কে বলে উইণ্ডচিল। এর মাঝে কোনও মানুষ পড়লে জমাট বরফ হতে সময় নেয় মাত্র দেড় মিনিট।'

এরকম আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য (বিভিন্ন অস্ত্র, আবহাওয়া ও এলাকা বিষয়ক) পাওয়া যায় রানার প্রত্যেকটি বইয়ে। সবগুলোই কি আমি নির্ভুল হিসেবে ধরে নিতে পারি?

❋ আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি রানা-বই পড়েন–শুধু পড়েন না, ভালও লাগে জেনে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে হচ্ছে। আপনি জানেন রানা সিরিজের বেশিরভাগ বই-ই বিদেশি বইয়ের ছায়া নিয়ে লেখা। সে-সব বইয়ের তথ্যগুলো অনেক সময় নির্ভুল কি না যাচাই না করেই আমাদের নিতে হয় সময়-স্বল্পতার কারণে। তবে যেহেতু বিদেশি পাঠক আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন, সেহেতু ধরে নেয়া যায় তথ্যগুলো নির্ভুলই। তবু নেট থেকে যাচাই করে নেয়া সবচেয়ে ভাল।

উনুসিং মারমা *boighar.com*

marmaunusing@gmail.com

মাসুদ রানার নতুন বই 'ধর্মগুরু' অর্ধেকটা পড়ে ফেললাম। ভালই লেগেছে নতুন চরিত্র 'বেলা আবাসি'কে। আর ভাল লেগেছে বইটির সূক্ষ্ম রসগুলো। রানা আর লাবনীর রসায়নটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছি। বইটি যে গতিতে শুরু হয়েছে, মনে হয় না শেষ না করে উঠতে পারব। কিন্তু ২১৭ পৃষ্ঠাতে এসে একটু থামতে হলো। সেখানে কাদির ওসাইরিস লাবনীর কাছে 'টেলোমার্স' সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। প্রথমে ভেবেছি এটা হয়তো এমন কিছু, যার সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। পরের দুই পৃষ্ঠা পড়ে ধারণা করলাম, এখানে হয়তো 'টেলোমেয়ার্স' (Telomeres) সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই কি, কাজীদা?

❋ ঠিক বলেছেন: টেলোমেয়ার্সই হবে। বেলা আবাসিকে আমারও খুব ভাল লেগেছে। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই *boighar.com*

২২/১/১৮ দ্য বডিগার্ড (অনুবাদ) তৌফির হাসান উর রাকিব সম্পাদিত

বিষয়ঃ প্রিয় পাঠক, আপনি যদি স্যর আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, রাফায়েল সাবাতিনি, এইচ. পি. লাভক্র্যাফট, নীল গেইম্যান, রবার্ট ব্লক, সাকি, লী চাইল্ড, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন, গী দ্য মঁপাসা, এরিখ কেস্টনার, মিখাইল শলোকভ, জেমস হোল্ডিং, জেফরি আর্চার, টম ফ্যাবিয়ান, লরেন্স ব্লোক, জ্যাক রিচি প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের ভক্ত হয়ে থাকেন; তবে 'দ্য বডিগার্ড' বইটি আপনারই জন্য।

আরও আসছে *boighar.com*

২৭/১/১৮ রহস্যপত্রিকা (৩৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা) ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

১/২/১৮ ভন-ভন মাছি!+নিষিদ্ধ নগরী+রেলগাড়িতে খুন+মূর্তি-রহস্য+
কুয়াশা-দানব (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৪৪) শামসুদ্দীন নওয়াব

৭/২/১৮ দুরাত্মা (রানা-৪৫৫) কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগীঃ ইসমাইল আরমান